সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : হরিপুরা পোস্টার (শ্রী বিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই সংখ্যায় ছবি এবং আলোকচিত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শ্রীবিশ্বরূপ বসুর নাম। নিজের অমূল্য সংগ্রহ ব্যবহার করতে দিয়েছেন তিনি। শান্তিনিকেতনের কলাভবন ও রবীন্দ্রভবন, নয়াদিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডর্ন আর্ট, কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, রবীন্দ্রভারতী এবং লণ্ডনের অ্যালবার্ট এণ্ড ভিকটোরিয়া মিউজিয়ামের সৌজন্যে বিভিন্ন ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শান্তিদেব ঘোষ, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার কয়াল, রেণুকা কর ও অনুকণা খাস্তগির ছবি ও আলোকচিত্র দিয়েছেন।

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাঞ্ছাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়
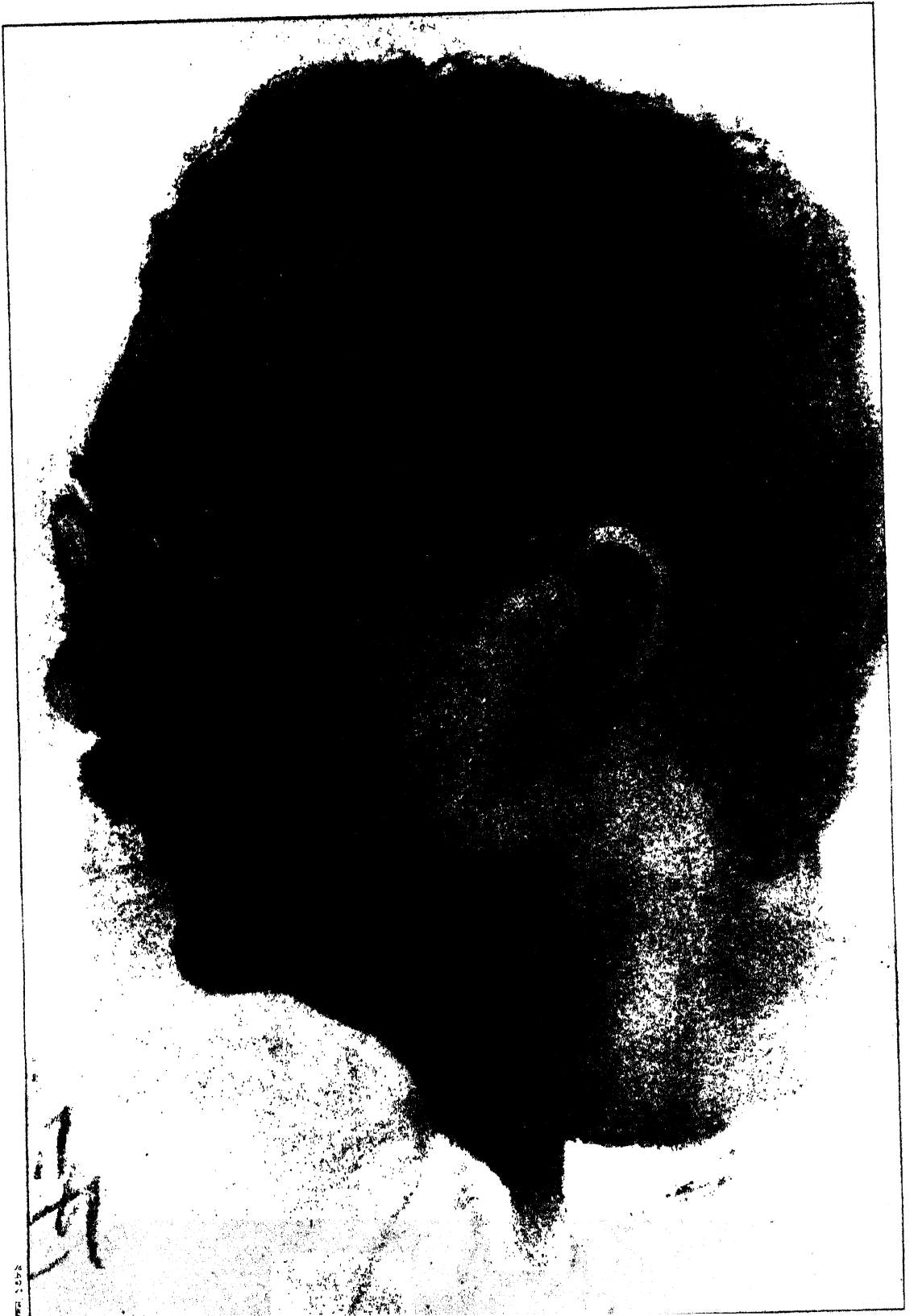
জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন

এ বছর রূপকার নন্দলাল বসুর জন্ম-শতবর্ষ। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্ম উৎসর্গ করেছিলেন কলা-সরস্বতীর পাদমূলে। বস্তুত সমকালীন আর কোনো ভারতীয় শিল্পীর কর্মজীবন এমন পরিপূর্ণভাবে শিল্পকলার জন্য নিবেদিত হয়নি।

তাঁর অগ্রজ এবং অনুজ শিল্পীরা যেখানে শুধুই নিজের কাজ এবং বৈষয়িক উন্নতির সম্বন্ধে ভেবেছেন, সেখানে তিনি নিজের কাজ সম্বন্ধে শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে শিল্পকলার সব দিক নিয়েই চিন্তা করেছেন—রূপায়ণের করণকৌশলগত সমস্যা থেকে নন্দনতত্ত্বের সূক্ষ্ম ভাবনা ছাড়াও, শিল্পকলার অধ্যাপনা, শিক্ষাক্রম, ছাত্র মনস্তত্ত্ব, পরম্পরা ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ভেবেছেন। চারুকলা আর কারুকলার সম্পর্ক, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, শিল্পের উপকরণ, মাধ্যম, উপজাত এবং ব্যবহারিক দিক নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা শিল্পকলাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর এই সব চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতার পেছনে ছিল গভীর স্বাদেশিকতা বোধ, তাই অন্তরের নির্দেশেই তিনি শিল্পকলার অঙ্গন বিস্তৃত করেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের আদিগন্ত ভূমিতে। শিল্পী যে জলটুঙ্গি বা কাচঘরের বাসিন্দা নন, কিংবা রুদ্ধ দুর্গের দুর্গেশ নন, একথা আজীবন প্রমাণ করে গেছেন তিনি। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে নন্দলাল অনুকরণীয় আদর্শ। জন্মশতবর্ষে শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই এবারের "দেশ" বিনোদন নন্দলাল বসু সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হল। তাঁর ব্যক্তিত্বের নানামুখী আত্মপ্রকাশ ও বিরাটত্বের পরিমাপে এই আয়োজন হয়তো যৎসামান্য, আড়ম্বরহীন, কিন্তু সাধ্যমতো আন্তরিক।

আধুনিককালের প্রথম পর্বে ভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রচর্চার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা কেমন করে ক্রমে লৌকিকতার স্পর্শে অলৌকিক হল, কিভাবে সশিষ্য তিনি একাজে নেতৃত্ব দিলেন, তা ভারতীয় সমকালীন শিল্পকলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কয়েক বছর আগে চারজন শিল্পীকে জাতীয় শিল্পীর মরণোত্তর মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় এবং অমৃত শেরগিল। মনে হয়, এঁদের মধ্যে ভূমিকার বৈচিত্র্যে নন্দলাল দ্বিতীয় রহিত।

"দেশ"-এর জন্মলগ্ন থেকে এ পত্রিকার সঙ্গে নন্দলালের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর অজস্র ছবি আর রেখাচিত্র 'দেশ'-এর সাধারণ এবং শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পূজা সংখ্যার জন্য শ্রী শ্রীদুর্গার আলেখ্য এঁকেছেন বহুবার। এ ছাড়া গত পঞ্চাশ বছরে কত ছবি এঁকে দিয়েছেন তাঁর কোনো হিসাব নেই। এমন কি চিত্রচর্চা বিষয়ে তাঁর সচিত্র প্রবন্ধও ধারাবাহিক বেরিয়েছে এই পত্রিকায়। সুতরাং জন্ম শতবর্ষে এই শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় পত্রিকার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের কথা মনে পড়বেই। তাঁর অশেষ ঋণ অপরিশোধ্য। আমাদের প্রচেষ্টা ঋণশোধ নয়, অন্তর উৎসারিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

এই সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে বহুজনই তাঁদের উপদেশ, লেখা, সংগৃহীত ছবি এবং আলোকচিত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

৪

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন

পিতা পূর্ণচন্দ্র বসুর কর্মস্থল বিহারের মুঙ্গের-খড়গপুরে ১৮৮২ সালের তেসরা ডিসেম্বরে নন্দলালের জন্ম হয়। বাল্যকাল তাঁর খড়গপুরে কাটে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই সমাপ্ত করেন। কলকাতায় এসে ক্ষুদিরাম বসুর সেণ্টরাল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে কুড়ি বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পরে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এফ, এ, ক্লাশে ভর্তি হলেন, কিন্তু পরীক্ষায় আর উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হলেন এবং সেখানেও অকৃতকার্য হয়ে শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে কমার্স ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রচলিত বাঁধাধরা শিক্ষার প্রতি মন ও আকর্ষণ না থাকায় ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। ছোটকাল থেকেই শিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিল। খড়গপুরে গ্রামের দক্ষ শিল্পী কুমারের প্রতিমা নির্মাণ দেখে নিজেও কাদামাটি নিয়ে দেবদেবীর মূর্তি গড়তেন। কলকাতায় পুরনো বইয়ের দোকানগুলিতে ঘুরে ঘুরে ছাপান ছবিওয়ালা পত্রিকা এবং র‍্যাফেল ও অন্যান্য শিল্পীদের আঁকা ছাপানো ছবির নকল কিনতেন। এমনিভাবে কলকাতায় তাঁর ছয় মাস কেটে যায়। একদিন অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছাপানো ছবি দেখতে পেয়ে তিনি মুগ্ধ হন এবং জীবনের লক্ষ্যপথের যেন সন্ধান পেলেন। তাঁর এক পিসতুতো ভাই অতুল মিত্র তখন কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের আঁকা কিছু ছবি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর শিষ্যত্বলাভের আশায়। আর্ট স্কুলে তখন অবনীন্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষের পদে কাজ করছিলেন। ভর্তি পরীক্ষায় বসলে তাঁকে প্রমাণ আকারের একটি ড্রইং কাগজ দিয়ে বলা হল সামনে রাখা সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তিটি দেখে আঁকবার জন্য। সাধারণত কাগজের মধ্যে যতটা সম্ভব বড় করেই সকলে ড্রইং করে বলে কাগজের সবটা জুড়ে আঁকতে হবে কিনা এ কথাটা বলা হয়নি। এই না বলার সুযোগ নিয়ে নন্দলাল ড্রইং কাগজের এককোণে ছোট্ট করে গণেশের মূর্তিটি অতি নিপুণভাবে এঁকে দিলেন। অধ্যক্ষ ই, বি, হ্যাভেল ছোট্ট ড্রইংটি দেখে ভারি খুশি হয়ে অবনীন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান পেইন্টিং ক্লাসে ভর্তি হবার অনুমতি দিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদের নিকটেও তাঁকে চিত্র বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ঈশ্বরী প্রসাদ ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির একজন দক্ষশিল্পী, নানা কলাকৌশল জানতেন। মুঘল চিত্রের চার পাশে বোর্ডারে কাগজের উপর সোনার পাতলা তবকের ছোট ছোট টুকরো লাগানো থাকে। কি উপায়ে সোনার তবক লাগান হয় এ বিদ্যা তাঁর জানা ছিল। তিনি নিজেও তাঁর ছবির বোর্ডারের উপরে সোনার তবক লাগাতেন। কিন্তু এই বিদ্যা ছাত্রদের কিছুতেই শিখাতেন না। নন্দলালের কৌতূহলের সীমা ছিল না এই বিদ্যা জানতে। একদিন ভৃত্য ক্লাসের আবর্জনাগুলিকে ঝাঁট দিচ্ছিল। তার মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন কতগুলি টুকরো অভ্রের পাত। সেগুলিকে কুড়িয়ে যখন ভালোভাবে দেখলেন তখন লক্ষ্য করলেন অভ্রের পাতে বিক্ষিপ্ত সব ছোট ছোট অনেকগুলি ঈষৎ লম্বা ধরনের ছিদ্র। বুদ্ধিমান ছাত্র নন্দলাল সোনার তবক লাগাবার বিদ্যাটা বুঝে নিলেন। তাঁর একটি ছবির বোর্ডারের কাগজে সোনার তবক লাগিয়ে যখন ঈশ্বরী প্রসাদকে দেখালেন তখন লুকোনো বিদ্যা বেফাঁস হয়ে যাবার জন্য দুঃখ না করে ছাত্রের কৃতিত্বে প্রশংসা করেছিলেন। তারপর থেকে দুপুর বেলায় ক্লাসের মধ্যে তিনি রোজ যে কমলা লেবু খেতেন তার থেকে নন্দলালকেও সামান্য ভাগ দিতেন। সোনার তবক লাগাবার বিষয়ে গল্প করতে গিয়ে নন্দলাল বলেছিলেন ছবির বোর্ডারের কাগজে যে স্থানে সোনার তবক লাগানো হবে সেখানে পাতলা করে মিছরির জল লাগিয়ে নিয়ে তার উপরে অভ্রের পাতটি বসিয়ে দিতে হবে। সোনার তবকটি নিয়ে অভ্রের পাতের উপর বসিয়ে ধীরে ধীরে উপর থেকে ঘষে দিলে তবকটি কেটে কেটে অভ্রের পাতের ছিদ্র দিয়ে মিছরির জলে কাগজের উপরে এঁটে যাবে। কলাকৌশল সামান্য হলেও প্রণালীটি না জানলে কাজটি করা কঠিন।

শেষ বয়সে কাগজ ছিঁড়ে ছবি করতেন তারই একটা নমুনা "পাখির ছা"

কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের নিকটে নন্দলাল পাঁচ বছর শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ হয়। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে স্নেহ করতেন এবং নানাভাবে সুপরামর্শ দিতেন। ইতিমধ্যে হ্যাভেল আর্ট স্কুল ত্যাগ করে চলে যান এবং তাঁর স্থানে অধ্যক্ষের পদে এলেন পার্সি ব্রাউন। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে উপাধ্যক্ষের পদে আর্ট স্কুলে আনবার যখন প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দুপুরে দিবানিদ্রা দেবার ও ঘন ঘন তামাক খাবার অভ্যাস থাকায় এই অবস্থায় আর্ট স্কুলে যোগ দেব কি করে?" হ্যাভেল একথা শুনে বলেছিলেন এর জন্য এত ভাবনা কিসের, কোনো অসুবিধা হবে না, আর্ট স্কুলে একটা বিছানার ব্যবস্থা থাকবে ও আলবোলা এবং তামাকেরও আয়োজন থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ কাজে যোগ দিয়ে খুব আনন্দের সঙ্গে কাজ করে চলেছিলেন। ছাত্রগণ

এত আগ্রহ ও নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছেন যার জন্য খাতায় ছাত্রদের নাম ডাকার প্রয়োজন অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন নি। হ্যাভেলেরও এ বিষয়ে কোনো আপত্তি ছিল না। পার্শি ব্রাউন ছিলেন কেতাদুরস্ত অফিসার। একদিন অবনীন্দ্রনাথ ক্লাসে ছাত্রদের শেখাচ্ছেন এমন সময় পিয়ন একটি খাতা নিয়ে এসে উপস্থিত। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ক্লাসের ছাত্রদের নাম ডাকার জন্য খাতাটি পাঠিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ খাতাটি নিয়ে ছিঁড়ে পিয়নের হাতে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে বিরোধ বাধতে লাগলো। একবার অবনীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যের কারণে ছুটির জন্য দরখাস্ত দিলেন, পার্শিব্রাউনও বিলাত যাবার জন্য মনস্থ করলেন। কে আগে ছুটি নেবেন এই বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাদবিতণ্ডা হয়। পার্শিব্রাউন বলেন, যেহেতু তিনি প্রিন্সিপ্যাল সেই কারণে তাঁর ছুটির দাবী প্রথমে বিবেচ্য হওয়া উচিত। অবনীন্দ্রনাথ যুক্তি দেখালেন যে স্বাস্থ্যের জন্য যখন ছুটি চাইছেন তখন তাঁকেই প্রথমে ছুটি দিতে হবে। অনেক তর্কাতর্কির শেষে চটে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ হাতের লাঠিটি মেঝের উপরে জোরসে ঠুকে বললেন, "তোমার মত সাহেবকে আমি কমই তোয়াক্কা করি, রইল তোমার আর্ট স্কুল, আমি চললাম।" এই বলে আর্ট স্কুল ত্যাগ করে চলে এলেন। এই ঘটনার শেষে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদল নন্দলাল, অসিতকুমার, শৈলেন দে, ক্ষিতীন মজুমদার আরো কয়েকজন ছাত্র আর্ট স্কুল ত্যাগ করে চলে এলেন। অধ্যক্ষ পার্শিব্রাউন আর্ট স্কুলে নন্দলালকে কাজ দিতে চেয়েছিলেন।

আর্ট স্কুল ছেড়ে চলে আসার পর নন্দলাল ও তাঁর সহপাঠী শিল্পীরা মহা ভাবনায় পড়লেন তারপরে কি করা যায় বলে। প্রথমে ঠিক হলো যে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সকলে একত্রে ছবি আঁকার কাজ করবেন এবং তার সঙ্গে কমার্শিয়াল কাজের অর্ডারও গ্রহণ করবেন। অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি জোড়াসাঁকোর নিকটে ঘর ভাড়া নেবার কথা হলো এতে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষারও সুবিধা হবে বলে সকলেই মনে করলেন। এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জোড়াসাঁকোর নিজের ষ্টুডিওতে কাজ করবার জন্য নন্দলালকে ডেকে পাঠালেন। এই প্রস্তাব নন্দলাল আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে মাসিক ষাট টাকা বৃত্তি দিতেন। অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে এই সময়ে জাপানের বিখ্যাত মনীষী ও শিক্ষাবিদ ওকাকুরা, শিল্পী টাইকান, শিল্পী হিশিদা, বিখ্যাত চিত্র সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে নন্দলালের পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। এই সব বিদেশী মনীষীরা নন্দলালের জীবনে আদর্শের দিক দিয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর একটি চিত্রের জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই টাকা নিয়ে ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারত ও ওড়িষার ভ্রমণে বিখ্যাত চিত্র সমালোচক ও, সি, গাঙ্গুলী, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি, প্রমথনাথ গাঙ্গুলীদের দলের সঙ্গে যান। অজন্তা, ইলোরা, এ্যালিফ্যাণ্টা এবং ওড়িষার বিখ্যাত মন্দিরগুলি খুব ভালো করে এই সময়ে দেখেন।

১৯০৯ সালে লেডি হেরিংহ্যাম বিলাত থেকে ভারতে এলেন অজন্তা গুহার ভিত্তি চিত্রের নকল করবার জন্য। ভগিনী নিবেদিতার আগ্রহে এবং অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টায় নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত ইত্যাদি কয়েকজন তরুণ শিল্পী লেডি হেরিংহ্যামের সহকারী হিসাবে অজন্তায় কাজ করেছিলেন। নন্দলাল সেখানকার কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন অজন্তার অনেক ভিত্তিচিত্র এত বিবর্ণ ও ম্লান হয়ে গেছে যে তাদের নকল করতে গিয়ে তার উপরে ট্রেসিং কাগজ রাখলে নীচের রেখা ভালো করে দেখা যায় না। সমরেন্দ্র গুপ্ত অজন্তার ভিত্তি চিত্রের বিখ্যাত ছবি মৃত্যু সম্ভবা রাজকুমারীর (Dying Princess) নকল করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ট্রেসিং কাগজে মূল চিত্রের রেখা দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি কেরোসিন তেলে এক টুকরো ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিত্তি চিত্রের গায়ে হালকাভাবে লাগিয়ে দিতে ছবিটা একটু স্পষ্ট দেখা যায়। তখন খড়িমাটি নিয়ে ছবির রেখাগুলির উপরে দাগ কেটে দিতে লাগলেন, ভাবলেন এতে ট্রেসিং করবার সুবিধা হবে। তিনি যখন এই প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত তখন হঠাৎ লেডি হেরিংহ্যাম তাঁকে দেখে ফেলেন। সমরেন্দ্র গুপ্তের এই কাজে লেডি হেরিংহ্যাম এত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হলেন যে তিনি খুব বিরক্তি ও দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন "তুমি একজন ভারতীয় শিল্পী, কি করে এই অপূর্ব ছবির গায়ে এমনিভাবে কেরোসিন তেল লাগিয়ে খড়িমাটি দিয়ে দাগ কাটতে সাহস করেছ, ইত্যাদি।" পরবর্তীকালে অজন্তা গুহায় গুরু নন্দলালের সঙ্গে যখন ভিত্তিচিত্রগুলি দেখছিলাম তখন সেই ডাইং প্রিনসেসের ছবিটি দেখিয়ে তাঁর পুরনো স্মৃতিকথা আবার উল্লেখ করেছিলেন।

জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িতে "বিচিত্রা" সভা স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শিল্প ইত্যাদি চর্চার স্থান করে দিয়েছিলেন। কবিগুরু তাঁর বহু প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ইত্যাদি কলকাতা শহরের সাহিত্য রসিক ও গুণী ব্যক্তিদের নিকটে এখানে পড়ে শুনিয়েছেন। চিত্র প্রদর্শনী, সঙ্গীত ও অভিনয় ইত্যাদির অনুষ্ঠানও মাঝে মাঝে এখানে হয়েছিল। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নন্দলাল বিচিত্রায় এসে যোগদান করেন। জাপানের খ্যাতনামা শিল্পী আরাইসান বিচিত্রায় অতিথি হিসাবে কিছুকাল বাস করে যান। তখন নন্দলাল জাপানী চিত্রণরীতি তাঁর কাছে শিক্ষা করেন। উভয় শিল্পীর মধ্যে তখন গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। আরাইসান শান্তিনিকেতনেও বেড়াতে আসেন। ৭ই পৌষ উৎসবের মেলায় যাত্রার আসরে যাত্রার শিবকে দেখে আকৃষ্ট হন এবং খুব নিবিষ্ট মনে স্কেচ করতে দেখেছিলাম। বিচিত্রা গৃহে এক সময় রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ পারুল ঠাকুর, ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা অরুন্ধতী দেবী ও আরো কয়েকজনকে নন্দলাল ছবি আঁকা শেখাতেন।

শান্তিনিকেতনে নন্দলালের প্রথম আগমন ১৯১৪ সালের শীতকালে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সমস্ত আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগে আম্রকুঞ্জে নন্দলালকে উপযুক্তভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সৌম্য মূর্তি নবীন শিল্পী নন্দলালের প্রতিভার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই সংবর্ধনায় শিল্পীর উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। এই সময়ের একটি কথা মনে আছে, আমরা কয়েকজন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র দুপুরবেলায় ছাতিমতলার বড় বড় লতায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় খাকী সবুজ রঙের গরম কাপড় ভায়লার চুরিদার পাঞ্জাবী পরে এক ভদ্রলোক লাল নীল পেন্সিল দিয়ে সাদা কার্ডে আমাদের স্কেচ করছিলেন। একটু পরে আগ্রহ সহকারে তাঁর নিকটে গিয়ে স্কেচটি দেখছিলাম। আমাদের মধ্যে একটি ছাত্র চুপিচুপি বললে ইনিই হচ্ছেন নন্দলাল বসু। জীবনে সেই প্রথম তাঁকে দেখেছিলাম। প্রবাসী পত্রিকায় ছাপানো তাঁর কতগুলি ছবি পূর্বেই দেখেছিলাম বলে তাঁর নামটা আমাদের জানা ছিল। ১৯১৭ সালের তেসরা জুলাই সুরেন্দ্রনাথ কর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আমাদের ড্রইং ক্লাসের শিক্ষক হয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। তিনি নন্দলালের পিসতুতো ভাই। তাঁর শিল্প শিক্ষা নন্দলালের নিকটে হয়।

কলাভবনের গোড়াপত্তন হল ১৯১৯ সালে, তখন অসিতকুমার হালদার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। নন্দলালও কলাভবনে যোগদান করেন কিন্তু কয়েকমাস পরেই অবনীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়ানুসারে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টসে চিত্র বিদ্যা শিক্ষণের ভার গ্রহণ করে কলকাতায় ফিরে গেলেন। তারপরে ১৯২০ সালে স্থায়ীভাবে কলাভবনের কাজে এসে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ কর গোয়ালিয়র দরবারের নিমন্ত্রণে বাঘগুহার ভিত্তি চিত্রের নকল করতে যান। ১৯২২ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কোনো বিষয়ে যেমন ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও পথপ্রদর্শক তাঁরা বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েই আবির্ভূত হন। বর্তমানকালে ভারতীয় শিল্পজগতে তাঁর অপূর্ব শিল্পসৃষ্টির দ্বারা শ্রেষ্ঠ ও পথপ্রদর্শক হিসাবে শিল্পাচার্য নন্দলাল বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসের যুগসন্ধিকালে তাঁর আবির্ভাব। এই দেশের শিল্পের গতি যখন প্রায় স্তব্ধ, ক্ষয়িষ্ণু ও ম্রিয়মান, তখন নবপ্রাণের সঞ্চার করেছিলেন গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রিয় শিষ্য নন্দলাল। বিশে শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল অঙ্কনরীতির ভিন্ন ভিন্ন প্রচলন থাকাতে সমগ্রভাবে ভারতীয় স্কুল বা অঙ্কন শৈলীর স্বীকৃতি লাভের যোগ্যতা তাদের কারোরই ছিল না। কাংড়া, বাসুলী, রাজপুত, মুঘল ইত্যাদি নামে সেই সব স্কুলগুলি পরিচিত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর বা স্কুলের তাদের নিজস্ব ধরনের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অঙ্কনের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যেও

আণ্ডা ও কুঁকড়ো

লেখককে নববর্ষের আশীর্বাদ, ১৯৫৮

একটা গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল। রাধাকৃষ্ণ, রাজা মহারাজা, মুঘল সম্রাটগণ, বাদশা, ওমরাহ, প্রেম বিষয়ক রাগমালা এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ে অনেক চিত্র সেকালে আঁকা হয়েছে। তবে নিজেদের গণ্ডী অতিক্রম করে শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও অঙ্কন শৈলীর আদানপ্রদানের বিশেষ সুযোগ তখনকার দিনে ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় শিল্প জগতে নূতন পটভূমির সূচনা হয়। ই· বি· হ্যাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী, ওকাকুরা, টাইকান এঁদের সংস্পর্শে এসে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্প বিষয়ে মানসিকতা প্রসার লাভ করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্প জগতের দ্বার ভারতীয় শিল্পীদের নিকটে উন্মুক্ত হয় এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুস্থ সমন্বয় রূপায়িত হয়।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন অজন্তা, ইলোরা, মহাবলীপুরম, কোনারক মন্দির ও উড়িষার অপূর্ব ভাস্কর্য, বাঘ গুহা ইত্যাদি নন্দলাল অতি আগ্রহ সহকারে দেখেছেন, অনুশীলন করে মনে প্রাণে আনন্দ পেয়েছেন। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই এই মহান শিল্পীর কলাসৃষ্টির মধ্যে আধুনিক কাব্যিক সাবলীলতা, তারই সঙ্গে ক্লাসিক্যাল শিল্প সৃষ্টির ধ্রুপদী মেজাজ। তাছাড়াও আরো দেখা যায় তাঁর রূপ সৃষ্টি একটি দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। নন্দলাল পাশ্চাত্যের এবং ইজিপ্ট, পারসীক, চীন, জাপান ইত্যাদি বিদেশী শিল্পগুলি ভালো করে দেখেছেন এবং তার থেকে আনন্দ পেয়েছেন, কিন্তু যেখানে তিনি শিল্পী হিসাবে কাজ করছেন সেখানে তিনি ছিলেন খাঁটি ভারতীয় শিল্পী, নিজের সত্তাকে কখনও ক্ষুন্ন করেননি।

কলাভবনের কাজে যখন তিনি এসে যোগদান করেন তখন তাঁর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। ইতিমধ্যেই তাঁর কতগুলি শৈবলীলার অপূর্ব চিত্র রচনার দ্বারা শিল্পী সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নন্দলালের ধ্যানকল্পিত সুন্দর শিব হলেন চির যৌবনের প্রতীক। শ্মশ্রুবিহীন এমন সুন্দর শিবের কল্পনা একমাত্র দক্ষিণ ভারতের নৃত্যরত নটরাজের মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে। তিনি শিবের যে কয়েকটি ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে চিহ্নিত হয়েছে সতীর দেহ ত্যাগে শোকমগ্ন ধ্যানস্থ শিব, বিষপানরত শিব, সংহার নৃত্যরত শিব, অন্নপূর্ণার সম্মুখে ভিক্ষার্থী শিব। প্রথমের তিনটি শিবের আকৃতিতে যৌবনের সুন্দর রূপটি শিল্পী নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন, বিষপানরত শিব চিত্রে অজন্তার প্রভাব শিল্পী সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। এই তিনটি চিত্রের অনেক পরে শেষের চিত্রটি শিল্পী এঁকেছেন। চিত্রটি ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে কল্পনার দিক দিয়ে অনেক উন্নত ও সহজ হয়েছেন শিল্পী, করণ কৌশলের বিষয়ে এবং শিল্প রচনার সব গুণ তখন তাঁর আয়ত্তে। সকল প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অতি সাহসের সঙ্গে ভিক্ষার্থী শিবের কল্পনা করলেন তাতে দেখালেন দৈহিক গঠনতন্ত্রের কঙ্কাল ইত্যাদি। পূর্ববর্তী সকল শিবচিত্রের তুলনায় এই শিব রূপ কল্পনায় যেমন অভিনব তেমনি সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের। শিবের রূপ ও ভাবের ব্যঞ্জনায় শিল্পী যেমনি সিদ্ধহস্ত ও অনন্যসাধারণ তেমনি উমা, পার্বতী, সতী অঙ্কনে তাঁর দক্ষতার অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন। আমরা যদি বিশ্বাস করি চিত্র রচনায় শিল্পীর সত্তা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে তবে যে শিল্পী অপূর্ব শিবের ও পার্বতীর রূপ কল্পনা অন্তরে করেছেন, তাঁকে নিশ্চয়ই ধ্যান করতে হয়েছে,

সেখানে শিল্পীকে সাধক বলব।

১৯২০ সালে নন্দলাল স্থায়ীভাবে কলাভবনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি গুরুপল্লীর একটি দোতালা মাটির ঘরে তখন সপরিবারে বাস করতেন। দ্বারিক নামক গৃহের দোতালায় কলাভবন তখন অবস্থিত। ছাত্র ছাত্রীর মোট সংখ্যা দশবারোজনের বেশি নয়। নিয়মিতভাবে কলাভবনে এসে ছাত্রদের ছবির কাজ দেখানোর থেকে দু'দিন ধরে বিরত আছেন। আমার একটি ছবির কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এখন গুরু নন্দলালকে না দেখালে ছবিটি সমাপ্ত করতে পারছিলাম না। ছবিটিকে সঙ্গে নিয়ে সকালের দিকে তাঁর গুরুপল্লীর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাড়ি পৌঁছে দেখি নিস্তব্ধ, শান্ত পরিবেশ, আমি ধীরে ধীরে দক্ষিণের অপ্রশস্ত বারান্দায় গিয়ে দেখতে পেলাম নন্দলাল নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছেন। বারান্দার দক্ষিণপ্রান্তে নীচু সামান্য ভাবে কাঠের রেলিং দিয়ে স্টুডিও তৈরী করে নিয়েছেন। এইখানে বসেই তিনি আঁকতেন। আমি চুপটি করে পিছনে একটু দূরে বসে তাঁর ছবি আঁকা দেখছিলাম। ছবির কাজ প্রায় সমাপ্তির মুখে। চিত্রের বিষয় ছিল মদন ভস্মের পরে প্রত্যাখ্যাতা উমার শোক। রং গোলার পাত্রে বেশ কিছু কালো রং তৈরী করে মোটা চেপ্টা তুলিতে নিয়ে ছবির মধ্যে ডানদিকে যে পাথর আঁকা হয়েছিল তার গায়ে দৃঢ়হস্তে এখানে সেখানে ফাইনাল টাচ লাগিয়ে হাত থেকে তুলিটি রেখে ছবির সামনে বসে পড়লেন। তাঁর বসার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম এতক্ষণ ছবি আঁকায় নিবিড়ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। দূরের থেকে ছবিটি দেখবেন বলে যখন পিছনে ফিরলেন তখন আমাকে চুপটি করে বসে আছি দেখে একটু অবাক হলেন। ছবিটি বেশ বড় আকারের, এঁকেছিলেন ১৯২১ সালের শেষের দিকে। গুরু অবনীন্দ্রনাথকে এই ছবিটি দেখালে তিনি খুশী হলেন না, বললেন কিছু হয়নি, শান্তিনিকেতনে গিয়ে তোমার একি হল। তাঁর কথা শুনে নন্দলালের মনে বড় ধাঁধা লাগলো, খুবই মনে কষ্ট হল। মনের ভার নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন শান্তিনিকেতনের একটি মেয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঘাড়ের বেন্‌ট্‌টা দেখতে পেলেন। ব্যস যা চাইছিলেন তাই পেয়ে গেলেন। "উমার প্রত্যাখ্যান" এর চেয়ে আর কি কষ্টের বিষয়বস্তু হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের বিষয়কে নিয়েও তিনি কয়েকটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। এই সময়ে আঁকা তাঁর সব ছবির মধ্যেই ভারতীয় আত্মার মর্মবাণী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। চিত্রগুলি দেখলে একটি কথাই মনে আসে তা হল স্বল্পভাষী, আত্মস্থ, সংযত, চিন্তাশীল নন্দলালের আত্মার প্রতিফলন যেন এ গুলিতে পড়েছে। সমাজের অনেক বিষয়কে নিয়ে শিল্পী ছবি এঁকেছেন এবং সেইগুলিও সার্থক কলা সৃষ্টি বলে সমাদৃত হয়েছে। শিল্পী ও সাধক নন্দলালের শিল্পসৃষ্টির এই যুগের পরিবর্তন দেখা গেল যখন তিনি শান্তিনিকেতনে এসে বসবাস করলেন।

শিল্প প্রতিষ্ঠান কলাভবনের শিক্ষাপ্রদানের দায়িত্ব নিয়ে যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন শিল্প শিক্ষার প্রতি অনুরাগী একদল তরুণ শ্রদ্ধা ও নম্রতা সহকারে তাঁর কাছে এসেছে। এমন সুযোগ তাঁর জীবনে পূর্বে কখনও আসেনি। তিনি আনন্দিত চিত্তে এই তরুণ শিষ্যদের গ্রহণ করলেন। শিল্পী হিসাবে জীবনে যে সৃষ্টির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নবীন শিষ্যদের গড়ে তোলবার কাজে লেগে গেলেন। তবে একটি কথা কখনও ভুলে যাননি শিক্ষকতা করলেও যেন "মাষ্টার বনে না যান"। এই বাক্য গুরু অবনীন্দ্রনাথ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও উচ্চারণ করেছিলেন। নন্দলাল ছাত্রদের বলতেন, "আমিও একজন শিল্পীছাত্র এখনও, তবে তোমাদের চাইতে হয়ত বছর কুড়ি পূর্বে ছবি আঁকা শুরু করেছি।" কলাভবনকে গড়ে তোলবার প্রয়াসের মধ্যে নন্দলালের একটা আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। দেশের বড় বড় শহরের অন্যান্য আর্ট স্কুলগুলির পরিচালনায় ও শিক্ষাদানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায় তার চেয়ে আরো একটু ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ছিল। সেটি হল গুরু-শিষ্যের মিলিত সাধনায় ছাত্রগণ যথার্থ শিল্পী হয়ে উঠুক, একটি শিল্পী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হক, পরস্পরের মধ্যে থাকবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন। তিনি ছাত্রদের শিল্প-শিক্ষাকে সামগ্রিক জীবনভোর শিক্ষারূপেই দেখেছিলেন, আংশিক ভাবে নয়। আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে কিছু ড্রইং, কিছু রঙের প্রয়োগ জানা হলেই শিক্ষা সমাপ্ত হল বলে তিনি মনে করতেন না। হাতে কলমে শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের শিল্পী হওয়ার উপযুক্ত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করা তিনি একান্ত প্রয়োজন বলে ভেবেছিলেন। সেই কারণে ছাত্রদের কল্পনাশক্তি বিকাশে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, তার গভীরতম রহস্যের সন্ধান পাওয়া, আশেপাশের প্রবহমান জীবনের প্রকাশকে বুঝতে পারা, তাকে উপলব্ধি করা, ভালো কবিতা, সঙ্গীত শিল্প রস ভোগের ক্ষমতা লাভ করা, রসজ্ঞান ও কৌতুক বোধ থাকা, নিজের আত্মপ্রকাশের এই গুণগুলিকে আয়ত্ত করতে হবে যদি ভালো শিল্পী হওয়ার বাসনা অন্তরে থাকে এই সব কথা তিনি ভেবেছিলেন। ষ্টুডিও ঘরেতে বসে ছবি আঁকায় সব শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, এই কথা ভেবে ছাত্রদের বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নিয়ে গেলেন গুরু নন্দলাল। বসন্তে, শরতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় ছাত্রদের নিয়ে বেড়াতে গেলেন, নদীর ধারে চড়ুইভাতির আয়োজন করালেন। প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প প্রধান স্থানগুলি দর্শন শিল্প শিক্ষার অঙ্গ বিশেষ বলে তিনি মনে করতেন। সেই জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অজন্তা, ইলোরা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, রাজগৃহ, মহাবলিপুরম, কোণারক ইত্যাদি স্থানগুলিতে শিক্ষাভ্রমণে যেতেন। কোণারক মন্দির সম্বন্ধে একবার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলেছিলেন। এই মন্দিরের গায়ে যে সব উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যের কাজ আছে তার ঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে অনেকে নানা বিরূপ মন্তব্য করে থাকে। একবার কয়েকজন উদ্‌ভ্রান্ত যুবক মন্দিরের ভাস্কর্যগুলি দেখছিল, হঠাৎ তাদের মাথায় দুর্বুদ্ধি জাগলো পাথরের মূর্তিগুলি ভেঙে দেবার। মাটির থেকে বড় একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে যেই মূর্তির গায়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে ওমনি পিছন থেকে একজন গৈরিক বসনধারী প্রৌঢ় ব্যক্তি—ইংরাজি ভাষায় তাদের এ কাজ করতে বারণ করলেন। ধীরে ধীরে তাদের নিকটে এসে জানতে চাইলেন কেন তারা মূর্তি ভাঙতে চাইছে। তাদের কথা শুনে তিনি বুঝিয়ে দিলেন মূর্তিগুলির অর্থ এবং অপরূপ সৌন্দর্যের কথা এবং বললেন মূর্তি ভাঙার অন্যায়ের কথা। তখন তারা লজ্জিত হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল। গৈরিকধারী সন্ন্যাসীটি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাই সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

নন্দলাল ছাত্রদের কেবলমাত্র শিক্ষাগুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন পিতামাতার ন্যায় স্নেহশীল, কল্যাণকামী, বন্ধুর মতো সহৃদয়, অসুস্থতায় আপদে বিপদে পাশে এসে দাঁড়াতেন। কলাভবন থেকে প্রতি বছরই বহু ছাত্রছাত্রী তাঁদের শিল্প শিক্ষা সমাপ্ত করে অন্যত্র দূরে চলে গেছেন কিন্তু তাঁদের মাষ্টারমশায়কে তাঁরা কখনও ভুলতে পারেননি। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সর্বদা স্মরণ করেছেন, চিঠিপত্রের দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, সুযোগ পেলে সাক্ষাৎ লাভ করে প্রণাম জানিয়েছেন। নন্দলালের উদার দৃষ্টি সকল ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সমান ছিল। সকলকেই যত্ন করে শিক্ষা দিতেন। যথার্থ শিক্ষক কেবলমাত্র ছাত্রদের ছবি সংশোধন করেন না কিন্তু তাতে উৎকর্ষ এনে দেন, তিনিও তাই করতেন। ছাত্রদের মধ্যে যার যে বিষয়ে ক্ষমতা আছে তাকে সেইদিকে উৎকর্ষ লাভের জন্য উৎসাহিত করতেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের মনকে বুঝবার বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন।

নন্দলাল কলাভবনের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার সময়ে ভারতের অন্যান্য আর্ট স্কুলগুলি কিভাবে পরিচালিত হয় তার খোঁজখবর বিশেষ কিছু করেননি। দেশের আর্ট স্কুলগুলির শিক্ষাপ্রদান ও পরিচালনার পদ্ধতি তখন সম্পূর্ণভাবে বিলাতী আর্ট স্কুলগুলির নকল ছিল। সেই পদ্ধতি ভারতীয় আর্ট স্কুলগুলিতে কতদূর প্রযোজ্য ও তার সার্থকতার কথা তখন কেউ ভাবতেন না, কারণ আর্ট স্কুলগুলির পরিচালক বা প্রিন্সিপ্যাল সাহেবেরা ছিলেন। সরকারী আর্ট স্কুলগুলির প্রচলিত নিয়মকানুন নন্দলাল অনুসরণ করেননি। কলাভবনের শিক্ষাদানে তিনি গুরুর প্রদর্শিত পথে চললেও নিজের অভিজ্ঞতার সুফল তাতে সংযোজন করেছিলেন। তা ভিন্ন অবনীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাদ অমূল্য সম্পদরূপে কলাভবনের শিক্ষায় গুরু ও শিষ্যদের সর্বদা উৎসাহিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সর্বদা খোঁজখবর রাখতেন কে কখন কোন ছবি আঁকছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, কবিতা, তাঁর সাহিত্য ও তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের আদর্শের দিক দিয়ে পথ নির্দেশক ও উৎসাহের উৎসস্বরূপ ছিল।

বছর চারেকের পরে দ্বারিক বাড়ির অদূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত সন্তোষালয়ে সাময়িকভাবে কলাভবন স্থানান্তরিত হয়। সেখানে অল্পকাল

নন্দলাল বসু এবং ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন ৩.১২.৬৪।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু.

থাকার পরে আরো পশ্চিমে পুরনো লাইব্রেরীর উপরতলায় কলাভবন ১৯২৩ সালে চলে যায়। এখানে বছর পাঁচেক মতো থেকে পশ্চিম দিকে পুরনো নন্দন গৃহ ও তার পাশে কতকগুলি কাজ করবার স্টুডিও গৃহাদি তৈরী হলে কলাভবনের কাজকর্ম সেখানে শুরু হয়। একবার নন্দলাল কথাপ্রসঙ্গে কৌতুকছলে বলেছিলেন কলাভবনের যাত্রা পূর্ব দিক থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে চলেছে। এই সব স্টুডিও বাড়িগুলির মাঝখানে জাম গাছের নিকটে একটি স্টুডিও ঘরে নন্দলাল ছবি আঁকতেন। মাষ্টারমশায়ের স্টুডিও নামে এই ঘরটি পরিচিত ছিল।

আর্ট শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের ইতিহাস, শাস্ত্র , দর্শন, সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়েও ছাত্রদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এ কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। কলাভবনে তখনও শিল্পের ইতিহাস শাস্ত্র শিক্ষাদানের বিশেষ কোনো ক্লাসের ব্যবস্থা হয়নি। গুরু নন্দলাল কিন্তু ছাত্রদের ছবি আঁকা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনমতো শিল্পের ইতিহাসের কথা, শাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্বের বিষয়ে আমাদের বুঝিয়ে বলতেন। ছবি আঁকার সঙ্গে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া যেমন চিত্তাকর্ষক হত তেমনি ছাত্রদের মনের মধ্যে গেঁথে যেত। পরীক্ষা পাশের শিক্ষার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ অমিল ছিল। জীবনশিল্পী নন্দলালের শিক্ষা সেই কারণেই এত আকর্ষণীয় ছিল। ছাত্রদের সম্পূর্ণভাবে শিল্পীরূপে মনে প্রাণে রূপান্তরিত করানোই তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল। সৌন্দর্যসৃষ্টির যে কোনো প্রয়াসকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। আলপনা-প্রবর্তন করালেন কলাভবনে, কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও হল এবং কারুশিল্পীদের প্রতি খুবই দরদী ছিলেন এবং তাদের কাজের প্রতি সর্বদা আগ্রহ প্রকাশ করতেন, পরামর্শ ও সাহায্য করতেন যাতে তারা উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কমতি ছিল না। শান্তিনিকেতনে আসার পরে এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা স্ফুরনের অনেক সুযোগ পেয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়, ঋতু উৎসব বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব ও গীতিনাট্য শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় নাম করা রঙ্গমঞ্চগুলিতে মাঝে মাঝে অভিনীত হত। তখন নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ কর মঞ্চসজ্জা, অভিনেতাদের বেশভূষা নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন। মঞ্চসজ্জায় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন শুধু শান্তিনিকেতনে নয় সমস্ত বাংলা দেশে এই বিষয়ে একটা পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচির প্রবর্তন করেছিলেন। এ বিষয়ে নন্দলালের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়।

কলাভবনের শিক্ষার সঙ্গে ভিত্তিচিত্র বা ফ্রেস্কো আঁকা বিদ্যা সর্বপ্রথমে নন্দলালই প্রবর্তন করেছিলেন। এই অঙ্কন পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল যখন সুরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল ১৯২১ সালে শীতকালে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র রাজ্যে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বাঘগুহার ভিত্তিচিত্র নকল করতে গিয়েছিলেন। চিত্র বিদ্যার সঙ্গে ধীরে ধীরে মডেলিং শিক্ষা, গ্রাফিক আর্ট শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। চিত্রবিদ্যার ছাড়াও অন্য যে সব আর্টের কথা উল্লেখ করা গেল তার সব বিষয়েই নন্দলাল একজন পারদর্শী শিল্পী, তার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন। তুলির কাজের দক্ষতায় যে কোনো ভালো চীনা বা জাপানী শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। শিক্ষক হিসাবেও নন্দলালের তুলনা হয় না। মানুষ, জীবজন্তু পাখীর শারীরিক গঠন আকার তাঁর নখদর্পণে জানা ছিল। যখনই প্রয়োজন হয়েছে সেই সকলের ড্রইং অনায়াসে করে দিয়েছেন। কলাভবনের কাজে নন্দলাল নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন একথা খুব সত্য হলেও শান্তিনিকেতন আশ্রমজীবন ও এখানকার সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন রাখেননি। আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। যে সব উৎসবস্থানে অলঙ্করণের প্রয়োজন হত কলাভবনের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আলপনা ইত্যাদি দিয়ে শ্রীমণ্ডিত করে দিতেন। মনের দৃঢ়তা, সেবাপরায়ণতা, বন্ধুবাৎসল্য ও উদারতা এই সব চারিত্রিক গুণের জন্য আশ্রমবাসী ছোটবড় সকলেই এই মাষ্টারমশায়কে ভালোবাসতেন শ্রদ্ধা করতেন।

নন্দলালের শান্তিনিকেতন আগমন তাঁর জীবনে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল। বিশ্বসৃষ্টির রহস্যের দ্বার তাঁর নিকটে খুলে গেল। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিরাট নীলাকাশ, উদার উন্মুক্ত প্রান্তর, গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথে চলা পথিকের দল, ক্ষেতখামার, প্রান্তরে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের সংস্পর্শ, এখানকার তাল খেজুরের বন, পশুপাখীদের বিচরণ তাঁর শিল্পীর মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। যা কিছু দেখেছেন, নিজেকে তাদের মধ্যে বিলিয়ে মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। যা কিছু দেখেছেন, এখানে এসে দূরে রেখে তাদের দেখা নয় কিন্তু একেবারে মুখোমুখি হয়ে দেখেছেন, নিজেকে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। অন্তরের রূপচেতনা ও বহির্বিশ্বের মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন, তারই প্রকাশ তাঁর রূপসৃষ্টির কাজে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছবির

বিষয় নির্বাচনে তাঁকে আকাশপাতাল ভাবতে হয়নি। রবীন্দ্র সংস্পর্শ নন্দলালের জীবনে পরম লাভ বলে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তাঁর জীবনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। একবার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন গুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন উন্মেষ করে দিয়েছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া তাঁর শিল্প রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে। শান্তিনিকেতনে আগমনের পূর্ববর্তীকালের অধিকাংশ তাঁর চিত্রের বিষয় ছিল হিন্দুদের দেবী, পৌরাণিক আখ্যান, ভারতীয় ইতিহাসের প্রখ্যাত ঘটনা বা ব্যক্তিরা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসবার পরবর্তীকালের ছবিগুলির বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের দ্বার যেন খুলে গেল, রূপসাগরের সন্ধান তিনি যেন পেয়ে গেলেন। সাধারণভাবে বলা যায় পুরাণ, বেদ, আখ্যানের গণ্ডি অতিক্রম করে শিল্পী প্রকৃতি ও জীবনের যে রসময় ধারা প্রতিনিয়ত চলমান তারই রসানুভূতি পেলেন। শান্তিনিকেতনে আসার পরে দীর্ঘ জীবনব্যাপী তিনি যে সব শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের রূপটিকে। লতা, পাতা, ফুল, ফল, জীবজন্তু এবং কর্মরত মানুষের রূপটিকে ধরে রেখেছেন তাঁর স্কেচে ও চিত্রে। জীবনভোর এত কাজ করে গেছেন যার জন্য তাঁর চিত্রের সম্পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নয়। তা ভিন্ন তাঁর আঁকা বহু ভিত্তিচিত্র শান্তিনিকেতনের বহু গৃহের দেয়ালগুলিকে অলঙ্কৃত করে আছে। তিনি মাটি দিয়েও কিছু মূর্তি গড়েছিলেন। লিনোকাট, এচিং পদ্ধতিতে আঁকা তাঁর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রের দ্বারা পুস্তকের শোভাবর্ধন বা বুক ইলাস্ট্রেশনের কাজও অনেক করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, আরো কয়েকটি কবিতা গ্রন্থ, অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী, শকুন্তলা, ভূত পতরীর দেশ এবং পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের লেখা শিশুপাঠ্য সহজপাঠ বইটির ছবিও লিনোকাট চিত্র দিয়ে ইলাস্ট্রেশন করে দিয়েছিলেন। শিল্পীর এ কাজটাই শেষ ইলাস্ট্রেশনের কাজ ছিল। শেষ বয়সে নন্দলাল বলতেন তাঁর অবস্থা অর্জুনের শেষের সময়ের অবস্থার মতো। গাণ্ডীব থাকা সত্ত্বেও অর্জুন যেমন প্রয়োগ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন তেমনি রং তুলি কাগজ থাকলেও তেমন কলাসৃষ্টির কাজ আর করতে পারছেন না।তবে ছবি আঁকা তাঁর একেবারে বন্ধ হয়ে তখনও যায়নি। প্রতিদিনই একটি করে চীনাকালিতে খেয়ালী ধরনের ছবি আঁকতেন। অতীত জীবনের স্মৃতিপটে ম্লান হয়ে এখনও যারা রয়েছে তাদেরই কথা রূপকথা বলার মত করে ছবিতে ধরে ছিলেন, নদীর জলে মাছের দল চলেছে, গাছের ডগায় বাঁদর বসে আছে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। চীন দেশে শিল্প সমঝদারদের একটি উক্তি হচ্ছে বৃদ্ধ শিল্পী যাই আঁকুক না কেন তাকে হালকা ও হেলার চোখে দেখো না। অবনীন্দ্রনাথ যেমন শেষ বয়সে "কাটুমকুটুম" আনন্দের সঙ্গে তৈরি করতেন তেমনি শেষ বয়সে নন্দলাল কাগজ ছিঁড়ে একটা আকার দিয়ে অন্য একটি বিপরীত রঙের কাগজের উপরে আঠা দিয়ে জুড়ে ছবি করতেন, এই ধরনের কাজে শিল্পী বেশ আনন্দ ও কৌতুক বোধ করতেন। তা ছাড়াও ছোট সাদা কার্ডের উপরে ফুল পাখী ইত্যাদির রঙিন ছবি আঁকতেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলে তিনি আগ্রহ সহকারে এই ধরনের কার্ডে আঁকা কতগুলি ছবি দেখিয়েছিলেন। অড়হর গাছের ফুল, পাখী, ডিমওয়ালা, খড় বোঝাই করা গরুর গাড়ী ইত্যাদির ছবি সুন্দর ভাবে রঙ দিয়ে এঁকেছেন। ছবিগুলি দেখে বড় আনন্দ হল এবং মনে মনে ভাবলাম হে মহান শিল্পী তোমার গাণ্ডীব এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তাঁর রচিত কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে রূপাবলী, শিল্পচর্চা ও শিল্পকথার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানুষের আচরণ, চালচলন, কথাবলা, কওয়ার সঙ্গে তার কাব সাহিত্য সঙ্গীত ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যেমনটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে তেমনি অন্য কিছুতে ধরা পড়ে না। বিশেষ করে রূপকারদের বেলায় এ কথ আরো সত্য। নন্দলালের চারিত্রিক গুণে শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসী সকলেরই তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। সাদাসিদে বেশভূষা, মাথায় ছোট চাদর জড়ানো, হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি এবং পায়ে থাকতো চামড়ার চপ্পল তিনি গ্রীষ্মের প্রখর রোদে অবলীলায় ঘুরে বেড়াতেন। বলতেন যত গরম পড়তে থাকে ততই ছবি আঁকার প্রেরণা তার মাথায় আসে। এই কারণে হয়ত তাঁর বহু ভালো ও বিখ্যাত চিত্রগুলি গ্রীষ্মের সময়ে আঁকা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২৪ সালে চীন, জাপান, মালয় ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে এবং ১৯৩৪ সালে অভিনয় দলসহ রবীন্দ্রনাথের সিংহল ভ্রমণে তিনি সঙ্গী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর হরিপুরার কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে মণ্ডপ, তোরণ ও অন্যান্য বহিরঙ্গ সাজান। হরিপুরার কংগ্রেস মঞ্চ তিরাশিখানা পটচিত্র এঁকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে বরোদা রাজ্যের কীর্তিমন্দিরে ভিত্তিচিত্র এঁকেছিলেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান গ্রন্থটি চিত্রের দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত করেন। তাঁর জীবিতকালে তিনি নানা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৫০ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডকটরেট উপাধি প্রদান করে। ১৯৫৩ সালে বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট উপাধি ও দাদাভাই নৌরজী স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রথম যুগে নন্দলাল ছিলেন যথার্থ বাংলার শিল্পী, বাংলার মন দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য তাঁর শিল্পকলায় বিশেষভাবে ফুটে আছে। কীর্তন সঙ্গীত যেমন বাংলার নিজস্ব রসময় সঙ্গীত তেমনি নন্দলালের চিত্রে সেই গুণগুলি প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান কালের উপযুক্ত করে শিব, সতী, উমা ইত্যাদি দেবদেবীর রূপকল্পনা নন্দলাল তাঁর চিত্রে এঁকে গেলেন, এতে তাঁর শিল্পরুচি ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই যুগের পরিবর্তন হয়েছিল যখন ১৯২০ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবনের কাজে যোগ দিয়ে এখানে বাস করতে লাগলেন। এখানকার প্রকৃতি, রবীন্দ্র সান্নিধ্য, তাঁর সঙ্গীত, নানা ভবনের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের সবুজ প্রাণের চাঞ্চল্য, বসন্তে শালবৃক্ষের নবপল্লবের হাতছানি, নিত্য মধুরস্বরে পাখীর গান, দূর থেকে ভেসে-আসা সাঁওতালী বাঁশীর তান, দিনের কাজের শেষে গৃহাভিমুখী সাঁওতাল রমণীদের সন্ধ্যায় মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত, এরা সকলে মিলে শিব, সতীর রূপ কল্পনায় যে শিল্পী একদিন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন করে দিতে চাইল। শিল্পীর জীবনে নতুন এক অধ্যায় এখানে শুরু হল। এখানে রসময় জগৎসৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করতে হলে চোখ মন খোলা রাখতে হবে। এখানে চোখ খুলে শিল্পীর ধ্যান, চোখ বুজে নয়, যোগীর ধ্যান আর শিল্পীর ধ্যানে তফাৎ আছে। এই সত্যের উপলব্ধি নন্দলালকে পেতে হয়েছে। ধ্যানের মহিমার প্রকাশ পূর্ণ হয় প্রাণচাঞ্চল্যের সবুজ পটভূমিকায় যা বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্ব লীলা। মানুষের মহত্ত্বকে এবং জীব জন্তু গাছপালা নীরব প্রতীক্ষমান প্রকৃতিকে নিজের শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পী ভাষা দিতে চেয়েছিলেন। নন্দলাল রূপের আড়ালে অরূপবীণাবাজার সুর শুনে আনন্দিত চিত্তে আজীবন রূপসৃষ্টির কাজ করে গেলেন। প্রথম জীবনে শিল্পী বিষপানরত নীলকণ্ঠ শিবের রূপকল্পনা করেছিলেন, তাঁকেই শেষ জীবনে শিবের মত জীবন সুধারসের অমৃত পাত্রখানি নিয়ে আকণ্ঠপান করে ধন্য হতে হয়েছিল।

আমার দৃষ্টিতে নন্দলাল

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

নন্দলাল বসুর বয়স এখন একাত্তর বছর হল। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শিল্পচর্চা করেছেন। এইসময়ের কিছুটা তাঁর কেটেছে নবিশি করে, কিছুকাল তিনি ছিলেন কারিগর, শেষে আচার্যের গুরুদায়িত্ব বর্তালো তাঁর ওপর। নব্য ভারতীয় কলমের ভ্রাতৃসংঘের আদি সদস্যদের তিনি অন্যতম। এই ভ্রাতৃসংঘের সঙ্গে যদি আমরা ফরাসী দেশের ইমপ্রেসেনিস্ট ভ্রাতৃসংঘ বা বিলাতের প্রি-রেফেলাইট ভ্রাতৃসংঘের তুলনা করি তাহলে একটা তফাৎ ধরা পড়বে। ফরাসী এবং বিলাতী ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা পরস্পরের সহযোগী ছিলেন এবং প্রত্যেকের অধিকার সমান ছিল। নব্য ভারতীয় কলমের কিন্তু একজন প্রধান ছিলেন, যাঁকে গুরু বলে মানতেন ওঁরা সকলে। তিনি অবনীন্দ্রনাথ। নন্দলাল বসুর শিল্পচর্চা এবং শিল্পানুরাগে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব খুবই গভীর। বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে অবীন্দ্রনাথ সরকারীভাবে তাঁকে শিল্পকলা শিখিয়েছেন, বাড়িতেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে গুরুর মতো দেখিয়েশুনিয়ে দিয়েছেন। তবুও নব্য ভারতীয় কলমের পরিণত রূপের জন্য নন্দলালের অবদান অবনীন্দ্রনাথের তুল্যমূল্য। এই কলমের সকল শিল্পীর মধ্যে তিনজন প্রধান। তাঁরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু। রেখাঙ্কন, নকশা, কল্পনাশক্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কাজের বহর তুলনা করলে একথা মনে হতে পারে, নন্দলাল বসু তাঁর দুই সমসাময়িকদের চেয়ে হয়তো বড় শিল্পী।

নন্দলাল বসু আপন কলমের অন্যান্য শিল্পীর তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন। নব্য ভারতীয় শিল্পকলার অভিব্যক্তিকে তিনি অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রথমদিকের কাজ,যেমন ধরুন "সীতার অগ্নিপরীক্ষা" আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি এগুলি পোরটফলিও আকারে ছেপে বের করেছিল। ঐ ছবিটি সূক্ষ্ম অঙ্কন এবং বর্ণপ্রয়োগে তিনি এঁকেছিলেন অণুচিত্র (মিনিয়েচার)-এর শৈলীতে। মুঘল এবং রাজপুত কলমের শেষদিকের পরিণত কাজের সঙ্গে এই ছবিটিকে সমান আসন দেওয়া যায়। এরপর কিছু রেখাচিত্র আঁকলেন যেগুলির রেখাঙ্কন এবং রচনাসৌকর্যে অজন্তার গভীর প্রভাব পড়ল।

এসব অবশ্যই অজন্তার ওপর লেডি হেরিংহামের সুপরিচিত গ্রন্থের জন্য ছবি আঁকার প্রত্যক্ষ ফল। ১৯১৭ সাল থেকে নন্দলাল তাঁর অনুসৃত চিত্ররাজির রীতিপদ্ধতির প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব শৈলী এবং কলাকৌশল আবিষ্কার করলেন। আজকের ভারতবর্ষে তিনি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশিষ্ট চিত্রকর। তাঁর হাতে আঁকা কোনো ছবিকে কোনো কলম বা অন্য কোনো শিল্পীর কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া বা গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

প্রত্যেক শিল্পী—কবি, চিত্রকর কিংবা সুরকার—পর্যায়ক্রমে যে আবর্তে পরিণতিতে পৌছন নন্দলাল বসুর শিল্পী জীবনে সেই চক্রাকার আবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে এঁরা অনুকরণ করেন, মাঝখানের পর্যায়ে তাঁদের কাজে বহির্মুখী প্রবণতা দেখা যায়। এইসময়ে অতীতের বন্ধনমুক্ত হয়ে একা চলতে শুরু করে ক্রমে সমসাময়িকদের মধ্যে নিজের আলাদা আসন করে নেন তাঁরা। তখন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা করেন এবং আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন। শেষে সর্বস্ব পণ করে তাঁরা ধ্যানে মগ্ন হয়ে অনুকৃতির সকল অভ্যাসের মায়ামোহ মুক্ত হন। এরপর কিন্তু একটা সময় আসে যখন হৃদয়ের চিন্তাভাবনা ঢেলে দিতে তাঁদের আর ভাল লাগে না, কারণ জনসাধারণের বেশিরভাগেরই নতুন শিল্পকৃতিকে স্বাগত জানানোর মতো প্রস্তুতি থাকে না। তখন শিল্পীরা বাণপ্রস্থ নেন অন্তর্লোকে। সম্পূর্ণভাবে তাঁরা অন্তর্মুখী জীবনযাপন শুরু করেন। শুদ্ধ আনন্দ এবং বেদনায় সৃষ্টিলীলা শুরু করেন। লক্ষ্য থাকে একটাই, হৃদয়কে অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যের গরিমা মহিমায় ভরে তুলে আপন শিল্পকর্মে সৃজনশক্তি সম্পূর্ণভাবে কাজে প্রয়োগ করার দিকে। এসব কথা নেহাৎ বাগাড়ম্বর মনে হতে পারে, কিন্তু মহৎ শিল্পীর বিষয় আলোচনার সময় তাঁর মনের তূরীয় এবং উচ্চমার্গের বিচরণের কথা বাদ দেওয়া যায় না আদৌ। সে যাই হোক নন্দলাল বসু নবিশি থেকে শিল্পকৃতির স্তরে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হলেন।

এই উত্তরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না, যদি না তাঁর মনে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকতো, হয়তো সেটা সজ্ঞান নয় কিন্তু সজ্ঞাপ্রসূত তো বটেই এবং তদুপরি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দুঃসাহসের অভাব তাঁর ক্ষেত্রে কখনোই দেখা যায়নি। নন্দলাল বসু অস্থিরভাবে রূপবন্ধ এবং কলাকৌশলের পরীক্ষা করে গেছেন সতত। রঙের গুঁড়োমশলা থেকে শুরু করে কি দিয়ে রঙ গোলা হবে এসব নিয়ে যেমন পরীক্ষা করেছেন
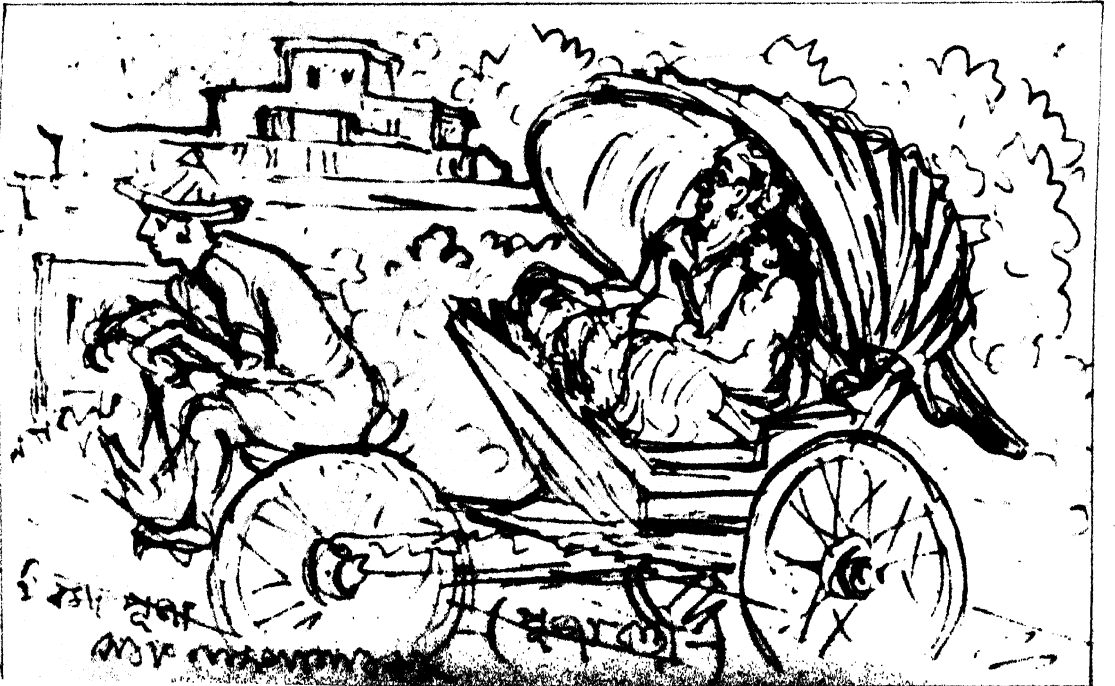
তেমনি দৃশ্যমান জগতের সৎস্বরূপ আবিষ্কার এবং উপলব্ধি এবং নামরূপ জগতের বস্তুগত তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন। অর্থাৎ, কৌশল থেকে ভাব, সব বিষয়ই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নব্য ভারতীয় কলমের বেশিরভাগ শিল্পীর সম্বন্ধে একথা হয়তো বলা যায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে শিল্পীজীবন শুরু করলেও, কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে তাঁরা আর অগ্রসর হননি, একটা বিশেষ "শৈলীর" কর্দমে তাঁদের রথচক্র দেবে বসে গেছে। নন্দলাল বসু সতত চঞ্চল হয়ে আগুয়ান হলেন বলে তিনি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন, যদিও সমকালীন শিল্পীদের এই বাঁক নেওয়াটা একটা যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়াও অবশ্যই।

ইদানীং কোনো শিল্পী তাঁর পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর শিল্পকর্মের ওপর অমোঘ "নিয়ন্ত্রণের" নিরাপদ দুর্গে অধিষ্ঠানের সুখ একালে আর ভোগ করতে পারেন না। আধুনিক সময়ে, ইদানীংকার সমাজে, সেই নিশ্চয়তা, স্থিরতা এবং ভোক্তাদের সুরুচিপূর্ণ বোধের ওপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যেতে পারেন না সমকালীন কোনো শিল্পী। অথচ প্রাচীন গ্রীস এবং রেনেসাঁসীয় ইটালিতে এমন পরিস্থিতিতে কাজ করতেন বলেই তাঁদের শিল্পকর্ম বিকার বা বিপথগমন থেকে রক্ষা পেত। সমকালীন প্রতীচ্যের শিল্পীদের যদি এমন সমস্যায় পড়তে হয়ে থাকে, তবে সংকটের রূপ ভারতীয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে আরও কতই না ভয়াবহ। সুতরাং প্রবৃদ্ধির দরুণই আধুনিক শিল্পকলা অবশ্যই আত্মসচেতন, সমন্বয়বাদী স্ববৈপরীত্যে আক্রান্ত এবং প্রায়শ লক্ষ্যভ্রষ্ট। আধুনিক শিল্পীকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাগৈতিহাসিক পুরাতন প্রস্তর যুগের শিল্পকলা থেকে শুরু করে আজকের ভবিষ্যবাদী এবং অভিব্যক্তিবাদী রূপবন্ধের রূপান্তরকে অনুধ্যান করতে হয় এবং এটা করার জন্যই তাঁকে মধ্যবর্তী পর্যায়ের রেনেসাঁস, বারোক, মুঘল, রাজপুত, চৈনিক এবং জাপানী চিত্রকলার বিষয় জানতে হয়। আশ্চর্যের কি যে এই 'গহীন-বনে সমকালীন শিল্পী পথ হারিয়ে লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে বেড়ান। কিংবা তাঁদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে নানান যুগের এমন কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস অনুকরণ করার প্রবণতা থেকে তাঁরা আত্মরক্ষা করতে পারেন না এমন নজিরও আছে। এই লোভেই তাঁরা মারা পড়েন।

পূর্বসূরীদের কাজ হুবহু না টুকে কোনো শিল্পী যদি সেটাকে ঢেলে সাজতে পারেন এবং পাখির মতো যত্রতত্র থেকে নানা বিচিত্র জিনিস এনে বাসা বাঁধার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন, তবেই কেবল শিল্পকলার অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হবেন। আধুনিক শিল্পী পূর্বসূরীদের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধ্যান করবেন এটা রীতিসিদ্ধ। কিন্তু যদি অনুকরণ করেন এবং নানা প্রভাবের চিহ্ন তাঁর কাজে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। বরং এসব থেকে তাঁর ব্যক্তিগত শৈলী তৈরি করবার রসদ পাওয়া উচিত এবং অবশ্যই অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যাপ্তি এবং বিস্তার লাভ করার কথা। আধুনিক শিল্পকলার মহারথীদের সম্বন্ধে একথা বলতে পারা চাই যে পূর্বজ কলমগুলি না থাকলে তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হতো না, কিন্তু তাঁদের কাজ দেখে যদি ধরা যায় যে এটা ওখান বা সেখান থেকে নিয়েছেন তাহলেই চিত্তির।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্যিই কঠিন। তবে আমার মতে,

সে-মতের মূল্য যাই হোক, নন্দলাল বসু সসম্মানেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রায় কুড়ি বছর আগে তাঁকে পুরাতন প্রস্তর যুগের শিল্পকলার ওপর একটি সচিত্র গ্রন্থ দেখাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কৌতূহলে তাঁর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল তিনি যেন বিস্মরণের ওপারে গিয়ে বিস্ময়ে দেখলেন কি-ভাবে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী শিশুর সারল্যে দৃশ্য জগতের আকারের ধাঁধার সমস্যা সমাধান করেছে, কি-ভাবে রূপ ধ্যান করেছে, এবং পরিশেষে আদিম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী শুদ্ধ এবং তীব্র ছিল বলেই কিভাবেই বা আকারের মৌলিক ব্যাপারটা সার্থকভাবে রূপায়িত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বস্তুত তাঁদের ভাগ্যবান উত্তরসূরী প্রযুক্তির নানা উপকরণ সত্ত্বেও এমনটিতো পারেননি। আমার এক বন্ধু আমার কাছে গল্প করেছেন তিনি একবার গিয়ে দেখেন নন্দলাল বসু একটা তালগাছের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে নন্দলাল অতি সরলভাবে সোজাসুজি উত্তর দিলেন, বড় পাতার যথাযথ আকারটা কিরকম সেটা ধরার চেষ্টা করছিলুম। তাঁর কাছে এমন উত্তরই প্রত্যাশিত ছিল। তিনি তো সহজভাবে দৃশ্যজগৎটা দেখবেন। কোনো পূর্বধারণার কলঙ্ক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্পর্শ করবে না। অন্য শিল্পীর কাজের ধারা থেকে দরকারী কিছু পেলে তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, কিন্তু তাঁর কাজের নিজস্ব ধারা, রূপবন্ধের ধরন এবং ব্যক্তিগত অনুভবের সঙ্গে যদি কোনো কিছু না মেলে তবে তার কিছুই গ্রহণ করবেন না।

ছোট নিবন্ধে নন্দলাল বসুর শিল্পী জীবন এবং শিল্পকর্ম সম্বন্ধে চুম্বক দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, যদিও এসব ক্ষেত্রে চুম্বকের কথা উঠতে পারে কি-না সে-প্রশ্ন থেকেই যায়। চুম্বকটা হল এই : নন্দলাল বহু কষ্ট করে রূপবন্ধ, রচনাসৌকর্য এবং কলাকৌশল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে নিজস্ব শিল্পী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন সফল হতে পেরেছেন। তথাপি তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্ব, যা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং কলাকৌশলের যোগফল, যদি সেই প্রসঙ্গে কিছু না বলি তবে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নন্দলাল বসুর শিল্পকলা পারসিক, ভারতীয়, চীনা, জাপানী রৈখিক ধারণা সঞ্জাত। অর্থাৎ যখন তাঁর কোনো আলেখ্য দর্শন করি তখন যেটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ে সেটা হলো তাঁর জীব এবং বস্তুর অবয়বের সীমারেখা। এইরকম ভাবে ছবি আঁকতে হলে অঙ্কনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই। সীমারেখার সৌন্দর্য উপভোগের জন্য উৎসারিত ছন্দের আবেদন যদি শিল্পীকে তৈরি করতে হয়, তাহলে তাঁর অঙ্কনক্ষমতা যথাযথ হলেই চলবে না। কিন্তু নান্দনিক বিচারে তাকে হতে হবে জোরালো এবং ছন্দিত। নন্দলাল বসু এতটা সাফল্য লাভ করতে

কিন্তু তিনি এখানেও থেমে থাকেননি। তাঁর প্রথমদিকের কাজে যেমন এবং পরিণত বয়সের কাজেও তেমনি রেখার প্রাধান্য আছে। তথাপি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শেষদিকের কাজে দেখা যায় তিনি ভাস্কর্যগুণান্বিত ভাবটা ধরার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে রৈখিক বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণ না করে। এসব কাজে জীবের অবয়ব এবং বস্তুর আকার নতোন্নত ভাস্কর্যের মতো পট থেকে বেরিয়ে আসে। যেখানে তাঁর কাজে বর্ণছায়ের প্রাধান্য সেখানেও নতোন্নত ভাস্কর্যের মতো তারা উঠতে থাকে। এইভাবে তিনি তাঁর শৈলীর বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। মাইকেলেঞ্জেলো নিজের পরিচয় দিতেন ভাস্কর বলে, চিত্রকর বলে নয় এবং তাঁর চিত্রাবলী অবশ্য ভাস্কর্যদৃষ্টির ফসল কিন্তু তিনি, চারিদিক প্রদক্ষিণ করা যায় এমন মূর্তির ভাস্কর, যাঁকে বাধ্য হয়ে ছবি আঁকতে হয়েছিল। শেষ পর্যায়ের নন্দলাল বসুর কাজকে নতোন্নত দ্বিমাত্রিক ভাস্করের চিত্র বলা যায়।

নন্দলাল বসুর পরিণত জীবনের কাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সেগুলি বীরাত্মক ভাব রঞ্জিত। নব্য ভারতীয় কলমের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের বীরব্যঞ্জক ছবি আঁকার জন্য হয়তো পুরাণ, কিংবদন্তী বা ইতিহাসের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি ছিল না। নন্দলাল বসু এককালে এমন ছবি যে আঁকেননি তা নয়। এখন তিনি ইচ্ছা এবং চেষ্টা করে এমন ছবি আঁকাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন তাও নয়। কিন্তু তিনি সমকালীন জীবনের একটা দৃশ্যেরও এমন উত্তরণ ঘটাতে পারেন। বিষয়বস্তু নয়, তাঁর বীরস্বব্যঞ্জনা আছে তাঁর ব্যবহার এবং ধরনে। এমন কি ছটা পশু এবং একটি মানব মাতা নিয়ে তিনি যে মজার পাটা এঁকেছিলেন বহু বছর আগে তার মধ্যে এই বীরভাব আছে। জোরালো অঙ্কন, মধুর ভঙ্গী—মানবী বা পশুগুলির মধ্যে—সবকিছুই এই ভাবমাধুর্যমণ্ডিত। ছোট ছোট ছবিগুলিকে বিরাট বিস্তারিত ভিত্তিচিত্র হিসাবে ভেবেছেন সেটা স্পষ্ট।

শেষ করবার আগে বলব, নন্দলাল বসু, ১৯০৫—বর্তমান পর্যন্ত নব্য ভারতীয় কলমের গতিপথ অনুসরণ করেননি। নন্দলাল বাদে বাংলা কলমের অন্যান্য শিল্পীদের ক্ষেত্রে ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল মুঘল, রাজপুত অণুচিত্রের অনুকরণের মধ্যে দিয়ে। তারপর ক্রমান্বয়ে ওঁদের কাজে অজন্তা, বাঘ, চীনা এবং জাপানী ছবির প্রভাব পড়ল এবং শেষে আত্মসন্তুষ্টভাবে পুরানোর পুনরাবৃত্তিই শুরু হয়ে গেল, আজ যেমন তরুণেরা অপেক্ষাকৃত কম আত্মতুষ্টভাবে-ইমপ্রেসেনিজমের-এবং পরবর্তী চিত্ররীতির অনুকরণ করছেন। নন্দলাল কিন্তু অলসগতি অনুকরণের গড্ডলস্রোতে গা ভাসাননি। তাঁর প্রতিভা শুধু নিজের জন্য, নিজের ধরনে ভগীরথ হতে পেরেছেন।

স্কেচ : নন্দলাল বসু

রূপকার নন্দলাল

শান্তিদেব ঘোষ

দর্শক হিসেবে বাইরে থেকে যাঁরা পূর্বযুগে শান্তিনিকেতনকে দেখতে আসতেন, তাঁরা এখানকার সাজগোজের অনাড়ম্বর ভাবটি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হতেন। শান্তিনিকেতনের উৎসব, অভিনয়, সভা ও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলে তার পরিচয়টি পেতেন। এইরূপ সাজসজ্জার মধ্যে ছিল একটি সুন্দর সরল, সংযত রুচির পরিচয়। অনাবশ্যক জাঁকজমকের কোন চেষ্টা ছিল না। শান্তিনিকেতনের এই পরিবেশে যে সহজ সরল সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটেছিল তার মূলে ছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। নন্দলাল, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকে নিজের মণ্ডনশিল্পের দক্ষতার দ্বারা প্রকাশ করে যেতেন। শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যাবতীয় শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুদেব যেভাবে অনুভব করেছিলেন, তা বাস্তবে কতখানি কৃতকার্য হতো তা বলা খুবই কঠিন। গুরুদেবের মত এমন একজন ঋষি কবি ও কর্মীর দ্বারা চালিত না হলে নন্দলালের এই প্রতিভার বিকাশ কোন পথে হোতো, তা কে জানে। নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য রূপে পাবার জন্য গুরুদেবের মনে যে কি প্রকার আগ্রহ ছিল তার প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যতে যদি কখন প্রকাশ পায় তবে তা জানা যাবে এবং তখন বুঝতে পারবো তিনি কি চোখে নন্দলালকে দেখতেন। নন্দলাল বলতেন, শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের কাছে না থাকলে তিনি এদিকে নতুন করে কিছু করবার সুযোগ কখনই পেতেন না। অন্তত দেশের আর্ট কলেজের কাজে জড়িত থাকলে নানা প্রকার মণ্ডনশিল্পের ও কারুশিল্পের বিষয়ে কিছু করবার বা ভাববার অবকাশ তাঁর হতো না। মণ্ডনশিল্প ও কারুশিল্পকে নূতন রীতিতে গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সঙ্গ পেয়ে।

দেশের শিল্পরসিক সমাজ বলেছেন নন্দলাল বড় চিত্রকর। তিনি নানা প্রকার কাগজে, কাপড়ে, সিল্কে এবং কাঠের উপর জলেভেজা ওয়াশ পদ্ধতি, টেম্পারা এবং চীন বা জাপানী প্রথায় কালি ও তুলিতে রঙীন এবং একরঙা ছবি ও স্কেচ এঁকে গেছেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে। গুরুদেব

"শাপমোচনে" শান্তিদেব ঘোষকে সাজাচ্ছেন আচার্য নন্দলাল।

নন্দলালের রেখাঙ্কনে "নটরাজ" ও "কাণ্ডি"র নর্তকী, সিংহল

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, নন্দলালের "বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ বিচিত্র হাতের ছাঁদে তাতে না আছে সাবেককালের নকল বা না আছে আধুনিকের, তা ছাড়া কোন ছবিতেই চলতি বাজার-দরের প্রতি লক্ষ্য মাত্র নেই।" শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন : "বিচিত্র চিত্রে তিনি বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ করিয়াছেন...উক্ত গুণসম্পন্ন শিল্পী ভারতে বিরল।" শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "নন্দলালের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। উপকরণ আঙ্গিক উপলব্ধি তিনের সংযোগে নানা পথে নানা ভাবে প্রবাহিত হয়েছে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।"

নন্দলাল তেলরং-এর ছবি আঁকা এবং ইয়োরোপীয় প্রথায় মূর্তি গড়া এছাড়া প্লাস্টার অব প্যারিসে তার ছাপ নেওয়ার প্রথার প্রবর্তন করেন। লিথো, উডকাট, ড্রাইপয়েন্ট এবং প্যাস্টেলেও ছবি এঁকেছেন। পেনসিল, কালিকলম, চাইনিজ ইংক ও তুলিতে তিনি অজস্র ছবি ও স্কেচ রেখে গেছেন। এ বিষয়ে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর বলেছিলেন, এই স্কেচগুলির মূল্য "তাঁর আঁকা চিত্র থেকে কোন অংশে কম নয়। বৈচিত্র্য এবং প্রকাশ রীতিতে সেগুলি কেবল জীবন্ত নয়, প্রকাশভঙ্গীও তাদের নূতনতর।"

শান্তিনিকেতনে, বৌদ্ধযুগের অজন্তা, বাঘ জয়পুরী, এবং ইতালীয় প্রথায় আঁকা নানা রঙের দেওয়াল চিত্র, 'শ্যামলী' এবং কলাভবনের ছাত্রাবাসের দেওয়ালে তুষ, আলকাতরা ইত্যাদি মেশানো মাটির মূর্তি ও ছবিগুলিতে নন্দলালের শিল্পকীর্তির প্রবাহ বর্তমান। তাঁরই প্রেরণায় শান্তিনিকেতনে কাঁকড় ও সিমেন্ট মিশ্রিত নানা প্রকার মূর্তি রচনায় হাত দিয়েছিলেন তাঁর ছাত্ররা। তিনি নিজেও মূর্তি শিল্পে খুবই দক্ষ ছিলেন।

নন্দলাল কলাভবনকে শিল্পী তৈরির কলেজ হিসেবে যেমন গড়তে চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন কলাভবনের দ্বারা দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনচর্যার প্রয়োজনীয় বিষয়েও উন্নত শিল্পরুচির পরিচয় ফোটাতে। মণ্ডনশিল্প ও কারুশিল্পকে এই কারণে কলাভবনের শিক্ষাসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের সভাসমিতি, উৎসব প্রাঙ্গণ ও নাট্যাভিনয়ের মঞ্চ ও রূপসজ্জার প্রয়োজনে মণ্ডনশিল্পের বা কারুশিল্পের এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের এইরূপ সৌন্দর্যের সাধনার মূল কারণ হলো এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখানকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্ত, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নির্জন নিশীথ রাত্রি বা পূর্ণিমার রাত্রি সবই সকলের মনের উপর বিশেষ ছাপ রেখে যেত। কিভাবে প্রকৃতি পরিবেষ্টিত আনন্দকে উপভোগ করতে হয় তার পথ দেখিয়েছিলেন গুরুদেব ঋতুউৎসবগুলির প্রচলন করে। তার সঙ্গে রূপসজ্জার যদি মিলন না ঘটে তবে তার সার্থকতা কোথায়? শান্তিনিকেতনের বাইরের শহরে ঋতু উৎসবের যে আয়োজন আমরা দেখি তার সাজসজ্জায় আমরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করি। শহরের রূপসজ্জা শহুরে জীবনেরই উপযোগী। শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসবে তার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে শান্তিনিকেতনের এই সব উৎসবগুলি যেভাবে জমে উঠতো তা শহরের উৎসবে তার পরিচয় আমরা পাই না, সেখানে দেখি সেই সব উৎসবের কঙ্কালটিকে। শান্তিনিকেতনে এই উৎসব কটির সঙ্গে যে মণ্ডনশিল্প বা রূপসজ্জার উদ্ভব হয়েছিল তা নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার একটি বড় পরিচয় বলেই আমি মনে করি।

এ ধরনের মণ্ডলশিল্পের প্রসার ভারতে ঘটেছিল যুগে যুগে। স্থান কাল পাত্রভেদে কি ভাবে তা রূপ গ্রহণ করে তার একটি সুন্দর উদাহরণ আমাদের দেশের আনন্দানুষ্ঠানে এখনো প্রচলিত। দেখি, বাংলার হিন্দুদের যে কোন মঙ্গল কাজে, গৃহের প্রবেশ পথের দু পাশে, কলাগাছের নীচে দুটি কলসী বা ঘটের মুখে আম্রপল্লব ও ডাব রাখা হয়। চালবাটা জলের সাহায্যে আল্পনা আঁকার রীতি প্রচলিত ছিল। কলাগাছ ও মঙ্গল ঘটের সঙ্গে অনুষ্ঠানের যে যোগই থাকুক না কেন এটি যে আমাদের বাঙালী জাতির আলংকারিক মনোবৃত্তির একটি বিশেষ প্রকাশ সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কলাগাছ, কলসী, আমপাতা ও ডাব বাঙলার অতি সহজলভ্য জিনিস। সুতরাং প্রাচীন গ্রামশিল্পীরা এই কটিকে তাদের উৎসব সজ্জায় কাজে লাগালেন। প্রচুর ধান যে দেশে উৎপন্ন হয় সেখানে চালবাটার জল দিয়ে আল্পনা দেওয়াও সহজ ছিল। ভারতের অন্য প্রদেশবাসীরাও তাদের আশেপাশে সহজলভ্য জিনিস দিয়ে উৎসবাদিকে অলংকৃত করত এবং এখনো করে। শান্তিনিকেতনের উৎসব সভাসমিতিকে নন্দলাল সাজাতেন এই আদর্শটিকে মনে স্থান দিয়ে। তাঁর কাছে এটিও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসাধনা।

শিল্পগুরু নন্দলালকে আমি শান্তিনিকেতনে দেখেছি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, যখন তিনি প্রথম অস্থায়ী পদে নিযুক্ত হয়ে 'দ্বারিক' বাড়িতে কলাবিভাগের গুটিকতক ছাত্র নিয়ে শিক্ষকতার কাজে এসেছিলেন। তখন থেকেই তাঁকে দেখেছি শান্তিনিকেতনের যাবতীয় আনন্দানুষ্ঠান, সভাসমিতি, উৎসব, নাটক, নৃত্যনাট্য ও গীতানুষ্ঠানের আয়োজনের সঙ্গে।

নন্দলালের আঁকা নর্তক ও নর্তকীর সাজসজ্জার পরিকল্পনা

দেখেছি এসবের সৃষ্টিতে এবং তার মহড়া নিয়ে গুরুদেব যখন তন্ময় হয়ে আছেন, তখন নন্দলাল তার প্রতিদিনের মহড়ার সময় অতি সন্তর্পণে নিজেকে আড়ালে রেখে, নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণে মগ্ন থাকতেন। মনের ভিতরে কল্পনার তুলিতে সে সময়ে যাবতীয় সাজসজ্জার একটি একটি করে ছবি এঁকেছেন মনে বা কখনো কাগজে। দেখেছি, উৎসব অনুষ্ঠান ও নাটকের অভিনয়ের পূর্বে তাঁর সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করবার প্রেরণায় তিনি কিরকম মত্ত। কলাভবনের ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ করতেন। উৎসব প্রাঙ্গণ, অভিনয়ের মঞ্চ এবং অভিনেতাদের সাজসজ্জা তিনি নিজের হাতে না করে শান্তি পেতেন না। অভিনয় ও নৃত্যানুষ্ঠান উপলক্ষে বরাবরই তাঁর হাতে সাজবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন দেখতাম ছবি আঁকতে তিনি যেরকম আনন্দ পেতেন ঠিক সেই আনন্দে বিভোর হয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ঠায় দাঁড়িয়ে, একের পর এক আমাদের সকলকে সাজিয়েছেন, রঙীন বস্ত্রে, কতরকমের ফুলের মালায়, কতরকমের তাঁর পরিকল্পিত গয়ণায় এবং কাঠি তুলি ও রঙে। আজ যাকে একভাবে সাজিয়েছেন তাকে পরের দিন সাজিয়েছিলেন অন্যরূপে। এইভাবে এ পথেও তাঁর শিল্পসৃষ্টির কাজ চলত। তিনি সাজের মধ্যে অবান্তর জাঁকজমকের দ্বারা চোখ ঝলসাবার কোনরূপ চেষ্টা করতেন না। যে সাজে আসল মানুষকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে সেইরূপ সাজে কাউকে সাজাবার চেষ্টা তিনি কখনো করতেন না। তাঁর সাজে ছিল দেহের সঙ্গে পরিচ্ছদের ভার ও রঙের ছন্দসাম্য।

গুরুদেবের কতগুলি নাটক আছে, যার চরিত্রগুলি যে কোন্ যুগের বা সেই সব নাটকগুলি তিনি যে কোন্ যুগের কথা ভেবে লিখেছিলেন তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তার চরিত্রগুলি এবং তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হবে, নানা যুগের ছড়ানো মানুষগুলিকে যেন নাটকের মাধ্যমে এক জায়গায় এনে তিনি সাজিয়েছেন। এই সব নাটকের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, চর, দূত, বালক-বালিকা, রানী, সখী ও গ্রামবাসীদের সামাজিক পরিবেশ যেন বিস্তীর্ণকালে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। নন্দলাল যখন এদের সাজাতেন তখন তা দেখে মনে হতো না কোন এক বিশেষ যুগের তারা। গুরুদেবের এই দলের নাটকের সাজসজ্জায় একই আদর্শের প্রভাব লক্ষ করেছি। নাটকের সাজসজ্জায় তিনি বিশেষভাবে কোন যুগ বা কোন দেশের নকল করতেন না। তা সত্ত্বেও নাটকের সময় মনে হতো চরিত্রগুলি সাজে পোশাকে সম্পূর্ণ ভারতীয়। নাটকের রূপ সজ্জার দিক থেকে বিচার করলে নন্দলালকে মনে হতো অত্যন্ত আধুনিক। নন্দলাল সাজসজ্জার দিক থেকে কোন প্রকার অন্ধ অনুকরণের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ছিলেন বিদ্রোহীর মত বর্তমান। তাঁর মত ছিল ভারতীয় রুচি ও পরিবেশকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে আধুনিক হতে হবে ভারতবাসীকে। আধুনিকতার নামে উল্লসিত হয়ে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব হারানোকে তিনি মনে করতেন মৃত্যুর সমান।

গুরুদেবের নাটিকা 'শাপমোচন'-এ ইন্দ্রসভা আছে। তার দেবদেবীরা কিন্তু সাজে পোশাকে ভারতীয় প্রাচীন মূর্তি অজান্তাযুগের নয় আবার উনবিংশ শতকের বা বিংশ শতকের থিয়েটার বা চলচ্চিত্রের মতনও নয়। 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' এবং 'তাসের দেশ'-এর সাজে তিনি কোন যুগ বা দেশকে কখনো অনুকরণ করেন নি। রঙ্গমঞ্চের রং এবং আলোর রং-এ সঙ্গে বিচিত্র সাজে অভিনেতারা যখন মঞ্চে দাঁড়াতেন তখন চোখের সামনে ভেসে উঠতো যেন একটি রঙিন প্রাণবান ভারতীয় চিত্র। সব মিলিয়ে একটি আনন্দময় মোহের সৃষ্টি করত।

গুরুদেবের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে রচিত নাটকের সাজসজ্জায় নন্দলাল সেইরূপ কোন যুগের কথা কোনদিনই ভাবেন নি। এ বিষয়ে প্রচলিত থিয়েটারের সাজপোশাকও তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। গুরুদেবের নাটকের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি নতুন শিল্পরীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। নাটকের পুরুষ চরিত্রে তিনি যখন পাগড়ী বাঁধতেন তাতে ভারতের কোন অঞ্চলের রীতিকে অনুকরণ করতেন না। সেখানেও তিনি তাঁর রচনার বৈচিত্র্য প্রকাশ করতেন। অল্প খরচে পিস্‌বোর্ডের উপর সোনালী রূপালী ও অন্যান্য রঙের কাগজকে বিচিত্র নকশাতে কেটে 'তাসের দেশ' ও 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি নাটকে যে সাজ তিনি রচনা করেছিলেন তা ভোলবার নয়। তাসের দেশের সাজের সময়
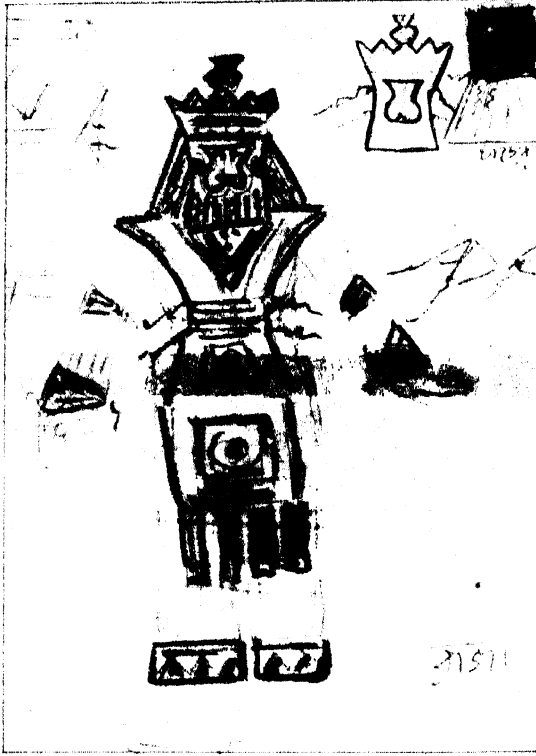
বুঝেছিলাম যে বড় নাট্যকার এবং বড় শিল্পীর রচনা যখন এক হয়ে মিশে যায় তখন তা কত মনোমুগ্ধকর হতে পারে। তিনি প্রয়োজনে কলাগাছের কাণ্ড সংগ্রহ করে তার থেকে সাদা অংশটি কেটে গয়না করেছেন। শিরীষ গাছের শুকনো পাতলা ফলগুলিকে ব্যবহার করেছেন গয়নার মত করে। এরকমের বিচিত্র ধারার পরীক্ষা আর কোথাও হয়েছে কিনা জানি না। নানা প্রকার ফুল ও নানা গাছের পাতাও তাঁর হাতে পড়ে নটনটীদের অঙ্গসজ্জায় স্থান পেয়েছে। অভিনয়ে বা নৃত্যাভিনয়ে দামী গয়না বা সাজপোশাকের প্রয়োজনকে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় দিতেন না। ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত সাধারণ গয়না তিনি পছন্দ করতেন। গ্রামবাসী নরনারীদের ব্যবহৃত নানা প্রকার রঙীন বস্ত্র তিনি গুরুদেবের নাটকে অবাধে ব্যবহার করেছেন। অভিনেতাদের মধ্যে যাদের রং কালো ছিল তাদের তিনি রঙ মাখিয়ে কখনো ফরসা করতেন না। তিনি পুরুষ ও মেয়েদের গায়ের স্বাভাবিক রঙের উপর নানা রঙীন বস্ত্রে এবং গয়নায় এমন ভাবে সাজাতেন যে তাতে দেহের রঙকে কখনো মঞ্চে দৃষ্টিকটু মনে হতো না। তিনি মনে করতেন, সকলের মধ্যেই দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য ফোটানো যায়। প্রকৃত শিল্পীর পক্ষেই তা সম্ভব। নন্দলালের মধ্যে ছিল সেইরূপ একটি শিল্পী প্রতিভা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে। তাঁর এই প্রতিভার বড় পরিচয় হলো, তিনি সবরকম পরিস্থিতিতেই শিল্প প্রতিভার পরিচয় ফোটাতে পারতেন। তাঁর কাছে মূল্যবান উপকরণের কোন মোহ ছিল না। অতি সামান্য অপ্রয়োজনীয় বলে যা আমরা মনে করি তাঁর হাতে পড়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে তারা স্থান পেয়েছে।

বর্তমানে কলাভবনের বাড়িগুলিকে ঘিরে নানা প্রকার ছোট বড় গাছ আমরা দেখি। ১৯২৯-এ যখন কলাভবনের ঐ কটি বাড়ি তৈরি হয় তখন সেখানে একটি ছাতিম, কয়েকটি বুনো জাম ও শিরীষ ছাড়া আর কোন গাছ ছিল না। কয়েক বছর পর, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের দিনে নন্দলাল স্থির করলেন কলাভবনের চারপাশে ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে নিজের হাতে একটি করে এমন সব গাছের চারা পুতবে যা এখানকার মাটি ও বীরভূমের আবহাওয়ার অনুকূল এবং মালির দ্বারা নিয়মিত যত্নের অভাবেও তারা বেড়ে উঠবে। এছাড়া চারাগাছগুলির জন্য স্থান নির্বাচন সম্পর্কে তিনি যা

নন্দলাল কৃত "তাসের দেশ" পোশাকের খসড়া।

কোপাই নদীর তীরে বালি নিয়ে বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণে রত নন্দলাল।

ভেবেছিলেন তাও অভিনব। কলাভবনের চারি পাশে সুনির্দিষ্ট ভাবে তৈরি কোন রাস্তা ছিল না। ছিল পায়ে হাঁটা কয়েকটি সরু পথের চিহ্ন। সেগুলি যে ভাবে এঁকেবেঁকে রূপ নিয়েছিল পথচারীদের পদস্পর্শে, তারই দুপাশে চারাগুলিকে পোঁতালেন। এর জন্য মাপ জোক করা সাজানো রাস্তার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করলেন না। এখন আমরা যে সব গাছ কলাভবনের চারপাশে দেখি সে গুলির প্রায় সবকটিই তখনকার। এখন তা দেখে মনে হবে, গাছগুলি যেন আপনা থেকেই যেখানে সেখানে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশন যখন ১৩৩৫-এ লখেন্ট, ১৩৩৬-এ মহারাষ্ট্রের ফৈজপুরে এবং ১৩৩৮-এ গুজরাতের হরিপুরা গ্রামে হয়েছিল, তখন মহাত্মা গান্ধী নন্দলালকে তার যাবতীয় সাজসজ্জার দায়িত্ব দেন। নন্দলাল সানন্দে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমেই তিনি স্থির করেছিলেন, গ্রামবাসীদের দ্বারা তৈরি যে সব মণ্ডনশিল্প ও কারুশিল্প গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং যে সব দ্রব্য, যেমন বাঁশ, খড়, চাটাই, ঘাস, পাটি, মাটির হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি যে অঞ্চলে যা সহজ লভ্য তা দিয়ে জাতীয় মহাসভার সব কিছুকেই তিনি সাজাবেন। শিকে, কাঁথা ও পাঞ্জাবী, গুজরাতি, বাঞ্জারী মেয়েদের রঙিন চোলি, ঘাগড়া এবং রঙিন খদ্দর সহ গ্রাম প্রচলিত নক্‌শা আঁকা বস্ত্রই কেবল ব্যবহার করেছিলেন। সভাপতিকে বহন করে সভামণ্ডপে আনার জন্যে নন্দলাল মটরগাড়ি সাজালেন না, সাজালেন কয়েক জোড়া তেজী ষাঁড়ে টানা গরুর গাড়ির রথ। গরুগুলিকে গ্রামে প্রচলিত রঙিন নক্‌শাকাটা কাপড়, গলার মালা ও ঘণ্টা দিয়ে সাজালেন। চালকদেরও সাজিয়েছিলেন উৎসবে তারা যে সাজে নিজেদের সাজিয়ে থাকে। জাতীয় মহাসভার এই কটি অধিবেশনকে ভিন্নরীতিতে এমন ভাবে সাজিয়ে ছিলেন যা পূর্বের কোন কংগ্রেসের অধিবেশনে কেউ দেখেনি বা সেভাবে সাজাবার চেষ্টাও পূর্বে হয়নি। এছাড়া হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশন প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে যে বিরাট গেট তৈরি হয়েছিল সেখানে গ্রামজীবনে নানাবিধ কর্মরত নরনারীদের প্রাণোচ্ছল ৬০টি ছবি বাংলার পটশিল্পের আঙ্গিকে নিজে হাতে এঁকে, সাজিয়ে দিয়েছিলেন। ছবিগুলি যখন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তিনি আঁকতেন তখন দেখেছি কত সহজ এবং কত দ্রুতলয়ে তাঁর হাত চলত। প্রতিদিন মেঝেতে ৭/৮ খানি কাগজ সেঁটে পর পর ছবিগুলি কয়েক প্রকার দেশী রঙে তুলিতে আঁকতেন। এভাবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সব কটি ছবি তিনি শেষ করেছিলেন। এই ছবিগুলি হরিপুরা পোস্টার নামে পরিচিত। শিল্পী বিনোদ বিহারীর মতে, ছবিগুলিতে "উজ্জ্বল রঙের প্যাটার্ণ এবং ক্ষুরধার ক্যালিগ্রাফিক লাইন সমবেত ভাবে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। আবেদন ও সরলতা সুস্পষ্ট।" যে সহজ সরল অথচ প্রাণোচ্ছল মাধুর্যের কারণে লোকসঙ্গীত সব শ্রেণীর শ্রোতাদের মনোহরণ করে নন্দলালের হরিপুরা পোস্টারে সে প্রকার সব গুণই বর্তমান। ছবিগুলি অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসী এবং সহরবাসী শিক্ষিতদের মনকে সহজে আকৃষ্ট করেছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনকে সাজানোর দায়িত্ব নিয়ে নন্দলাল দেশবাসীকে দেখিয়ে দিলেন, প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টি থাকলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে সৌন্দর্য সৃষ্টির যে সহজ উপাদান ছড়িয়ে আছে তাকে অবহেলা করে ধনের আড়ম্বরের প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন হয় না।

নন্দলালের মত একজন প্রখ্যাত শিল্পী জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশনের বিরাট অঞ্চলের সাজসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলে তৎকালীন কিছু শিল্পরসিক মনে করেছিলেন, এতে নন্দলালের শিল্পী মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তিনি যে তাঁর শিল্প সাধনাকে সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক থেকে দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন সে কথা তাঁরা তখন বুঝতে পারেন নি। কিন্তু মহাত্মাজী এইরূপ রূপসজ্জার প্রয়োজনের কথা অনুভব করে নন্দলালকেই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন তাঁকে ছাড়া একাজ কখনই সম্ভব নয়।

কোন স্বদেশ প্রেমিকের মুখে অভিযোগ শুনেছিলেম যে নন্দলালের মত শিল্পীরা দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একতালে যদি না চলতে পারেন, তবে তাঁদের শিল্পসাধনার সার্থকতা কি? শিল্পীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তাঁর মনকে আঘাত করে ও শিল্পীর শিল্প প্রচেষ্টায় তা প্রকাশ পায়। কিন্তু বড় শিল্পসৃষ্টি সেই সাময়িক আবহাওয়ায় জন্মলাভ করেও চিরকালের জগতে স্থান গ্রহণ করে। সৌন্দর্যবোধহীন দেশবাসীর চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগানো কি বড় কাজ নয়? তা ছাড়া সৌন্দর্যের সৃষ্টি যে ব্যয়বহুল নয় দেশবাসীকে সে শিক্ষাও তিনি কংগ্রেসের কাজে এবং শান্তিনিকেতনের নানা প্রকার উৎসবের সাজসজ্জার দ্বারা বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

দোলের শালবীথিকায় গানের আসরের মাঝখানে আছেন দিনেন্দ্রনাথ, তাঁর ডানদিকে জগদানন্দ রায় এবং নন্দলাল।

আমাদের দেশের শিক্ষিত বা ধনীদের চেয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের সৌন্দর্য বোধ ও চর্চায় নিজস্ব একটি বিশেষ মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের দারিদ্র যতই প্রবল হোক না কেন, তার মধ্যেই তারা তাদের বাড়ি ঘরের প্রত্যেকটি কাজেই তাদের সরল সহজ আলংকারিক মনোভাবের ছাপ নিজেরাই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। নিজেদের ব্যবহারের কাপড় জামা, বসবার চৌকি, চাটাই, বাসনপত্রে, দরজায়, ঘরের চালকে অলংকৃত করবার লোকের অভাব হয় না। হালে গ্রামবাসীদের এইরূপ মণ্ডণশিল্প ও কারুশিল্পের প্রতি নজর পড়েছে সহরের শিল্পীদের। তাঁরা চেষ্টা করছে সহরবাসীদের মধ্যে তাকে স্থান দিতে। উদ্দেশ্য, তারাও যে নিজস্ব সৌন্দর্য বিকাশে পেছিয়ে নেই সে কথা সকলকে জানানো। গ্রামবাসীদের মত সহজ সরল শিল্পবোধের চর্চার ব্যবস্থা সহরবাসী সমাজে নেই বলে, তাদের সব সময়ে শিল্পকলেজের শিক্ষিত পেশাদার শিল্পীদের সাহায্য নিতে হয়। নিজেদের চেষ্টায় নিজের বাড়ির কোন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের সাজসজ্জার দায়িত্ব নিতে সাহস পায় না। শিক্ষিত ধনীরা অর্থব্যয়ের মাপকাঠিতে সব কিছুকে বিচার করেন বলে তাঁদের সমাজে সাজসজ্জার মধ্যে রুচিবোধের পরিচয় প্রায়ই দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে।

শিল্পাচার্য নন্দলাল, কলাভবনকে শিল্পী তৈরির কলেজ হিসেবে যেমন গড়তে চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন কলাভবনের দ্বারা দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনচর্যার প্রয়োজনীয় বিষয়েও উন্নত শিল্পরুচির পরিচয় ফোটাতে। মণ্ডন শিল্প ও কারুশিল্পকে এই কারণে কলাভবনের শিক্ষাসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের যাবতীয় সভা, উৎসব ও অনুষ্ঠানকে নানা রঙের আলপনায় এবং বিশেষ কয়েকটি রঙের কাপড় অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে সাজাবার একটি নূতন রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। তাতে সুন্দর, সহজ ও সংযত রুচির প্রকাশ দেখা যেত। অনাবশ্যক জাঁকজমকের কোন স্থান ছিল না। শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, নন্দলালের মণ্ডন শিল্প ও কারুকলার প্রতিভা বিষয়ে বলেছিলেন, তাঁর হাতে, "মণ্ডনশিল্প নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে, বাধা রাস্তায় চলেন নি।" শিল্পী রামকিংকর বলেছিলেন, "মণ্ডনশিল্পের দেশীয় অপূর্ব ধারা-যেটি অবলুপ্ত ছিল—মাস্টারমশাই (নন্দলাল) সেটি আবার জাগিয়ে তুললেন।"

রবীন্দ্রনাট্যের সাজসজ্জার নব বিকাশে নন্দলালের দান

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গীতিনাট্য প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে যখনই অভিনীত হয়েছে তখন তার সঙ্গে জড়িত যে সাজে রঙ্গমঞ্চকে আমরা দেখেছি, তা কোনো দেশের প্রাচীন বা আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে যে মেলে না—এ কথা মানতেই হবে। আমরা দেখি রঙ্গমঞ্চের পিছনে ঘন নীল বর্ণের কাপড়। তার প্রায় ২/৩ ফুট সামনে থাকতো প্রথমে ঘন হলদে রঙের দুটি উইংস। তারই সামনে, সমদূরত্বে থাকত আরো দুটি নীল রঙের দ্বিতীয় উইংস, বেগনী-নীল রঙের তৃতীয় উইংস দুটি থাকত তার আগে। আর মঞ্চের সম্মুখে থাকত লাল ইটের রঙের চতুর্থ উইংস দুটি। চার রঙের এই উইংসগুলি কাঠের ফ্রেমে টান করে আটকিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হোত মঞ্চের দুই পাশে। উচ্চতা হত মঞ্চের উচ্চতার প্রয়োজন মত। এক একটি উইংসের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে মঞ্চের এক পাশের উইংসে থেকে অপর উইংসের মাথা পর্যন্ত, অনুরূপ চওড়া চারটি ফ্লাই টান করে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। উইংসের উপরে থাকতো গ্রামে তৈরি রঙীন নক্‌শা কাটা কাপড়। কখনো নিচু জল-চৌকী, কখনো কাঠের বাক্স নানাপ্রকার গ্রামীণ নক্‌শাকাটা কাপড়ে সাজিয়ে মঞ্চের কয়েক স্থানে রাখা হয়েছে বসবার আসন হিসেবে। কখন প্রদীপদানি বা ফুলের সারি দিয়ে একটু বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। কখনো কখনো মঞ্চের পিছনে বা পিছনের নীলপর্দার মাঝখানে প্রবেশ প্রস্থানের প্রয়োজনে ছোট দরজার আকারে ফাঁক রেখে তার তিন পাশে নানা রঙীন কাপড় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কখনো কাঠের ফ্রেমে স্থাপত্য কলার ইঙ্গিত ফোটানো হতো। এক কথায় রঙ্গমঞ্চটিতে সাজসজ্জার আড়ম্বর থাকতো যথা সম্ভব কম, রিয়েলিস্টিক দৃশ্যসজ্জা বা আঁকা সিনের কোন স্থান তাতে ছিল না।

দেশী লাল বা গেরুয়া, হলদে, নীল রঙের সঙ্গে কখনো সামান্য একটু সবুজ, সাদা বা কালো রঙের মিশাল মঞ্চে রঙের একটি ছন্দোময় বিন্যাস ঘটাতো।

রঙ্গমঞ্চের এইরূপ ছন্দোময় বর্ণ বিন্যাস আমাদের দেশের কোন কোন সমালোচকের প্রথমদিকে ভাল লাগেনি। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একজন বাঙালী সমালোচক বাঙলা দেশের থিয়েটারের বিষয়ে আলোচনাকালে শান্তিনিকেতনের মঞ্চসজ্জা বিষয়ে যা লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ উল্লেখেই সেই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে, ঃ—

"It looks like a bit of painted canvas of hazy and subdued colour and weired assemblage of unintelligible angles and lines, made to subject if any thing at all something quaint. shadowy and unsubstantial"

তাছাড়া য়ুরোপের futurist tendenciesএর এগুলো ব্যর্থ অনুকরণ বলেও তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন ঃ—

"The vagueness of their methods in a sense encouraged by the vagueness inherent in the plays of Rabindranath."

এইসব চিন্তাধারা যে কতটা অজ্ঞতাপ্রসূত তা জানতে হলে আমাদের রঙ্গমঞ্চসজ্জার ঐতিহাসিক ও আদর্শগত ভিত্তি নিয়ে আগে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

ভারতবর্ষে নাটক রচনা ও তার অভিনয় যে বহু প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত ছিল একথা শিক্ষিত মাত্রেরই জানা আছে। থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে ভারতে প্রথম লিখিত গ্রন্থ, ভরতের নাট্য শাস্ত্রের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ ও তার সাজসজ্জা বিষয়ে যতটুকু বর্ণনা পাই, তাতে বোঝা যায় যে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের দেশে নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার ছিল। আজকালকার মত নাটকের প্রত্যেক অঙ্কে যেমন দৃশ্যপট পরিবর্তন করা হয়, সে ধরনের কোন পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর পাই না আজকালকার মত "ড্রপসীন"-এর কোন কথা। নটনটীদের যাওয়া আসার সুবিধার জন্যে যে একটি "যবনিকা" ব্যবহৃত হত তার গায়ে কিছু কিছু দৃশ্য আঁকা থাকত বলে মনে হয়। একটি মাত্র "যবনিকা" থাকার দরুণ নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য দর্শকগণকে কল্পনায় দেখতে হত। এই 'যবনিকা' ব্যবহারের সঙ্গে বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত "কথাকলি" ও "যক্ষগণ" নৃত্যাভিনয়ের "যবনিকা" ব্যবহারে মিল পাওয়া যায়।

সেখানে যে 'যবনিকা' দেখেছি তা অভিনয় মঞ্চের পিছনটার মাপে তৈরী নয়; তা দশ বারো হাত চওড়া ও লম্বা। কেবল রঙ বেরঙের নক্‌শাকাটা দৃশ্যহীন একটি পরদা। নটের প্রবেশের সময় তাকে এর দ্বারা আড়াল করে দুটি মানুষ দুদিকে ধরে থাকে। নটের প্রকাশের পর 'যবনিকা' সরিয়ে ফেলা হয়।

প্রাচীন নাটকের রঙ্গমঞ্চে পাহাড় গুহা বিমান অশ্বাদি ব্যবহার হ'ত কিন্তু তা একবারেই আসল জিনিসের হুবহু অনুকৃতি নয়। যাত্রায় ছোট ছোট তীর ধনুকে কুরু-পাণ্ডবের প্রচণ্ড যুদ্ধকে দেখানো হত, ছোট লাঙ্গলটি কাঁধে ফেলে বলরামের আবির্ভাব হত, চাটাইয়ের সাহায্যে সর্বাঙ্গ মুড়ে ভূত প্রেতকে যাত্রার আসরে দেখেছি। ছোট একটা পর্বতের মত কিছু একটা হাতে করে হনুমানকে যাত্রার আসরে গন্ধমাদন বহন করতে দেখেছি। প্রাচীন ভারতের আদর্শানুযায়ী এভাবে অনেক কিছুর ব্যবহার হতো। পূর্ব এশিয়া মহাদেশের প্রাচীন পদ্ধতির সব নাটকেই এই আদর্শ এখনো বর্তমান।

একথা ঠিক যে, তখনকার দিনে রঙ্গমঞ্চকে সাজানো হতো কিন্তু সে সাজের সঙ্গে নাটকের কোন দৃশ্যের বা উল্লিখিত নাটকের বিষয়বস্তু যে স্থান অবলম্বনে লিখিত, তার কোন পরিচয় ফোটান হতো না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা পড়ে মনে হয় যে সে যুগের লোকেরা সাজে মঞ্চকে এমন একটি বিশিষ্টতা দিতেন, যা দেখে মনে হতো যেন মঞ্চটি কোন একটি বিশেষ প্রয়োজনে সজ্জিত। অভিনয় স্থানকে বৈশিষ্ট্যদানের ইচ্ছা থেকেই মঞ্চসজ্জার আয়োজন। কোনরূপ বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এতে ছিল না। বৈশিষ্ট্যদানের প্রকাশ স্বরূপ রঙ্গমঞ্চে নানা রূপ রঙীন কারুকার্য ও আলপনা ইত্যাদি দেখা যেত। সে সাজের সঙ্গেও নাটকের বিষয়বস্তুর কোন সাদৃশ্য ছিল না। রঙ্গমঞ্চ সজ্জার এই বিশিষ্টতাটি চীন ও জাপানের প্রাচীন নাটকেও দেখা যায়। তাদের প্রাচীন নাট্যকলার রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় তারা একই আদর্শ মেনে চলে। চীন দেশের আদর্শে বলা হয়েছে, ঃ—

"Decoration is usually considred as an external of the drama. To the Chinese, scenery is a silly and unnecessary bother....scenic decoration of any importance were

কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কবিগুরু ও নন্দলাল

কলাভবনের ছাত্রীদের সঙ্গে নন্দলাল।

always out of question in the Chinese theatre."

জাপানের প্রাচীন "নৌ" নাট্যের রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বলা হয়েছে, :—

"No does not seek to represent realistically...in the No Play there is no scenery, stage fixtures are of the simplest....The fixtures are intended to suggest and not to be realistic."

চীন ও জাপানের প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের তিন দিক খোলা থাকে, অর্থাৎ দর্শক তিন দিকেই বসে অভিনয় দেখে। সেখানেও রঙ্গমঞ্চকে অলংকৃত করা হয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে নাটকের স্থান কালের সঙ্গে কোন যোগ নেই। সেখানেও মঞ্চটিকে সাজানো হয়েছে কেবল মাত্র একটি বৈশিষ্ট্য দেবার জন্যে। যে বৈশিষ্ট্যদানের আদর্শে আমরা পূজার বেদী ও উৎসবদিনের প্রাঙ্গণ, ঘর বাড়ী পথ ইত্যাদি সাজাই।

প্রাচীন আদর্শে পরিচালিত নাট্যশালার একটি নমুনা আমি দেখেছি দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশের একটি বিখ্যাত মন্দিরে। আজও তাতে পেশাদারী অভিনেতা সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় নাটকের অভিনয় করে। সেখানকার অভিনয়-গৃহ ও তার রঙ্গমঞ্চ ও সাজসজ্জার প্রকৃতি ও আদর্শের সঙ্গে ভরত বর্ণিত বা চীন জাপানের প্রাচীন থিয়েটার ও তার রঙ্গমঞ্চ সজ্জার আদর্শে মিল লক্ষ্য করেছি। প্রকাণ্ড মঞ্চগৃহের পশ্চিম দিকে স্থাপিত পূর্বমুখী রঙ্গমঞ্চটি। মঞ্চের তিন দিক খোলা। সেই তিন দিকেই দর্শকরা বসে। কারুকার্যময় কাঠের থামে মঞ্চটি সীমাবদ্ধ ও কারুকর্যময় কাঠের আচ্ছাদনে মঞ্চের উপরটি আচ্ছাদিত। পিছনে লাগা সাজ-ঘর। সেখান থেকে দুটি দরজা দিয়ে তারা মঞ্চে প্রবেশ করে। এইখানেও বহু শত বৎসর ধরে অভিনয় কলা সম্পন্ন হচ্ছে কিন্তু কোনরূপ বাস্তব দৃশ্যসজ্জার কথা এরা কখনো চিন্তা করেনি, আজও করে না। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হলেও চীন, জাপান ইত্যাদির মত "ড্রপসীন"-এর ব্যবহার এদের মধ্যেও নেই।

বাস্তব দৃশ্যের সমর্থন এরা করেনি বলে যে এই মঞ্চকে একেবারে নিরলংকার করে সাজিয়েছে তা নয়। তাকে অভিনয় স্থান হিসেবে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে নয়নরঞ্জন করে সাজিয়ে।

রঙ্গমঞ্চকে বিশেষ স্থানরূপে অলংকৃত করবার পিছনে যে চিন্তা কাজ করেছে সেটিকেও আমাদের জানা উচিত। এই যে সাজসজ্জা, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হোলো স্থানটির প্রতি দর্শকের মনে একটি অনুকূল ও সহৃদয়তার ক্ষেত্র রচনা করা। পূজার স্থান, উৎসব বেদী বা প্রাঙ্গণ সাজানোর ভিতর দিয়ে আমাদের মনের উপর যে ক্রিয়া করে এরও আসল উদ্দেশ্য তাই। সেইরূপ সজ্জিত রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন নট নটীরা স্থান নেয় তখন তারাও একটি বিশেষ রূপ নিয়েই দর্শকের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একেও বলা চলে কতকটা স্থান মাহাত্ম্য। এদিকে নট নটীদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চ আপনাকে এমনভাবে দর্শকদের মন ও চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় যে যতক্ষণ মঞ্চে নট নটীরা অভিনয় করছে ততক্ষণ তার কথা একটুও মনে থাকে না। কিন্তু যে মুহূর্তে অভিনেতারা নেই সেই মুহূর্তেই সে মঞ্চটি নিজের স্নিগ্ধ গম্ভীর মাধুর্য নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির। অভিনেতারা অভিনয়ে গানে ও নৃত্যে যে রসের সৃষ্টি করে গেল মঞ্চের জন্যে সে রস ব্যাহত হল না একটুও। তখন মনে হবে যে-সাজে রঙ্গমঞ্চটি সেজেছে সে সাজটি যেন নাটকের সব রকম রসেরই অনুকূল।

রঙ্গমঞ্চ সজ্জার এই দৃষ্টি-ভঙ্গী বা আদর্শটিকে ভারত ও পূর্ব এশিয়া মহাদেশে এতকাল প্রতিপালিত হয়েছে। কিন্তু এ যুগে য়ুরোপের সভ্যতার চাপে, তাদের মঞ্চসজ্জা পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করলাম। আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক শহরে থিয়েটারের যে চলন দেখি এ সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপের আদর্শ উদ্ভূত এবং এর রঙ্গমঞ্চের সাজও সম্পূর্ণরূপে সেই পথেই আত্মনিবেদন করেছে। অর্থাৎ দৃশ্যসজ্জা বা সীন এঁকে রঙ্গমঞ্চকে নাটকের বর্ণনা অনুসারে যথাসম্ভব বাস্তবমুখী করবার দিকেই প্রবল চেষ্টা। নট নটীদের অভিনয়কালে এই দৃশ্যসজ্জা প্রবলভাবে দর্শকদের চোখে ভাসতে থাকে, সব সময় মনে করিয়ে দিতে চায়, সে আছে। কিন্তু স্থিতিশীল কোন বিশেষ দৃশ্য অভিনেতাদের চলনশীল হৃদয়াবেগের প্রকাশের সঙ্গে খাপ খায় কিনা, তা চিন্তার বিষয়।

বাঙলা দেশ য়ুরোপের আদর্শে রঙ্গমঞ্চের সাজকে গ্রহণ করেছিল উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ; কলিকাতাবাসী য়ুরোপীয়দের থিয়েটারের অভিনয় দেখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশে পেশাদারী থিয়েটার স্থাপনের পর থেকেই সে আদর্শ কার্যকরীভাবে দেশের অভিনয় বা নাট্যকলার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 'হিন্দুমেলা' বা 'জাতীয় মেলা' আন্দোলনের যুগেই ব্যাপক ভাবে এই পদ্ধতি গৃহীত হয়।

এই আন্দোলনের প্রভাব কলিকাতাবাসী বাঙালী সমাজেই প্রথম প্রবলভাবে পড়ে। জোড়াসাঁকোয় গুরুদেবের পরিবারও এই প্রভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এই পরিবারে যখনি নাটকাদির অভিনয় হয়েছে তখন য়ুরোপের আদর্শে রঙ্গমঞ্চ সজ্জার প্রতি তাঁদের কি প্রকার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাদের পরিবারে অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার দৃশ্যসজ্জার বর্ণনা থেকেই তা ধরা পড়বে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর পরিবারের অভিনয় ইত্যাদি কলার একজন প্রধান উৎসাহী। তখনকার কালে এই পরিবারের যাবতীয় অভিনয়ের পিছনে এঁরই উৎসাহ বিশেষভাবে কাজ করতো। নিজেও এক সময় কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন ; গুরুদেব ও অন্যান্য আত্মীয়দের দিয়ে নাটক রচনা করিয়ে তা অভিনয়ও করিয়ে ছিলেন। পরিবারের অভিনয় আন্দোলনের প্রথম যুগের দৃশ্য সজ্জার কিছু বর্ণনা তাঁর কোন কোন লেখায় আমরা আজও যা পাই এখানে তা তুলে দিচ্ছি। তাঁর নিজের রচিত একটি নাটকের অভিনয় কালে তাঁদের বাড়ির—"দোতালার হলের ঘরে স্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া...সীন আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপসীনে, রাজস্থানের ভীম সিংহের সরোবর তটস্থ জগমন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল।... তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। স্টেজ যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতিসুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।"

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঐ সময়কার রঙ্গমঞ্চের বিষয়েও একই কথা লিখেছেন, :—

"সীনও যেখানে যেমনটি দরকার, পুকুরঘাট রাস্তা ; স্টেজ-আর্ট যতটুকু রিয়ালিস্টিক হোতে পারে হয়েছিল। একটা বনের দৃশ্য ছিল, অন্ধকার বনের পথ,...সেই বনের সীন এলেই বাবামশায় অন্ধকার বনপথে জোনাক পোকা মুঠো মুঠো করে ছেড়ে দিতেন। ড্রপসীন পড়ল তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা, রাজপুত্তুর নৌকোতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহাড়ের সার, গ্রীক যুদ্ধের একটি কপি। কোনও সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়ে ছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই ছবি। নৌকো থেকে গোলাপফুলের মালা ঝুলছে ; কী ভালো যে লেগেছে, তন্ময় হয়ে দেখছি।"

অপর একটি নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু লিখেছেন :—

"ঝড়বৃষ্টির একটি দৃশ্য ছিল—তাহাতে সত্য সত্যই ঝর ঝর করিয়া জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত বৃষ্টি ধারা বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল।"

এর পরে এলো গুরুদেবের নাটকের যুগ। প্রথম নাটক "বাল্মীকি প্রতিভা।" অবনীন্দ্রনাথ এর বর্ণনায় লিখেছেন, :—

"হ, চ, হ, এলেন সেবারে তাঁর উপর ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার। কোত্থেকে দুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌঞ্চমিথুন হলো। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সীন আঁকলেন কচু বনে বন্যবরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে।...আর বাগান থেকে বটের ডাল পালা এনে লাগিয়ে দিলেন।" আর একবার এই নাটকের অভিনয়কালে..."মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ভরাট করলেন।...বনজঙ্গল বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দোতালার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে। নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সীন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্ম বন, শোলার পদ্মফুল পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পর পর চার-পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ

ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে পরে এক-একটা পর্দা উঠে যাবে, ও-পাশ থেকে আস্তে আস্তে আলো ফুটবে আর একটু একটু করে পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।"

"তখন এ-রকম ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাস বাতি, কার্বন লাইটের ব্যবস্থা হলো। লাল সবুজ মখমলের পর্দা দিয়ে স্টেজটা সাজানো হোলো।"

..."তার পর বৃষ্টি হোলো স্টেজে, আর সঙ্গে সঙ্গে গান 'রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে।' পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় ক'রে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি, দুটো দম্বেল ছিল...নিতুদা দোতালার ছাদ থেকে সেই দম্বেল দুটো গড়গড় করে এধার ওধার গড়াতে লাগলেন। সাহেব মেমরা তো মহাখুশী, হাততালির পর হাততালি পড়তে লাগল। যতদূর রিয়েলিস্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল।...ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে 'দিনু' স্টেজে এল। একজন আবার গিয়ে ঘোড়াকে একটু ঘাস-টাসও খাওয়ালে। সে কী অ্যাক্টিং যদি দেখতে।"

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে প্রথম যেবার 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয় সেবারেও স্টেজ খাটানোয় কলকাতার প্রভাব দেখা গেছে। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইবারের নাটকের মঞ্চসজ্জার বর্ণনায় লিখেছেন—

"স্টেজ তৈরি করার জন্য যদিও খানকয়েক নড়বড়ে তক্তপোষমাত্র ছিল আমাদের সম্বল, তবু 'সিন' আঁকবার জন্য কলকাতা থেকে একজন শিল্পীকে আনানো হ'ল। তাঁর হাতের তুলি ছিল মুক্তগতি, আর তিনি দুটানে ছবি যা আঁকতেন তা হত একেবারে কিম্ভূতকিমাকার...তাঁর জবড়জঙ্গ চিত্রবিদ্যায় আমরা বরং রীতিমত বিমুগ্ধ হয়ে স্টেজ বাঁধতে উঠে পড়ে লেগে গেলাম।...দৃশ্যপটে রুচির অভাব যতই থাক, অভিনয় মোটেই খারাপ হয় নি।"

এর পরে শান্তিনিকেতনের দৃশ্যসজ্জায় একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়—তার প্রথম সূত্রপাত হোলো "শারদোৎসব" নাটকটি অবলম্বন করে এবং এর জের চলেছিল "অচলায়তন" এবং "ফাল্গুনী" পর্যন্ত। এই পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"'শারদোৎসব', 'অচলায়তন' এবং 'ফাল্গুনী'—শান্তিনিকেতনে এই তিনটি নাটকের অভিনয়কালেই চিত্রিত দৃশ্যপট বর্জন করা হয় এবং তার পরিবর্তে এল স্বাভাবিক দৃশ্যের প্রয়োজন", অর্থাৎ গুরুদেবের নাটকে সীন আঁকা দৃশ্য-পট এইবারেই প্রথম ত্যাগ করা হল। স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজন বলতে যা বোঝায় তা হোলো, রঙ্গমঞ্চের পিছনে মাটির ঢিবি, ঘাসের চাপড়া, কাশের বন, শিউলির গাছ, শরৎকালের নদী রচনা করে একটি বাস্তব চিত্র রচনা। এই পদ্ধতির দৃশ্যসজ্জা ১৯১৯ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের শারদোৎসবের অভিনয়ে দেখেছি। আরো দেখেছি মঞ্চের সামনে শিল্পগুরু নন্দলাল পরিকল্পিত নটরাজের চিত্র আঁকা প্রকাণ্ড একটি "ড্রপসীন"। এটি এঁকেছিলেন শিল্পী মুকুল দে।

এই "ড্রপসীন" জরাজীর্ণ হয়েছিল বলে এইবারের শারদোৎসবে অভিনয়কালে নন্দলাল আর একটি "ড্রপসীন" এঁকেছিলেন। তাতে ছিল শরৎকালের একটি দৃশ্য। এইটিই বিদ্যালয়ের অভিনয় জীবনের শেষ "ড্রপসীন"।

এই সময়ের কয়টি নাটক লেখার মূলে ছিল শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের আদর্শ ও পরিবেশ। অর্থাৎ যেখানে ছাত্ররা বিশ্বপ্রকৃতির আবেষ্টনে মন ও দেহকে তৈরি করবে। তাই মঞ্চসজ্জায় ও প্রকৃতিকে ছবির মত পিছনে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। রিয়েলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তখনও প্রবল।

প্রথমবার 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়ের কিছু আগে থেকেই গুরুদেবের মনে রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে যে বিশেষ চিন্তার উদয় হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে। তাতে লিখেছেন, "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমণ্ডপের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।...

"ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকা মাত্র;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা

বাঁদিক থেকে উপবিষ্ট পত্নী সুধীরাদেবী, শ্রীমতী ঠাকুর, নন্দলাল ও রেণুকা কর। দাঁড়িয়ে: গৌরী ভঞ্জ ও অশোকা রায়

চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।...

"দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ওই জন্যে ভালো লাগে।...মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে—একা মালিনীরই মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে।

"য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিকগকে ভুলাইবে।

"তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের স্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।...

"প্রাচ্য দেশের ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল সহজ।...আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিসটাই মারা যাইত।

"বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য ;... দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরব-দান করিলেই সহৃদয় হিন্দু সন্তানের মতো কাজ হয়।...

"বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে ...।"

সীন আঁকা দৃশ্যসজ্জা পরিত্যক্ত হ'ল কিন্তু দৃশ্যসজ্জায় বাস্তবিকতা পরিত্যক্ত হ'ল না। গাছ গাছড়ার সাহায্যে দৃশ্যসজ্জা শান্তিনিকেতনের ঋতু নাটকগুলিতে রয়ে গেল। এই সাজ সজ্জার প্রকৃত শিল্পরুচি প্রকাশিত হয় নি বটে, তবুও তখনকার আশ্রমবাসীদের কাছে তা দৃষ্টিকটু ঠেকেনি। 'ফাল্গুনী'তে অভিনয়ের সময় শালবীথিতে দোল্‌না বেঁধে তাতে দুলতে দুলতে গান "ওগো দখিন হাওয়া', এর একটি ভাল উদাহরণ। যেন বসন্তকালে প্রস্ফুটিত ফুলের বাগানে দোলনা চড়ে একটি বালক গাইছে। শান্তিনিকেতনে ১৯২০/২১ সাল পর্যন্ত যখনি "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয় হয়েছে তখনও প্রচুর ডালপালা দিয়ে স্বাভাবিক বনদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। তবে কলকাতার যুগের মত অতটা রিয়েলিস্টিক্ করা সম্ভব হতো না।

এরই মধ্যে ১৯১৬তে "ফাল্গুনী" ও ১৯১৭ "ডাকঘর" কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত হোলো। এই সময়টি হোলো জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" সংঘের যুগ। যেখানে গুরুদেব, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নন্দলাল ও অসিত হালদার, সুরেন কর ইত্যাদি শিল্পরসিকরা মিলে ভারতীয় শিল্পাদর্শ ও রুচিকে মানুষের জীবন-যাত্রার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে কিভাবে মেশানো যায় তার অনুশীলনে চিন্তায় ও কর্মে মগ্ন ছিলেন। রঙ্গমঞ্চ সজ্জাও এই সংঘের কার্যসূচীতে বিশেষ স্থান পেয়েছিল। এর কাজ তাঁরা শুরু করেছিলেন গুরুদেবের নাটকের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ দিয়ে। "ফাল্গুনী" ও "ডাকঘর"-এর মহড়ার সঙ্গে এই শিল্পীবৃন্দ প্রতিদিন একটু একটু করে রঙ্গমঞ্চ পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। এখানে আঁকা সীন তাঁরা ব্যবহার করেন নি ; কিন্তু স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার আয়োজন ছিল।

তবুও এই সময় মঞ্চসজ্জায় একটি বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হোলো নীলরঙের কাপড় টানিয়ে ব্যাকগ্রাউণ্ড রচনা করে। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় এর একটু বর্ণনা তুলে দিচ্ছি। "ফাল্গুনী" রঙ্গমঞ্চের বর্ণনায় তিনি বলেছেন—

"স্টেজ সাজিয়েছিলুম দোলাটোলা বেঁধে।...ব্যাকগ্রাউণ্ডে দেওয়া হোলো. সেই বাল্মীকি-প্রতিভার নীল রঙের মখমলের বনাত, দেখতে হোলো যেন গাঢ় নীল রঙের রাতের আকাশ পিছনে দেখা যাচ্ছে।...বাদাম গাছের ডালপালা এনে কিছু-কিছু এখানে-ওখানে দিয়ে দিয়ে স্টেজ সাজানো হোলো।...বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলা টানিয়ে দিলুম। উপরে একটু ডালপালা দেখা যাচ্ছে, মনে হতে লাগল যে উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে দোলা টানানো হয়েছে।"

মঞ্চের ব্যাকগ্রাউণ্ডে প্রথম নীল রঙের মখমলের বনাত টাঙাবার ইতিহাসটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য। নাটকের মহড়ার সময় সব শিল্পীরাই উপস্থিত থাকতেন—তা ছাড়া তাঁরা অনেকে নাটকে অংশও গ্রহণ করেছিলেন। গুরুদেব যখন অন্ধ বাউলের অভিনয়ে 'ধীরে বন্ধু গো' গানটি গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে অন্তরালে চলে যেতেন তখন শ্রোতাদের মনে গানের সুরে, ভাবে ও অভিনয়ে একটি বিশেষ রসাবেশের সৃষ্টি করতো। তাতে শিল্পীবৃন্দের মনে প্রশ্ন জাগলো অন্ধকার নিশীথের মধ্যে বহুদূরে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দৃশ্যসজ্জায় কোথাও ফুটিয়ে তোলা দরকার। সেই চিন্তা থেকেই ঘন নীল পর্দার সূত্রপাত। তাতে দূরত্বের ছাপ দিতে গিয়ে রূপালী চাঁদের ফালি এক কোণে লাগানো হয়। মঞ্চের সামনে ফুল সমেত আসল পলাশ গাছের ডালও দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও এই দৃশ্যসজ্জায় পূর্ব যুগের তুলনায় একটু অভিনবত্ব ছিল কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টিতে ব্যাকগ্রাউণ্ডে নীল পর্দায় দূরত্বের ইঙ্গিত ফোটানো হলেও বাস্তবতার ঝোঁক তখনো ছিল।

১৯০২ সালে "রঙ্গমঞ্চ" প্রবন্ধে, সাজসজ্জা নিয়ে গুরুদেব যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক সেই কথাই তাঁকে আর একবার বলতে হোলো ১৯১৬ সালে 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের পরে। এবারে তিনি তাঁর বক্তব্য ইংরাজী ভাষায় বললেন অন্য প্রদেশবাসীদের ইচ্ছায়। বললেন আমাদের রঙ্গমঞ্চ 'imaginative', য়ুরোপের হল realistic। এ ছাড়া আরও বললেন,—

"The theatre which we have set up in India today, in imitation os the west, are too elaborate to be brought to the door of all. In them creative richness of the poet and the player is overshadowed by the mechanical wealth of the capitalist. If the Hindu spectator has not been too far infected with the greed for realism: if the Hindu artist has any respect for his own craft and skill: the best thing they can do for themselves is to regain their freedom by making a clean sweep of the costly rubbish that has accumulated and is clogging the stage of the present day."

এবারেও তিনি শিল্পীবৃন্দকে রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় কোন্ পথ নেওয়া উচিত তাই স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিচিত্রা সঙ্ঘের শিল্পীবৃন্দের কাজে তার প্রভাব কিছুটা কার্যকরী হয়েছিল।

কলকাতায় অভিনীত 'ফাল্গুনী' ও 'ডাকঘরে'র অভিনয়ের মঞ্চসজ্জায় বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে খানিকটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা যে হয়েছিল,তা বেশ বোঝা যায়। ডাকঘরের সময় শিল্পীবৃন্দ একত্রে চিন্তা করে মঞ্চের উপরে সত্যিকার খড়ের চাল ও বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি কুটীর বানান। এ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'দরমা, চালা বেঁধে, গোবর মাটি লেপে, আলপনা কেটে, সিঁকেতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে, মাটির পিলসুজে প্রদীপ রেখে রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব শ্রী ফুটিয়ে তোলা হোলো।...পিছনের যবনিকার একপ্রান্তে নীলপর্দায় উজ্জ্বল রূপালী কাগজ মেরে চাঁদের প্রতিকৃতি করে দেওয়া হল।'

ডাকঘরেও নীলপর্দা ও চাঁদের ফালি লক্ষণীয়।

বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার পর শুরু হোলো আর এক ধরনের বর্ষাঋতুর গীত আসর, গুরুদেব যার নামকরণ করলেন 'বর্ষামঙ্গল'। কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রথম বর্ষামঙ্গলের আয়োজন হোলো। খোলা মঞ্চের তিন দিকে ছিল শ্রোতাদের বসবার চেয়ার। মঞ্চের পিছনে ছিল কেবলমাত্র একটি নীলপর্দা—আর ছিল তার গায়ে আঁটা কাগজের এক সারি পাখা মেলে উড়ে-যাওয়া বক। আর কিছু ছিল না। মঞ্চ ছিল বর্ষার নানা ফুলে সজ্জিত। গায়ক-গায়িকাদের গলায় ছিল বর্ষাকালীন ফুলের সুগন্ধি মালা। এতখানি সরল ও অলঙ্কার বিরল করে ফেলা হোলো মঞ্চকে। এখন থেকে শান্তিনিকেতনের প্রায় সব উৎসবই এই ভাবে অলংকার বিরল ও কেবলমাত্র ইঙ্গিতপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে নাটকের

অভিনয় ও গানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে লাগল।

শরৎ ও বসন্ত ঋতুর উৎসবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, কিংবা আম্রকুঞ্জকে বিশেষভাবে সাজিয়ে নেওয়া হতো। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় যখন আর একবার পরপর পরিবর্তিত আকারে শারদোৎবের অভিনয় হোলো তখন দেখা গেল, রঙ্গমঞ্চ সজ্জার আর একটি নতুন রূপ। এই রূপের বৈশিষ্ট্য হোলো কেবলমাত্র রঙ্গীণ কাপড়ের বর্ণচ্ছটা। গাছ-পালা ইত্যাদির দ্বারা শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের স্বাভাবিক দৃশ্য রচনার ধারাও পরিত্যক্ত হল এখন থেকে। সবটাই গতি নিল রংয়ের সহজ সরল অলংকরণের দিকে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত যত রকমের নাটক শান্তিনিকেতনে কলকাতায় বা বাইরে অভিনীত হয়েছে, তার রঙ্গমঞ্চ সজ্জাও রচিত হয়েছে একই আদর্শকে ভিত্তি করে। এই যুগটিকে বলেছি গুরুদেবের নাটকের সঙ্গে জড়িত রঙ্গমঞ্চ সজ্জার তৃতীয় যুগ। প্রথম হোলো জোড়াসাঁকো বাড়ির যুগ, দ্বিতীয় যুগ হল শান্তিনিকেতনের প্রথম কুড়ি বৎসর। ঐ শেষ যুগটির প্রবর্তক হলেন শিল্পগুরু নন্দলাল। আরম্ভেই সংক্ষিপ্তাকারে রঙ্গমঞ্চ সজ্জার যে বর্ণনা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, সেইটিই হোলো তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত ও প্রচলিত গুরুদেবের নাটকের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ সজ্জার মূল ভিত্তি। তিনি এ পথে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে কলকাতায় তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সেই আদর্শের মধ্যে নিজেকে তিনি বদ্ধ রাখেননি। তিনি গুরুদেবের উৎসাহ ও প্রেরণায়, তাঁরই ইচ্ছামত রঙ্গমঞ্চকে সাজাতে গিয়ে কতখানি সহজ, সরল অথচ একটি বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে পারেন তিনি তারই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই কাজে রঙের ছন্দোময় বিন্যাসই পেল প্রাধান্য। তাতে এনে দেয় মনে একটি স্নিগ্ধতা, গভীর শান্তি। তা দুর্বল রসমুগ্ধতায় মন ভোলায় না। এরই আবেষ্টনে দাঁড়িয়ে নট ও নটীরা যখন অভিনয় করে তখন সেই রঙ্গমঞ্চের সাজ-সজ্জা আলাদা করে নিজেকে জাহির করে না। এ যেন ভারতীয় ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড। আছে কি আছে না ছবি দেখার সময় বোঝবার যো নেই। শিল্পগুরু নন্দলাল প্রবর্তিত এই রঙের বিন্যাসেও আমরা দেশী ছবির আদর্শ লক্ষ্য করি। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে যে কয়টি রঙ প্রধান, এই মঞ্চসজ্জায় তিনি সেই রঙগুলিকে বিশেষ করে ব্যবহার করেছেন। রঙের বিন্যাসেও তিনি সেই ধারাকেই প্রাধান্য দিলেন। রঙগুলিকে সাজানোর আরও একটি কারণ ছিল। নীল রঙের পর্দারসাহায্যে দূরত্বের যে ইঙ্গিত জেগেছিল, তাকে আরও মধুর করে প্রকাশের ইচ্ছা থেকেই অন্য রঙগুলি স্থান পেল। নীলের বিশেষত্বটিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়েই শিল্পগুরু মঞ্চের সামনে হলদে ও লাল রঙকে বসালেন।

অনেক সময় এই প্রশ্ন মনে উঠতে পারে যে, গুরুদেবের একমাত্র লিরিক ধর্মী নাটকেই এইরূপ মঞ্চসজ্জা উপযুক্ত। সামাজিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখিত ড্রামাটিক পরিবেশের নাটকের জন্যে এ নয়। কিন্তু এই আদর্শের মঞ্চ পরিকল্পনা গুরুদেবের এ ধরনের নাটকে ব্যবহৃত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, সব রকম নাটকের পক্ষেই এ উপযুক্ত।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন পুরাতন নাটক 'বিসর্জন' অভিনীত হোলো, স্বয়ং গুরুদেব যাতে অভিনয় করলেন, তারও মঞ্চসজ্জা শিল্পগুরু নন্দলাল প্রবর্তিত আদর্শকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। প্রথম ও মধ্য যুগের রিয়েলিস্টিক দৃশ্যসজ্জার কথা কারুরই মনে জাগেনি। পরে 'নটীর পূজা' ও ১৯২৯-এ 'তপতী'র মত নাটকেও আমরা একই আদর্শকে ভিত্তি করে রঙ্গমঞ্চ সাজাতে দেখলাম। এখানে স্থাপত্যকলার যে ইঙ্গিত ফোটানো হয়েছিল, তাতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করেরও হাত ছিল। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা মূল ধারার কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেই প্রকাশিত।

এ ধরনের নাটকের সঙ্গে স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার কথা ওঠা স্বাভাবিক মনে করে গুরুদেব পূর্বেই সতর্ক হয়ে প্রথমে "ভৈরবের বলি" পরে "তপতী"র ভূমিকায় দৃশ্যসজ্জা বিষয়ে আর একবার সাধারণ দর্শক ও পাঠকদের সাবধান করেছিলেন। এই দুটি ভূমিকাকে ১৯০২ ও ১৯১৬ সালের মন্তব্যের প্রায় পুনরুল্লেখ বলা চলে। কিন্তু এখানে আরও দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় সেই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে "ভৈরবের বলি"-র ভূমিকায় লিখলেন "অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের পরিবর্তনকালে রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট ওঠানো নামানো আমার মতে অনাবশ্যক। এইরূপ সন্ধিস্থলে একবার আলো নিবাইয়া পুনরায় আলো জ্বালাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট। নাট্যাভিনয়ে

শেষবারের মতো শান্তিনিকেতনের বর্ষমঙ্গল উৎসবে রবীন্দ্রনাথের যোগদান

দৃশ্যবিভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি অত্যাচার—উহা ছেলে ভোলানো খেলা। প্রাচীন ভারতে বা গ্রীসে উহা ছিল না। তখন নটদিগের ও দর্শকদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নাটকের সাহিত্যগত নাট্যবস্তুর প্রতি।" "তপতী" নাটকের অভিনয়ের সময় মুদ্রিত গ্রন্থে জানালেন—

"এই উপলক্ষ্যে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধন দৃশ্যপট একদা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিতে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে, সেখানে পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

আজকাল বিজলী বাতির যুগ, রঙ্গমঞ্চের আলোক-সজ্জার নানারূপ উপায় য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে তার সদ্ব্যবহারও হচ্ছে। শান্তিনিকেতনও সেই পথের সাহায্য নিয়েছে, কিন্তু আলোর এতটা কারিকুরি এই সব নাটকে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে আলোর ভিতর দিয়েও সেই সব মূল রঙের ছন্দোময় বিকিরণই প্রাধান্য পেয়েছে। তা ব্যবহার করা হয়েছে নাটকের রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ঘন ঘন রঙের পরিবর্তনে অর্থহীন রঙের খেলা দেখানোই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। এখানেও আলো ফেলার রীতি সহজ ও সরল। সাধারণত অ্যাম্বার লাল ও নীল এই ক'টি রঙই অভিনয়ের সময় ব্যবহার করা হয়। মঞ্চের রঙে ও অভিনেতাদের সাজের রঙেও আলোর রঙে একটি বর্ণসাম্য যাতে ঘটে, শিল্পী নন্দলালের সেই ছিল ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটিকে ভারতের শিল্পরুচি ও আদর্শজাত একটি খাঁটি জিনিস এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। সুতরাং এই মঞ্চসজ্জা বিদেশী শিল্পদৃষ্টির ব্যর্থ প্রকাশ বা অনুকরণ এ কথা কোনমতেই বলা চলে না। এ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত আমাদেরই শিল্পীর একটি বিশেষ সৃষ্টি, যা গুরুদেবের প্রভাবে ও শিল্পগুরুর চেষ্টায় আমাদের দেশে এ যুগের রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় একটি যুগ প্রবর্তন করেছে।

* "রূপকার নন্দলাল" শান্তিদেব ঘোষের বহুপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের অংশ। পুনর্মুদ্রিত হল কারণ অধুনা গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য।

"আয়না, আমার আয়না,
সত্যি করে বলনা,
কেমন করে হলো আমার এই
অপরূপ কেশ ?"
"কেন ?
ওয়েসিস®
এর অবদান কি
ভোলবার ?"
ওয়েসিস®
ডাবল্ অ্যাকশান্
হেয়ার ফার্টিলাইজার
ওয়েসিস ডাবল অ্যাকশন হেয়ার ফার্টিলাইজার, তৈল-বিহীন, আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়া থেকে প্রস্তুত এক তব্য ঔষধ যা চুলের গোড়া পরিষ্কার করে উপহার দেয় মাথা ভর্তি ঘনকৃষ্ণ, সজীব, অঢেল, অফুরন্ত চুলের বাহার।
যারাই দেখে তারাই হয় চমৎকৃত, তারাই হয় ঈর্ষান্বিত। আবার ওয়েসিস একটি অসামান্য হেয়ার-কণ্ডিশনার—আপনার কেশকে মসৃণ, সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি করে এমন একটি মুখশ্রী তৈরী করবে, যা সবারের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
IMPROVED FORMULA
EXPORT QUALITY
Oasis®
DOUBLE ACTION HAIR FERTILIZER
Oasis
DOUBLE ACTION
HAIR FERTILIZER
কেশবিহীনতার মরুভূমিতে ওয়েসিস
সত্যিই—ওয়েসিস-মরুদ্যান।
প্রস্তুতকারক :
হার্বাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
কলিকাতা-৭০০ ০০৫
HRI
সব বড় দোকানে পাওয়া যায়।
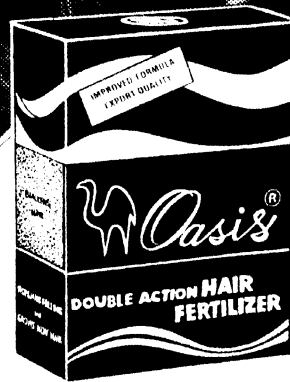
নন্দলাল বসুর শিল্পী জীবনের গোড়ার দিকের তিনটি ছবি

জয়া আপ্পাস্বামী

এই তিনটে ছবি আছে লন্ডনের ভিকটোরিয়া এবং অ্যালবার্ট যাদুঘরে।

যে কোনো শিল্পীর গোড়ার দিকের কাজ অবশ্যই জরুরী। কারণ প্রথম জীবনের কাজে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের বীজের অঙ্কুরোদগম পরিদৃষ্ট হয়। এই বিশেষত্বগুলি পরে ফুলন্ত এবং ফলন্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। কলকাতার সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে থাকাকালীন নন্দলালের অঙ্কিত চিত্রগুলি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে মহৎ পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তবুও এই আলেখ্য দর্শন করার ফলে তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ যেমন বোঝা সম্ভব হয়, তেমনি সহজেই বোঝা যায় যে তিনি পল্লবগ্রাহী ছিলেন না। শুধু তাই নয়, বরং স্বাধীনভাবে মৌলিক কাজ করার চেষ্টা করছিলেন।

শিল্পকলা শিক্ষণ খুব সূক্ষ্ম একটা পদ্ধতি। শিল্পশিক্ষককে তার জন্যে হতে হয় মনস্তত্ত্ববিদ এবং আবিষ্কারক। ধাত্রী এবং মালঞ্চের মালি। ছাত্রের মধ্যে প্রতিভার পল্লবোদগম লক্ষ্য করা মাত্র তার যত্ন নিতে শুরু করতে হয়। অবনীন্দ্রনাথের মতো মহা গুরুর অধীনে ভারতীয় বিভাগে ভর্তি হতে পারাটা নন্দলালের পক্ষে যে পরম সৌভাগ্যের বিষয় হয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নেই। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রীতি, ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রেম, নতুন মাধ্যমের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা, নন্দলালের মনের তন্ত্রীতে স্বভাবতই সুরের হিল্লোল তুলেছিল। এমন গুরু আর কোথায় পাওয়া যাবে যিনি ছাত্রদের মনকে ঐশ্বর্য সম্ভারে ভরে তোলার মানসে মহাকাব্য এবং পুরাণ পাঠ করার জন্য নিজ ব্যয়ে শাস্ত্রপাঠক নিয়োগ করবেন? তাঁর উৎসাহ তিনি ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করতে সক্ষম ছিলেন। রূপময় জগতের সকল আকারে নিহিত সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি ফেলার জন্য তিনি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন সহজেই। কল্পনাকে তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পারতেন এবং মনের চোখ দিয়ে যা দেখতেন তা তিনি আলেখ্যয় রূপায়িত করতে পারতেন। তথাপি তিনি ছাত্রদের মেজাজ মর্জি অনুসারে কাজ করার স্বাধীনতা দিতেন এবং ব্যক্তিগত শৈলী উন্নয়নের পথে বাধা হতেন না। আর্ট স্কুলের বৃটিশ অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলকে ধন্যবাদ! ভারতীয় পরম্পরা এবং প্রতীচ্যের প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলার বিরোধ এবং ব্যবধান তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না বলেই তাঁর অনুমত্যানুসারে, বস্তুত উদ্দীপনায়, অবনীন্দ্রনাথের আধুনিক

ঘুমন্ত মেয়ে

ভারতীয় শৈলীর আবিষ্কারের কাজ সহজ হয়েছিল।

চারুকলা বিদ্যালয়ে নন্দলালের ভর্তি হওয়াটা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের দুঃখ দিয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি তাঁর সহজাত স্বধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন। পেশা নির্বাচনে ভুল হয়নি এটা বুঝেছিলেন। এর জন্য সবরকম আত্মত্যাগ করতে তিনি রাজী ছিলেন। অধিকন্তু তিনি তখনকার দিনে জনপ্রিয় প্রচলিত এবং অর্থকরী পশ্চিমী শিল্পরীতি না গ্রহণ করে, অবনীন্দ্রনাথের কাছে কাজ শিখবেন বলে স্থির করলেন। যে তিনটে ছবি নিয়ে আলোচনা করবো সেগুলি তাঁর মাত্র বাইশ বছর বয়সের কাজ। অচলা গুরুভক্তি সত্ত্বেও, নন্দলালকে স্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠানের আয়োজন শুরু করতে দেখা যায়। এই অল্প বয়সেই তিনি দেখিয়েছেন কোন পথে গন্তব্যে পৌঁছবেন।

শিল্পী হিসাবে উত্তরণ ঘটার প্রক্রিয়ায় সম্ভবত দুটি প্রভাব ছাত্রদের ওপর ক্রিয়া করে সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ এই দুইয়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রথমত শিল্পীর নিজের পরিবেশ এবং ঈক্ষণ সম্বন্ধে সমকালীন ধারণা এবং পরম্পরা এবং দ্বিতীয়ত শিল্পীর গুরুর মেজাজ এবং কাজ। নন্দলালের গোড়ার দিকের কাজে দুইয়েরই ছাপ পড়েছে কিন্তু তাও সামান্য। করণকৌশলের বিচার তাঁর অঙ্কন এবং আলেখ্যের সঙ্গে সমকালের সম্পর্ক থাকলেও এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যও সন্দীপ্ত। "বাংলা কলমের" অন্যতম প্রধান শিল্পী এবং অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে তাঁকে ধরা হলেও, তাঁর সতীর্থ এবং গুরু থেকে তিনি স্বতন্ত্র। অবনীন্দ্রনাথ কল্পচিত্রলোকের অধিবাসী ছিলেন এবং ছবি আঁকার সময় তিনি রূপকথার জগতে প্রস্থান করতে ভালবাসতেন, সেক্ষেত্রে নন্দলাল মাটির কাছাকাছির

ড্রু সিলোন, ১৯০৯

নবাবিবাহিত বর-বধূসহ বরযাত্রা

পলাশ গাছ

মানুষ। নর-নারীকে তিনি বাস্তব পরিবেশের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতেন। অবনীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীরা স্বপ্নমায়ার অলীক জগতে বাস করে, তাদের সৌন্দর্য ক্ষণভঙ্গুর এবং বায়বীয়। পক্ষান্তরে নন্দলালের চরিত্রগুলি পরম্পরা, নিসর্গ এবং জীবনের প্রতিনিধি। অবনীন্দ্রনাথ যেখানে ছায়াচ্ছন্ন বা ইঙ্গিতময়তার দ্যোতনায় আভাসিত, সেখানে নন্দলালের ছবি গঠনে এবং রূপবন্ধের দৃঢ়তায় প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথ কল্পনাবিলাসী। নন্দলালের কল্পনায় অভিজ্ঞতার স্পর্শ।

নন্দলাল ধুয়ে নিয়ে আঁকার রীতিপ্রকরণ ওয়াশ পদ্ধতি শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি তরুণ বয়স থেকেই তুলির কাজও আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। প্রথমদিকের কাজে রংয়ের কিছু ঔজ্জ্বল্য থাকলেও, তাতে বাংলা কলমের কাব্যময়তারও ছাপ আছে। ক্রমে দেখা যায় তিনি দু ধরনের বিষয় এবং অভিব্যক্তি নিয়ে কাজ শুরু করলেন। হয় তাঁর ছবি পুরাণঘেষা, দেবদেবীর লক্ষণ মিলিয়ে আঁকা এবং রূপারোপিত, না হয় দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাই তাতে রূপায়িত। প্রথম ধরনের কাজে হিন্দু দেবদেবীর প্রাধান্য বা তা নিছক নকশাকারী—যথা "সরস্বতী" বা "স্বর্ণকুম্ভ"। দ্বিতীয় ধরনের কাজে গ্রামীণ লৌকিক জীবনযাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে। এতে হয় নিসর্গদৃশ্য বা মাটিঘেষা মানুষজন চিত্রিত। পরিশেষে একথা ভুললে চলবে না যে নন্দলাল তাৎক্ষণিক রেখাচিত্র আঁকতে ভালবাসতেন। এমন কোনো বিষয় নেই যা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। প্রকৃতির সকল কিছুই পর্যবেক্ষণ এবং সযত্নে স্মৃতিতে ধরার জন্য রেখাচিত্ররূপে এঁকে নিতেন, বিশ্লেষণ করে নিতেন।

বাইশ বছর বয়সে আঁকা এই চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলির

আভাস আছে। প্রথম ছবিতে বরযাত্রীদের বিয়ের পর কন্যাকে নিয়ে ঘরে ফেরার দৃশ্য এঁকেছেন। পাত্রপাত্রী গ্রামের সাধারণ মানুষ। ছবি ধূসর ছায় (টোন)-এ আঁকা। ধুয়ে আঁকা পদ্ধতিতে না আঁকলেও, ছায়ের বৈচিত্র্যে ধোয়া রীতির কিছু সামান্য অবদান আছে। বিষয়তে আনন্দের ভাব পরিস্ফুট হলেও অবনীন্দ্রনাথের ঘরানা রোমান্টিক আবহসৃষ্টির কোনো ছাপ নেই। বর-কনে ঘিরে অল্পবয়সী কিছু তরুণ নাচছে, গাইছে। খোলামেলা তেপান্তরে ঘটনাটা ঘটছে। এখানে ওখানে গাছপালা। সকলের যেন গতি আছে। কিছু যুবক ঢোল আর মাদল বাজাচ্ছে। কারোবা ঠোঁটে বাঁশী। তাদের সঙ্গেই চলেছে গ্রামের একটা কুকুর। পরবর্তীকালে তাঁর ছবির সেই দৃঢ় রূপরেখা এখানে নেই। কিংবা ক্ষুরধার খুঁটিনাটিও নেই। সকলের চুল ঘন কালো চাপিয়ে আঁকা। তুলির রেখায় আঁকা বস্ত্রাবরণ নরম খুবই। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যরকম কিছু বিশেষত্বও আছে। দৃশ্যটি আটপৌরে এবং নাটক জমানোর কোনো চেষ্টাই নন্দলাল করেননি।

দ্বিতীয় চিত্রটির নাম সোজা সরল—নিসর্গ অনুশীলন। এই ছবিতে ফুলে ভরা একটি পলাশ গাছকে এঁকেছেন নন্দলাল। আঁকার খাতার পাতায় আঁকা কাজটি মিশ্র পদ্ধতির। পেছনটায় ধোয়া পদ্ধতি ব্যবহৃত। গাছটি টেম্পেরা জাতীয় প্রক্রিয়ায় অঙ্কিত। নরম কোরা বেলে রঙের পশ্চাদপটে ঝরাপাতার প্রেক্ষিতে একা বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষ পলাশ গাছটা ডালে লাল ফুল নিয়ে। প্রকৃতির মধ্যে বসে আঁকা নয় ছবিটা কিন্তু প্রকৃতি অবলম্বনে আঁকা। বৈজ্ঞানিক নিখুঁতত্বের চাইতে এখানে মণ্ডনধর্মিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। পলাশের সেই কালো ভেলভেট কুঁড়ি একটিও নেই, সেটা কিন্তু লক্ষ্য করার মতো। গাছটার কাণ্ডটি বলিষ্ঠ এবং বাকলের বলিরেখার বুনোট খুব জমাটি। নীচে ঝরাপাতা এবং পাঁপড়ি। চারপাশের পরিবেশ ছবিতে নেই। আকাশও নয়। প্রধান রঙগুলো ম্যাটমেটে। কিন্তু পাতার স্বচ্ছ সবুজ, কালচে রং-এর গুঁড়ি এবং কোঁকড়ানো ফুলকির মতো ফুলগুলির জন্যে ছবিতে বর্ণের জেল্লা আছে। ঈষৎ রূপারোপিত কাজটিতে হয়তো অবচেতন থেকে মণ্ডনধর্মিতা উঠে এসেছে।

তৃতীয় ছবিটাতে রয়েছে একটি ঘুমন্ত মেয়ে। কালচে নীল পটের ওপর সোনালী রেখায় আঁকা। মোটা কাগজটায় প্রথমে ধোয়া পদ্ধতিতে নীলটা হয়তো লেপে নিয়ে, তারপর সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে সোনালী রেখাগুলো আঁকা হয়েছিল। পশ্চাদপটের নীল আবছা, অনুজ্জ্বল এবং নরম। তুলি নিয়ে বাদবাকী কাজটুকু সম্পূর্ণ করেছেন রেখা দিয়ে। সরু কিন্তু নরম আঁচড় কেটে। মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে। তার দেহের তিন চতুর্থাংশ দেখা যাচ্ছে এবং বাদবাকীটুকু দর্শকের কল্পনার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়েটির মুখের খুঁটিনাটি এঁকেছেন, আদৌ মুখশ্রীকে আদর্শায়িত করেন নি। হয়তো দেখেই আঁকা, তাই হাতগুলো পড়ে আছে স্বাভাবিকভাবে। সাজিয়ে নিয়ে আঁকেন নি বলেই মনে হয়। তুলির রেখা সাবলীল, কখনো সরু কখনো মোটা, ঢেউয়ের মতো গড়ানো। আলতো মধুর। অলঙ্কারবর্জিত ছবি। শূন্য ফাঁকা জায়গা খাট বাদ দিয়ে ছড়িয়ে থাকাতে শায়িত দেহবল্লরীর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

প্রথম জীবনের এই ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে গোড়া থেকেই নন্দলালের চিত্রশৈলী নিজস্ব খাতে বহমান ছিল। মনে রাখতে হবে সেইসময় পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক রীতিপ্রকরণের রমরমা চলছিল। প্রথাগত পদ্ধতিতে আলো ছায়ার খেলা দেখিয়ে তেল রং-এ ছবি আঁকার বয়স ইতিমধ্যে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ছবি এঁকে জীবন নির্বাহ তখন খুবই কঠিন। নব্য বাংলা কলমচীর পক্ষে তো আরও শক্ত। কারণ এঁদের নতুন শৈলী তখন বিতর্কের ঝড় তুলেছে। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হয়ে নন্দলাল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন যে তাঁর শৈলী মৌলিক, গুরুর প্রতিধ্বনি নয়। স্বভাবতই তিনি স্বতন্ত্র। প্রথমদিকের কাজে এটুকু স্পষ্ট যে, নন্দলাল অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে রূপায়িত করেছেন, কল্পনাকে নয়। তিনি আটপৌরে গ্রামীণ দৃশ্য এঁকেছেন, শহুরে জীবন নয়। প্রকৃতিই তাঁর উৎস, স্বপ্ন নয়। রচনায় অঙ্কনই তাঁর প্রধান হাতিয়ার। সর্বোপরি লক্ষ্য করি যে তাঁর মন অভিযাত্রীসুলভ, এবং শিল্পী হিসাবে তিনি স্বাধীন। নন্দলালের পরবর্তী কাজে এসবই বেড়ে উঠে ফুলে ফলে ভরে যেতে দেখি। এসবই তাঁর ছবির প্রস্তর কঠিন দৃঢ় ভিত্তিভূমি।

ছবি তিনটি ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামের সৌজন্যে
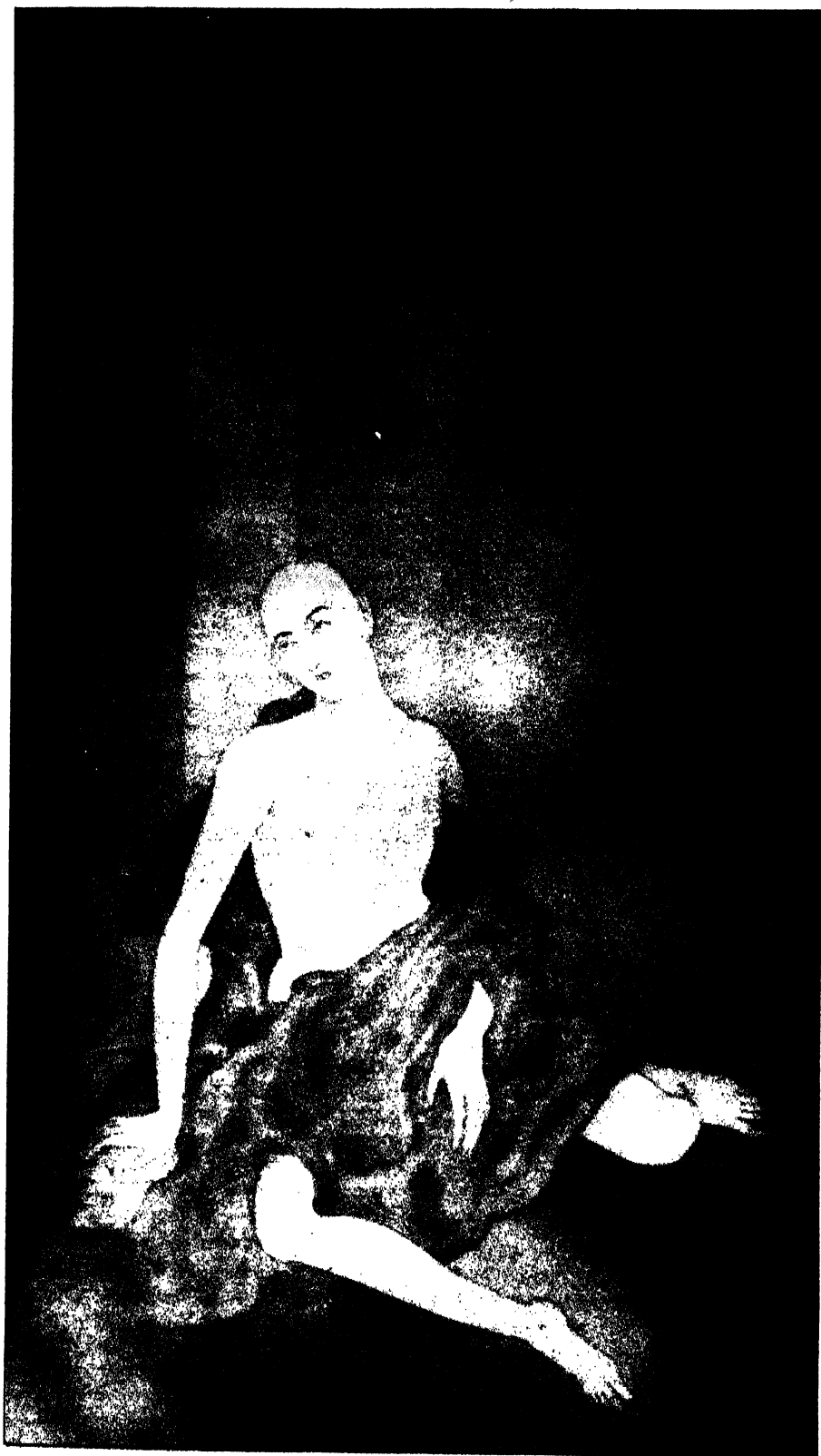
'গড়ুর স্তম্ভের পাদমূলে শ্রীচৈতন্য' (ধোয়াপদ্ধতিতে [ওয়াশ] আঁকা, ১৫১/২"×৯", ১৯০৬)।   বিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে

নন্দলাল : কারুসংঘ ও জাতীয় আন্দোলন

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইরের জগতের কাছে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পরিচয়-ভারতবর্ষের বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হিসাবে। তিনি শিল্প গুরু আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রিয়তম এবং প্রধানতম শিষ্য ছিলেন, ম্রিয়মান ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনে তাঁর যোগ্যতম সহায়ক এবং গুরুর ভাবানুসারী শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন, অপরদিকে আধুনিককালে অতীতের অজন্তা বাগগুহার শিল্পীদের শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাধক হয়েও তিনি তাঁদের ঐতিহ্যে পরম্পরাকে,—এমনকি তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত অঙ্কন পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে থেমে থাকেননি ; আজীবন তিনি নূতন পথের সন্ধানী পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, দেশী-বিদেশী নানা শিল্পধারায় পরিচয়লাভের চেষ্টায় এবং রঙ ও রেখা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। বিশ্বভারতী কলাভবনে তিনি শুধু অধ্যক্ষ ছিলেন না, ছিলেন তার প্রকৃত স্রষ্টা—সবরকম কর্মপ্রেরণার জীবন্ত উৎস স্বরূপ প্রাণপুরুষ। তাঁর আকর্ষণে দেশ-বিদেশে নানা শিল্পশিক্ষার্থী কলাভবনে এসেছেন, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি পৃথিবীর সর্বত্র চারুকলার ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন। কবিগুরু কর্তৃক প্রবর্তিত শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে ও অভিনয়ে নন্দলালের উদ্ভাবিত অনাড়ম্বর অথচ মনোরম সজ্জা ও মঞ্চসজ্জা এবং আলপনা প্রভৃতি অলঙ্করণের কাজ আজও অপরিহার্য, আজও সারা ভারতে বিদগ্ধসমাজে তাঁর উৎসবক্ষেত্রমণ্ডন পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শুধু অতীতের শিল্পীদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করে প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে নিত্য নূতন মণিরত্ন আহরণ করতে শিখিয়েছিলেন ; বিশ্বকর্মার সৃষ্ট যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অজয়অমর সৌন্দর্যসম্ভার আমাদের চারদিকে প্রসারিত,—যা থেকে আদিমগুহামানব থেকে আরম্ভ ক'রে অতীতের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীরা যুগে যুগে রূপসৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যোগসাধনের পথ দেখেছিলেন। তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর শিক্ষা নিজেদের সাধ্যানুসারে কাজে লাগিয়েছেন এবং দেশময় বিকীর্ণ করেছেন। অন্তত মণ্ডনশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁদের দেখাদেখি ভারতের বহু নগরে ও গ্রামে দীনতম কুটির বাসীরাও নিজেদের চেষ্টায় সুলভ সামান্য উপকরণের সাহায্যে শোভন সুরুচিসম্মত প্রসাধনের দ্বারা দেহ, গৃহ এবং উৎসবক্ষেত্র সাজিয়ে আনন্দ দিতে এবং পেতে শিখেছেন দেখা যাচ্ছে। নন্দলাল আপাতদৃষ্টিতে অতিতুচ্ছ,—এমনকি অসুন্দর বস্তুকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে জানতেন; বাঁশ, খড়, পাট, পাঁকাটি, শরকাটি, কলসী, ঝুড়ি, ঝাঁটা, হুঁকোর খোল, দরমা, চাটাই, গরুর গাড়ির চাকা, মাটি, তুঁষ, গোবর, আলকাতরা প্রভৃতি দিয়ে তিনি তোরণ, ভাস্কর্য শোভিত কুটির ও বিচিত্র গৃহসজ্জাদ্রব্য প্রস্তুত করেছেন ; নারকেল মালা, বেলের ও লাউয়ের খোলা, তালপাতা, গাছের বাকল প্রভৃতি দিয়ে কত রকম পাত্র পাখা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য সুন্দর জিনিস তৈরি করেছেন তার হিসাব নেই, সেই সব অপরূপ শিল্পদ্রব্য সযত্নে তৈরি করে অকাতরে প্রার্থীদের বিলিয়ে দিতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকারা মাঝে মাঝে কাছাকাছি কোন গ্রামে শালবনে বা নদীতীরে চড়ুইভাতি করতে যান, বছরে একবার দুবার শিক্ষামূলক দেশ-ভ্রমণে [illegible] প্রথা আছে। দলের সঙ্গে সেইরকম পর্যটনে বেরিয়ে পথে নন্দলালের হাতের কামাই থাকত না ; গ্রামে, ট্রেনে, বনে পাহাড়ে, তাঁবুতে তিনি অজস্র 'স্কেচ' করতেন এবং সেগুলি সঙ্গীদের দান করতেন। ছাত্রছাত্রীদের বন্ধুদের তিনি কতশ' সচিত্র চিঠি লিখেছেন এবং স্বাক্ষর সন্ধানী পরিচিত ও অপরিচিত কত ভক্তকে কত সহস্র রেখাচিত্র স্বাক্ষরের সঙ্গে 'ফাউ' দিয়েছেন তার হিসাব কেউ রাখেনি সেগুলির সংখ্যা নিরূপণ ও মূল্যায়ন ও কোনোদিন হবে না। কবিগুরুর সঙ্গে এবং শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া এবং বহিঃপ্রকৃতির প্রেরণা তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে নবযুগ এনেছিল এবং তাঁকে ঋণী করেছিল—সে কথা মানতেই হবে, কিন্তু দীর্ঘজীবনের অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠায়, অপরিসীম ত্যাগস্বীকারে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা ভারতে এবং বহির্বিশ্বে বিশ্বভারতীর কলাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে, অপরূপ সারল্যসুন্দর সুরুচিসম্মত প্রসাধনে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বহিরঙ্গের শোভা বাড়িয়ে এবং প্রতিটি উৎসবে, অভিনয়ে ও স্বদেশী-বিদেশী মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এবং আশ্রমের দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণ ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তিনি সে ঋণ শোধ তো করেই গেছেন, মনে হয় যা পেয়েছেন তার চেয়ে বেশি দিয়ে তিনি কবিগুরুকে এবং তাঁর মানসকন্যা বিশ্বভারতীকে চিরঋণী ক'রে রেখে গেছেন। মহাকবির অপূর্ব তপস্যাকে পূর্ণতা দেবার জন্য তাঁর মতো মহাশিল্পীর সারস্বত সহায়তা এবং আদর্শ জীবনের অর্ঘ্যোৎসর্জন ছিল অপরিহার্য। মণি যতই উজ্জ্বল এবং মহার্ঘ হোক—তার সৌন্দর্যের সম্যকরূপে মর্মোদ্ঘাটনের জন্য সে কাঞ্চনের অপেক্ষা রাখে অলঙ্কার নির্মাণের সময়। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে তাঁর দক্ষিণ হস্ত বলতেন,

অকারণে বলতেন না।

মানুষ নন্দলাল তাঁর সৃষ্ট শিল্পকার্যের চেয়ে কত বড়ো ছিলেন তা' তাঁর ছাত্রছাত্রী প্রতিবেশী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ছাড়া আশ্রমের বাইরে অল্পলোকেই জানেন। বীরভূমের অন্ত্যজপল্লীর অগ্নিদাহে জ্বলন্ত কুটিরশীর্ষে উঠে প্রাণপণ চেষ্টায় আগুন নেবাতে, শান্তিনিকেতন মন্দিরের পরিপূর্ণ উপাসনাসভা থেকে সকলের আগে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সহস্র সহস্র ক্রোধোন্মত্ত পাহাড়ী মৌমাছির দ্বারা আক্রান্ত অবোধ শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে তা'কে বুকে ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে অদূরে অতিথিশালার রুদ্ধদ্বার গৃহে আশ্রয় দিতে, দরিদ্র সাঁওতাল ডোম বাউরি প্রভৃতি অবহেলিত দুঃখী গ্রামবাসীর আপনজন হ'য়ে রোগে শোকে তাদের পাশে দাঁড়াতে এবং অকুণ্ঠ সেবা ও অবৈতনিক চিকিৎসায় তাদের দুঃখ লাঘব করতে, পরলোকগত দুঃস্থ সতীর্থের পরিবারকে এবং প্রবাসে বিপন্ন প্রাক্তন ছাত্রদের নিজের চরম অর্থকষ্টের মধ্যে গোপনে অর্থ সাহায্য করতে যারা না দেখেছে,—তাদের কাছে মানুষ নন্দলালের সম্যক পরিচয় অল্পকথায় দেওয়া সম্ভব নয়। সে-যুগে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তহবিলে টানাটানি লেগেই থাকত, আদর্শবাদী অধ্যাপকেরা কোনোমতে সপরিবারে জীবনধারণের উপযোগী সামান্য বেতনও মাসকাবারে একসঙ্গে পেতেন না, তাঁদের প্রাপ্য অর্থ সারা মাস ধরে পাঁচ দশ টাকা ক'রে নিতে হ'ত। সেই অবস্থায় প্রতিদিন সংসারের নানা অভাবের মধ্যে পরিবার প্রতিপালন এবং অতিথিসৎকারের জন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রে যে ভারতবিখ্যাত শিল্পী বারংবার ভিন্ন প্রদেশের সরকারী সাহায্য পুষ্ট কলা শিক্ষালয়ের দেড় হাজার দু'হাজার টাকা মাসিক বেতনের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে দেড় শ' থেকে আড়াইশ' টাকা বেতনে আপন আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে প'ড়ে থেকেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আজ আমি শুধু কর্মযোগী নন্দলালের দু'টি কল্যাণ কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু ব'লব। দু'টি ব্যাপারেই আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলুম, তাই কথাপ্রসঙ্গে নিজের কথাও কিছু বলতে হবে, সহৃদয় পাঠক পাঠিকা সেজন্য অপরাধ নেবেন না আশা করি। আজ আমার আলোচ্য বিষয় হ'ল কারুসংঘ স্থাপনে এবং জাতীয় আন্দোলনে অর্থাৎ স্বাধীনতাযুদ্ধে শিল্পাচার্য নন্দলালের ভূমিকা।

কারু সংঘের কথা বলবার আগে শিল্পাচার্যের ছাত্রবাৎসল্যের কথা কিছু বলা দরকার। নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে নন্দলাল চিরদিন পুত্রস্নেহ পেয়েছিলেন, নিজের ছাত্র-ছাত্রীদেরও তিনি চিরজীবন পুত্র-কন্যার মতো ভালোবাসায় অভিষিক্ত করে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন কলাভবনের অধ্যক্ষ, কিন্তু তাই বলে প্রতিষ্ঠানের 'সর্বেসর্বা'র অভিমান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন না; প্রথমদিকে দেহলীর দোতলার পিছনদিকের লম্বা ঘরটায়, তারপরে গ্রন্থভবনের দোতলায় হলঘরে কলাভবনের ছেলেমেয়েরা যেমন একটা করে ডেস্ক ও জলভর্তি মাটির গামলা নিয়ে মাদুর বা আসন পেতে মেঝেয় বসে ছবি আঁকত,— তিনিও তেমনি তাদের সঙ্গে একই সারিতে ঘরের শেষ প্রান্তে বসে নিজে ছবি আঁকতেন; মাঝে মাঝে উঠে এসে তাদের কাজ দেখতেন, পরামর্শ দিতেন, কখনও কখনও একটু আধটু শুধরেও দিতেন। বিকেলের দিকে তাদের নিয়ে কাছাকাছি সাঁওতাল গ্রামে, শালবনে, মাঠে বা খোয়াইয়ে স্কেচ করতে বেরোতেন, প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে অতীতের শিল্পীরা কীভাবে সম্পদ আহরণ করে ছবির উপাদান সংগ্রহ করেছে এবং বর্তমানেও আমরা কীভাবে তা করতে পারি সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। চড়ুইভাতিতে, শিক্ষামূলক পর্যটনে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সমানে কায়িক পরিশ্রম করতেন, অমাবস্যা পূর্ণিমার ছুটিতে, গান্ধী পূণ্যাহে এবং ৭ই পৌষের মেলার আগে আশ্রম পরিষ্করণের কাজে ছাত্রদের সঙ্গে ঝুড়িঝাঁটা নিয়ে জঞ্জাল সাফ করতেন। তিনি প্রায়ই ছাত্রাবাসে গিয়ে ছেলেদের সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করতেন, তাদের যতদূর সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন, দরিদ্র ছেলেদের অবৈতনিক ছাত্র করে নিতেন প্রয়োজন বুঝলে নিজ দায়িত্বে। ছাত্রছাত্রীরা আশ্রম ছেড়ে যাবার পরেও তাদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে চিরজীবন যোগ রাখতেন বিপদে সুপরামর্শ, (কখনও বা গোপনে অর্থ সাহায্য) শোকে সান্ত্বনা দিতেন। শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁর ঘড়ি-ঘণ্টার হিসাব থাকত না, নিজের আহার নিদ্রার চিন্তা থাকত না, দিনে রাত্রে ছাত্রদের কাজে সাহায্য করতে বা করতেন না। নন্দলাল নিজে অবনীন্দ্রনাথের কাছে জলরঙে ছবি আঁকতেই শিখেছিলেন কিন্তু শান্তিনিকেতনে ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কার্প্লের কাছে আমরা কেউ কেউ যখন তেলরঙে ছবি আঁকতে, কাঠ খোদাই করে ছাপ নিতে শিখি তখন তিনি বাধা তো দেনইনি, সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন। অস্ট্রিয়ান শিল্পী লিজা ফনপট ও ইংরেজ শিল্পী মাদাম মিলওয়ার্ড প্রভৃতি মডেলিং ক্লাসের পত্তন করে গেছলেন, (তিনি নিজে প্রৌঢ় বয়সে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বসে কিছুদিন সুসংবৃতবেশী সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষকে দাঁড় করিয়ে বা বসিয়ে মডেল ড্রয়িং করেছিলেন) তিনি ভাস্কর্য শিক্ষার জন্য নতুন বাড়ি না তৈরি হওয়া পর্যন্ত গৌর প্রাঙ্গণের দক্ষিণে তোরণঘরের দোতলায় তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, বিদেশী শিল্পীরা চলে গেলে নিজেই শেখানোর ভার নিয়েছিলেন। লিজাপটের নির্দেশে এক বুক উঁচু যে 'ঘুরন চৌকি'গুলি তৈরি হয়েছিল নির্মীয়মান মূর্তিকে সব দিক ঘুরিয়ে দেখে সুসামঞ্জস্য দেবার জন্য, সেগুলি ছুটির সময় বাড়ি নিয়ে যাওয়া যেত না বলে ছেলেদের কাজে বাধা পড়ত, মাস্টার মশাই নিজের বুদ্ধিতে দু'খানা এক ফুট-দেড় ফুট কাঠের পাটা দিয়ে তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেগুলি অল্প খরচে তৈরি করিয়ে বিছানা বা ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে যাওয়া চলত, ছাত্রেরা বাড়িতে তেপায়া বা টেবিলে বসিয়ে ঘুরন চৌকির মতো মূর্তি নির্মাণের কাজে লাগাতে পারত। ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল চিন্তা ছিল নন্দলালের আন্তরিক, তাই তারা সামান্য বেতনে আর্থিক প্রয়োজনে যখন দূরদূরান্তরে চলে যেত তখন তিনি আত্মীয় বিচ্ছেদ ব্যথা অনুভব করতেন। রমেন্দ্র চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, মণি রায় প্রভৃতি অনেকেই এভাবে বাইরে গেছলেন। বিদ্যালয়ের তখন এমন অবস্থা ছিল না যাতে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ দিয়ে বিশ্বভারতীর কাজে লাগানো যায়। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনায়ক মাসোজী প্রভৃতি যাঁদের নামমাত্র বেতনে তিনি চাকরী দিতে পেরেছিলেন, তাঁদের অর্থাভাব লেগেই থাকত, কারণ বাইরে খ্যাতি না থাকায় ইচ্ছামতো ছবি এঁকে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ছবি পাঠিয়ে দু' চারজনের যা দু' চারখানা ছবি বছরে বিক্রি হ'ত বা প্রবাসী বিচিত্রায় ছাপিয়ে যা সামান্য দক্ষিণা মিলত তাতে কারোই অভাব মিটত না। মাঝ থেকে বাইরে প্রদর্শনীতে গিয়ে অনেকেরই কিছু ছবি হারাত। আমার, রামকিঙ্করের এবং অন্য বন্ধুদের কারও কারও ছবি মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ে গিয়ে উদ্যোক্তাদের উদরপূর্তির সাহায্য করেছিল।

নন্দলাল তখন নিরুপায়, নিজে বাইরের বহু উচ্চ বেতনের আহ্বান প্রত্যাখান করে ও প্রলোভন জয় করে দু'শ টাকা বেতনে পড়ে আছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর বন্ধু গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী পুজোর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছবি এঁকে দেবার জন্য একশ টাকা করে অগ্রিম দিতেন, তাতে তাঁর পুজোর বাজারের সাহায্য হ'ত। সার্জন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্ত্রোপচারের জন্য প্রাপ্য টাকাও নন্দলাল ছবি এঁকে শোধ করেছেন সেই সময়ে। এই অবস্থায় বন্ধুদের মধ্যে আমিই প্রথম পিতৃবিয়োগের পর আর্থিক প্রয়োজনে শান্তিনিকেতনে বসেই ফরমাসী পুস্তক প্রসাধনের কাজে বিজ্ঞাপনী ছবি, প্রাচীর চিত্র প্রভৃতি এঁকে স্বাধীনভাবে কিছু কিছু উপার্জন করতে আরম্ভ করি। প্রথম দিকে অধ্যাপক জগদানন্দ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি স্থানীয় শুভার্থীরা তাঁদের পুস্তক প্রসাধনের কাজ দিয়ে সাহায্য করতেন, পরে কলকাতায় বুক কোম্পানী এবং অন্যান্য প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়ায় নিয়মিত কাজ পেতে থাকি। ১৯২৯ সালে মাসিক আয় যখন প্রায় গড়ে পাঁচশ টাকা দাঁড়িয়েছে তখন মাস্টারমশাই একদিন তাঁর অন্তরের বাসনা প্রকাশ করলেন আমার কাছে: "নিজে তো ভালোই রোজগার করছ, তোমার বন্ধুদের জন্য কিছু করতে পারো না?" তিনি নিজে শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে, আশ্রম গুরুর সান্নিধ্যে, নিত্যনব উৎসবানুষ্ঠানে এবং সুধীজনের পরিমণ্ডলে ও যাতায়াতে যে আনন্দ প্রবাহে স্নান করে নিজের অর্থদৈন্য ভুলেছিলেন, তিনি চাইছিলেন তাঁর প্রিয় ছেলে-মেয়েরা সেই আনন্দতীর্থ ছেড়ে আর্থিক প্রয়োজনে নির্বাসিত জীবনযাপন না করে, এইখানে বসেই যাতে তারা জীবিকানির্বাহের মতো উপার্জন করতে পারে। বললেন, "এইখানে শিল্পীদের একটা উপনিবেশ গড়তে চাই কিছু জমি কিনে; সেখানে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্রম

বিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে
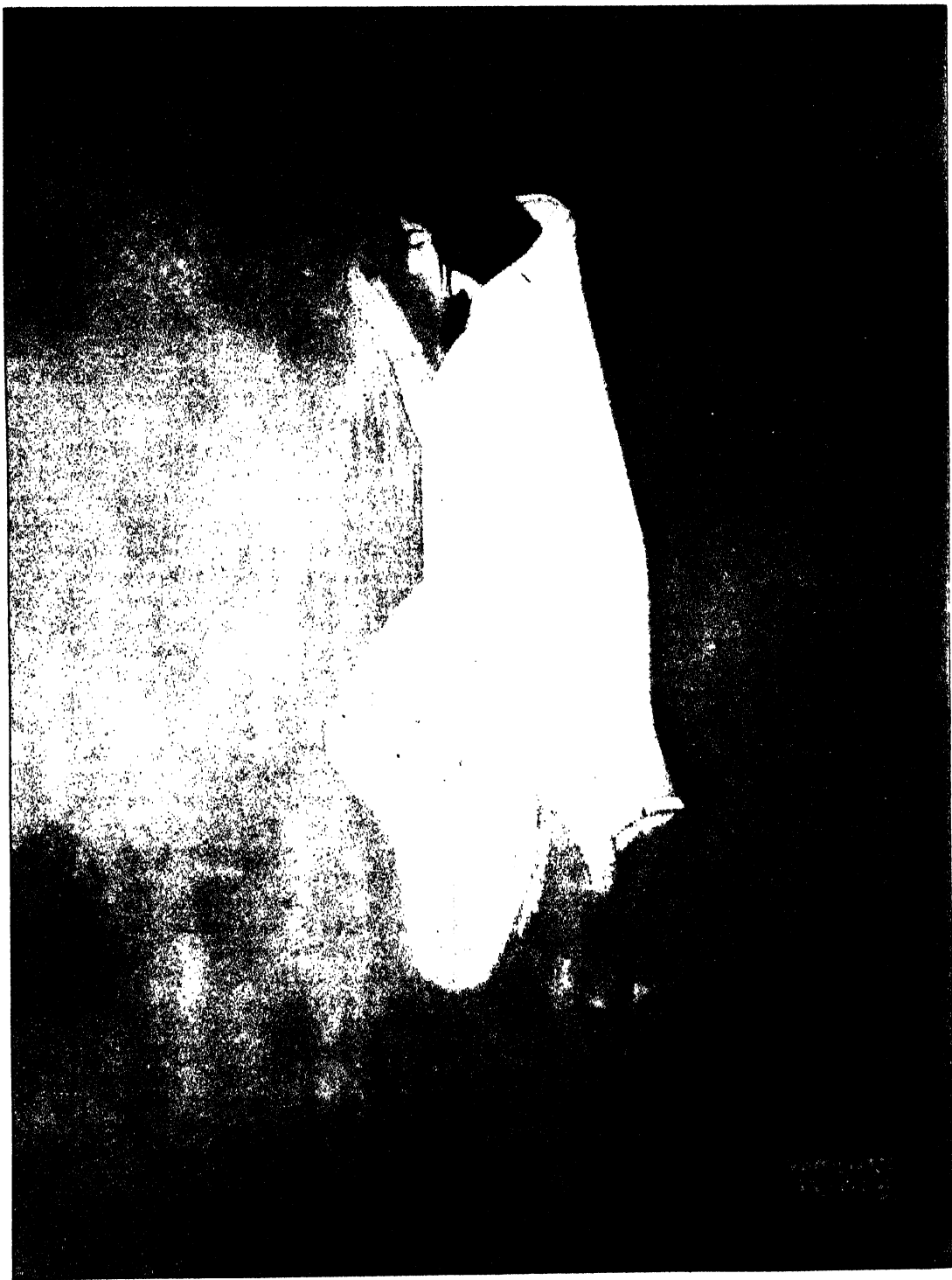
করে বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কিছু টাকা রোজগার করবে, আর বাকী ক'দিন নিজেদের মন থেকে ছবি আঁকবে, মূর্তি গড়বে, ললিতকলার চর্চা করে আত্মোন্নতি করবে। অর্থ না হলেও নয়, আবার আপনার কল্পনাকে রূপ দিয়ে আনন্দ না পেলেও আর্টিস্ট শুকিয়ে যাবে, তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। যাঁরা জাত শিক্ষক, অন্যকে ছবি আঁকতে শিখিয়ে যারা সত্যি আনন্দ পায়, তাদের দ্বারা দেশের বড়ো কাজ হবে, তাদের আমি বাধা দিতে চাই না ; কিন্তু পেটের দায়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার ছাত্রেরা কেউ বিদেশে মাস্টারী করতে যায়— এ আমি চাই না ! এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে হলে সমবায়ভিত্তিতে দল বেঁধে কাজ করতে হবে, প্রত্যেককে কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হবে অন্য সবার জন্য। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন শহর থেকে এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র শান্তিনিকেতনের যে সব অনুরাগী শিল্পপ্রিয় মানুষ ছড়িয়ে আছেন তাঁদের কাছ থেকে 'বুক ইলাস্ট্রেশন' (পুস্তক প্রসাধন), পোস্টার (প্রাচীর চিত্র), সূচী শিল্পের এবং কাপড়ে ও চামড়ায় বাটিকের অলঙ্করণের কাজ ও সিমেণ্ট ঢালাই, মোজেইক প্রভৃতির অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে। মূল্যাবাবদ যা মিলবে তা থেকে সংঘ খরচ ও মজুরি বাবদ কিছু অংশ (১৩%) কেটে রাখবে কমিশন হিসাবে। সেইভাবে যে টাকা জমবে তা থেকে সদস্যেরা যার যখন প্রয়োজন হবে বিনা সুদে টাকা নিতে পারবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেদের আয় থেকে শোধ করতে হবে সে টাকা। তোমার এ কাজে অভিজ্ঞতা আছে, তুমি যদি অর্ডার সংগ্রহের এবং প্রাথমিক খরচপত্রের দায়িত্ব নাও তবে কাজে নামা যায়।"

বিভিন্ন কারুশিল্প সম্বন্ধে সচিত্র পুস্তিকা ছাপানোও ছিল তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে। আমি প্রাথমিক খরচের ও দেখাশোনার দায়িত্ব এবং বাইরে থেকে অর্ডার সংগ্রহের ভার নিলুম। শিল্পীরা কারুশিল্পের জন্য দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় কাজ আরম্ভ করলেন। আমার পরামর্শে 'কারু সংঘ' নাম রাখা হল শিল্পীগোষ্ঠীর। শ্রীনিকেতন যাবার পথের ধারে তাঁর নিজের বাড়ির ডাইনে বাঁয়ে পাঁচ বিঘা জমি সংগৃহীত হল আমার টাকায় এবং তাঁর চেষ্টায়, আমি এবং মাসোজী সঙ্গে সঙ্গে এক বিঘা করে জমি পেলুম মূল্য দিয়ে। সংঘের পরিচিত পুস্তিকা ছাপানো হল বিনোদবাবুর 'হাসি' নামক রঙিন ছবি দিয়ে। সংঘের প্রতীকচিহ্নস্বরূপ মাস্টারমশাই একটা "সীল" করে দিলেন, দু' পাশে দু'টি করে পাতা ঝুলে আছে তারমধ্যে থেকে একটা ফুলের কুঁড়ি উঠছে। সংঘের শিল্পীরা নিজেদের আঁকা ফরমাসী কাজে কেউ নিজের নাম ব্যবহার করতে পারতেন না, সেই 'মুদ্রা'ই তাঁদের গোষ্ঠীর পরিচয় দিত। শান্তিনিকেতনে লর্ড আরুইনের আগমন উপলক্ষে শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবার এবং কুটির শিল্প কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেবার জন্য সেই সময় কর্তৃপক্ষ কিছু রঙিন প্রাচীর চিত্র (পোস্টার) আঁকাবার জন্য কলকাতা থেকে শিল্পী আনাচ্ছেন জানতে পেরে আমি বাধা দিই এবং রথীন্দ্রনাথের কাছে নিজ দায়িত্বে সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আঁকিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিই। নবনির্মিত 'নন্দম' বাড়িটার পশ্চিমের হলঘরে (পরে যার দেয়ালে বাগগুহার ভিত্তিচিত্র আঁকা হয়েছে) সমবেত চেষ্টায় কাজ আরম্ভ করি আমরা ক'জন সতীর্থ। প্রত্যেক প্রাচীর চিত্রের উপরে কিছু লেখন এবং ছ'টি করে ছকের মধ্যে আঁকা রঙিন ছবি ছিল। মাস্টারমশাই কয়েকটা ছবির খসড়া করে দিয়েছিলেন পেনসিলে, সব ছবির মাথায় একই অক্ষর বারবার লেখা শ্রমসাধ্য বলে একটা বাদামী কাগজে বিশ্বভারতী পল্লী সংগঠন বিভাগের নাম এবং সেই ছবিতে যে কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় আছে তার বিবরণ বড়ো অক্ষরে লিখে ছুঁচ দিয়ে ফুটো করে দিয়েছিলেন, সেই কাগজটা ছবির কাগজের উপর ফেলে কিছু গাঢ় রঙের গুঁড়ো ন্যাকড়ায় বেঁধে বুলিয়ে গেলেই নীচের কাগজে অক্ষরগুলোর আউটলাইন ফুটে উঠত, তখন সেগুলোকে বিনা পরিশ্রমে তুলি দিয়ে কালো অক্ষরে ছবির শিরোনামায় পরিণত করা যেত। ভিতরের ছকের মধ্যে কী আঁকা হবে স্থির হলে হয়তো পেনসিলের 'আউট লাইন' মাস্টারমশাইয়ের, মাথা হাত পা'র ও জামা কাপড়ের রঙ ভরলুম আমি বা সুধীর খাস্তগীর, চোখমুখ আঁকলেন এবং পরিণত রূপ দিলেন রামকিঙ্কর। এইভাবে যন্ত্রের মতো কাজ করে কয়েকদিনে আট শ' টাকা উপার্জন করা গেল। কারু সংঘের সব সদস্য তখনও মিলিত হননি ; সুতরাং আমরা যে ক'জন ছিলুম টাকাটার ভাগ পেলুম, মাস্টারমশাই কিছু নিতে চাইলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল সংঘের অর্থ ভাণ্ডার স্থাপনে নিজে কিছু সাহায্য করবেন, [illegible] সুবিধামতো। ঐসময় কলকাতায় এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা কাগজে একটা প্রাচীর চিত্র প্রতিযোগিতার সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিলেন, 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' (হেলথ্ ইজ ওয়েলথ) সম্বন্ধে নির্বাচিত পোস্টার 'একশ' টাকা পুরস্কার পাবে। আমি মাস্টারমশাইকে বিজ্ঞাপনটি দেখাতেই তিনি সেইদিনই মোটা বাদামী কাগজে 'পোস্টার কলারে' মোটা তুলি দিয়ে একটা ছবি এঁকে দিলেন, একটি অল্পবয়সী মা তার ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে নাচছে এবং তাকে নাচাচ্ছে। আমি সেটি কলকাতায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দিই এবং মনোনীত হয়েছে চিঠি পেয়ে একশ' টাকা পুরস্কার মাস্টারমশাইয়ের অনুমতি পত্র দেখিয়ে নিয়ে আসি। ছবিতে শিল্পীর নাম ছিল না, কারু সংঘের সীল ছিল। অন্য যে দশ বারোখানা ছবি এসেছিল, তার সবকটিই দেয়ালে টাঙানো ছিল। বিজ্ঞাপনে জানানো ছিল, ছবি ফেরত দেওয়া হবে না। তার মধ্যে রামকিঙ্করের একটি ছবি দেখেছিলুম, জন আষ্টেক জোয়ান লোক একটা নৌকোয় একযোগে দাঁড় বাইছে। সে নিজের নামেই আমাদের না জানিয়ে কবে ছবি পাঠিয়েছিল জানি না। সেটি মনোনীত না ক'রে কৌশলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যাইহোক সেই একশ' টাকা দিয়েই কারুসংঘের অর্থভাণ্ডার খোলা হল। কাগজ, রঙ, তুলি, সেট স্কোয়ার, টি· স্কোয়ার, কালি, ড্রয়িং বাক্স, কাপড় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগৃহীত হল।

সংঘের প্রথম সদস্যদের মধ্যে সুধীর খাস্তগীর, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনায়ক মাসোজী, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হীরেন্দ্র ঘোষ, কেশব রাও, বনবিহারী ঘোষ, ইন্দুসুধা ঘোষ ছিলেন মনে আছে, সম্পাদক আমি ছাড়া। তারপর থেকে আমি যতদিন আশ্রমে ছিলুম ততদিন সংঘের সব দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হয়েছিল—মাস্টারমশাইয়ের পরামর্শ অনুসারে। রামানন্দবাবু প্রবাসীতে কারুসংঘের কথা লেখেন, তাতে বহির্বঙ্গের বাঙালী অনেকে জানতে পারেন আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালীর কথা, তাতে বাইরের অর্ডার পেতে সাহায্য হয়। পুস্তক প্রসাধনের (বুক ইলাস্ট্রেশনের) কাজেই ছিল নিয়মিত আয়। কালি কলমের কাজ এবং রঙিন ছবি সবই থাকত অর্ডারের মধ্যে। মাস্টারমশাইয়ের একটি 'কাবুলিওয়ালা ও মিনু'র অপূর্ব সুন্দর রঙিন ছবি দশ টাকায় গেছল মনে পড়ে। বাটিকের কাজে হীরেন্দ্র নাম করেছিলেন। রামকিঙ্কর, সুধীর, মাসোজী, আমি ও কেশব রাও তিন টাকা থেকে দশ টাকা মূল্যে অনেক বইয়ের ছবি এঁকেছিলুম মনে পড়ে। ইন্দুসুধা ঘোষ ছিলেন সূচীশিল্পে ও অলঙ্করণের কাজে সিদ্ধহস্ত, তাঁর সূচীশিল্পের নকশার বই 'সীবনী' অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ বার হয়েছিল কারুসংঘের উদ্যোগে। ছুঁচের এবং কাপড়ের কাজ ছাড়া বাটিক করা চামড়ার থলি, বটুয়া প্রভৃতি বিক্রি হত, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ফরমাসে রামকিঙ্কর দুটি সিমেণ্ট জমানো টালিতে অজন্তার ধরনের দুটি বিচিত্র হাঁসের মূর্তি ঢালাই করেছিলেন, আয় পঞ্চাশ টাকা। আমি সেগুলি ক্রেতার ভবানীপুরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে আসি। সদর দরজার মাথায় লাগানো হয়েছিল সেগুলি, পরে নীচের ঘর 'বাটা' কোম্পানী ভাড়া নেওয়ায় তাদের সাইনবোর্ডের তলায় চাপা পড়েছিল দেখেছি, এখন কী অবস্থায় আছে জানি না। ১৯২৯ সালে হেমন্তকালে মাস্টারমশাই আমাদের আটজন ছাত্রকে নিয়ে প্রায় একসপ্তাহ শান্তিনিকেতন থেকে মাইলখানেক দূরে খোয়াইয়ের মধ্যে তাঁবু ফেলেছিলেন, সেইসময়ে আমরা সকলেই অনেকগুলি করে কার্ডে কালি কলম এবং রঙ তুলি দিয়ে 'স্কেচ' করি, সবচেয়ে বেশি রঙিন এবং কালিতুলির কাজ করেছিলেন মাস্টারমশাই নিজে। সাতই পৌষের মেলায় সেই কার্ডগুলি দু'আনা থেকে চার আনা দামে বেচে প্রায় দু'শ টাকা সংগৃহীত হয়। সেই টাকায় কারুসংঘের নামে একটি ছোটো তাঁবু কেনা হয়। কলাভবনের ছেলেরা বার্ষিক শিক্ষামূলক পর্যটনের সময় সেটি অন্য তাঁবুর সঙ্গে ব্যবহার করত, ক্রমে তার স্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়েছে। যাই হোক বাইরের বিভিন্ন শহর থেকে 'ব্যবহারিক শিল্প'র কাজ পেতে থাকায় ও সংঘের সদস্যদের ঘরে বসে নিজেদের কলা সাধনা বজায় রেখে কিছু কিছু আয় হতে থাকায় সকলেই খুশি ছিলেন। মাস্টারমশাইয়ের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পেরে আমি, পরিশ্রম বাড়লেও এবং নিজের আয় কমলেও, তৃপ্তি পেয়েছিলাম। শ্রীপল্লীতে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির পাশে বাড়ি করব, সংসারী হব, সব ঠিক, হঠাৎ জীবনটা বদলে গেল। ১৯৩০ সালের ক'মাস না যেতেই মহাত্মাজীর 'ডাণ্ডি যাত্রা' করছেন শুনে মনটা চঞ্চল হল, কারুসংঘের কর্তৃত্বের এবং কবির শান্তিনিকেতনে ঘর বাঁধবার লোভ ছেড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেওয়া কর্তব্য মনে হল। মাস্টারমশাই বাধা তো

দিলেনই না, বরং আশীর্বাদ করলেন, তাঁর বহুদিনের অপূর্ণ সাধ আমি পূর্ণ করতে যাচ্ছি জানিয়ে উৎসাহ দিলেন। কারুসংঘের সমস্ত দায়িত্ব এবং হিসাবপত্র বুঝে নিলেন। আমি চলে যাওয়ার পর মণি গুপ্তদা কিছুদিন সম্পাদকের কাজ নেন। মাসোজী আমার সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য বেরিয়ে প্রথমে কলকাতায় আমার বাড়িতে ওঠেন, পরে গুজরাটে যান। কিছুদিন পরে ফিরে এসে সংঘের সম্পাদকতা করেন। কিন্তু মন্দার বাজারে—বিশেষ করে বুক কোম্পানী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে তাঁদের আমার মতো ঘনিষ্ঠতা না থাকায় এবং অন্যত্র অর্ডার সংগ্রহের কৌশল না জানায় এবং প্রধানত সাধারণের কাজে নিঃস্বার্থ ভাবে কঠিন পরিশ্রম করার মনোবলের অভাবে বন্ধুরা কারুসংঘ বৎসরাধিক কাল চালাতে পারেননি। বাইরের অর্ডার আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সদস্যদের মাসিক আয় একশ'র নীচে নেমে যায়। রামকিঙ্কর কারুসংঘের দ্বারা সবচেয়ে উপকৃত হয়েছিলেন সে সময়ে, তিনি আর্থিক প্রয়োজনে দেড়শ' টাকায় দিল্লীতে নিউ মডেল স্কুলে ছ'মাস কাজ করে বনিবনা না হওয়ায় ফিরে আসেন। সুধীর খাস্তগীর গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া স্কুলে দুশ' টাকায় চাকরি নেন, পরে 'ডুন' স্কুলে অনেকদিন ছিলেন, তারও পরে বিলেত ঘুরে এসে লখনৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মাস্টারমশাইয়ের চিঠি পাই "...কিঙ্কর বেচারার টাকা অর্ধেন্দুবাবু দিলেন না, আমি আনিতে গিয়াছিলাম, অপমানিত হইয়া আসিয়াছি।...তোমার কি ছবি ছিল পাই নাই। গুরুসদয় বাবুর বই দং ২০০্-র মধ্যে ১০০্ আদায় হয়েছে ('চাঁদের বুড়ী' বইখানিতে রামকিঙ্করের কতকগুলি চমৎকার ছবি ছিল, সে বইখানি এখন দুষ্প্রাপ্য : প্র ব) আবার চিঠি দেওয়া হইয়াছে। হিসাব মাসোজী রাখছেন, হিসাব পরিষ্কার আছে।...কারুসংঘ মরে নাই, আমার সঙ্গে মরিবে। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। আমি এখনও ভরসা রাখি।...অ্যানাটমির ক্লাস নিয়মিত হচ্ছে, তবে একটু নীরস লাগছে। তুমি তো জানো কারুসংঘের কাজ উঁহারাই করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাতে একটু ঢিলা পড়েছে। তবে আমি সলতেটা জ্বালিয়ে রেখেছি। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনও দিই। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি জার্নালও বড় একপাতার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ফ্রেস্কোর চেষ্টাও করছি। ছুটিতে করব বলে অনেককে খোঁজখবর করতে বলেছি। আর পারি না। বয়স হয়েছে, জীবন অবসাদ গ্রস্ত কেন জানি না, তেমন উৎসাহ নাই।"

ধীরে ধীরে অর্ডার আসা বন্ধ হয়ে গেল, সদস্যরাও ক্রমে সরে গেলেন। মাসোজী এবং ইন্দুসুধা শ্রীনিকেতনে শিল্পসদনে চাকরি নিয়েছিলেন, বনবিহারী আহমদাবাদে কাপড়ের কলে একশ' টাকা বেতনে ডিজাইনার হয়ে চলে গেছলেন। কারুসংঘের কাজ সেবারের মতো বন্ধ হল। নন্দলালের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। তবে 'কারুসংঘ মরে নাই', নন্দলাল তা দেখে গেছেন। তাঁর মেয়ে যমুনা সেন এবং অবনীন্দ্রনাথের পৌত্রবধূ অরুন্ধতী ঠাকুরের চেষ্টায় কারুসংঘ নবরূপে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে নন্দলালের দুই কন্যা, গৌরী ভঞ্জ এবং যমুনা সেন প্রভৃতি তাঁদের ছাত্রীদের নিয়ে স্বর্গীয় অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেনের 'তাল ধ্বজ' নামক কুটিরটিতে কারুসংঘের কার্যশালা খুলেছেন, তার মাধ্যমে অনেকগুলি আশ্রমবাসিনী গৃহবধূ এবং কাছাকাছি বিভিন্ন গ্রামের মেয়ে বাটিকের, সূচীশিল্পের, চামড়ার চিত্রিত থলি, পশম বোনার ও নানারকম অলঙ্করণের কাজ করে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য অনুযায়ী সুরুচিসম্মত গৃহ ও দেহসজ্জার উপকরণ সৃষ্টি করে চলেছেন। কলাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কিছু আয়ের ব্যবস্থাও তার দ্বারা করেছেন। তাঁদের পরিকল্পনায় নন্দলালের ব্যাপক কর্মসূচী—শিল্পীউপনিবেশ স্থাপন, পুস্তক প্রসাধন, বইছাপানো বহির্বঙ্গে প্রচারকার্য প্রভৃতি না থাকলেও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার একটা দিক তাঁরা গত কয়েক বছর ধরে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর তৈরি 'কারুসংঘে'র প্রতীকচিহ্ন এবং নামও বজায় রেখেছেন, নন্দলালের আত্মা তাঁদের কর্মনিষ্ঠায় নিশ্চয় তৃপ্তি পাচ্ছে। আমরা কারুসংঘের প্রথম যুগের সদস্যেরা আমাদের কর্মক্ষেত্র পরাধীন ভারতের কয়েকটি শহরে ও গ্রামে সীমাবদ্ধ রেখেছিলুম, অরুন্ধতী ঠাকুর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা প্রবাসিনী হওয়ায় তাঁর চেষ্টায় সুদূর যুক্তরাষ্ট্রেও কারুসংঘের কুটির শিল্পের কাজ আজ পৌঁছোচ্ছে এবং আদৃত হচ্ছে। বাটিকের কাজ করা শাড়ী-ব্লাউজ, চামড়ার থলি, ঝোলা ও বটুয়া আজ সেদেশের প্রবাসিনী ভারতনারী ছাড়া শ্বেতাঙ্গিনীরাও উচ্চমূল্যে কিনে ব্যবহার করতে গর্ব অনুভব করছেন। বোঝা যাচ্ছে, কর্মসূচী সঙ্কীর্ণতর হলেও কারুসংঘের কর্মক্ষেত্র ক্রমেই ব্যাপকতর হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে অবস্থা আরও সচ্ছল হলে হয়তো নন্দলালের পরিকল্পনাকে পূর্ণরূপ দিতে পারবেন বর্তমান পরিচালিকারা।

কারুসংঘের কথা ছেড়ে, স্বাধীনতা যুদ্ধে নন্দলালের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলব। এ বিষয়ে পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় আমি অনেক কথা লিখেছি, তবু যাঁরা সেসব প্রবন্ধ পড়েননি তাঁদের কাজে লাগতে পারে। জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকার কথা বলবার আগে নন্দলালের জীবনের পূর্বকথাও কিছু বলা প্রয়োজন হবে।

ভারতবর্ষের অতীত শিল্পকীর্তির জন্য—তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার জন্য মমতা, শ্রদ্ধা ও গৌরববোধ যেমন শিল্পাচার্য নন্দলালের সহজাত ছিল, তেমনি একদা জগৎপূজ্যা দেশজননীর পরাধীনতার জন্য তীব্র অপমানবোধও ছিল তাঁর সহজাত। কিশোর বয়স থেকেই ভারতবর্ষকে বিদেশীর শৃঙ্খলমুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর প্রবল ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে যাঁরা সেদিন মৃত্যুপণে অসমযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই বীর যুবকেরা ছিলেন তাঁর আত্মার আত্মীয়, তাঁর জীবনের আদর্শ। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশোদ্ধারের জন্য বোমাবন্দুক নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে পারিবারিক নানা প্রতিকূলতার জন্য সম্ভব হয়নি। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ায় এবং অল্প বয়সে পিতার বন্ধুকন্যাকে পিতৃনির্দেশে বিবাহ করতে বাধ্য হওয়ায় পিতার অবর্তমানে সংসারের যে দায়িত্ব তাঁর উপরে পড়েছিল তা অস্বীকার করা তিনি কর্তব্য বোধ করেননি, অথচ দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে না পারায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। গোপনে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ রাখতেন তিনি, দেশাত্মবোধক বই পড়তেন; স্বদেশীব্রত নিয়েছিলেন; বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্যরূপে দেশের বঞ্চিত অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র মানুষদের অন্তরঙ্গ হয়ে তাদের সেবা করতেন সাধ্যমত। তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথও দেশকে ভালোবাসতেন, ভারতশিল্পের পুনরভ্যুদয়ের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। বর্তমান যুগের মহান শিল্পিগুরু ঐ মানুষটিও লর্ড কার্জনকৃত বঙ্গভঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃগণ যখন রাখীবন্ধন দ্বারা এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে যোগরক্ষার এবং বিদেশী বর্জন, স্বদেশীব্রত গ্রহণ ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের দিকে জোর দিলেন তখন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চরখায় সুতো কেটেছিলেন, বাড়ির বিদেশী আসবাব দূর ক'রে ভারতীয় আদর্শে গৃহসজ্জা করেছিলেন, চতুর্ভুজা তপস্বিনীরূপা ভারতমাতার অপূর্বসুন্দর ছবি এঁকেছিলেন, গরিবের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়িয়েছিলেন; কিন্তু খুনখারাপীর মধ্যে যেতে বা ইংরেজবিদ্বেষের জন্য জেল ফাঁসির বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তাঁর বাড়িতে তাঁর ছবির সমঝদার ইংরেজ রাজপুরুষেরা আসতেন, তাঁদের চেষ্টায় সরকারী সাহায্যে তিনি 'ওরিয়েন্ট্যাল আর্ট সোসাইটি' স্থাপন করে ভারতশিল্পের প্রদর্শনীর, শিক্ষার ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর মুখে শুনেছি, নন্দলাল তাঁর কাছে ছাত্র হবার জন্য গেলে তিনি তাঁকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করবার পূর্বে তাঁর আগেকার আঁকা কিছু ছবি দেখতে চান। নন্দলাল পরদিন তাঁকে যে ক'খানি ছবি দেখাবার জন্য নিয়ে গেছলেন তার মধ্যে একটি ছিল ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়িতে ঝুলছেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "সর্বনাশ! করেছ কি? লুকিয়ে ফেল, আর কাউকে দেখিও না। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ছবি আঁকতে শিখতে চাও তো এস কাল থেকে।" মাস্টার মশাই একদিন আমাকে বলেছিলেন, "কাগজে প্রায়ই ধেরোতো ইংরেজ প্রভুর জুতোর ঠোক্করে গরিব চাকরের বা চা-বাগানের কুলির পিলে ফাটার ফলে মৃত্যুর খবর, ইংরেজ বিচারকের বিচারে নামমাত্র জরিমানা হ'ত বা কিছুই শাস্তি হ'ত না অপরাধীর। কেউ কোথাও পথে ঘাটে ইংরেজের অবজ্ঞা অপমানের শোধ দিয়েছে ইংরেজকে পিটিয়ে শুনলে আমারও হাত নিসপিস করত। মোহনবাগান যেদিন গোরাদের হারিয়ে শীল্ড পেল সেদিন কী আনন্দ হয়েছিল কী বলব!" তিনি পরিহাস ক'রে বলতেন, "ভগবানের প্যালেটে যত রঙ ছিল, সব আমাদের শরীরে পোঁচের পর পোঁচ লাগিয়ে খরচ করে ফেলেছিলেন, তাই ও ব্যাটাদের ভাগ্যে আর রঙ জোটেনি, জমির চামড়া সাদাই রয়ে গেছে।" বলতেন, "ট্রেনে সম্ভ্রান্ত দেশী ভদ্রলোক ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে ইংরেজ যাত্রী থাকলে অনেক সময় উঠতে পেতেন না—টিকিট থাকা সত্ত্বেও; পরে কেউ ইংরেজ এসে তাঁর স্থান দখল করে তাঁকে নামিয়ে দিলে গার্ড ও স্টেশনের

'মধ্যাহ্নের স্বপ্ন' (স্পর্শন পদ্ধতিতে [টাচ টেকনিক] আঁকা, ১৩"×২৬", ১৯৩১)। বিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে
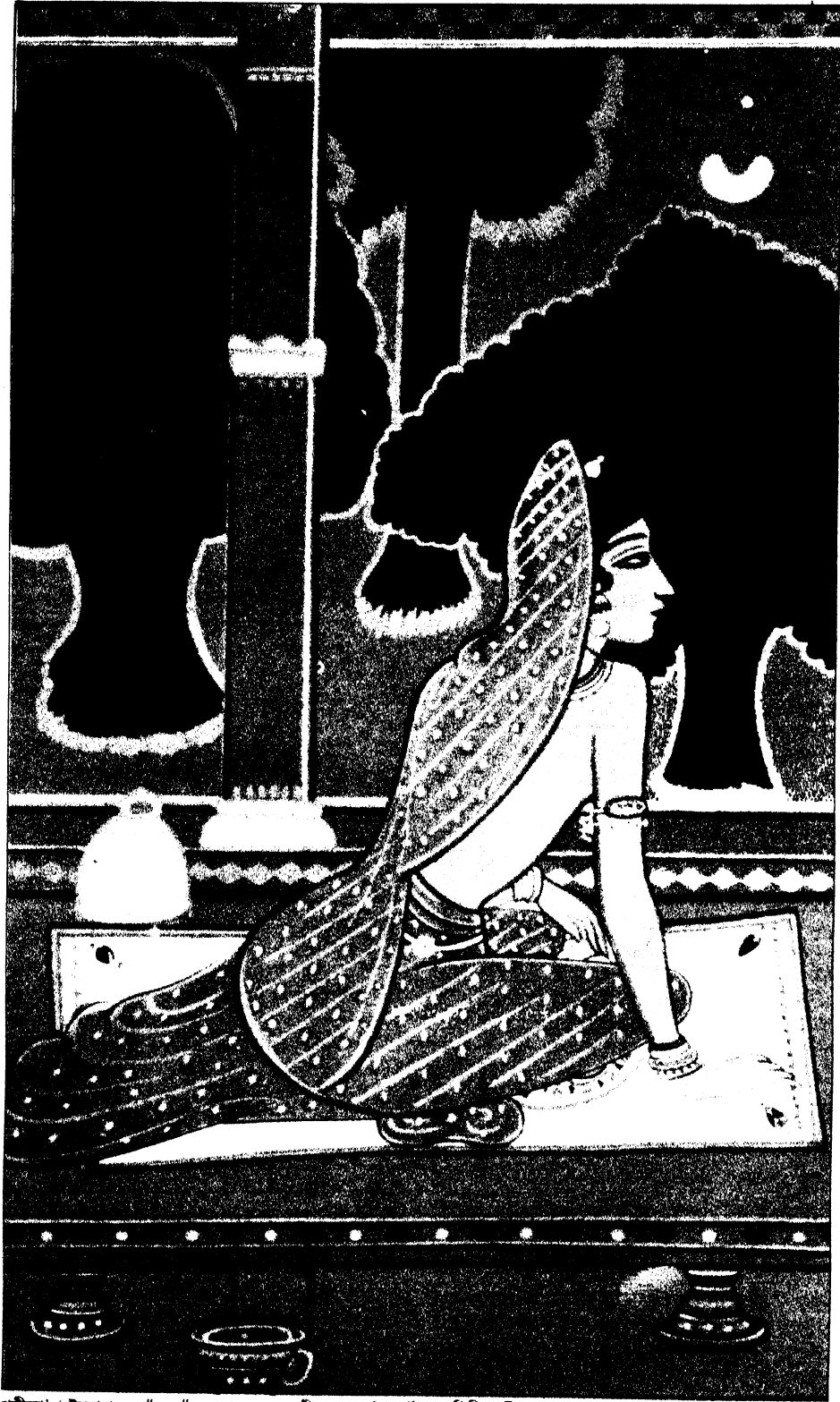
'প্রতীক্ষা' (টেম্পেরা, ১৬"×২৬", ন্যাশানাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট, নয়াদিল্লীর সৌজন্যে।

কর্মচারীরা তার পক্ষ সমর্থন করত, ট্রেনে 'ইউরোপীয়ান' লেখা থার্ড ক্লাস কামরায় কোনো বাঙালী ধুতিচাদর পরে উঠতে পেত না অথচ কালো খ্রীষ্টান বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কোটপ্যান্ট পরে উঠত, অনেক বুদ্ধিমান বাঙালী অন্য গাড়ির ভিড় এড়িয়ে সেই ফাঁকা গাড়িতে আরামে যাওয়ার জন্য হাফ প্যান্ট শার্ট পরে অবশ্য উঠত তাতে। কলকাতার পথেঘাটে বিশেষ করে চৌরঙ্গীপাড়ায় তখন সাহেব-মেম এবং গোরাসৈন্য গিসগিস করত, সুযোগ পেলেই, পান থেকে চুন খসলেই তারা নেটিভদের অপমান করত, অধিকাংশ পথচারীই সে অপমান নীরবে হজম করতেন ; সেই থেকে আমার এমন হয়েছিল যে, সাদা চামড়া দেখলেই রক্ত গরম হয়ে উঠত।" আর্ট স্কুলে ছাত্রাবস্থায় ভারত শিল্প প্রেমিক হ্যাভেলের সংস্পর্শে এসে এবং প্রথম যৌবনে শ্বেতাঙ্গিনী ভগিনী নিবেদিতার, অজন্তার গুহাচিত্রের নকল করতে গিয়ে লেডি হেরিংহামের এবং শান্তি নিকেতনে এসে অ্যান্ড্রুজ, পিয়র্সন, এলমহার্স্ট প্রভৃতি মহাপ্রাণ শ্বেতাঙ্গদের দেখে ও তাঁদের সঙ্গে মিশে তাঁর শ্বেতাঙ্গবিদ্বেষ কমে গেছল বটে, তবে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস তখনও যায়নি। প্রৌঢ় বয়সে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র বলে ভারত জোড়া জনজাগরণ দেখে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস যুদ্ধের সফলতার পূর্ব ইতিহাস শুনে তাঁর বিশ্বাস হয় গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংসার পথেই দেশের মুক্তি আসবে। সেই থেকে তিনি সেই যে মহাত্মাকে চিত্ত সমর্পণ করলেন, তার পর থেকে আর তাঁর মতি পরিবর্তন বা পথভ্রম হয়নি। আসলে মুখে বোমাবন্দুকের কথা বললেও মনটা ছিল তাঁর খুব নরম, মানুষের কষ্ট দেখলে,—রক্তপাত দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। গুরুপত্নী সুধীরা বৌদি'র কাছে শুনেছি, ডাক্তার শিশুকন্যার অস্ত্রোপচার করছে দেখে তিনি একবার অজ্ঞান হয়ে গেছলেন। সেই মানুষের পক্ষে গুপ্তহত্যা, স্বদেশী ডাকাতি, ট্রেন উড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি নিষ্ঠুর কাজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল এবং অন্যায় মনে হ'ত, কেবল স্বাধীনতালাভের অন্য উপায় নেই ভেবে তিনি সেপথে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ; দেশপূজ্য সত্যসন্ধ নেতা যখন দেশের বন্ধন মোচনের জন্য অন্য সরল পথের সন্ধান দিলেন তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, স্বস্তি পেলেন। কিন্তু তখনও তিনি প্রকাশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি, বাইরে থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছেন, গঠনমূলক কাজ করেছেন। আমি যখন সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে আশ্রম ছেড়ে যাই তখন তাঁর মনও খুবই চঞ্চল হয়েছিল আমার সঙ্গী হবার জন্য। তার কয়েক বছর আগে ইংরেজ গভর্নর আশ্রম পরিদর্শনে আসছেন শুনে তিনি কলাভবনে তালা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বনভোজন করতে গেছলেন। সেবার রবীন্দ্রনাথ খুবই অপ্রস্তুত হয়েছিলেন, তবু কিছু বলেননি। লর্ড আরুইনের আগমন উপলক্ষ্যে যখন তোড়জোড় চলছে, তখনও মাস্টরমশাই সরে পড়বার মতলবে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসে আমাদের সামনে অনুরোধ করেন, "নন্দলাল, আমার অতিথি আসছেন। তাঁর যেন অপমান না হয়, আমার যেন মুখরক্ষা হয় দেখো।" অগত্যা মাস্টারমশাইকে হাসিমুখে রাজপ্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করতে হয়। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির ডাণ্ডি মার্চের সময়েও তিনি অভাবের সংসারের দায়িত্ব এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ন্যস্ত কলাভবনের দায়িত্ব অগ্রাহ্য ক'রে তাঁকে অনুসরণ করতে পারেননি। আমি শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের নেতৃত্বে মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গ, চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ, মাদক বর্জন আন্দোলন প্রভৃতি উপলক্ষে যখন কঠিন পরিশ্রম করছি এবং নির্যাতন সহ্য করছি তখন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল তকলি চরখার প্রবর্তন করেছেন, স্বদেশী প্রচার উপলক্ষ্যে ছবিতেও দেশী রঙ ব্যবহার আরম্ভ করেছেন কলাভবনে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসবার সময় মাস্টার মশাই আমাকে কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিলেন প্রয়োজন পড়লে নিজের এবং সঙ্গীদের কাজে লাগবে বলে, একটা আংটা দেওয়া ঘটি এবং নিজের তৈরি একটি তকলি রাখবার চামড়ার বটুয়াতে তকলি ও পাঁজ ভরে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন কিছু অমূল্য উপদেশ, যা চিরজীবন কাজে লেগেছে। বলেছিলেন, "গুরুদেব বহুদিন আগে যা বলেছিলেন মহাত্মাজী আজ তাই বলছেন, নতুন কথা কিছু নয়। তবে মহাত্মাজীর কথার পিছনে কঠিন দুঃখের সাধনা আছে, কিছু সাফল্যের ইতিহাস আছে, তাই তাকে বেশি মানছে লোকে। স্বামীজী বলতেন, 'খেতে পায় না যারা, তাদের কাছে ধর্মের কথা বলতে যাসনি।' গুরুদেবও বলছেন, 'স্বাধীনতার আগে গরিব দেশবাসীর জন্য অন্ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুবিচার এবং নির্মল আনন্দদানের ব্যবস্থা করা দরকার।' মহাত্মাজী বলছেন, 'দেশবাসী যতদিন স্বার্থপর বিদেশী বেনেদের শাসনশোষনের সুযোগ দেবে ততদিন অন্য কোনো সমস্যার সমাধান হবে না, তাই স্বাধীনতা আগে চাই।' তবে তাঁর মতে, 'স্বাধীনতা আনতে হবে অহিংস যুদ্ধে, শত্রুকে ভালোবেসে জয় করতে হবে—তার সঙ্গে অসহযোগ ক'রে!" তার অত্যাচারকে ভয় না ক'রে, তার প্রভুত্ব অস্বীকার ক'রে। বিশ্বের ইতিহাসে এ যুদ্ধের নজির নেই, ভুলো না তোমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছ। তেমনি ভুলো না, তুমি গুরুদেবেরও শিষ্য, শান্তিনিকেতনের প্রতিনিধি ; কল্যাণকর্মের সঙ্গে সুন্দরের সাধনা ছেড়ো না। শুধু স্বাধীনতা আনলে চলবে না, লক্ষ্মীছাড়া দেশে লক্ষ্মী ফিরিয়ে আনতে হবে। যে গ্রামে থাকবে সেখানে শুধু রাস্তাঘাটের পানাপুকুরের আবর্জনা সাফ করলে চলবে না ফলফুলের বাগান করবে, শুধু ওষুধ দিলে, ছেলে পড়ালে হবে না, আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, সবার আপনজন হ'য়ে দলাদলি ভোলাতে হবে। বিপ্লবীরা কাজ খানিকটা এগিয়ে রেখেছেন, তোমাদের ভার শেষ করবার।" প্রণাম ক'রে রাত্রের ট্রেনে আমি সেদিন সতীর্থ বিনায়ক মাসোজীর সঙ্গে কলকাতায় আসি। সেখানে আমাদের বাড়িতে একদিন থেকে মাসোজী গুজরাটে চলে যান, আমি যাই মহিষবাথানে সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের কাছে লবণসত্যাগ্রহ শিবিরে।

স্থানীয় দেশভক্ত জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকেরা তিন ভাই মহিষবাথানে আগেই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে চৌকিদারী ট্যাক্সবন্ধ, তাড়ি-তৈরি-বন্ধ, বিদেশী-বর্জন প্রভৃতি আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অবৈতনিক জাতীয় বিদ্যালয় গৃহটি সতীশবাবুকে সত্যাগ্রহশিবির করতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, পাশে ছিল বিভিন্ন তাঁবুতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির শিবির। সেখান থেকে দিনকতক মাথায় দশ সের নুন নিয়ে জলার জলকাদা ভেঙে কলকাতায় বেচবার জন্য যাতায়াতে ষোলো মাইল হাঁটায় শিবিরে পুলিসের এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন গ্রামে তাল গাছের মোচ কাটতে গিয়ে তাড়িয়ালের মার খাওয়ায় অভ্যস্ত হচ্ছি, এমন সময় খবর পেলুম, মাস্টারমশাই আমের ঝুড়ি নিয়ে সোদপুর আশ্রমে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছেন। মহিষবাথানেই খবর এল, সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে ক'লকাতার এবং বাংলাদেশের সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ হয়েছে, আনন্দবাজার পত্রিকা ও অন্য বহু কাগজের হাজার হাজার টাকা জামিন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সতীশবাবু অবিলম্বে 'সাইক্লোস্টাইল' কিনে হাতে ছাপা 'সত্যাগ্রহ সংবাদ' পত্রিকা বার করলেন, আমাকে করলেন তার মুদ্রাকর। কাজের সুবিধার জন্য ঐ পত্রিকার কার্যালয় প্রথমে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে, পরে সেখান থেকে কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে আইন অমান্য পরিষদের ভাড়া-বাড়িতে উঠে যায়। আমি এবং আমার সহকর্মী রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে দিনে রাত্রে কুড়ি ঘন্টা খেটে কয়েক হাজার কাগজ ছাপতুম। প্রতিদিন ভোরবেলা অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদের অঞ্চলের সত্যাগ্রহের এবং পুলিসের অত্যাচারের খবর নিয়ে আসত, সেগুলি বাছাই ক'রে সংক্ষেপে সংবাদ ছাপতে হ'ত আমাদের। সতীশবাবু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। পত্রিকা স্বেচ্ছাসেবকদের মারফতেই সারা বাংলায় ছড়াত। মাঝে মাঝে পুলিস এসে সাইক্লোস্টাইল কেড়ে নিয়ে যেত, সেইদিনই নতুন যন্ত্র কেনা হ'ত। কিছুদিন টাইপরাইটারও ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিস সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই আমরা কিছু মুদ্রিত কাগজ (কিছু অর্ধসমাপ্ত সংবাদ সহ) তেতলার ছাদে উঠে পাশের বাড়ির ছাদে ফেলে দিতুম, পরদিন কলকাতার বড়ো বড়ো পথের মোড়ে সেগুলিই দেখা যেত ; তাতে ছাপা থাকত, 'পুলিস এইমাত্র আসিয়া মুদ্রণযন্ত্রটি লইয়া গেল।' সতীশবাবু অসম্ভব খাটতে পারতেন, কলকাতা, মহিষবাথান, সোদপুরে প্রায় প্রতিদিন ছুটে বেড়াতেন। আমরা শেষ পর্যন্ত ঐ বাড়ি থেকে বন্দী হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা ও লালবাজারে যাই, তারপর দণ্ডিত হয়ে প্রেসিডেন্সি জেল ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকি। সেই সময় মাস্টার মশাইয়ের বড়ো ছেলে বিশ্বরূপ এবং ছাত্র হরিহরণের কারুশিল্প শিক্ষার জন্য জাপান যাওয়া স্থির হয়, তার আয়োজন করতে তিনি সস্ত্রীক কিছুদিন কলকাতায় বাসা ভাড়া ক'রে বাস করেছিলেন ; প্রায় প্রতিদিন আইন অমান্য পরিষদের বাড়িতে আমাদের খোঁজ নিতে আসতেন তিনি। সেখানে মাখন সেন, সুরেশ দেব প্রভৃতি পরিচিত দেশকর্মীরা ছাড়া তাঁর বন্ধু শান্তিনিকেতনের বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার অক্ষয়বাবু ছিলেন, তাঁর বিশেষ কোনো কাজ থাকত না, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে কোথায় কী রকম চলছে আন্দোলন জেনে

যেতেন। আমাকে ক্লান্ত দেখলে উৎসাহ দিতেন। ঐ সময় একদিন অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল জোড়াসাঁকো থেকে পালিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকদলে নাম লেখায়, কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমার সহকর্মী ক'রে দেবার ঘণ্টা দুই পরে অবনীন্দ্রনাথ সপুত্র এসে রাগারাগি ক'রে তাঁকে নাম কাটিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। শিল্পীর প্রিয়তম শিষ্য নন্দলাল সেদিন সেখানে উপস্থিত ; তিনি তেতলার সিঁড়িতে লুকিয়ে বসেছিলেন, রুদ্রমূর্তি গুরুর সামনে যেতে সাহস করেন নি। সে বাড়িতে যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ এলে গ্রেপ্তার করতে পারত। তাঁদের চেয়ে তিনি তাঁর গুরুকে ভয় করতেন বেশি। আমার কাছে তিনি পাঁচ মিনিটের বেশি বসতেন না, কাজের ক্ষতি হবে বলে। তবে আমার অনুরোধে মহাত্মাজীর ডাণ্ডি অভিযানের ছবিটি তিনি এঁকে নিয়ে আসেন বাড়ি থেকে একদিন, পরদিন আমি সেটি সাইক্লোস্টাইলে ছাপি সত্যাগ্রহ সংবাদের জন্য। পরে ঐ ছবিটির নানা রূপান্তর ঘটে এবং সেটি ভারত বিখ্যাত হয় এবং স্বাধীন ভারতের ডাকটিকিটে স্থান পায়। সতীর্থ সুধীর খাস্তগীর সেটিকে শান্তিনিকেতনে একটা বাড়ির দেয়ালে বড়ো মাপে লাল সিমেন্টের 'রিলিফ' কাজে রূপায়িত ক'রে গেছেন, দেবীপ্রসাদ, রামকিঙ্কর প্রভৃতি ভাস্কর্যে রূপ দিয়েছেন কিছু পরিবর্তন ক'রে।

প্রৌঢ় শিল্পী নন্দলাল স্বেচ্ছাসেবকদলে নাম লিখিয়ে জেল খাটতে বা মার খেতে প্রকাশ্যে পথে নামেননি ব'লে জাতীয় আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি বলা ভুল হবে ; নিজের পথে সৃজনকর্মের মাধ্যমে তিনি যা করেছেন তা' আর দ্বিতীয় কারও দ্বারা সম্ভব হ'ত না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা দিয়ে রসদ যুগিয়েছেন সেদিন আরও অনেকে, কিন্তু তিনি মহাত্মাজীর নির্দেশে তিনবার জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে নগর ও মণ্ডপসজ্জা এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিবাসীকে তাদের স্বদেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষে অবহিত ক'রে এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোকশিল্পের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমাজকে সচেতন ক'রে তিনি জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করেছেন। তার পূর্বে তিনি নিজে হাতে সুতো কেটে বোলপুরে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু প্রতিষ্ঠিত তাঁতে বুনিয়ে আমাকে খদ্দর উপহার দিয়েছেন। আমি আইন অমান্য পরিষদ থেকে গ্রেপ্তার হয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গেলে বোলপুর থেকে বিনোদ মুখোপাধ্যায়, ইন্দুসুধা ঘোষ প্রভৃতি চার পাঁচজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। আমি প্রথমবার প্রথম শ্রেণীর বিনাশ্রমে দণ্ডিত কয়েদী থাকায় কারাগারে কিছু লেখবার ও আঁকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে শান্তিনিকেতনে গেলে মাস্টারমশাই সভা ক'রে কলাভবনে আমার জেল থেকে এঁকে আনা কারাভ্যন্তরের বিভিন্ন দৃশ্যের স্কেচগুলি 'প্রজেক্টর' যন্ত্রের সাহায্যে ছায়াচিত্রে রূপায়িত ক'রে দেখিয়েছিলেন। গুরুদেব তারপর উত্তরায়ণে সভা ডেকে আমার দেশাত্মবোধক কবিতা কিছু শোনেন। অতঃপর নন্দলাল গ্রামাঞ্চলে রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য কতকগুলি প্রাচীরচিত্র মোটা তুলিতে এঁকে দিয়েছিলেন ; 'লিনো কাট'-এর সাহায্যে সেগুলি মুদ্রিত করে আমরা চব্বিশ পরগনার রাজারহাট থানায় এবং ভাঙড় থানায় বিভিন্ন গ্রামে কুটিরের গায়ে আটকে দিয়ে এবং গ্রামপরিক্রমার সময় স্বেচ্ছাসেবক দলের সামনে রেখে জনতাকে উত্তেজিত করেছি ! দু'রঙে ছাপা 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' ছবিটি ছিল এক অপূর্ব বলিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি। তিন সারি নরমুণ্ডের সিঁড়িযুক্ত বেদীর উপর চরকা চিহ্নিত জাতীয় পতাকা উড়ছে, তার ডানদিক থেকে একজন পুরুষ এবং বাঁদিক থেকে একজন স্ত্রীলোক সেটিকে ধ'রে আছে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন শিশুও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সে ছবিটি বাংলার বাইরেও গেছল এবং আদৃত হয়েছিল, এক সময়ে আমি পাটনার নিউ মার্কেটে একটা দেয়ালের গায়ে একটা মুদ্রিত পোস্টার দেখেছিলুম। আর একটা ছবিতে ছিল পেটমোটা রিংমাস্টার জন বুল পৈশাচিক হাসি হেসে চাবুক ঘুরিয়ে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে একটা চৌকিতে দাঁড়িয়ে, তার দু'পাশে ছ'টি বৃত্তের মধ্যে ছিল ছ'টি রেখাচিত্রে তার এদেশের ভেদবুদ্ধিতে ইন্ধন দেওয়ার দৃশ্য ; উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মোন্মাদদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড, দেবস্থান অপবিত্রীকরণ, সেইসঙ্গে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সেনা দিয়ে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালনা। শিরোনামায় ছিল 'হাড় খাব মাস খা'ব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।' বিদেশী রাজশক্তি কীভাবে দেশের মানুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে স্বার্থোদ্ধার করছে তা'র বীভৎস বাস্তব বর্ণনা। আর একটি ছবিতে ছিল সমুদ্র বেষ্টিত একটা রুদ্ধদ্বার দুর্গের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী হাত নেড়ে বলছেন, 'ফিরে যাও।' আর ইংরেজ জাপানী প্রভৃতি বিদেশী বণিকেরা যে-যার পিঠে পণ্য সম্ভার বেঁধে নিয়ে সাঁতার কেটে আসতে আসতে সমুদ্রের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। 'ইণ্ডিয়াজ ফস্টার মাদার' শিরোনামার ছবিতে একজন স্থূলকায়া ইংরেজ নার্স বেতের চেয়ারে বসে আছে, তার পিছন দিকে দেয়ালের তাকে সাজানো আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, ট্রেন, স্টীমার, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি কিছু খেলনা। নার্সের পায়ের কাছে রাখা একটা বেতের চ্যাপ্টা ঝুড়িতে একটা উলঙ্গ কঙ্কালসার ছেলে শুয়ে পা ছুঁড়ে কাঁদছে, তার দু'হাতে ধরানো আছে একটা ফিডিং বটল্-এর উল্টো মুখটা ; সোজা মুখ থেকে একটা লম্বা রবারের নল গেছে নার্সের মুখে, সে সেটা চুষতে চুষতে খুখ বাঁকিয়ে বলছে, 'আনগ্রেটফুল বীস্ট !'

দুর্ভাগ্যক্রমে কলকাতার যে বন্ধুরা সেগুলি আমার অনুরোধে গোপনে ছেপেছিলেন, তাঁরা জেলে যেতে প্রস্তুত না থাকায় পুলিশের ভয়ে মূল ছবিগুলি এবং বাকী মুদ্রিত প্রতিলিপিগুলি পুড়িয়ে ফেলায় নন্দলালের সে-যুগের কয়েকটি বহু মূল্য শ্রেষ্ঠসৃষ্টি চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে নন্দলালের ভূমিকার কয়েকটি দুর্ধর্ষ সাক্ষীকেও আজ পাঠক-পাঠিকার সামনে হাজির করা গেল না।

গান্ধীজির মধ্যে যে শিল্পরসিক সৌন্দর্যরসপিপাসু ব্যক্তিসত্তা দেশসেবায় রূপাঞ্জলি দেবার উপযুক্ত সহ-সাধক খুঁজেছিলেন তার আশা মিটল। তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনের আগে নন্দলালকে ডেকে পাঠালেন সেখানে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতশিল্পের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের লোকের প্রত্যক্ষগোচর করার জন্য। শান্তিনিকেতন থেকে, কলকাতা থেকে এবং ভারতের নানা ধনীগৃহ থেকে ও গ্রন্থাগার থেকে চিত্র সংগ্রহের কাজে আমি গুরুকে সাহায্য করবার সৌভাগ্য লাভ করি। সতীর্থ বিনোদ মুখোপাধ্যায়ও প্রথম থেকে আমার সঙ্গে ছিলেন মাস্টারমশাইকে সাহায্য করতে। প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ফোটোর সাহায্যে দেখানো হল। যতদূর মনে পড়ে, স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন রইল ধামেক স্তূপ, সাঁচীর তোরণ, মহাবল্লীপুরমের গঙ্গাবতরণ, ইলোরার কৈলাস মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, খাজুরাহোর কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির, কোণার্কের সূর্যরথ মন্দির, চিতোরের জয়স্তম্ভ, বিজাপুরের গোলগুম্বজ, মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির, আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা, সাসারামে শের সাহের সমাধি, ও অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের ফোটোতে। ভারত ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ রইলেন ধ্যানী বুদ্ধ, ত্রিমূর্তি, নটরাজ। মৌর্য যক্ষিণীমূর্তি, বোধিসত্ত্বের, বিষ্ণুর, সূর্যের, মহিষমর্দিনীর, নৃসিংহ ও বরাহ অবতারের এবং অতীতের হস্তী, সিংহ, বৃষ, অশ্ব প্রভৃতি পশু মূর্তির ছায়াচিত্রও ছিল মনে হয়। সীমান্ত গান্ধীর ছেলে আমাদের সতীর্থ আলিখান তাঁর তৈরি আবক্ষ দারুমূর্তি দুটি শেষ মুহূর্তে নিয়ে এসেছিলেন, আধুনিক ভাস্কর্যের নমুনাস্বরূপ তারা স্থান পায় দুই কোণে দুটি তাকে। অজন্তা ও বাঘগুহার ভিত্তিচিত্রের হাতে আঁকা রঙীন প্রতিলিপি, পাল যুগের তালপাতায় আঁকা দেবীমূর্তি, দক্ষিণী চোল, গুজরাতের জৈন, মোগল, রাজপুত, পাহাড়ী কাংড়া প্রভৃতি শৈলীর মূল ছবির সঙ্গে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বহু ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, অসিত হালদার এবং তাঁদের সতীর্থ ও শিষ্যদের ছবিগুলি কালানুসারে সাজানো হয়েছিল, ছবির শোভাযাত্রা শেষ হয়েছিল অতি-আধুনিক বিমূর্তবাদীদের ছবি দিয়ে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছলেন ফ্রান্সের মুজে গিসের অধ্যক্ষা, নন্দলালের বৃহদাকার তপস্বিনী উমার ছবিটি বহু দর্শকের এবং তাঁর বন্ধু ও শিষ্যদেরও মনোহরণ করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিদগ্ধ নাগরিক অভ্যাগত এবং লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর উত্তরপ্রদেশের পল্লীবাসী মানুষকে স্বদেশের শিল্পৈশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য ঐরকম সুবিপুল আয়োজন তার পূর্বে বা পরে ভারতবর্ষে কোথাও হয়নি। প্রদর্শনী গৃহ তৈরি হয়েছিল রৌদ্র বৃষ্টি রোধের প্রয়োজনে ঢেউ তোলা (টিন) লোহার লালিত্যহীন উপকরণ দিয়ে, ভিতরে ঢুকলেই বিমুগ্ধ দর্শকের চোখে ভেসে উঠত এক অপরূপ মায়াপুরীর দৃশ্য। বিশাল কক্ষটির ভিতরে চারদিকের দেয়াল ঢাকা পড়েছিল আকাশীনীল রঙের খদ্দরে, চারদিকের গ্যালারির লম্বা কাঠের তক্তাগুলি সাদা খদ্দরে মুড়ে তার উপরে সারি দিয়ে সাজানো হয়েছিল বিচিত্র বর্ণাঢ্য চিত্রসম্ভার।

'পলাশ' (স্পর্শন পদ্ধতি, ১৩"×১৩", ১৯৩১)।

বিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে

'সন্ধ্যা' (স্পর্শন পদ্ধতি, ১৩"×২৬", ১৯৩১)।

বিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে

গান্ধীজির 'ডাণ্ডি অভিযান' : লিনোকাটে ছাপ নেবার আগে অঙ্কিত খসড়া । অণুকণা খাস্তগীরের সৌজন্যে

ছবিগুলির পিছনে ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট পীতাভ শ্বেত শরকাঠি দাঁড় করানো, যেন নীল আকাশের পশ্চাৎপটে কাশবনের মধ্যে নন্দনিকুঞ্জ থেকে নেমে আসা রঞ্জনার ধারা বয়ে চলেছে ! প্রদর্শনীগৃহের প্রবেশ ও নির্গমন পথের জন্য রচিত দরজা দুটির মাথায় দুলছিল ফুলের মালা, দু পাশে ছিল চিত্রিত মঙ্গল ঘটে পদ্মগুচ্ছ, মেঝেয় ছিল সুন্দর আলপনা। মহাত্মাজী ভারি খুশি।

মাস্টারমশাইয়ের নির্দেশে আমি প্রবীণ শিল্পী যামিনী রায় মশাইয়ের দ্বারা বিভিন্ন কুটির শিল্প বিষয়ক অনেকগুলি বৃহদাকারের পট আঁকিয়ে ছিলাম. তিনি নিজে সেগুলি কংগ্রেস নগরের বাইরের দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গেছলেন। নামমাত্র মূল্যে সেগুলি নেওয়া হয়েছিল, প্রদর্শনীর শেষে আমরা তাঁকে সেগুলি খুলে নিয়ে যেতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি বেশি হয়নি। তিনিও ছিলেন নন্দলালের মতো দেশভক্ত অভাবী শিল্পী, জনতাকে আনন্দ দিয়ে নিজেও তৃপ্তি পেয়েছিলেন। পর বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হয় মহাত্মাজীর নির্দেশে খান্দেশের নিভৃত পল্লী প্রান্তে ফৈজপুরে। মহাত্মাজী সেবার নন্দলালকে ডাক দিয়েছিলেন ভারতের কুটির শিল্পের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে এবং গ্রামের উপযোগী বাঁশ খড় দরমা চাটাই দিয়ে নগরসজ্জা করতে। মাস্টার ডেকে পাঠালেন, আমি তখন আন্দোলন বন্ধ থাকায় কৃষ্ণপুর গ্রামে একটি অবৈতনিক জাতীয় বিদ্যালয় চালাচ্ছিলাম, সঙ্গীদের ভার দিয়ে ফৈজপুরে গেলাম। সতীর্থ বিনোদ মুখোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত ও অরুণাচল পেরুমল আগেই গেছলেন, অধিবেশন স্থানের পাশেই একটি তাঁবুতে স্থান নিয়েছিলেন তাঁরা। এবার প্রদর্শনীগৃহ তৈরি হয়েছিল বাঁশের কাঠামোয় দরমার এবং চাটাইয়ের আচ্ছাদন দিয়ে, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গ্রাম্য কারুশিল্পের অনেক ভালো ভালো নিদর্শন এসেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলার নক্সী কাঁথা ও শিকে এবং মধ্যপ্রদেশের যাযাবর বাঞ্জারী মেয়েদের বিচিত্র আঙরাখা বাঞ্জারী চোলি। গ্যালারিগুলি ছিল বাঁশের মাচামাত্র, ঘরের মাঝখানে ছিল একটা প্রকাণ্ড শাল কাঠের খাম ত্রিবর্ণ খদ্দরে মোড়া এবং উপর থেকে খদ্দরের ঝালর ঝোলানো। খামটার নীচে শোভাবৃদ্ধির জন্য চার পাশে বৃত্তাকারে মাস্টারমশাই লাল পাতার কেয়ারি না দিয়ে ছোলার চারা লাগিয়েছিলেন, যাতে অধিবেশন শেষে গ্রামের ছেলেরা কিছু ছোলা খেতে পায়। ফুল পাতা মঙ্গল ঘট ও আলপনা দিয়ে 'খেড়াতিল কারাগরী'র ঘরটি অল্পব্যয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল, মাচায় সাজানো বাঁশের, মাটির, ধাতুর, কাঠের ও কাপড়ের শিল্পদ্রব্যগুলি যাতে কেউ ছুঁতে না পারে সেজন্য এক হাত তফাতে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিনেই জনতার ভিড়ের চাপে বেড়াগুলি ভেঙে পড়বার উপক্রম হলে আমি প্রবেশদ্বারের মাথায় পেস্টবোর্ডে লিখে টাঙিয়ে দিই 'ফক্ত স্ত্রিয়াঁ কড়িতা' অর্থাৎ কেবল মেয়েদের জন্য ঐদিনটি নির্দিষ্ট। স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল অল্প, আর পুরুষ কেউ ঢুকল না, যারা ঢুকেছিল তারা বেরিয়ে এল অবিলম্বে, মেয়েরা ফাঁকা ঘরে আনন্দ করে প্রদর্শনী দেখলে। মাস্টারমশাই অবাক হয়ে বললেন, "কী ডিসিপ্লিন দেখেছ ! কলকাতায় তো এভাবে নোটিস দিলে আমাদের মেরে পাট পাট করে দিত।" কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, করাচি সর্বত্রই বড়ো শহরের কংগ্রেস অধিবেশনে মেয়েরা প্রধানত কুচকাওয়াজ করে গান গেয়ে শাঁখ বাজিয়ে শোভাবৃদ্ধি করেছেন, রান্নার এবং পরিবেশনের কাজ করেছেন পুরুষেরা। ওখানে রান্না করেছেন মেয়েরা বড়ো বড়ো হাঁড়া, কড়া, বালতি ভর্তি ভাত রুটি ব্যঞ্জন। মেয়েরা দু-তিন জনে ধরে নিয়ে এসেছিলেন বাঁশের সাহায্যে, অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিবেশন করেছিলেন। মাস্টারমশাই বাড়িতে চিঠি লিখেছিলেন, "বাংলার মেয়েদের এদেশে তীর্থযাত্রায় আসা উচিত।" সেবার বড়ো বড়ো তোরণগুলি তৈরি হয়েছিল বাঁশ দরমা দিয়ে। সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) জবাহরলালকে স্টেশন থেকে কংগ্রেসের মণ্ডপে আনবার জন্য মাস্টারমশাই একটা বলদের গাড়িকে ত্রিবর্ণ খদ্দরের সাজে সাজিয়ে উপরে ছাতা লাগিয়ে রথে পরিণত করেন। তাতে যে চারটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত বলদ জোতা হয়েছিল, সভাপতি নেমে গেলে সেই তেজী বলদ গুলিকে তাদের মালিক বাড়ি নিয়ে গেছলেন। পরদিন ভোরে মহাত্মাজী প্রদর্শনী দেখতে এসে বললেন, সভাপতির রথটার গোরু খুলে দেওয়ায় সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। যারা শোভাযাত্রার সময় দেখেনি তাদের মন ভরছে না। তুমি চারটে 'বয়েল' তৈরি করে ওটাতে জুতে দাও। "লকড়ি-উকড়ি কোই চীজ সে বনা দেনা। কাল সুবাকো হো যাগা না ?" ব'লেই তাঁর দ্রুত পদে প্রস্থান। নন্দলাল তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, "এক রাত্রে চারটে ষাঁড় ! বাদশার হুকুম শুনলে ?" কিন্তু দমবার মানুষ নন আমাদের গুরু। কাঠের ষাঁড় হল না বটে তবে প্রায় এক-মানুষ-উঁচু চারটে দরমার গায়ে পুরু করে তেল রঙ দিয়ে চারটে সাদা ষাঁড় আঁকা হল। তাদের গায়ে বিচিত্রবর্ণের কাপড়ের টুকরো জুড়ে তৈরি ঝালর দেওয়া সাজ, গলায় সারি সারি ঘণ্টার মালা, পিতল বাঁধানো শিঙে ঘুন্টি, ঠিক যেমন বাস্তবে ছিল। দরমাগুলোকে মাঝখানে ক'টা বাঁশের খুঁটি দিয়ে দাঁড় করানো হল, আগে পিছনে জোড়া জোড়া করে। রথটার ধুরোটা তুলে দেওয়া হল দুই সারি দরমার মধ্যে গুপ্ত একটা পিপের উপর। রথ খাড়া হল, দশ হাত দূর থেকে দেখলে মনে হচ্ছিল সত্যিই মহাকায় বৃষেরা রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাস্টারমশাই বাইরের রেখাগুলো আঁকেন এবং একটা সাজ আঁকেন, আমরা রঙ ভরি এবং অন্য সাজগুলোয় তাঁর আঁকা কারুকার্যের নকল করি।

মহাত্মাজী সকালে দেখে মুগ্ধ, সভায় বললেন, "নন্দলালজী তো জাদুগর হ্যায় !" উপস্থিত সভ্যেরা তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন, মহাত্মাজীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি যাননি। আত্মপ্রচারবিমুখ তিনি চিরদিনই। কিন্তু ঐ মানুষটিরও ধৈর্যচ্যুতি হত আত্মসম্মানে ঘা লাগলে। মহাসভার অধিবেশন শেষে আমরা অজন্তা ইলোরা দেখতে যাব কথা ছিল, আমরা ছাত্রেরা ষাট টাকা করে নিলুম, কিন্তু তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর 'নন্দলালজীকা ষাট রূপেয়া বেতন' নন্দলালজীর সহ্য হল না ! তিনি নিজেও টাকা নিলেন না, আমাদেরও নিতে দিলেন না। যে যার বিছানা পিঠে বেঁধে কয়েক মাইল পথ হেঁটে আমরা স্টেশনে পৌঁছেছি এমন সময় কর্তৃপক্ষের অন্যতম 'সহস্রবুদ্ধি' মোটর নিয়ে এসে হাজির : "আপনি অপমানবোধ করবেন আমরা বুঝতে পারিনি, মহাত্মাজী খুব রেগেছেন আমাদের উপর। ফিরে চলুন।" শিল্পাচার্য ফিরলেন না, অগত্যা আমাদের অজন্তা ইলোরায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা মোটর দিয়ে গেলেন তিনি। আমরা সেই মোটরে অজন্তা, দেবগিরি এবং ইলোরা দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলুম সেবার শিল্পাচার্যের সঙ্গে।

মহাত্মাজীর ডাকে পর বৎসর হরিপুরার কংগ্রেস নগর সাজাবার ভার নিতে হয়েছিল শিল্পাচার্যকে, আমি নানা কারণে যেতে পারিনি। কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখেছিলুম, তিনি নন্দন বাড়িটার ছাদে তাঁবু খাটিয়ে হরিপুরার তোরণ সাজাবার জন্য সাধারণ দরিদ্র পল্লীবাসীর গার্হস্থ্যজীবনের ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন দৃশ্য দেশী রঙে মোটা তুলিতে পটের মতো করে আঁকছেন, ছাত্রেরা সেগুলি নকল করছে। তাঁর আঁকা তিরাশিটি ছবি এবং সেগুলির প্রতিলিপি মিলিয়ে দু'শ'র বেশি প্রাচীর চিত্রে সেবার জাতীয় মহাসভা অধিবেশনে চুয়ান্নটি তোরণ-দ্বার সাজানো হয়েছিল, 'হরিপুরা পোস্টার' নামে সেগুলি বিখ্যাত হয়েছিল। সুভাষবাবু ছিলেন সভাপতি, তিনি নন্দলালের স্নেহভাজন কুটুম্বস্থানীয় দেশনেতা। সেবার তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে বহু ছাত্র গেছল, তাঁর স্ত্রী, সুধীরা বসুও অধিবেশনের আগে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওরকম বিপুল শিল্পৈশ্বর্যমণ্ডিত আয়োজন পূর্বে বা পরে আর হয়নি কংগ্রেসের অধিবেশনে। সুভাষবাবুর অপমানে ব্যথিত নন্দলাল তারপর আর যেতেন না কংগ্রেসনগর সাজাতে।

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে নন্দলালকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি বাজিয়েছি বাঁশের বাঁশি, আর তোমরা সেই বাঁশে মঞ্জরী ফুটিয়েছ।" কবির আশ্রমে বিদগ্ধ রুচির নরনারীর নৃত্য-গীত-বিদ্যাচর্চার আবহাওয়ায় বাঁশে শিল্পের মঞ্জরী ফোটানোর চেয়ে ঢের কঠিন কাজ কঠোর কর্মযোগী সংগ্রামী গান্ধীজীর সহকর্মীদের নীরস রাজনৈতিক দ্বন্দ্বোদ্বেল স্বাধীনতা যুদ্ধোদ্যমের আখড়ায় আন্তরিক দেশপ্রীতির সঙ্গে অনাবিল সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করে, আত্মবিস্মৃত ভারতীয়দের তাদের স্বদেশের ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে পাথরে ফুল ফোটানো। রবীন্দ্রনাথ-নন্দলালের মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির দুর্লভ সমাবেশ দেখেছিলেন, গান্ধীজীও তাঁর মূল্য বুঝেছিলেন। নিঃস্বার্থ নিবেদিতজীবন শিল্পী তাঁর নিজের নিভৃত অন্তরের সৌন্দর্য সাধনাকে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সাধনায় যুক্ত করে জাতীয় আন্দোলনে নবজীবনরস সঞ্চার করেছিলেন, কল্যাণকর্মে আনন্দকে মূর্ত করে তাকে শ্রীমণ্ডিত করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজের রীতিতে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা আর কারও পক্ষে নেওয়া সম্ভব হত না বলে আমার বিশ্বাস।
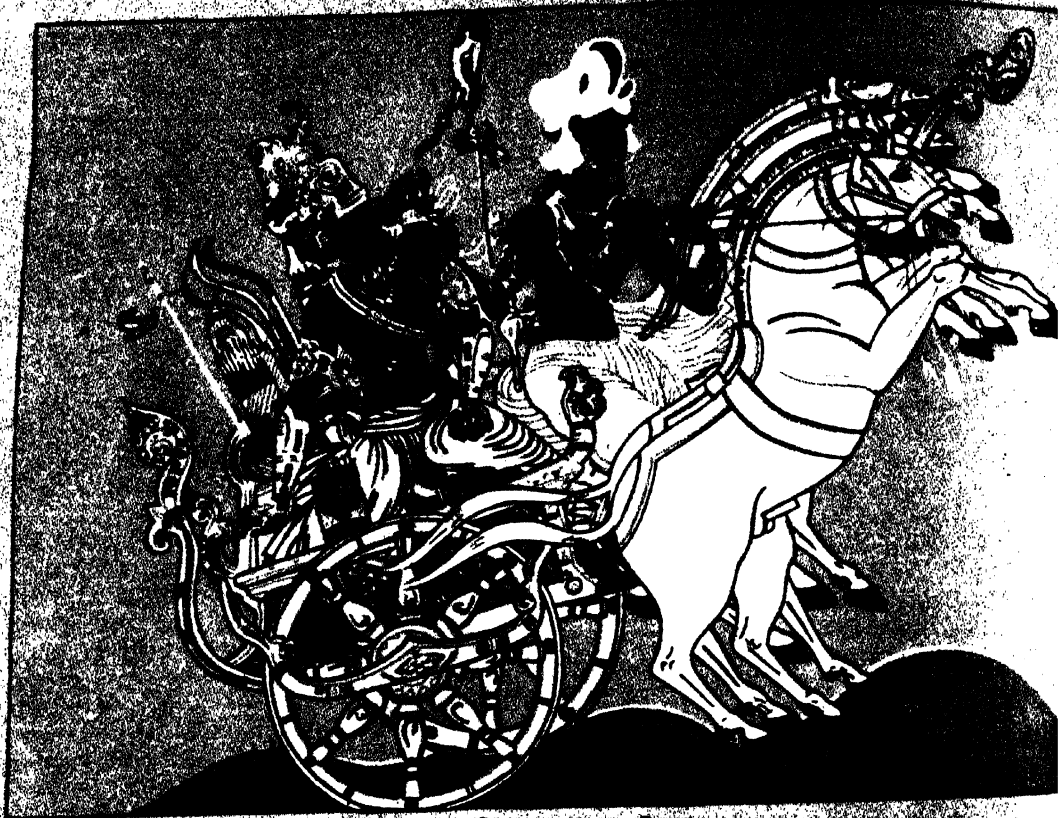
ফুলকারী

প্রথম খণ্ড

শ্রীনন্দলাল বসু

কলাভবন, শান্তিনিকেতন

বোলপুর

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স

[illegible] নং কলেজস্কোয়ার,

কলিকাতা।

পরিচয়

যে তুলির কাজের মর্ম্ম জানে সূচের কাজের সৌন্দর্য্যটিও সে ধরে নেয় সহজে।

যে জানে সে জানে যে তুলি দিয়েই টানি বা সূচ দিয়েই বুনি দুয়েই তুল্য মূল্য আর্টের হিসেবে !

ঘরের দেওয়াল সাজলো ছবিতে, ঘরের বিছানা পর্দ্দা গালিচা এমন কি ঘরের মানুষগুলিও সাজলো সূচে বোনা ফুলের এবং পাতার অলঙ্কারে ! ভালমন্দ ছোট বড় একথা ওঠার অবকাশই হোলনা আর্টের নানা বিভাগের চর্চ্চার ও সাধনার বেলায়।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য—।৵০

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, কলাভবন, শান্তিনিকেতন, বোলপুর।
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
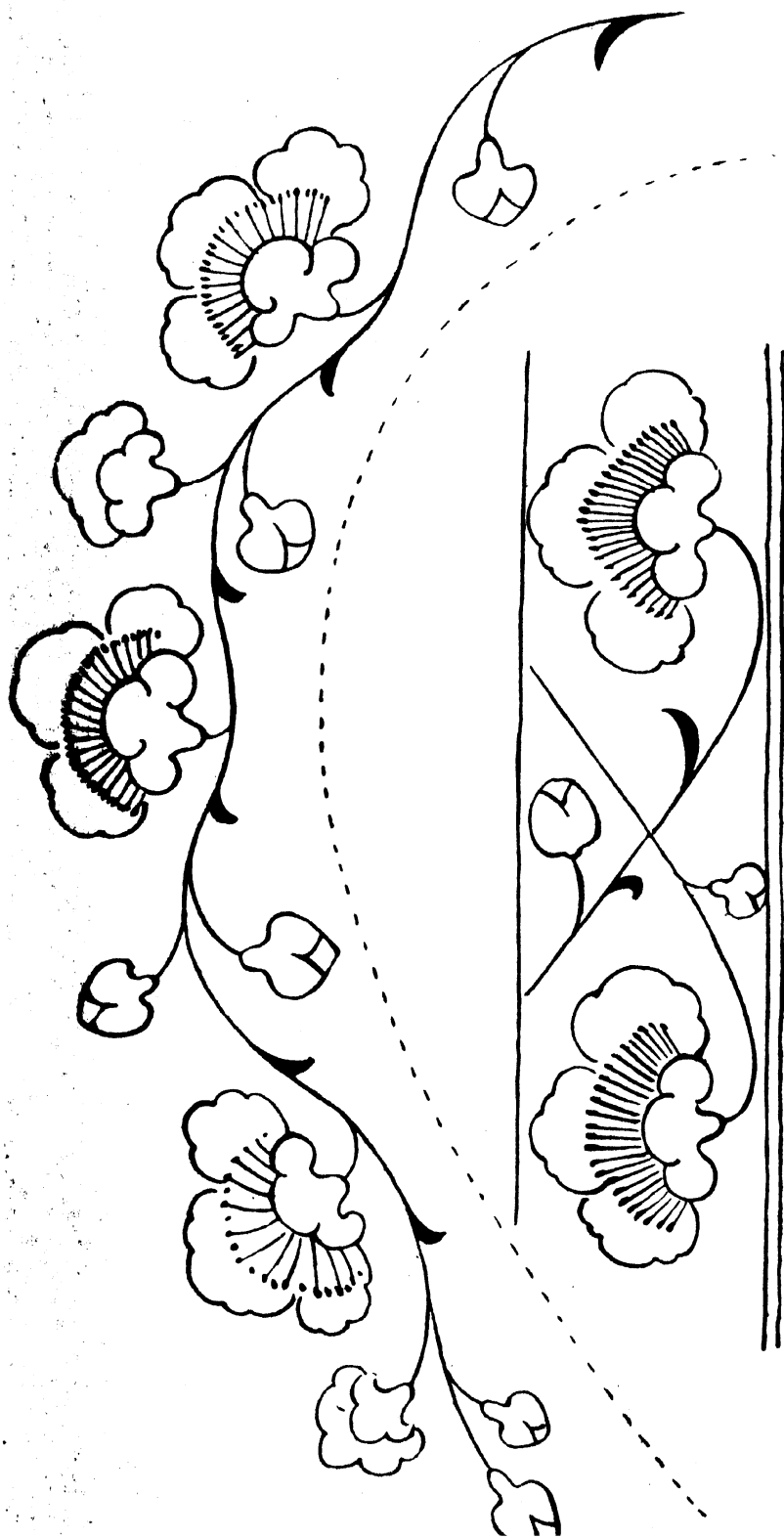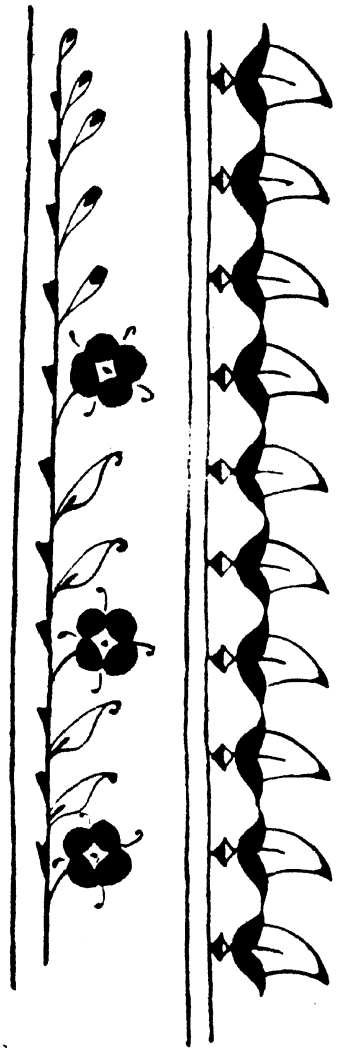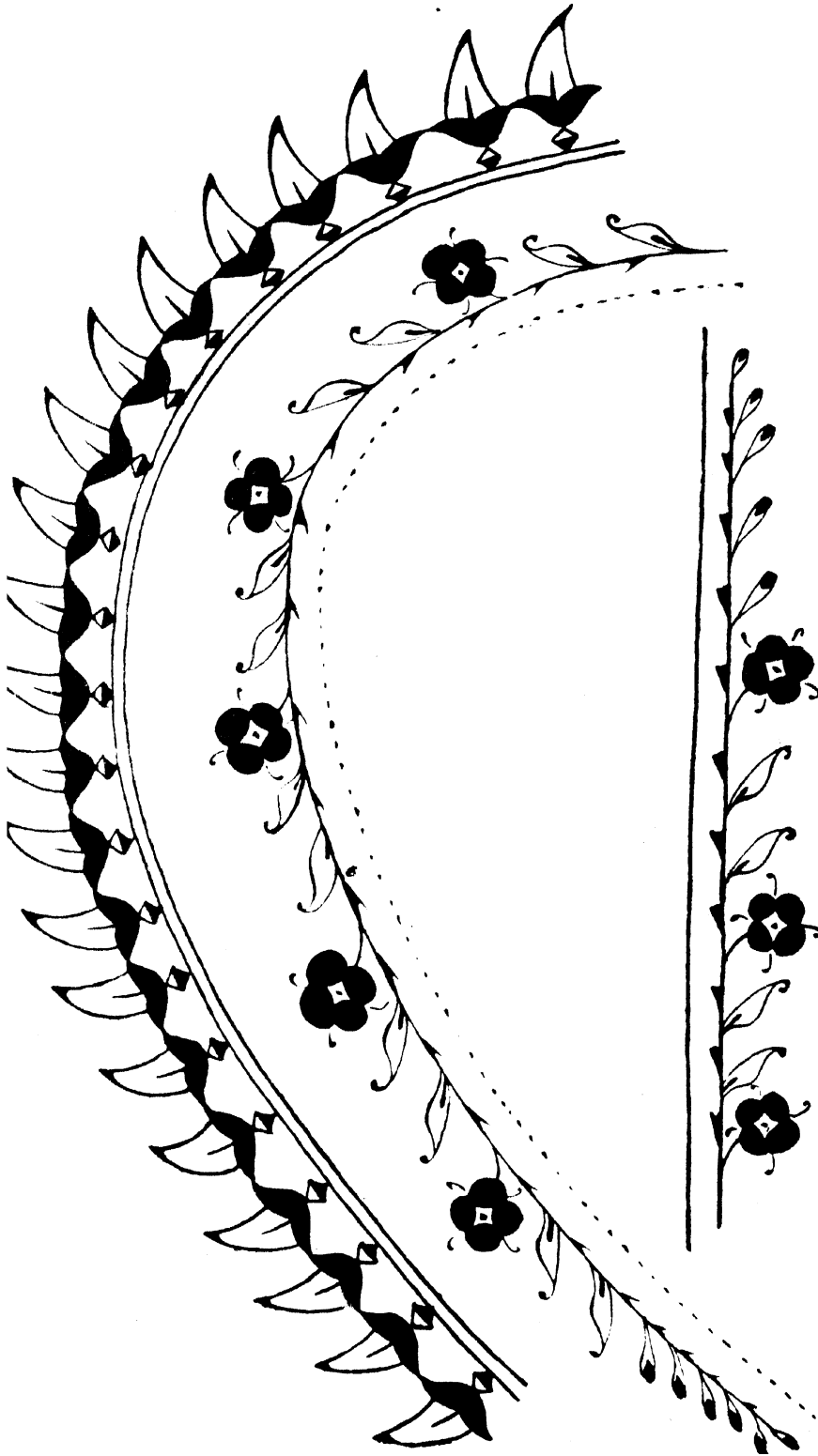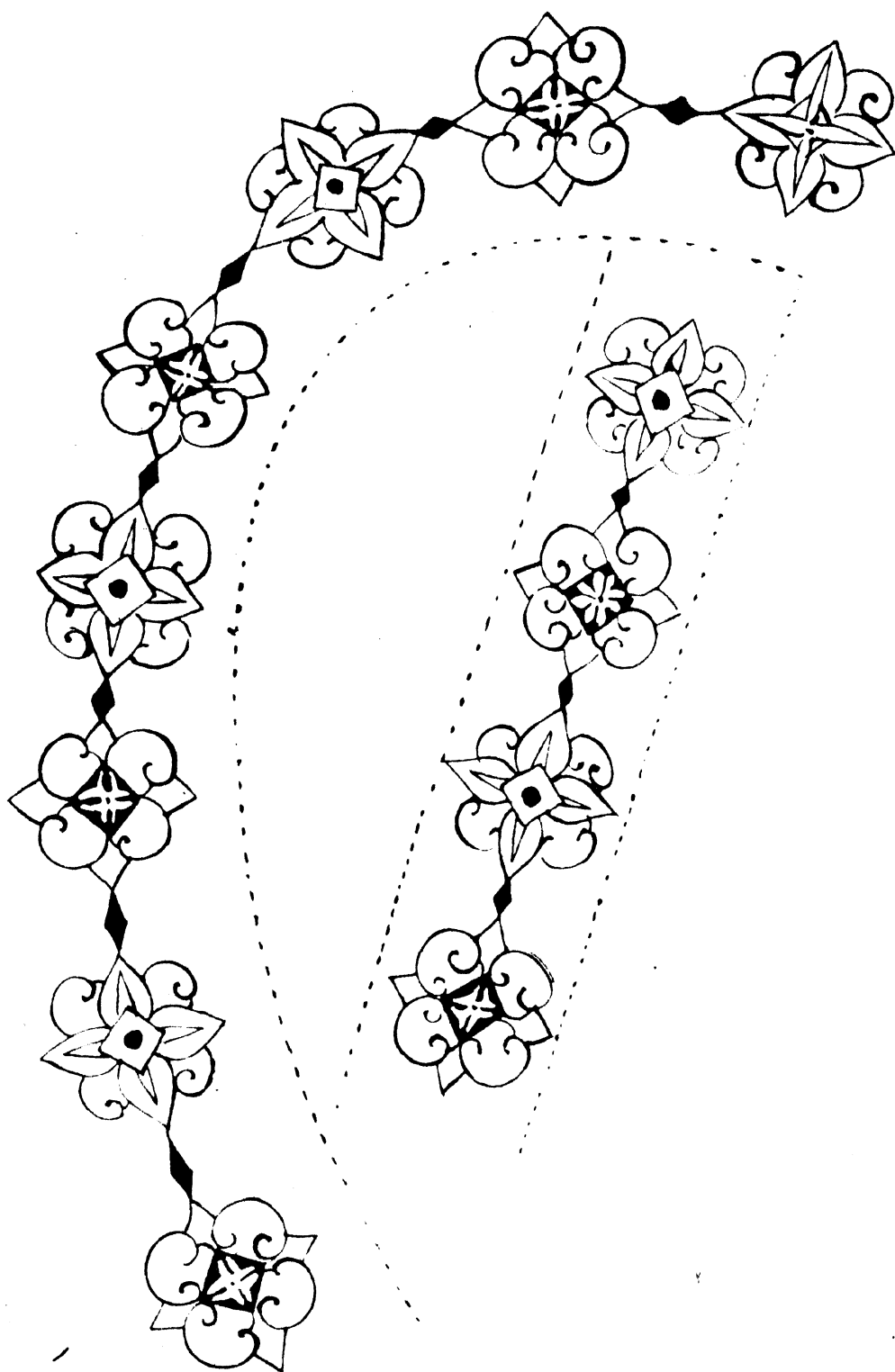
মানুষ নন্দলাল

রানী চন্দ

মানুষ নন্দলাল' লেখা চাই।

মানুষ-নন্দলাল বলে আলাদা কিছু ছিলেন না তো তিনি। ছিলেন ষে শিল্পীতে মিলেমিশে একজন।

সবাই তাঁকে ডাকেন 'মাষ্টার মশায়' আমরা বলি নন্দদা। আমাদের া (শিল্পী মুকুল দে) এই নামেই ডাকতেন, তাঁর কাছ হ'তেই নন্দদা শিখেছি আমরা। কত ছোট বয়েস থেকেই নন্দদাকে জানতাম। আমার বয়েস চার বছর, বাবা-মারা গেলেন, কলকাতাতেই ছিলাম রা সে সময়ে। নন্দদা আসতেন, আমাকে কোলে তুলে নিতেন, আদর তেন। সেই তখন হ'তেই তাঁর স্নেহটুকু আমার বুক ছুঁয়ে ছিল। তারপর কিছুকালের ব্যবধান। মা ছোট ছোট ভাই-বোন আমাদের কে নিয়ে ঢাকা চলে এলেন। বড়দা বিলেত গেলেন। ফিরে এলেন কয়েকবছর বাদে। কলকাতার আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপালের কাজ ন। আমরা ফিরে এলাম কলকাতায়।

আর্টস্কুলেরই দোতলায় প্রিন্সিপালের ফ্ল্যাট। সে আমলের সাহেবদের। বিরাট বিরাট ঘর, উঁচু ছাদ। চওড়া দেয়াল। পশ্চিমদিকে মস্ত র ঘর, একসময়ে সেই ঘরের মেঝেতে বসে ছবি আঁকার ধুম পড়ে। বড় বড় মেঝে তৈরী করার সময়ে মেঝে যাতে না ফাটে—মাঝা মাঝি আড়াআড়ি সুতলীর দাগ দেগে দেয় রাজমিস্ত্রিরা—তাদের রীতি মাফিক। তেমনি দাগ কাটা চার চারটে ভাগ ছিল মেঝেতে।

সে সময়ে যামিনীদার (যামিনী রায়ের) ভাড়া বাড়িটি ছিল অতি ছোট। ছড়িয়ে বসে ছবি আঁকার পরিসর ছিল না তেমন। যামিনীদা তখন আগের আঁকা-পদ্ধতি ছেড়ে পট নিয়ে মেতে উঠেছেন।

বড়দা যামিনীদা'কে এনে সেই ঘরের একটা ভাগে বসিয়ে দিলেন, প্রচুর কাগজ দিলেন, রঙ দিলেন, —বললেন, 'যত ইচ্ছে ছবি এঁকে যাও'। যামিনীদা বসে বসে পটের পর পট এঁকে যেতেন।

আরেকটা ভাগে বড়দা ছবি আঁকতেন ছুটির দিনে বা অবসর সময়ে। তাঁর ছবি আঁকার সরঞ্জাম থাকতো তাঁর ভাগের মেঝেতে।

যামিনীদা'র পাশাপাশি ভাগটাতে বসে গেলাম আমি। তখন সবে আঁকা শুরু করেছি, তাই উল্লাসটা ছিল আমারই বেশী। বাকী একটা ভাগ খালি পড়ে থাকতো, নন্দদা কলকাতায় এলে—তখনকার দিনে প্রায়ই আসতেন, এলে আমার ভাগের মেঝেতেই এসে বসে পড়তেন। বড়দা যামিনীদা'র সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাতে রঙ তুলি নিয়ে আমার ছবিতে রঙ দিতেন, রূপ ফোটাতেন। আমি তন্ময় হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতাম। যেবারে যেটুকু ধরতে পারতাম সেইটুকু নিয়েই আবার আঁকা শুরু
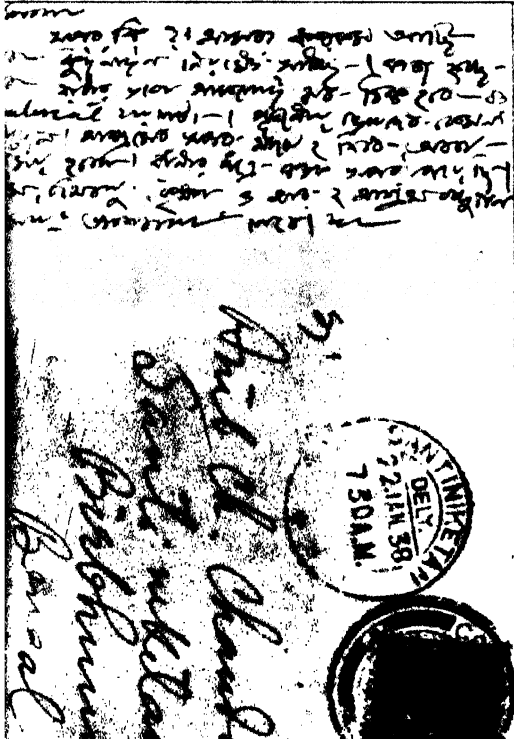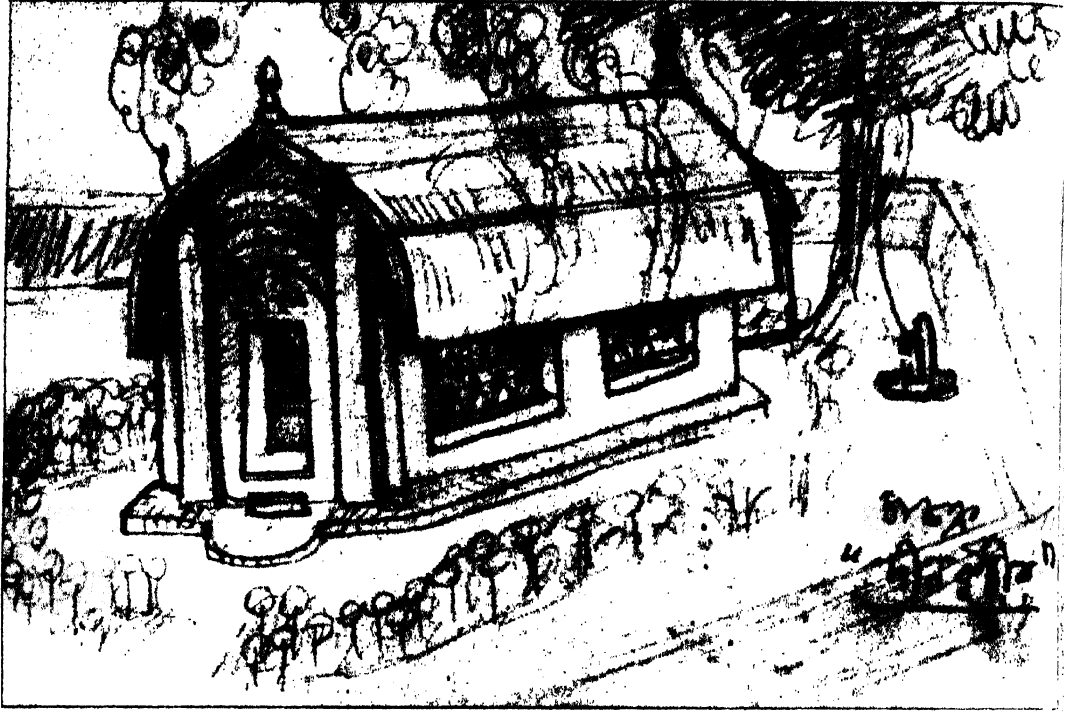
করতাম। নন্দদা এসে এসে ছবিতে যেন রস সিঞ্চন করতেন। সেই তখন হতেই সারা মন প্রাণ দিয়ে নন্দদাকে 'আঁকড়ে ধরেছিলাম, সে মুঠি এতটুকু ঢিলে হয়নি কোনদিন।

নন্দদার হাতে যেন যাদু খেলতো। দেখতাম —বড়দা তখন একটা বড় ছবি আঁকলেন। ছবিখানা অনেক আগের করা, ছোট আকারের ছিল,—সেখানাই বড় করে বড় কাগজে এঁকেছেন। তখনকার দিনে মোটা কার্টিজ কাগজ কাঠের ফ্রেমে আট্‌কে আঁকতে হত এইসব ওয়াশের ছবি। গঙ্গাস্নানের ছবি, ঘাটে বৃদ্ধা প্রৌঢ়া ও যুবতী বধূ—তিনটি নারী। বৃদ্ধা স্নানান্তে ঘাটে বসে জপ করছেন, প্রৌঢ়া স্নানশেষে পারে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বধূটি-গলা জলে—তখনো আর একটা ডুব দেবে আশা। সায়াহ্নকাল। ঘাটের অশ্বত্থগাছের পাতাভরা ডাল জলের উপরে এসে পড়েছে। জল মাটি আকাশ সব মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ ছবি একখানি। এই ছবিটি আঁকবার কালে বার কয়েক এসেছেন নন্দদা—যথারীতি বসেছেন আমার ছবি নিয়ে। আঁকতে আঁকতেই গল্প করেছেন বড়দা যামিনীদা'র সঙ্গে। কিছু সময় কাটিয়ে চলে গেছেন।

বড়দা বার বারই বলতেন, 'নন্দদা আমার ছবিতে একটু হাত দাও'। বড়দাও বুঝতে পারতেন ছবিটা যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। কোথায় যেন একটা অভাব।

একদিন—সেদিন বড়দা খুবই আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন।

নন্দদা আমাকে বললেন,—ঘন করে খানিকটা চাইনিজ ইংক্ গোলো তো, আর কিছুটা ইণ্ডিগো, আমি রং গুলছি, নন্দদা তাকিয়ে আছেন ছবির দিকে।

নন্দদা একটা বড় চওড়া ফ্ল্যাটব্রাশ জলে ডুবিয়ে ছবির নানা অংশে একটু ভিজিয়ে নিলেন। আর একটা চওড়া ফ্ল্যাটব্রাশের ডগা দিয়ে তুলে নিলেন চাইনিজ ইংক আর ইণ্ডিগো পর পর একটা ব্রাশেই, নিয়ে ঘাটের পার ঘেঁষে কয়েকটা স্ট্রোক দিতে দিতে গঙ্গার উপর দিয়ে চলে গিয়ে আকাশে মিশে গেলেন। সন্ধ্যের কালো কালো ঢেউগুলি ঘাটের কাছে এসে ছলাৎ ছলাৎ করে ধাক্কা খেয়ে উঠলো। বড়দা খুশীতে হেসে উঠলেন। নন্দদা হাতের তুলি নামিয়ে রাখলেন।

সে সময়ে আমরা নন্দদা যামিনীদা কত সময়ে কত গম্ভীর কথা বলতেন বাইরে গেছেন, নন্দদা তাড়াতাড়ি তাঁর কাগজে পটের স্টাইলে একখানা ছবি এঁকে রেখে দিলেন। যামিনীদা এসে প্রথমে অবাক হতেন, পরে বুঝতেন, হাসতেন। হেসে ছবিখানা যত্নে পাশে তুলে রাখতেন।

যামিনীদা'র তখনকার সেই সব ছবি দিয়ে আর্টস্কুলে প্রথম যামিনীদা'র ছবির একজিবিশন হয়। বড়দাই ব্যবস্থা করেছিলেন সব। এ কাজটা করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং অতিশয় নিপুণভাবে করতেন। মনে আছে একজিবিশন শেষে যামিনীদা দাগকাটা তাঁর মেঝেতে বসে আছেন, বড়দা এসে একগাদা নোট তাঁর মাথার উপরে পুষ্পবৃষ্টির মতো ছড়িয়ে দিলেন। যাক্—এ' প্রসঙ্গ আলাদা।

এর পর তো আমরা দু'বোনে চলেই এলাম শান্তিনিকেতন।

প্রকাণ্ড বনস্পতি, তার তলায় শালপিয়াল লতাগুল্ম কত কী—সবশেষে একেবারে মাটি ছেয়ে মাটির বুক ঘেঁষে লুটিয়ে আছে ঘাস—সবার স্নেহসিক্ত ছায়া তলে তা'তে ফুল ফোটে লাল নীল হলুদ গোলাপী। ঘাস জানতেও পারেনা কে ফোটালে ফুল। কে দিল তাকে নিরাপদ আশ্রয়।

নন্দদার ছায়ায় আমার ভূমিটুকু চিরকালের মতো পাকাপোক্ত হয়ে রইলো।

মানুষ-নন্দলাল লিখতে হবে—ঘরে ঘরে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার, তবু দূরে যাবো না কোথাও। হাত পাতবো না কারো দোরে। আমার ঘরে যা আছে তা হতেই ধরে দেব যা পারি। তাতেই অনেক হবে।

অজস্র পোস্টকার্ড আঁকতেন নন্দদা, সাদা পোস্টকার্ড কতকগুলি কাছে তাঁর সঙ্গেই থাকতো। চলতে ফিরতে কথা বলতে বলতে তিনি আঁকতেন। এইসব কার্ডের বেশীরভাগ অংশই দিতেন তিনি তাঁর ছাত্র ছাত্রীদের। বিজয়াদশমী নববর্ষে বা বিশেষ বিশেষ দিনে নিয়মিত পেতাম আমরা তাঁর আঁকা কার্ড। চিঠি পত্রও লিখতেন এইরকম কার্ডেই সর্বদা। তাঁর আঁকা কার্ড পাবার আগ্রহে তাঁকে এঁকে কার্ড পাঠাতে আমাদের উৎসাহ ছিল কত।

আমি কলকাতায় থাকাকাল হতেই নন্দদা আমাকে কার্ড এঁকে পাঠাতেন। কখনো তাতে কিছু লেখা থাকতো, কখনো ছবিই কথা বলতো। সেই প্রথম দিকে কলকাতায় একদিন একটা মুরগী এঁ

নন্দদাকে। উত্তরে নন্দদা একটা কার্ড পাঠালেন—রংচেঙে একটা মুরগী ছুটে বেড়াচ্ছে বনে। লিখলেন, এটা বনমুরগী, মেরে খাওয়া হয়েছিল,—ছবিতে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছি। মুরগী বাঁচাতে শিখলে মেরে খেও।

একটি মেয়ে তকলীতে সুতো কাটছে—এঁকে পাঠালাম নন্দদাকে। নন্দদা পাঠালেন কার্ড, কার্ডের মেয়েটিও তক্‌লীতে সুতো কাটছে। আঁচল উড়ছে চুল উড়ছে—হাত নামছে উঠছে—তকলী ঘুরছে ফুর ফুর করে মেয়ে সুতো কেটে চলেছে। দেখে দেখে কেবলি মনে হতে লাগলো আমার মেয়েটি বড় ধীর, সুতো বড় বেশী মোটা। আর এর সুতো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া। চোখে ধরা যায় না—এত মিহি।

এই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার পদ্ধতি। তাছাড়াও যখন যেখানে যেতেন—যোগাযোগ সর্বদা সমান রাখতেন। এই কার্ডের মাধ্যমে তিনি কাছে কাছেই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে যেন না-দেখা জায়গাগুলি দেখে দেখে বেড়াতাম। বুদ্ধগয়ায় গেলেন—এঁকে পাঠালেন, লিখলেন,—এই পাহাড়ে বুদ্ধদেব থাকতেন, আর চারদিকের গ্রামে ভিক্ষা করতেন। এটি নিরঞ্জন নদী।

নদীর বালুরেখায় বুদ্ধদেব চলেছেন পায়ে পায়ে ছাপ, চোখে ভেসে উঠতো।

সুজাতার গ্রামে গেলেন, কার্ড পাঠালেন, এই জায়গাতে সুজাতার বাড়ী ছিল। যেখানে ভগবান বুদ্ধকে তিনি পায়েস খাইয়েছিলেন সেখানে একটা পুরাতন স্তূপের ভগ্ন অংশ পড়ে আছে।

আবার এই কার্ডের লিখনেই কখনো কখনো তাঁর মনের গভীরের একটু আধটু সুর শুনেছি সেইটুকু নিয়ে আজো নাড়াচাড়া করি। লিখেছিলেন একবার, গতকাল মহাত্মাজীর নিকট হতে ফিরলাম। মহাত্মাজী বোম্বের নিকট 'বিথল' বলে জায়গায় ছিলেন। এখান হতে প্রায় কুড়ি দিন ঐখানে ছিলাম। রানী, প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দেখলাম মানুষ তার মধ্যে প্রধান। তার সঙ্গে কেন মনের মিল হল না ? গাছ পাথর আকাশে মন কেন হাহা করে আছড়ে পড়ছে ? এই প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। খোলা আকাশে নিজেকে হারাই। মানুষের অন্ধকার মনে-পথ হারাই।

কথা কয়টি আজো মনের গভীরে গুঞ্জন করে বেড়ায়—কেন এমন

নন্দদা সেবার হাজারিবাগে গেলেন। কার্ড পাঠালেন, লিখলেন, আজ হয়তো আশ্রমে পৌঁছেছ। ভালো আছো তো ? আমি এখানে এসেছি প্রায় একমাস হ'ল, বড় গরম। জলটা ভালো শুনেছিলাম, মন্দ উপকার হয় নাই। তবে বড় শুকনো। পাহাড় জঙ্গল শালগাছ ধুধু করছে। লোকজন চলছে কোনো স্ফূর্তি নাই। কে এদের এমন করে মেরে দিয়েছে ? দেখলে মনটা শুকিয়ে যায়—বড় নিরাশ হ'তে হয়। হাহাকার পড়ে গেছে। অন্ন নাই অন্ন নাই রব।

ছবি আঁকি কান্নার মতো, চোখের জল ধরে রাখা যায় না, ঝরে পড়ে। ইহাতে কাহারো উপকার নাই। উপায়ও নাই বটে।

আশ্রমে গেলে আবার দেখা হবে। নুতন মেস দেখতে পাবো এই আশা নিয়ে ফিরছি। আকাশটা বিধবার সাদা কাপড়ের মতো দেখাচ্ছে, দেখলে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ....

মানুষের দুঃখে নন্দদা যেমন কাতর হ'তেন, প্রকৃতির দুঃখও তাঁকে তেমনি ব্যথিত করে তুলতো, বারে বারে দেখেছি তা'।

নন্দদার কথা কতভাবে বলবো ? তিনি ছিলেন আমার সকল সুখে দুঃখে নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী—আমার বন্ধু।

আমি তখন কলকাতায়, অভিজিতের জন্মসময় ঘনিয়ে আসছে। নন্দদা খুবই চিন্তিত, নন্দদাকে চলে যেতে হ'ল ফৈজপুরে—কংগ্রেস অধিবেশনের তোরন সাজাতে। সেখান হতে কেবলই কার্ড, পাঠাতেন আমার স্বামীকে—'রানী কেমন আছে' 'রানীর খপর দিবে' 'রানীর 'খপর' যেন ঠিক সময়ে পাই'। অভিজিতের জন্মের খবর পেয়ে লিখলেন—'শুভ সংবাদ পাইয়া বড় খুশী হ'লাম। দীর্ঘজীবী হোক—সুখে থাকুক—আমার আশীর্ব্বাদ'। সেই কার্ডটিতে এঁকে ছিলেন শিশু বুকে আঁকড়ে নিয়ে বসে আছে ওখানকারই একটি পাহাড়ী মেয়ে।

অভিজিতের নামকরণ হয়ে যাবার পরও তাকে তিনি কখনো 'গুগুা', কখনো 'খোকন' কখনো বা 'বাচ্চা' বলে উল্লেখ করতেন। তার জন্য আলাদা করে কার্ড পাঠালে তাকে 'জেঠু' বলে সম্বোধন করতেন। এই 'জেঠু' সম্পর্ক নিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। নন্দদাকে অভিজিত আমার সম্পর্ক নিয়ে 'মামা' বলবে, কি, স্বামীর সম্পর্ক নিয়ে 'জেঠু' বলবে। স্বামীই জিতলেন শেষটায়—তাঁর কথার জোর বেশী। নন্দদা হেসে তাঁর দিকটাই মেনে নিলেন।

কলাভবনে—নন্দদা যেখানে বসে ছবি আঁকেন সেখানে। নন্দদা ছবি আঁকা থামিয়ে অভিজিতকে কোলে বসালেন। বসিয়ে রঙভরা তুলি তার মুঠিতে ধরিয়ে সেই 'মুঠি' নিজে মুঠো করে চেপে ধরে কাগজে কাগজে ছবি আঁকালেন। নন্দদার ডেস্কের পাশে একটা স্লেট আর স্লেট-পেন্সিল থাকতো। সেই পেন্সিল ধরিয়ে স্লেটের এ'পিঠ ও'পিঠ এঁকে ভরিয়ে দিলেন। আমি বসে বসে দেখলাম।

অভিজিত পাঁচমাসে পড়তে আমি তাকে নিয়ে শিলচরে শ্বশুরালয়ে গেলাম। গুরুদেব সেবার গরমে গেলেন আলমোড়ায়। আমার স্বামী ও গেলেন সেই সঙ্গে।

আশ্রমে ফিরবার আগে শিলচরেই অভিজিতের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করলেন গুরুজনরা, নন্দদা খবর পেয়ে কার্ড পাঠালেন,—'খোকার অন্নপ্রাশনে একটা বাজিয়ে পাঠালাম'। উল্টোপিঠে লিখলেন 'খোকনের অন্নপ্রাশনে আমার আশীর্বাদ পাঠালাম। দীর্ঘজীবী হয়ে তোমাদের ও সকলের আনন্দবর্ধন করবে। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে ও আরটিস্ট হবে। ভগবান করুন ও যেন একটা বড় আরটিস্ট হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে'।

অন্নপ্রাশনের সময়ে একটা থালায় সোনা রূপো বই কলম মাটি ধান নানা—কিছু সাজিয়ে শিশুর সামনে ধরার রীতি, শিশু কোন জিনিসটি হাত বাড়িয়ে আগে তুলে নেয়। সেই তুলে নেওয়া দ্রব্যই নাকি ইঙ্গিত দেয়, বড় হয়ে শিশু বিদ্বান হবে, কি, ভূমি সম্পত্তির অধিকারী হবে, কি, প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে।

আমি সে সময়ে চেয়েও দেখিনি— অভিজিত তার মুঠিতে কি বস্তু তুলে নিল। আমার চোখে ছিল নন্দদার শক্ত মুঠির ভিতর একখানি কচি কোমল মুঠি—সে মুঠিতে নন্দদারই তুলিটি ধরা।

নন্দদার স্নেহ মমতার কথা মুখে বলা যায়না। অতলের তল কি ধরতে পারা যায় এই হাত দিয়ে?

আমার স্বামীর জ্বর হ'ল। এ' অনেকদিন আগের কথা। অভিজিত তখন দশ মাসের শিশু। তিন দিনের দিন ডাক্তারবাবু বললেন, ভালো দেখছি না, কলকাতায় নিয়ে চলুন, কলকাতায় নিয়ে এলাম। প্রবল জ্বর। পাঁচদিনের দিন থেকে প্রলাপ বকতে শুরু করলেন। ডাক্তাররা বললেন 'টাইফয়েড'। তখনকার দিনে টাইফয়েডের ওষুধ এখনকার মতো ছিল না। ধরতে গেলে কেবল শুশ্রূষা উপরই রাখতে হত রোগীকে। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় চিকিৎসা করছেন, সেবা করছি আমি। অন্য কাউকে দিয়ে হবে না। ঐ জ্বরের ঘোরেও আর কেউ তাঁর সেবা করলে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। ডাঃ কুমুদশঙ্কর চেয়েছিলেন পাকা নার্সের ব্যবস্থা করতে। ব্যাপার দেখে বললেন—থাক।

সাতচল্লিশ দিনে ছাড়লো সেই জ্বর। শান্তিনিকেতনে নন্দদা রথীদা—সবাই চিন্তিত। গুরুদেবের সেই সময়ে ইরিসিপ্লাস হয়—তাঁকে নিয়ে সকলে উদভ্রান্ত। তারই মধ্যে নন্দদা নিয়মিত খবর নিতেন—লোক পাঠিয়ে, চিঠি দিয়ে, নানা প্রকারে। লিখতেন—অনিলের জন্য আমরা সকলেই—বড় চিন্তিত আছি। প্রত্যেক ডাকে তার খপরের জন্য আমরা উদগ্রীব থাকি।

আমি প্রথম থেকেই নিয়মিত আমার স্বামীর খবর দিয়ে গুরুদেব রথীদা নন্দদা—ওঁদের একজনকে রোজ চিঠি দিয়ে যাচ্ছি। সেই চিঠিতে সবাই খবর জানতে পারতেন। মাঝখানে একবার আমার স্বামীর অবস্থা খুবই খারাপ হল। সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল আশ্রমে। সকলের আশঙ্কা উদ্বেগ, আমার আতঙ্কগ্রস্থ মন—সব মিলিয়ে যেন আসন্ন এক প্রলয়ের দিন—মনে হয়েছিল সেই দিনটায়।

ধীরে ধীরে ওঁর অবস্থা একটু ভালোর দিকে মোড় ফিরলো। সবার মনে আশা ফিরে এলো। নন্দদা লিখলেন, 'অনিল যে সুস্থ হয়ে উঠছে তাতে
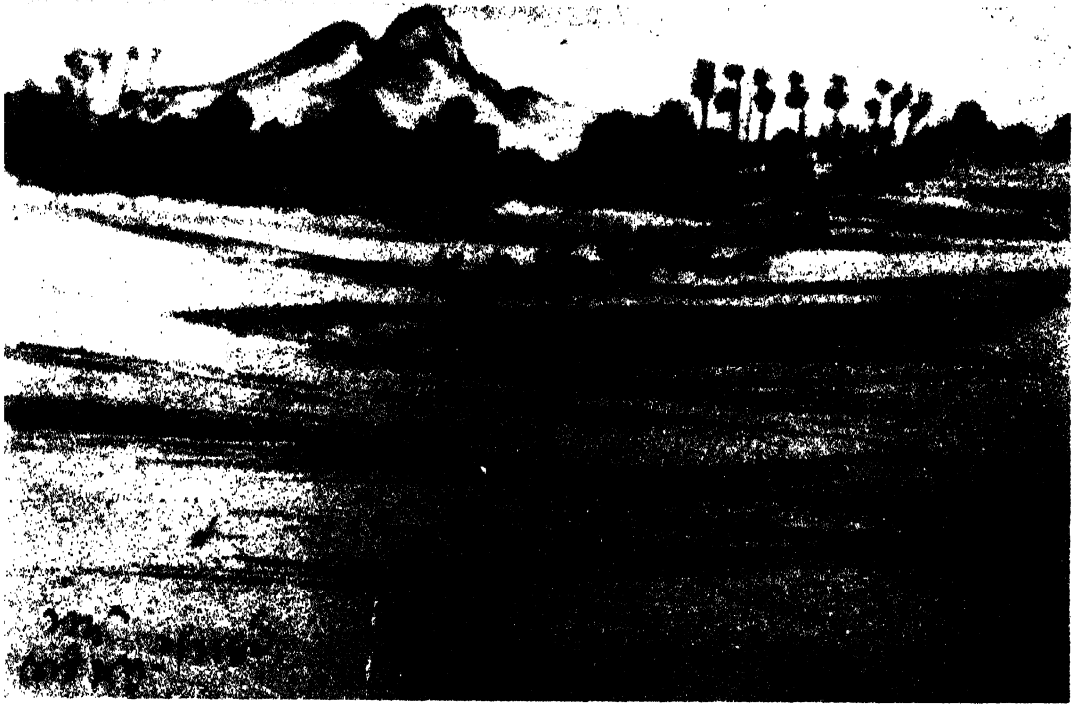
আমাদের কত স্বস্তি হচ্ছে তা বলবার নয়'।

এ'কয়দিন নন্দদা আমাকে কার্ড পাঠাননি পত্র লেখেননি। তাই লিখলেন,—'আমি পত্র দিই নাই দু'টা কারণে। ভগবানের দোহাই দিয়ে তোমায় আশ্বস্ত করবো তা'ভালো লাগে না। ...আমি পত্র দিলে তুমি আশ্বস্ত হবে তা' আমি জানি, কিন্তু আমি কেন নিশ্চিন্ত আছি জানো? কারণ নির্মল তোমার পাশে আছে। তাঁকে আমি সর্বরকম দায়িত্বের উপযুক্ত বলে জানি। তিনি আমাদের সকলের হয়ে অনিলের সেবা করছেন।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না, অনিল শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠবে—এ'আমার আন্তরিক আশীর্বাদ।'

এই সময়ে নন্দদা আমাকে একটি কার্ড পাঠিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে।—ঝরে পড়া অশ্বত্থপাতা রোদে জলে সবুজের সব অংশটুকু ধুইয়ে কেবল জালিটুকু নিয়ে পড়ে থাকে তলায়, সেই একটি অশ্বত্থপাতার জালি কার্ড আটকে চারদিকে কালো লাইনের নক্‌শা এঁকে মধ্যে খানটায় দু'টি কচি সবুজ পাতার ডগায় লাল হলুদ পাপড়ির একটি ফুল জ্বলজ্বল করছে।

চিঠিতে যা লিখলেন তার শত শত গুণ আশীর্বাদ পাঠালেন তিনি এই অশ্বত্থ পাতায় ধরে দিয়ে। নিরস নিষ্প্রাণ শুকনো পাতার জালির বুকে আবার রঙে রসে প্রাণ ফিরে আসবে, ফুল ফুটবে। বললেন 'ভয় নেই—আবার সব হবে'।

আমার স্বামী দিনে দিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন। যত সুস্থ হচ্ছেন ততই যেন তাঁর রাগ বাড়ছে। দেহ শুকিয়ে চারভাগের একভাগ, কঙ্কালসার মূর্তি। হাল্কা। আমিই দু'হাতে তুলে বালিশে ঠেস দিয়ে খানিক বসিয়ে দিই—আবার তেমনি করে তুলে শুইয়ে দিই। ভার নেই দেহে। এ'অবস্থায় ভালো করে রাগতেও পারেন না, দু'তিন সেকেণ্ডের জন্য রাগটা হয়, রাগটা হয়েই থামতে আরম্ভ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন। খুব সামলে থাকতে হচ্ছে তাই।

নন্দদা'র যত ভাবনা ওঁর জন্য, তা'র চেয়ে বেশী ভাবনা যেন আমার জন্য। বারে বারে লেখেন, 'খুব সাবধানে চলা চাই। সেবার যেন ত্রুটী না হয়। দুর্ব্বলতার দরুণই অনিলের রাগ বেড়েছে। তুমি কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকবে'।

আমার স্বামী আরও একটু সুস্থ হলেন। নন্দদার চিঠি পর পর আসে। লেখেন, কর্তার মেজাজ কি একটু নরম হল? তা'কে বোলো—'বোঙ্গার' পূজাটা এবারে নিশ্চয়ই দেব।

'বোঙ্গা' সাঁওতালদের দেবতা। হাড়িয়া-মাংস পূজোর উপকরণ, প্রসাদও তাই। এই কারণে বোঙ্গার পূজার লোভ দেখাতেন নন্দদা। এটা ওঁরা কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন।

স্বামী যখন একটু ভালো থাকতেন—নন্দদা'র চিঠির এই খবর টুকুই দিতাম। হাসতেন। নন্দদা বলেছিলেন তুমি ভালো হয়ে ওঠো, 'বোঙ্গা'র পূজো দেবো।

কিছুদিন বাদে নন্দদা এলেন, আমার হাতে কিছু ফুলবেলপাতা দিয়ে বল্লেন—'চুপি চুপি এটা অনিলের বালিশের তলায় রেখে দিও। কাউকে বোলো না কিছু'।

আমার স্বামী ভালো হয়ে উঠছেন, নন্দদা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পূজো দিয়ে এসেছেন। তারই আশীর্বাদী পুষ্প বিল্বপত্র দিয়ে গেলেন সেদিন।

নন্দদা মুখে কোনদিন বলতেন না তেমন কিছু। ঐ ছবির জগতেই ফাঁকে অবকাশে নিজেকে একটু ছেড়ে দিতেন। ঐ একটুতেই যোগাযোগ গভীর হতে গভীরতর হত।

তখন গুরুদেব আমাদের নিয়ে চন্দননগরে আছেন। শ্যামলীবাড়ি পুরোপুরি মেরামত হলে ফিরে আসবেন। মাটির বাড়ি নতুন এক্সপেরিমেণ্ট, মেরামতের প্রয়োজন হয়। নন্দদা ছবির পাশে পাশে লিখে পাঠান—'শ্যামলী মেরামত হয়ে গেল, গুরুদেবকে নিশ্চিন্ত থাকতে বল।'

আসতে লিখেছ, আর কোথাও নড়তে ইচ্ছা নাই। তোমারা কতদিন থাকবে—লোভও হচ্ছে। অবসাদ এখনও ঘুচে নাই। জানি চিন্তা করে ফল নাই, চিন্তা করা অভ্যেস হয়ে গেছে মাত্র। পশ্চিম আকাশ কালো মেঘে ভরে গেছে, গুরু গুরু ডাকছে, বৃষ্টি হবে বোধহয়। চোখ জলে ভরে আসছে আনন্দে না অভিমানে। ভগবানের উপর অভিমানও হয়, ভালোও লাগে, —এ বড় অদ্ভুত।'

নন্দদা দূরে কোথাও গেলে অত কাজের মধ্যেও সেখানকার কাজকর্মের কথা লিখে জানাতে ভুল হত না কখনো তাঁর। ফৈজপুরে মহাত্মাজীর ডাকে গেলেন, কত কাজ—কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত ডেকোরেশনের ভার তাঁর উপরে। নতুন ধরনের করতে হবে সব। লিখলেন—আমাদের কাজ শেষ হতে আর তিন চার দিন লাগবে। আজ সকালে মহাত্মাজী এসেছিলেন। আমাদের কাজ দেখে অত্যন্ত খুশী

হলেন। বললেন, 'এই ত চাহ্‌তা থা,—খুব সিম্পল আওর সুন্দর হ্যায়।' প্রথমেই দেখে বললেন, 'ফঁস গ্যা হ্যায় ?'

এবারে গেটের নামগুলি এইরূপ হয়েছে,—'শিবাজীতোরণ', 'ঝাঁসিরাণীতোরণ', 'সুভাষতোরণ', সেনাপতি বাপট তোরণ' (?) 'শোলপুর শহীদতোরণ' (?) 'সর্বজনিক কাকা'—ইত্যাদি। পরে গেটগুলির ছবি পাঠাবো। ....

আমার স্বামী ছিলেন কৌতুক রসে ভরপুর, নন্দদার সঙ্গেও ছিল তাঁর এই রসেরই সম্পর্ক। নন্দদা এটা উপভোগ করতেন, ভিট্টলনগরে কংগ্রেস অধিবেশনের গেট তৈরী হচ্ছে কার্ডে এঁকেছেন, নন্দদা ভারার উপর উঠে বসেছেন, ভিতরে গাধারা ঢুকে নিশ্চিন্ত মনে চড়ে বেড়াচ্ছে। পাশে লিখেছেন, অনিল—গেটের খপর ইহারা জানে না, এবং নন্দলালকেও চেনে না।পরে এখানে কড়া পাহাড়া বসবে, টিকিট লাগবে।

আর একটা কার্ডে—এই কার্ডটা কোথা থেকে এসেছিল বুঝতে পারছি না—কতকাল আগের কথা। পেন্সিল কালি সবই ঝাপসা হয়ে যায়। মনও।

লিখেছেন, 'অনিল—এ'এক অজীব দেশে আছি। এদের পাগড়ি ও জুতাই সর্বস্ব। কথা খানিকটা ওড়েদের মতো। বড় কঠিন জাত, শোলমাছের প্রাণ। মাছ মাংস খাওয়ার নামও পর্যন্ত করবার জো নাই। গান যে কি জিনিষ এখানে এসে বুঝলাম। তবে একটা হাটে ইহাদের লাইফটা টের পাওয়া গেল। বেশীরভাগ মেয়েরা হাট করে। খুব বেচাকেনা, নানারকম শস্য জোয়ারীর কামিনী ধান, গুড়ের জিলাপী, ঝুলুবি। ১৮ হাত মারাঠী শাড়ি আর নাগরা জুতা। হাতে গড়া বড় বড় মোটা হাঁড়ি। মেয়েরা কাছা দিয়ে ধাক্কা মেরে চলে। পুরুষরা পাগড়ি বেঁধে ৬ সেরি নাগরা পরে গোঁপে তা'দিয়ে হড়বড়র করে চলে। ইত্যাদি। আমার কাজ এবার আর্টিস্টের নয়, গ্রাম রচনার। আমার অবস্থা যেন জল হতে মাছকে ডাঙায় তোলা হয়েছে।

রামলীলাটা এখানে আনতে ইচ্ছা করি। মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছি। নিয়ে আসাটা ভালো হবে কি ? গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করো।'

গুরুদেব মংপুতে আছেন, সঙ্গে আছেন আলুদা ও আমার স্বামী। স্বামী সেখানকার খাবার বিবরণ দিয়ে বোধ হয় চিঠি লিখেছিলেন নন্দদাকে। নন্দদা লিখলেন, 'অনিল তোমাদের খপর পেলাম। দেখ, আলুতো কুমড়ো হয়েছে—যেন কুমড়োপটাস না হয়ে যায়। তোমায় কিরূপ দেখাবে ফিরলে পরে, তাই বসে বসে কল্পনা করছি। একটা কল্পনা করে ছবি এঁকে পাঠাবো। ....এখানে আমরা তো মোমবাতির মতো গলছি গরমে। ব্রীজ ক্লাব চলছে এয়ার টাইট কম্পার্টমেন্টে। সুধাকান্ত টাক ভুঁড়ি ও দন্ত খুলেই বেড়াচ্ছেন ধীর পদবিক্ষেপে। বিনোদকে মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কিঙ্কর একেবারে গলা খুলে ফ্রেঞ্চ-সঙ্গীত করছে আশ্রম প্রতি ধ্বনিত করে। আর সব ভালো'।

বিদ্যা বলে কলাভবনের একটি মেয়ে মজঃফপুর থেকে কিছু লিচু পাঠিয়েছিল নন্দদাকে, আমার স্বামীর জন্যও কিছু দিতে বলেছিল, স্বামী তখন আলমোড়ায়। লিচু পাঠানো সম্ভব নয়।

নন্দদা কার্ডে কয়েকটা লিচু আঁকলেন। লিচুর গায়ের আঁশ আঁকতে আঁকতে কৈ মাছের আঁশ মনে পড়লো। রসালো লিচুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেটমোটা একটা তেলভরা কৈ মাছ আকলেন। এঁকে আমার স্বামীকে পাঠালেন পাহাড়ে। লিখলেন—'বিদ্যা তোমাকে লিচু দিতে বলেছিল—তাই পাঠাচ্ছি, কৈমাছটা ফাউ।'

সেই তেলভরা কৈ, রসেভরা লিচু আজো তেম্‌নি আছে—এ'কি শুকোয় কখনো, না—পচে নষ্ট হয় ?

এইভাবে নানা রকম কৌতুক রসিকতার আদান প্রদান হত এঁদের দু'জনের মধ্যে।
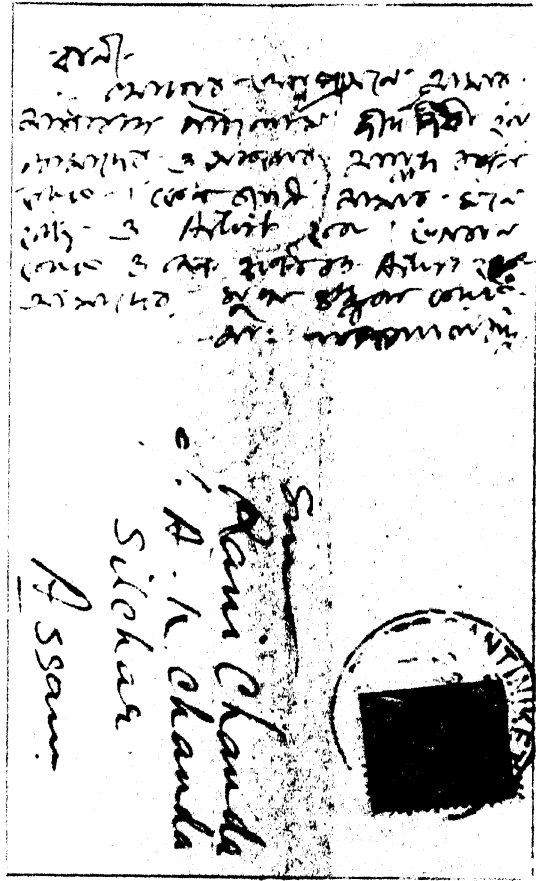
এ'সব কথা কাহিনীর শেষ নেই। সেই সব মজারই কি শেষ ছিল?

শিশু অভিজিতের চারমাসে দাঁত উঠেছিল সত্যিই, কিন্তু সাতমাসেই নাকি সে কথা বলতে পারছে এইরকম একটা খবর আমার স্বামী দিয়ে থাকবেন নন্দদাকে। নন্দদা লিখলেন, খোকার দাঁত ওঠার কথা শুনেছি কিন্তু কথা ফোটাটা আশ্চর্য্যের নয়, (অর্থাৎ কা'র ছেলে দেখতে হবে তো?)

একদিন কলাভবনের দু'টি ছাত্র মস্তবড় সুদৃশ্য একটা প্যাকেট নিয়ে এলো—রঙীন কাগজে মোড়া। বললো—মাষ্টার মশায় পাঠিয়েছেন আমার স্বামীর জন্য। কি আছে ভিতরে? স্বামী উত্তেজিত, না জানি কি শিল্প সম্ভার পাঠিয়েছেন মাষ্টারমশায়। খুলে দেখা গেল একটা ভাঙা মোড়া। সঙ্গে একটি চিরকুটে লেখা, অনিল, এই মোড়াটি পাঠালাম, ইহার অবস্থাটা দেখ। এরজন্য তোমায় খেসারত দিতে হবে। কে ইহার জন্য দায়ী—রানী জানে।

ঘটনাটা হ'ল—একটা ভাঙা মোড়া পড়ে ছিল কলাভবনের বাইরে। নন্দদা বললেন, 'রানী একটু বোসো তো ঐ মোড়াটায়'। বসলাম, বসেই উঠে পড়লাম। নন্দদা আর যারা ছিলেন কাছে—হেসে উঠলেন। পরিকল্পনাটি নন্দদা'র আগে হ'তেই তৈরী ছিল। আমি ভারী মানুষ যেন আমার বসাতেই মোড়াটার এই অবস্থা হ'ল। স্ত্রীর সকল দায় তো স্বামীরই। স্বামীকে একটু জব্দ করবার কৌশল ছিল এটা।

নন্দদা তখন ভিট্টলনগরে। আমার স্বামীর হাতে 'আঁকা' বলে কিছু আসতো না। আঙুলের কাজ বলে কিছু জানতেন না তিনি। একবার গুরুদেব তাঁকে একটা পেন্সিল কাটতে দিয়েছিলেন হাতের কাছে আর কেউ ছিল না বলে। আমার স্বামী পেন্সিলটা যত কাটছেন তত শীষ ভাঙছেন। ভাঙতে ভাঙতে পেন্সিলটার যখন চার আঙুল বাকী, গুরুদেব বললেন,—'রেখে দে, আর কাটতে হবে না তোকে। প্রতিজ্ঞা কর আর কোনদিন তুই হাত দিবি না আমার পেন্সিলে।

স্বামী ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আজ্ঞে না'। বলে পালিয়ে বাঁচলেন।

এ'হেন লোক কলমে পেন্সিলে নয় ছোট্ট একটা মুখের মতো আঁকা করলেন একদিন একটা কার্ডে। তাতে বিরাট গোঁফ জোড়াটাই হল প্রমিনেন্ট। কার্ডখানা নন্দদা'কে পাঠিয়ে দিলেন ভিট্টলনগরে,—যে, আপনার একটা পোর্ট্রেট এঁকে পাঠালাম।

দিন কয়েক পরে নন্দদা একটা খাম পাঠালেন ওঁর নামে। খামের উপরে লেখা 'সাবধান'। খুলবার সময়ে ভিতরের পুরিয়াগুলি পরে খুলবে।

এ'কে খামে চিঠি—যা নাকি নন্দদা করেন না বড়ো—তার উপরে 'সাবধান' ইত্যাদি লেখা, কি ব্যাপার? পুরিয়াই বা কিসের?

পুরিয়াতে ছিল দু'টা 'কিসু'। নন্দদা লিখেছেন 'একটা তোমার মাথায় ছাড়বে, তা হলে ঐরূপ গোঁফ আরও বিস্তর গজাবে, আর একটা গুরুদয়ালকে দিবে—তাহার দাড়িতে ছাড়বেন। তা হলে তাহার দুঃখটা যাবে'।

নন্দদা একবার কী সুন্দর একটি নকশার বাড়ি এঁকে পাঠিয়েছিলেন 'চা চক্রের' জন্য। লিখেছিলেন একটা 'চা চক্রের' নকশা করে পাঠালাম, পঞ্চাশ জনের মতো জায়গা হবে। এটা অজন্তার পাহাড়ের একটা গুহা দেখে মাথায় এসেছে'।

দিনদা'র নামে ভালো করে একটা চা চক্রের বাড়ি বানাবার কথা হচ্ছিল তখন কিন্তু কেন যে এই নকশাটা না হয়ে এখন যেটা আছে সেটা হ'ল বলতে পারছি না। এটি হলে বড় সুন্দর হ'ত। যেন মাটি থেকে ঘরে ঢুকছি ঘর হতে বাইরে আসছি। দুই-ই-একে অন্যের অতি কাছাকাছি।

কলাভবনের ছাত্র ছাত্রীরা ছিল নন্দদার প্রাণ, অপরিসীম স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে তিনি ঢেকে রাখতেন তাদের। সেখানে আলোময় সব

অনিল চন্দ ও নন্দলাল

দায় ছিল তাঁর নিজের। কলাভবন নিয়ে কেউ কোনো কথা বলতে সাহস করতেন না। গুরুদেবও কোনদিন সেখানে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নি। সেটা ছিল একান্তভাবেই নন্দদার তল্লাট।

তখন শ্রীভবনে পরিচালনার ভার নিয়ে আছেন ফরাসী ভদ্রমহিলা মিস বস্‌নেক। গুরুদেবই আনিয়েছিলেন তাঁকে। সুরুচি সম্পন্ন মহিলা, আভিজাত্য তার চলনে বলনে। সকলের কাছেই প্রিয় ছিলেন তিনি। সবাই ভালোবাসতো তাঁকে, না বেসে উপায় ছিল না, এত মধুর ছিলেন, সকল দিকে। শ্রীভবনের মেয়েদের তিনি 'দিদি',—তাদের নিয়ে শান্তিতে আছেন বসনেক।

একটি মেয়েকে নিয়ে এক সময় গোলমাল ঠেকলো একটু। মেয়েটি কলাভবনের ছাত্রী। নন্দদাকে বললেন। কি বললেন বস্‌নেক্, কি বুঝলেন নন্দদা—দু'জনের কেউ কিছু জানলেন না, জানলেন এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়ে গেল। ভুল বোঝাবুঝি হল।

বস্‌নেক্ রিজাইন করলেন।

'বিট্ঠলনগর' থেকে নন্দদার ডাক এসেছে, নন্দদা বিট্ঠলনগরে চলে গেলেন।

বস্‌নেক্ চলে যাবেন, কারো কিছু করার নেই। করার উপায়ও নেই। প্রাণে আমার বড় বাজলো। লোক আসে, লোক যায়। কেউ আপনা হতে যায়, কাউকে যেতে হয়। নিয়ম সংসারের। মিস বস্‌নেকও যাবেন যান, কিন্তু আমার নন্দদা—তাঁর উপর অভিমান করে কেউ আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে—তা হয় কি করে?

কাউকে না জানিয়ে নন্দদাকে চিঠি দিলাম।

উত্তরে নন্দদা লিখলেন পাঁচ পাতার এক চিঠি। লিখলেন, তোমার পত্রে সব জানলাম। হাঁ, আসবার আগে বস্‌নেকের সঙ্গে কিছু গোলমাল হয়েছে, সেটা আমিও হজম করতে পারিনি।

গোলমালটা যে এত জটিল আকার ধারণ করবে জানি নাই।

গোলমালটা ব্যাখ্যা করা দরকার। এটা ঝগড়া নয়, বচসা নয়, রাগারাগি নয়। ....হাঁ বলতে পারো অফিসিয়াল তর্ক মাত্র।

আর একটি কথা তিনি ইংরাজি ভালো বোঝেন না, তার উপর আমার ইংরাজি—আবার একটু গরম হলে হর্ষি দির্ঘী থাকেনা। তা'হলে ভাষার দোষ বলতে পারো।

আসবার আগে শুনলাম বস্‌নেক্ রিজাইন করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু আমি তো কাহাকেও ঐকথা ঘুণাক্ষরে জানাই নাই। ....তবে হয়েছে কি এখন বুঝতে পারছি উনি আমার উপর অভিমান করেছেন, কারণ আমি উহাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম এবং খুব স্নেহও করতাম। হঠাৎ আমার নিকট গরম গরম কথা শুনে ঘাবড়ে গেছেন। তুমি বসনেক্‌কে বোঝাবে আমার উহার প্রতি একটুও বিরক্তি নাই এবং কোনরূপ মনে সেজন্য দাগও নাই। ....

তুমি জানো আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদের কাহারো বিষয় খারাপ ধারণা কল্পনাও করতে পারি না। তাহার উপর ছাত্রীদের বিষয় তো কথাই নাই। ....

আমি কখনো শাসন করে কাহাকেও শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী নই। ভালোবাসার উপরই আমার সব শাসন রক্ষিত, অন্তত: এইটাই আমার আদর্শ। ....

আসবার সময় যখন বসনেক কে বাস হতে দেখলাম, মনে হল তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি। আমার দিকে উনিও একটু এগিয়ে এসে চলে গেলেন। কেহই কাছাকাছি হতে সাহস করি নাই। তুমি এই কথা লিখে খুব ভালো করেছ। ....

তুমি জানো আমি কাহাকেও আঘাত করলে আমার ছবি পর্যন্ত আঁকতে পারি না। মনটা খারাপ হয়। ....

বস্‌নেক্ আমার জন্য ছাড়িয়া যাবেন এই কথাটা আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে।

আমি রথীবাবুকেও একটা পত্র দিচ্ছি যাতে তাঁকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন, অন্ততঃ আমার সহিত তাঁহার কোনরূপ মনোমালিন্য নাই এই বলিয়া। ....তুমি অনিলকে বল আমার পত্রটা ধীরভাবে ভালো করে যেন বস্‌নেক্ কে বুঝাইয়া দেয়, এবং আমি যে তাহাকে আঘাত করার জন্য কত দুঃখিত তাহাও বলে। ....

আমার পত্রটা তুমি, অনিল ও বস্‌নেকের ভিতরেই থাকলে ভালো হয়।

এর পরের বারে এখানকার কথা লিখবো। বস্‌নেক্ কি বললেন লিখ। আশাকরি তিনি ছেড়ে যাবেন না!'....

এরপরও কি আর মনে কোনো দুঃখ অভিমান থাকে? না, বস্‌নেক্ আশ্রম ছেড়ে গেলেন না। রথীদা ও আর সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বস্‌নেক্ থেকে গেলেন দেখে গুরুদেবও খুব খুশী হলেন।

কলাভবন আমার বড় প্রিয়স্থান। কলাভবন ছাড়া হয়ে আছি এ'কথা ভাবতেও পারতাম না। বিয়ের পরেও বরাবর কলাভবনের পিকনিক যখন যেখানে হত—নন্দদা আমাকে ডেকে পাঠাতেন। ঐ এক ডাক—'রানী এসো'।

মাঝে মাঝে একটু রসিকতাও করতেন। একদিন একটা কার্ড রেখে গেলেন ঘরে, আমি ছিলাম না বাড়িতে, কার্ডে আঁকা—মা—গাধার পায়ে দড়ি বাঁধা, পিঠ ঘেঁষে তার বাচ্চা গাধা। নন্দদা লিখে গেছেন 'রানী আজ 'আমার কুঠিতে' পিকনিক, আসতে পারবে কি?'

পারবো না আবার? কয়মাসের শিশু আমার মার বাড়িতে মার কাছে দিয়ে চলে গেলাম—মাইল তিনেক দূরে 'আমার কুঠি'তে। নন্দদা ডেকেছেন না গিয়ে পারি?

স্বামী-পুত্র নিয়ে পাত্রা ঘরসংসার আমার, সব সময়ে কলাভবনে যেতে পারি না। বাড়িতেই ছবি আঁকি, নন্দদা এসে এসে দেখে যান। কিন্তু কলাভবনে নিয়মিত না যাওয়ার দুঃখটা থেকে যায়। নন্দদা কি ছবি আঁকছেন কাছে বসে দেখতে পাই না। বড় বড় ছবি আঁকলে স্লিপ লিখে আমাকে ডেকে পাঠান—'রানী এসো'। বরোদার মন্দিরে দেয়াল চিত্র আঁকবেন, পুরো ছবিটা এঁকেছেন আগে কাগজে, আমি তখন ছিলাম না আশ্রমে। বরোদায় যাবার আগে একদিন স্লিপ পাঠালেন, 'রানী কলাভবনের মিউজিয়ামে একবার এসো। বরোদার কার্টুনটা পাক করা হবে'। ছুটে গেলাম। আমি জানতাম নন্দদা আমাকে ডাকবেনই। বড় বড় ছবি যখন আঁকবেন আমাকে ডাকবেন। কাছে থেকে তাঁর আঁকা দেখাতে ভালোবাসি—তিনি জানতেন। তাই তাঁর ডাক পেয়ে সংসার ফেলে আমিও ছুটতাম বারে বারে। একবারই শুধু ব্যর্থ হয়ে ছিলাম।

চীনভবনে নন্দদা 'নটীর পূজা' ফ্রেস্কো করবেন, যেদিন শুরু করবেন সকালে আমাকে ডেকে পাঠালেন স্লিপ লিখে, আজ চীনভবনে ফ্রেস্কো শুরু করবো, তুমি এসো।

রান্না করছিলাম, কড়াই সমেত আধসেদ্ধ তরকারী নামিয়ে রেখে ছুটে গেলাম। চীনভবনের বারান্দা জুড়ে মাচা বাঁধা হয়েছে। নন্দদা ততক্ষণে মাচার উপরে উঠে গেছেন, আমিও উঠতে যাবো, তলা হতে বাধা পেলাম। নন্দদা জানতে পারলেন না কিছু। দুঃখে বুকের ভিতরে ভরা নদী উপচে উঠলো, কোনোমতে নিজেকে লুকিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। নন্দদা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বেশ কিছুদিন সে মুখে আমার প্রতি প্রসন্নতা দেখিনি। তিনি ডেকে পাঠালেন—আমি গেলাম না,—অভিমানে আমিও কোনদিন বলতে পারলাম না—'নন্দদা' আমি এসেছিলাম।

নানাভাবে নন্দদার আশীর্বাদ দিনে দিনে গড়ে তুলেছে আমাদের।

একবার—তখন ইউসুফ মেহের আলী আমাদের বন্ধু, হৃদরোগে আক্রান্ত, কয়েক বৎসর যাবৎ,—তবু তার মনের জোয়ারে ভাটা পড়তে দেখিনি কখনো এতটুকু। সে সময়ে কিছুকাল এসেছিলেন আমাদের কাছে কোনার্কের বাড়িতে। নন্দদা খুবই স্নেহ করতেন তাঁকে। প্রায়ই আসতেন, তাঁর ঘরে বসে থাকতেন। গাইয়ে কোনো মেয়ে পেলে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন, তাকে দিয়ে গান গাইয়ে শোনাতেন।

একদিন—আমি ছিলাম না বাড়িতে সব কাজই তো নিজেদের করতে হত, হয়তো বাজার করতে গিয়েছিলাম বোলপুর, মেহের আলী আছেন—ভালোমন্দ রান্না করে খাওয়াতে হয় একটু। রিকশা তখন ছিল না এখানে, হেঁটেই যেতে আসতে হল—দেরী হয়ে গেল। ফিরে এলে মেহের আলী বললেন,—নন্দবাবু তোমার জন্য একটা পেন্সিল ড্রইং রেখে গেছেন—ঐ টেবিলের উপর আছে, দেখ। ড্রইংটি হাতে নিয়ে আনন্দে আমার দুচোখ জলে ভরে গেল। সেটি হাতে নিয়ে বারে বারে মাথায় ঠেকাচ্ছি, মুখে হাসছি,—আর দু' গাল বেয়ে চোখের জল টসটস করে ঝরে পড়ছে। মেহের আলী তো অবাক। বলে, ছোট্ট একটা পেন্সিল ড্রইং—কী পেলে তুমি তাতে?

সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। ড্রইংটি ছিল, সাদাসিদে আটপৌরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন ঘরেরই মেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, আর পাশে খোলা অংশে আজকালকার মেয়ের মতো শাড়ি পরা একটি মেয়ে—যেন বাইরের জগতের মেয়ে সে,—দুই মেয়ে এক হয়ে আলিঙ্গন করছে একে অন্যকে। বললাম, দেখ। নন্দদা আশীর্বাদ করেছেন—'ঘর বাইরে তোমার এক হয়ে যাক'।

সেদিন সারাদিন মেহের আলী বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু'হাতে ছবিটি নিয়ে দেখতে লাগলেন। খাইয়ে দাইয়ে দুপুরের সব কাজ সেরে যখন আমি তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে আমাদের শোবার ঘরে যাচ্ছি—তখনো দেখি চিত হয়ে শুয়ে মেহের আলী বুকের উপর ড্রইংটি ধরে দেখছেন একমনে।

পরে বলেছিলেন, দেখতে শিখলাম ছবি এতদিনে।

এমনিতরো এক বিশেষ দিনে নন্দদা রেখে গিয়েছিলেন আমার টেবিলের উপরে জাপানী সিল্ক মাউন্ট করা একটি বোর্ডে তাঁর ডান হাতের একটি ছাপ—লালরঙে। সেটি আমার চিরকালের অভয়বাণী।

নন্দদার সঙ্গে ছিল আমার আলাদা এক ঘরসংসার।

নন্দদার সঙ্গই ছিল শিক্ষা। চলতে চলতে কত শেখাতেন, কত দেখাতেন। কত রেখা কত ছন্দ যেন নৃত্য করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। আমাদের বোজা চোখ দুটোকে যেন টেনে টেনে খুলে দিতেন।

নন্দদা তো শুধু শিক্ষাগুরু ছিলেন না। তিনি দীক্ষাগুরুও ছিলেন।
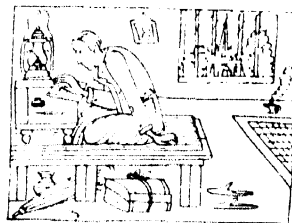
পোস্টকার্ডে অঙ্কিত চিত্রগুলি লেখিকার কাছে বিভিন্ন সময়ে নন্দলাল পাঠিয়েছিলেন।

নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

যিনি আমার চাক্ষুষ, যিনি সশরীরে বিদ্যমান তাঁর সম্পর্কে লেখার টা দায় থাকলেও শুধরে নেবার একটা ভরসা থাকে। কিন্তু এমন য়জন যিনি প্রয়াত, যিনি আমার একান্ত হয়েও প্রত্যেকের আপন, তেমন নুষের স্মৃতিচারণের একটা দায়িত্ব অনুভব করি।

যে পরম মানুষটির জীবনের বিশেষ দিক আমার বিষয়, যাকে নিয়ে খা চলতে শুরু করবে সেই প্রসঙ্গে আমার এই বিশেষ বিষয় অধিকারের ত্র সন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করি। সূত্র সন্ধানের প্রসঙ্গটি একান্ত জের হলেও জানানোর প্রয়োজন বোধ করি।

অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসার জনের কথা লিখতে গিয়ে ভাবপ্রবণতার তিশয্যে নিজেকে সংযত রাখাই সবচেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। তবে ভরসা র সম্বন্ধে এই লেখা তিনি আপন দ্যুতিতেই অম্লান। চেষ্টা করব, নদী মন তার সচল উচ্ছল প্রবাহ নিয়ে গান গেয়ে চলতে থাকে সেইভাবে দলালের এই সহজ সরল অথচ অসাধারণ শিল্পাশ্রয়ী অপার্থিব রসবোধ জীবন ঐশ্বর্যের অধ্যায়টুকু তুলে ধরতে।

আমার বাবাকে দেখতুম সারাক্ষণ তিনটে বইকে ভাগ করে পড়তে। রা সকাল একটি বাংলা বই আর তারই কতকগুলো খণ্ড। দুপুর গড়ালে কটি মোটা কবিতার বই, ঠিক সন্ধ্যের পরই আরম্ভ করতেন একটি রেজী গ্রন্থমালা।

নিজের কাজ লোকলৌকিকতা সব সারা হলেই বাবা রোজ মন ডুবিয়ে কটা বই পড়তেন। আমার কাছে ছেলেবেলায় এ-এক অবাক বিস্ময় ল।

বয়স ছোট। বাংলা অক্ষর দেখে বুঝি বাংলা আর ইংরিজী তার রফেই বুঝিয়ে দেয় সে বাংলা নয়। দিন আর রাতের কুপির আলোয় ামার অক্ষর পরিচয় ধাপে ধাপে চলতে চলতে একদিন বহুদিনের াসনার ইচ্ছা পূরণ হল। অনেকক্ষণ বইয়ের মলাটের ওপর তাকিয়ে ানান করে দেখলুম—সকালে যে বইটি বাবা পড়তেন তার ওপর লখা—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" দুপুর গড়ালে যে মোটা মোটা কবিতার ইটি পড়তেন সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি। সন্ধ্যের পড়ার খবর জানতে ামার সময় লেগেছিল যেদিন পড়লুম—.
Complete works of Swami Vivekananda.

এই জানার মাঝে একদিন রাতে মা লণ্ঠনটি তাঁর তোরঙ্গের সামনে লে ধরতে বলে খুলে বসলেন—বিস্ময়! কতদিন ভেবেছি এই লোহার াদরে ঢাকা তোরঙ্গের ভেতর কি আছে? সোনা, টাকা, পুতুল এসব কত ক? তার ভেতর থেকে একটি নিপাট কাপড়ে মোড়া প্যাকেট বার করে াঁর কোলে রেখে আমায় লণ্ঠন নিচে রেখে বসতে বলে, ধীরে ধীরে সেই াটি খুলে একটা বই আলতোভাবে বার করে আমায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন এমন একটি বই, একজন স্রষ্টা ও একটি গানের সঙ্গে যা আমার চিরদিনের হয়ে রইল। বইটি মেলে ধরে বললেন—পড়তো কি লেখা আছে। অস্ফুট লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম লেখা আছে—"গীতাঞ্জলি" নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বইয়ের থেকে যে অংশটি পড়তে দিয়েছিলেন তা আজও মনে আছে। সেটি আর কোন গান নয় সেটি হল "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে"। বইটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন এইটি আজ থেকে তোমার।

প্রবাহ তরঙ্গ একদিন আচার্য নন্দলালের সঙ্গ সান্নিধ্যে এনে উপস্থিত করে দিয়েছে।

নিঃসঙ্কোচ ও নির্দ্বিধায় বলতে কোথাও বাধা নেই যে নন্দলাল ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। কেবল আমার মা যাঁর হৃদয়ে আমার শিল্পবিদ্যা শিক্ষার একটি নিরন্তর সৎবাসনা কাজ করত। সেই বাসনার সত্যিকারের রূপকার হলেন স্বামী

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নন্দলালের নির্দেশে রামকিঙ্করের করা রিলিফ ভাস্কর্য

প্রজ্ঞানানন্দ। যিনি আমায় নন্দলালের কাছে পাঠিয়ে বলেছিলেন শিল্প পথের একজন যথার্থ মানুষের কাছে পাঠালুম। বেশ মনে আছে বৈশাখের শেষাশেষি (১৯৫৩) এক রোদে-ভরা দুপুরে রাঙ্গামাটির রাস্তা বেয়ে শান্তিনিকেতনে আচার্যের শ্রীপল্লীর বাড়িতে পৌঁছে তাঁর হাতে স্বামীজীর লেখা পরিচয় পত্র তুলে দিই। চিঠি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন—স্বামীজী মহারাজ তোমায় পাঠিয়েছেন। বোস। এই আমার আচার্য নন্দলালের সঙ্গে প্রথম দর্শন, সাক্ষাৎ ও পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচয় প্রবাহের সূত্রই ধীরে ধীরে তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ তিনি দিয়েছেন।
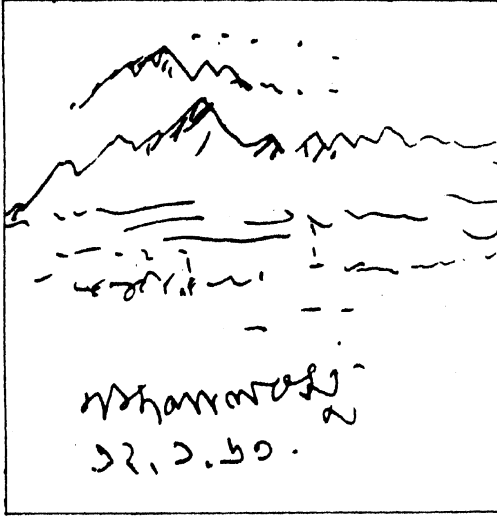
এমনই নিত্যদিনের আসা যাওয়া ও নানান আলোচনা প্রবাহের ভেতর দিয়েই নানান দুর্লভ অক্ষয় প্রসঙ্গ ও পরিবেশের সঙ্গী হয়েছি। আজ বোধ করি সব চেয়ে ভালো সময় সেকথা বলার। আমার এই লেখার ভেতর কারুর উদ্ধৃতি দিয়ে নন্দলালের প্রতিভার বনেদ গড়ার থেকে বিরত থাকব। কিন্তু বিরল ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ, যিনি নন্দলালকে যথার্থ চিনতে পেরেছিলেন আর এই চেনার পেছনে কোন মোহ কাজ করেনি। তিনি জেনে ছিলেন ব্যক্তি ও স্রষ্টা এই দুই নন্দলালকে সমানভাবে। আর সেই কারণেই তাঁর চেনার মধ্যে ছিল পূর্ণতা।

এইসব একান্ত নির্জন কথা যা জানলে কোথাও বুঝতে আটকাবে না—শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দলালের জীবনে সঞ্চারিত হয়ে কতটা পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নন্দলালের অধ্যাত্ম, সংসার ও সৃষ্টি এই তিন জীবন অধ্যায়েরই প্রেরণা ও ভরসা ছিলেন। নন্দলাল তাঁর হৃদয়টিকে সম্পূর্ণ করে নিশ্চিত ছিলেন।

প্রকৃতিকে ভালবাসার, ভালো লাগার ও তাতেই আত্মস্থ হওয়ার কথায় বলছেন—"ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) মহাশিল্পী ছিলেন। ঠাকুর যখন যা হতে চাইতেন তখনই তাই হয়ে যেতে পারতেন। শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। খালি ছবি দেখতে আর আঁকতেই ভালবাসতেন তাই নয়, শিল্পকে রক্ষা করতে কত যত্নবান হয়েছেন। দেখো না—দক্ষিণেশ্বরের ভাঙা দেবমূর্তি কেবল জুড়েই দিলেন না, রাণী রাসমণির আত্মজনের বিসর্জনের তুলনা করতে কোথাও আটকে গেলেন না। শিল্পের প্রতি ভালবাসার এ এক অনুপম দুর্লভ ঘটনা।

ঠাকুরের হাতের লেখা ছিল চমৎকার। যেমন ছাঁদ তেমনই পাকা গড়ন। তাঁর যেমন ভাব তেমন হয়ে যাবার গুণটি শিল্প সাধনার মস্ত দিক। তাঁর কাছ থেকেই আমরা পরম্পরা সূত্রে শিল্পের অনন্ত রসবোধের অনুভব উপলব্ধি করার ভাবনাটি পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে নন্দলাল বালক গদাধরের ঘনকালো মেঘে ঢাকা আকাশের বুকে উড়ে যাওয়া বকের সারি দেখে ভাবাবেশের অপার্থিব ঘটনার কেবল উল্লেখই করেন নি, সেই হৃদিনন্দন দৃশ্যকে চিত্ররূপ দিয়ে তাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার অনুভূতিতেই বলতে পেরেছিল— "পূব দিকের সবুজ বনের মাথায় কাজলা কালো মেঘ আমার এত ভালো লাগছে কেন? কেন মনকে নাড়া দিচ্ছে? কারণ আর কিছুই নয় একই সত্তার একটি চেতনার এক প্রান্ত হল ঐ মেঘ, আর একদিকে আমি, তাই মেঘের সুখ আমাতে অথবা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে। একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। একই চেতনায় নানান দোলা জাগছে ঢেউ জাগছে।"

আমরা সবাই জানি আচার্য নন্দলালের জীবনের একটি বিরাট অধ্যায়ের সূচনা শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসা ও অকৃপণ রবীন্দ্র-সঙ্গ সান্নিধ্য। প্রকৃতিকে এমন ভাবে একান্ত ও নিবিড় করে পাওয়া তাঁর সমস্ত জীবনের এক পরম অক্ষয় সম্পদ। যেদিন এই আশ্রমকে নিজের একমাত্র সাধনক্ষেত্র ও জীবন উৎসর্গের জন্য বেছে নিয়ে চিরদিনের জন্য চলে আসলেও হৃদয়ের আসনে সঙ্গে করে এনেছিলেন একটি আলেখ্য। সেটি চিরদিন "মনে বনে আর কোণে" অতি আপন হয়েই লালিত হয়েছে। সেই পরম আলেখ্যটি আর কারো নয় স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের।

শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবন আরম্ভের অনেক আগেই নন্দলালের সঙ্গে এই আলেখ্য ও তার পরিমণ্ডলের সংযোগ ঘটে গিয়েছে।

এ সংবাদ আমরা কতজনা জেনেছি? কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে কথা জানতেন। স্নেহের শ্রীমান নন্দলালের এই গভীর ভালবাসার ও বিশ্বাসের প্রতি শুধু সজাগই ছিলেন না, সে বিষয়ে যথাযথ মর্যাদা দিতে কখনও ভুল করেন নি। নন্দলাল নিজেই বলেছেন "যখনই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু সন্ন্যাসীরা আশ্রমে এসেছেন তখনই গুরুদেব নিজে আমায় তাঁদের দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে গুরুদেবকে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা নেওয়ার কথা বলেছিলুম তিনি উপাসনা নিয়েছিলেন।" শান্তিনিকেতনের সাধনক্ষেত্রের এই নির্জন নির্লোভ তপস্যা নন্দলালের জীবনে একটি গভীর সত্য উপলব্ধির ভিত গড়ে দিয়েছে। এই আশ্রম ও তার পারিপার্শ্বিক নির্মল উদার ও অনাড়ম্বর পরিবেশই তাঁকে প্রকৃতির অনন্ত বিচিত্র রূপকে চেনবার ও দেখবার প্রথম ভাগবৎ দৃষ্টিরও উপলব্ধি ঘটিয়েছে। এই খানেই এই পীঠভূমিতে বসেই পাঠ নিয়েছেন—মানুষও প্রকৃতির অংশমাত্র এবং তার সহজ সরল বেড়ে ওঠাও প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী। সেই এক করে দেখার দৃষ্টিতে বলছেন—

"রূপকে আর প্রধান করে দেখিনে; তাদের প্রত্যেকটিকে একই সত্তার বিভিন্ন ছন্দ ও বিগ্রহ হিসেবে দেখি। সমুদয় জগৎ অন্তরে বাহিরে সকল রূপ যে প্রাণ থেকে নিঃসৃত এবং যে প্রাণে স্পন্দমান, সত্তার সেই প্রাণ ছন্দকেই খুঁজি সমস্ত রূপে—কি সাধারণ কি অসাধারণ। পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দেখতে যত্ন করি,—মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।" "প্রকৃতির মধ্যেই সাধকেরা কালী মূর্তি শিবমূর্তি দেখেছে; আমরা সেই প্রকৃতিকে দেখতেই ভুলে গেছি—ঈশা বাস্যামিদম্ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

এই শিল্পাশ্রয়ী অধ্যাত্ম ভাবনা ও মননের উক্তিগুলি কেবলই সাজান শব্দ চয়নের মালা গাঁথা নয়, বিন্দু বিন্দু আত্ম চেতনার ভেতর দিয়েই এর প্রকাশ।

আমরা নন্দলালের সৃষ্টিগুলি প্রায় সময় বড় সহজে তার রেখা, রঙ, বিষয় আর ক্রিয়াকৌশলের বুনট ও চমৎকারিত্বের গুণটি আছে কিংবা নেই এই সন্ধানেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু যথার্থ নন্দলাল যে রসের সঙ্গে নিত্য বসবাস করতেন সেদিকে বিশেষ মন দেবার কথা এখনও ভাবতে চাইনি, একটু দ্বিধাগ্রস্তও।
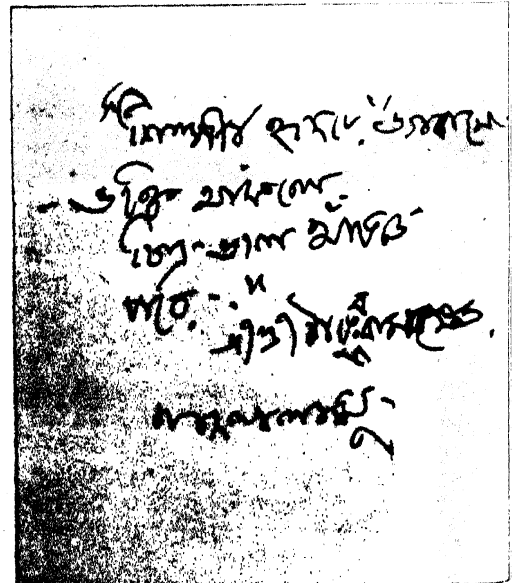
এই অন্তর বাহিরের গভীর বোধের দৃষ্টিতে অনন্য নন্দলালকে বুঝে
ন জেনে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছিন—

"যে নদীতে স্রোত অল্প সে জড়ো করে তোলে শৈবাল দামের ব্যূহ, র সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা করে ালে। তাদের কর্মে প্রশংসা যোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর ক ঘোরে না; এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনার মধ্যে নকল আপনি াতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর চুরি চলে। আপন তিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমা বন্ধন নন্দলাল ছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তার ই বিদ্রোহ কতদিন দেখে এসেছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টি শক্তির ন্তর্গত। যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয় শক্তি কেবলই তার পথ রি করতে থাকে। সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের কৃত সিদ্ধ।"

যাঁরা নন্দলালকে কেবলই পুরাতন বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন সেই াবনার আর মননের জন্যও চিরদিনের রবীন্দ্রনাথ ভারি সুন্দরভাবে লছেন, "আর্টের রাজত্বে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে ীবিতের জন্য শ্রেণী বিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল া জাতের লোক নন। আর্ট তার কাছে সজীব পদার্থ। . . . . . তাঁকে িনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্যই তাঁর সঙ্গ ডুকেশন।" শেষে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার করে বলেছেন যেখানে এই ামান্য বলার ভেতরও নন্দলালের চরিত্র নিহিত—"এ প্রশংসার তিনি কানো অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব রি"।

শান্তিনিকেতন — ২৮।৪।৬৫
স্নেহের বোন "প্রীতিভা"
[illegible] তোমার চিঠি
পেয়ে খুব সুখী হলাম।
[illegible] কলকাতা
[illegible] তোমার চিঠি
তাহাকে দিব। বেশ ভাল আছে
[illegible]
[illegible] হল, গেল। [illegible]
ভাল আছে। আমার [illegible]
[illegible] তোমাদের। [illegible]
[illegible]
[illegible]
ইতি
শ্রী: নন্দলাল বসু
[illegible]
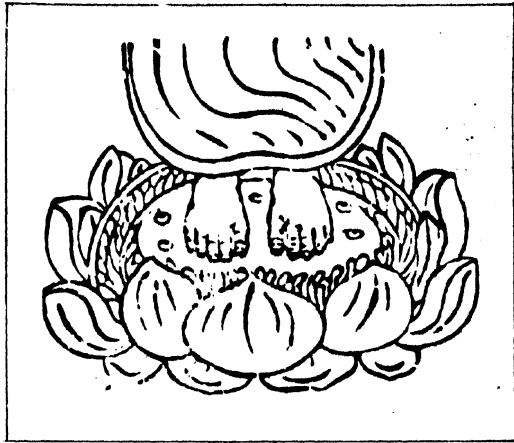
'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' বইয়ের প্রচ্ছদ

মূলত শিল্পী যে একজন পূজারী একজন সাধক সে ভাবনা করতে আমরা ভুলে গেছি। শিল্পচর্চার ভেতর দিয়ে অসীমের স্পর্শ পেয়ে অনায়াসেই সংসারের নিত্য ছোটখাট অহেতুক ভাবনার তাড়না থেকে মুক্তি পেতেই পারেন। শিল্প শিল্পীকে একটি আসন গড়ে দেবে যেখানে তিনি নিরাসক্ত হতে পারার অনুভবে আবেশিত হবেন।

'সাধক' শব্দটি এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চারণ—যাতে করে—সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে আলাদাভাবে উপভোগ করার ইঙ্গিত কখনই দেয় না, এর পূর্ণতা যুগলে। আমরা বিশ্বাস করি জীবনযাপন ও সাধনার উদ্‌যাপন একই। সাধনায় আলাদা করে জীবনের জন্য চাওয়ার বা পাওয়ার কোন বাসনা কাজ করে না।

নন্দলাল কেমন সুন্দর করে নিজেই এক জায়গায় বলছেন—"যে আর্টিস্টের সমতার বোধ ও সমগ্রতার বোধ হয়নি, তারই বিশেষ বিষয় চাই, বিশেষ বেদনা চাই। তার অভাব হল তো তার প্রেরণা শুকিয়ে গেলো। কেননা রসের চির উৎসের খোঁজ মেলেনি।"

আমরা স্রষ্টার জীবন বোধের ছোঁয়া পেয়ে থাকি তাঁর সৃষ্ট রচনা থেকেই। চোখে দেখা জগতের মধ্য দিয়েই অন্য এক জগতে পৌঁছানর নিরন্তর সাধনা চলতেই থাকে—সেই অনুভূত উপলব্ধিতে নন্দলাল বলছেন—"অদ্বৈতের সাধনায় পরম উপলব্ধিতেই পৌঁছতে হলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে উঠতে হয়। আর্টিস্টের আত্মবিকাশও হয় ঐভাবেই। কিন্তু অদ্বৈতবাদী মনে করতে পারেন, সাধনার পথে যা কিছু ছেড়ে যেতে হবে তা অনিত্য, তা তুচ্ছ, তাই নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করার দরকার কি? শিল্পীর উত্তর হল এই যে, শিল্পের সৃষ্টিই হচ্ছে মায়াকে আশ্রয় করে। মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপমাচ্ছলে বলছেন সাপের বিষ সাপকে লাগে না। শিল্পীও মায়াকে জেনে মায়ার ব্যবহার করেন বলেই তা হয়ে ওঠে লীলা।"

কিন্তু নন্দলাল একথা বলেও স্মরণ করতে ভুলে যাচ্ছেন না—"বিষয়ের মোহে পড়লেই ভয়ের কারণ। সেই হল মায়ার দাসত্ব। শিল্পী মায়াকে দেখে একের মধ্যে বিচিত্র ছন্দের দোলা রূপে।"

একজন সৎ একনিষ্ঠ সাধকের পরিচয় বলতে আমরা যা বুঝি নন্দলাল ছিলেন সেই সব জাগতিক ঐশ্বর্যবিহীন, নিরহঙ্কারী বিনয়ী, নিরাসক্ত ভয়হৃদয় সাধকদের একজন।

নন্দলালের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মযোগের সম্পর্ক ছাড়াও সেই পরিমণ্ডল ও সঙ্ঘের (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন) সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গভীর। সারা জীবনই সঙ্ঘের সামান্যতম কাজের মধ্যে আসতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই সঙ্ঘই ঠাকুরের পূর্ণ আলেখ্য। আর এই বিশ্বাস তাকে সারাক্ষণ সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগে ভরে রাখত। ভক্ত ও বিনয়ী নন্দলাল কখনো কোন সন্ন্যাসীকে চিঠি লিখলে প্রণতঃ নন্দলাল লিখতে সাধারণত ভুল করতেন না।

নিত্যদিন যাওয়া আসা করি কখনও ছবি নিয়ে কখন অন্য কোন কাজে তবে এমন দিন গেছে তাঁর কাছেই গেছি। কলকাতায় এলে সবার খোঁজ

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরের মন্দিরের প্রবেশপথের মাথার নকশা

নিতেন বিশেষ করে খোঁজ নিতেন পূজ্যপাদ মহীমবাবুর। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

কি অসীম শ্রদ্ধা ছিল। আমিও যখনই কলকাতায় গেছি পুণ্যদর্শন শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে দেখা করে ফিরতাম। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলেই আর নন্দলালের কাছ থেকে এসেছি জানলেই খুবই ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করতেন কথা। খাটের ওপর শোয়া অবস্থায় দেখেছি মাঝে মাঝে উঠে বসেন—নিজে হাতে করে মিষ্টি দিতেন নন্দলালকে দেবার জন্যে। পুণ্যদর্শন শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তের একটি রেখাচিত্র নন্দলালের কাজের ঘরে দেওয়ালে দেখতুম। এই সঙ্গে সাক্ষাতে ধন্য হয়েছি স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তিনিও নন্দলাল কি করছে কি আঁকছে, এমন সব কত কথা জিজ্ঞেস করতেন। উত্তর দিতে দেরী করলে বলতেন—অত চুপ করে থাকলে কি হবে আমি সব জানি সব বুঝতে পারি বুঝেছ। এই প্রসঙ্গে তাঁর অন্য আলোচনার যেসব দিক তা থেকে বিরত থাকছি। পূজ্যপাদ মহিমবাবুর কথার খেই ধরেই নানান টুকরো টুকরো আলোচনা করতেন আর সেই আলোচনার পথ চলাতেই শিল্প প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হ'ত ঠাকুরের অপূর্ব উপমা দেওয়া গল্প আর অনবদ্য বলার ভঙ্গী নিয়ে। গল্প বলা শেষ হলে জিজ্ঞেস করতেন এটা জানতে ? এমনভাবেই একদিন গল্প না বলে—সাদা পোস্টকার্ডে তাঁর একটা আঁকা দেখতে দিলেন—বিষয়—মাটিতে পোঁতা খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় একটি গরু চরছে—প্রশ্ন করলেন, কিসের গল্প ? বললুম ঠাকুর এই "দিকদড়ার" গল্প বলেছেন। এরপরই আর একটা ছবি বাড়িয়ে দিলেন। তাতে দেখলুম খুঁটি আছে, দড়ি আছে, তার টান আছে কিন্তু গরু নেই। বললেন গল্প তো নয় এক একটা ছবি। পোস্ট কার্ড থেকে গরুকে বার করে দেওয়াতে কাগজের আকার ছোট থাকলেও দর্শকের চোখ আপনা থেকেই বেশী করে দেখবার জন্যে গরুকে খুঁজতে চাইবে। আমরা ছবিতে যা দেখতে পাচ্ছি না অথচ দেখবার একটা অনুভব দিয়ে থাকি এই ছোট জায়গায় সেই অনুভবকে আনবার চেষ্টা করেছি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আমরাই যে কতটা ছাড়া আছি তাই কি জানতে পারছি ?

নিত্যদিনের সঙ্গ সান্নিধ্যের মাঝে মাঝেই মনে হয় নন্দলালের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মিক সম্পর্কের কথা বুঝতে পারি, যার জন্যে সব সময়ই কোন মানুষের দরকার এমন নাও হতে পারে। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার একটা আপন পথ তৈরী করে নেবার দিক আছে। কিন্তু তিনি কিভাবে এই পরিমণ্ডলের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এমনকি গৃহভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে এমনভাবে ঘনিষ্ঠ হলেন ?

এ জিজ্ঞাসা মনে এলেও দ্বিধাবোধ করেছি সঙ্কোচ লেগেছে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মঠের স্বামীজীদের কাছে নন্দলালের নানান টুকরো কথা শুনতে পেয়েছি। তিনি উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে যেতেন আর মাঝে মাঝে থাকতেনও। মায়ের (শ্রীশ্রী সারদাদেবী) বাড়ির পূজনীয় সত্যেন মহারাজ স্বামী আত্মবোধানন্দ ব্রহ্মচারী গনেন তাঁর যেমন আপনজন ছিলেন সমভাবেই নন্দলালও ছিলেন এঁদের অত্যন্ত প্রিয়।

নিজেই বলছেন, "পূজনীয় অমূল্য মহারাজের সঙ্গে আমার এক গভীর শ্রদ্ধা ছিল তিনিও আমায় সখ্যভাবে দেখতেন ভারী সহজভাবে মিশতেন। উনি (পূঃ অমূল্য মহারাজ স্বামী শঙ্করানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন) যখন ভুবনেশ্বরে বা মঠে থাকতেন তখন সেখানে যেতুম কত গল্প করেছি।"

মঠ মিশনের কথা উঠলে এমনভাবেই জানতে পারি কিন্তু যে বিষয়টিকে জানবার জন্য আগ্রহবোধ করছি সে বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসাই আর করে উঠতে পারি না।

শান্তিনিকেতনে শ্রীপল্লীর বাড়িতে তাঁর ছবি আঁকার ঘরে যেখানে তিনি বসতেন—সে ঘরটি ছিল—নিরাভরণ, সহজ শুচিশুদ্ধ বাতাবরণে পূর্ণ। দেখে মনে হ'ত পুজোর ঘর। আঁকার জায়গায় জল, তুলি রাখা, আঁকার অন্যান্য জিনিসপত্র খুবই পরিপাটি করে সযত্নে রাখা থাকতো। যখন কাজ শেষ করে উঠতেন, তখনও সমস্ত কিছু ঠিক ঠিক জায়গাতেই থাকত। শিল্পীর স্টুডিও বা কাজের ঘর বলতে আমরা সচরাচর একটা বিশেষ অবিন্যস্ত অগোছাল দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক মনে করে

থাকি, কিন্তু নন্দলালের এ ঘরের সঙ্গে তার কোন মিল পাওয়া যাবে না। পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও সংযত। এই ছবি আঁকার ঘরের যে জায়গাটিতে তাঁর আসন ছিল তার পেছনে আর বাঁ দিকের দেওয়াল টানা কাচের জানলায় ভরা। পর্যাপ্ত আলোর জন্যে। আবার প্রয়োজন মত পর্দা টেনে নেবার ব্যবস্থা ছিল। সামনের দেওয়ালের গা করে, খুব উঁচু নয় এমন একটা কাঠের আড়াআড়ি আলমারির উপরে আসন পেতে বসান থাকত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবীর ছবি। একই ভাঁজে। তারই সামনে কারুকার্য করা হাতের তৈরি ফুলের সাজিতে দেওয়া থাকত সময়ের পরিমিত ফুল। ডান দিকের দেওয়ালে এ ঘরে ঢোকবার দরজা বাদ দিয়ে প্রায় সমস্তটাই শিল্পকথার ছবির, ও সাহিত্যের দেশবিদেশের নানান বইপত্র ঠাসা।

কখনও সকালের দিকে এই ঘরেই আসি। আবার বাড়ির পেছন দিকের যে বারান্দায় বসতেন সেখানেও যাই। কলকাতা থেকে ফিরে তাঁর কাছে গেছি সঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর লেখা বই "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি"। বইটি দিতেই মাথায় ঠেকিয়ে গ্রহণ করে বললেন—স্বামী অভেদানন্দের লেখা শ্রীমৎভাগবদ্ গীতার বই-এর প্রচ্ছদেও আমার আঁকা কুরুক্ষেত্রে "কৃষ্ণার্জ্জুনের" ছবি আছে। পূজনীয় কালী মহারাজের সঙ্গে (স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) আমার প্রথম দর্শন দার্জিলিং-এ। তিনি বসে গড়গড়া টানছেন— আমি বসে আছি— দু-একটা কথা বলার পরই আচমকা জিজ্ঞেস করলেন—তামাক খাও নাকি ? আমার তো কোন নেশা নেই, এ প্রশ্নের কি জবাব দেব ? চুপ করে আছি। কি উত্তর দেব ? আবার হেসে বললেন খাবে ? আজ মনে হয় কত সৌভাগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী সন্তানদের কথা ও তাঁদের দর্শনের প্রসঙ্গ ওঠায় অনেকদিনের জানবার বাসনায় জিজ্ঞেস করলুম—মাস্টারমশাই, আপনার সঙ্গে কি ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে প্রথম দর্শন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ? আমার প্রথম দর্শন স্বামী ব্রহ্মানন্দ পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজের সঙ্গে। জানতে পারলুম তিনি বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়িতে আছেন। গেলুম একদিন তাঁকে দেখতে, প্রণাম করতে। সঙ্গে নিয়েছি আমারই আঁকা ছবি। মহারাজকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই আমায় প্রশ্ন করলেন বৎসের কি করা হয় ? আজও ছবি আঁকা শিখছি ; এই বলেই আমার আঁকা শ্রীরাধিকার ছবিটি তাঁর হাতে তুলে দিতেই সেটি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন—শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী ভাব হবে। ভাবের কাজ, ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবে। মাথা ঠিক রাখবে। বুঝেছ।

নিজেই বললেন ঠাকুরের গৃহী সন্তানদের মধ্যে প্রথম দেখা হয় গিরিশবাবুর সঙ্গে (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)। তাঁর সঙ্গেও বাগবাজারেই তার বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে দেখি, উনি খাটের ওপর বসে আছেন। প্রণাম করতেই বসতে বলে দু'একটা প্রশ্নের পরই জিজ্ঞাসা করলেন কি পড়ো ? ছবি আঁকা শিখছি। শুনে বললেন—বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে Transfer করতে হবে। তবেই যা চাইছ তাই হবে। আমার যখন বেড়াল হতে ইচ্ছে হয়—তখন মনে হয় খাটের তলায় ঢুকে ঝগড়া করি। গিরিশবাবু কত বড় শিল্পী ছিলেন, কি অসাধারণ কথা বলেছিলেন। তখন তো বয়স অল্প তার কথা অত বুঝতে শিখিনি আর পারিওনি। আস্তে আস্তে যত পরিণত হতে পেরেছি ততই বুঝতে শিখছি বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে এক করে না ফেলতে পারলে সবই বৃথা। এক হয়ে যাওয়ার পেছনে যেটি দরকার তা হল

অনুরাগ, বিষয়কে ভালবাসা। এই কথার সূত্রেই নন্দলাল সুন্দর ও বিস্তার করে বলছেন—"তুমি আজ এই যে বৃক্ষের আরাধনা করছ, ছবি আঁকছ, যদি সত্যি একে ভালো লেগে যায়, এ তোমার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে যাচ্ছে। জীবনে কোনদিন হয়ত অশেষ দুঃখ পাবে, প্রিয় পরিজনকে হারাতে হবে, সংসার শূন্য মনে হবে, তখন পথের ধারে থেকে এই গাছ বলবে, এই যে আমি আছি। তুমি সান্ত্বনা পাবে। এ তোমার অক্ষয় সঞ্চয় এ জীবনের শুধু নয় জীবনান্তরে।" নন্দলাল বারবার গিরিশচন্দ্রের কথা বলতে বলতে নিজে একটি শব্দ ব্যবহার করতেন তা হ'ল "বনে" যাওয়া হয়ে যাওয়া। এই "বনে" যাওয়ার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ইচ্ছামাত্র যা চাইতেন হতে পারতেন এ কথাও প্রায় সময়ই বলতেন। আসলে নন্দলাল জীবনে এই Transfer-'বনে' যাওয়ায় বিশ্বাস করতেন। আর এই হয়ে যেতে না পারলে সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না একথা সব সাধকদের মত তিনি অনুভব করতেন। "বনে" যাওয়ার কথাতে আর একটি উপমা দিতেন—শিল্পীর সারস আঁকতে গিয়ে সারস হয়ে যাওয়া এই প্রসঙ্গেই Light of Asia বইটা প্রায়ই পড়তে বলতেন। নন্দলালের অন্তরমুখী মননের একটা অদ্ভুত দিনের ঘটনা আজও আমার কাছে উজ্জ্বল এই সঙ্গে তাঁর অকৃপণ স্নেহের দিকটা বারবার আমায় তাঁর সঙ্গে অনুভবে আবৃত করে—প্রায় ভরসন্ধ্যে আসছে আসছে। আমি সাঁওতাল গ্রাম থেকে স্কেচ করে ফেরার পথে প্রায়ই দিনই তাঁর কাছ হয়ে আসি। সেদিনও আবছা আলোর আভায় গিয়ে দেখি উনি খোলা আকাশের নীচে খাটের ওপর শুয়ে আছেন। গিয়ে প্রণাম করতেই চমকে উঠে আমায় দেখে বললেন—"মা বলতেন (সারদাদেবী) শোয়া অবস্থায় কাউকে প্রণাম করতে নেই।" আমার এই ঘটনা বলার তাৎপর্য নন্দলাল কতটা মনেপ্রাণে এই পরিমণ্ডলে তন্ময় হয়ে থাকতেন তার একটি অনন্য উদাহরণ মাত্র। হঠাৎ চমকে ওঠার ভেতর আমার যেখানে বকুনি খাওয়ার কথা সেখানে একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের নির্দেশ। একে স্নেহ ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না।

এখন মনে হয় কত প্রশ্নই তাঁকে করেছি যা তিনি অনায়াসেই উত্তর না দিয়ে সে বিষয়ে কৌতূহলী না হবার জন্য সাবধান করতেই পারতেন কিন্তু উত্তর দিয়েছেন। সে উত্তর কেবলই হ্যাঁ বা না নয়। প্রশ্নমাফিক তার বিস্তার ঘটেছে। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি বেলুড় মঠ প্রথম কবে গিয়েছিলেন? বছর মনে নেই, তবে হাওড়া হয়ে যাইনি। গিয়েছিলুম আহিরীটোলার ঘাট থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে নৌকা করে। এক বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুর নাম মনে করতে পারলেন না। মঠে পৌঁছে আপনার সঙ্গে কার প্রথম দেখা হল? মঠে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে, স্বামী প্রেমানন্দ। সে যে কি স্নেহ, কি ভালবাসা তা তো বোঝান যাবে না। মানুষের শরীরে এত করুণা মিষ্টতা থাকতে পারে যা তার দর্শন আর সঙ্গ লাভ না করলে কিভাবে বোঝাবো। আমি যখন মঠে গেছি তখন মঠ কত নির্জন। আজকের মন্দির হয়নি। আপনি স্বামীজীকে দেখেছেন? না তাঁকে দেখা আমার হয়নি। অথচ তাঁকে দর্শন
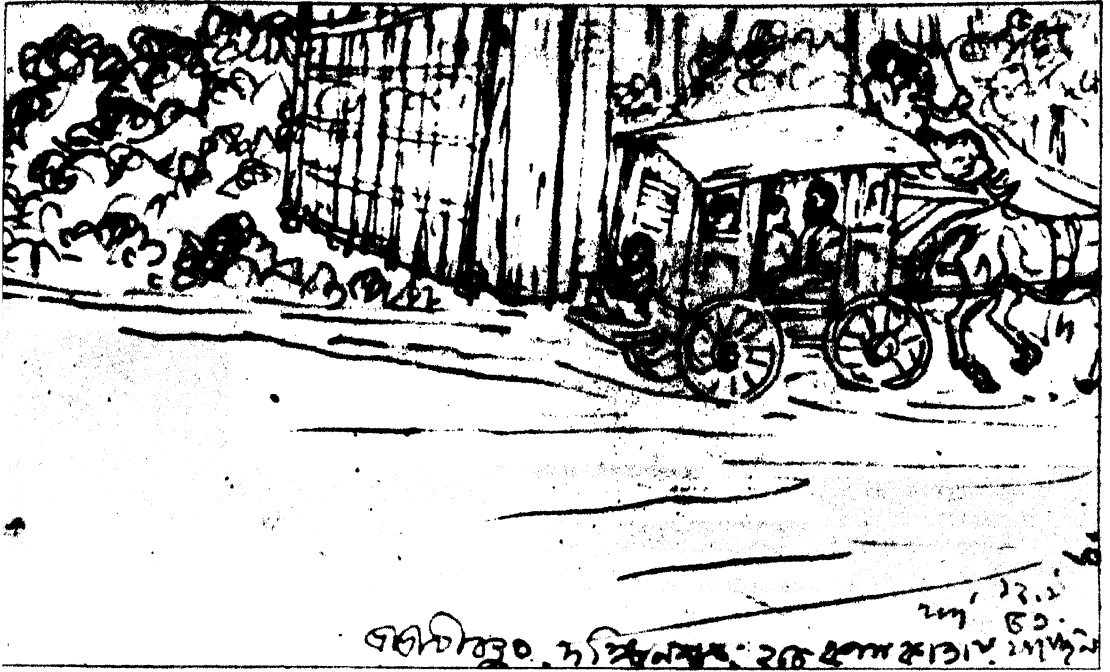
করার সুযোগ ছিল—হলনা।

স্কেচ ছবি ড্রইং সবই নির্ভয়ে তাঁকে দেখাই। তিনি ধরিয়ে দেন কেমনভাবে কোথায় কি করলে ড্রইং-এর চমৎকারিত্ব বা ঋজুতা থাকবে। কোনটি যথাযথ ছন্দ। ছবির ছন্দের গতি বলতে কি? এমন সব অমূল্য শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলেছেন; এ লেখার বিষয়ের সঙ্গে সাজুয্য না থাকলেও একটি বিশেষ দিকের কথা জানাতে ইচ্ছে করছে—কেমনভাবে নন্দলাল একজন সাধারণ নবাগত ছাত্রকে তার মনের দরজায় সাহস দিয়ে বলিষ্ঠতা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা এনে দিতেন। শিক্ষার্থীর অন্তরের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করে তাকে তার মতন করে তৈরী করার শিক্ষা দেবার গুণেই নন্দলাল অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য।

একদিন ধোয়া রঙে কাজ (ওয়াশ পদ্ধতি) করব বলে মহাভারতের কর্ণ কুন্তী" অধ্যায়ের ছবি এঁকে নিয়ে গেছি। তা দেখাতেই বলে উঠলেন বেশ হয়েছে—কেবল পায়ের পাতার কাছে সামান্য ভুল ধরিয়ে তা শুধরে নেবার জন্য কেবল বললেন তাই নয় অন্য জায়গায় দেখিয়েও দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আমি খুশী, ভাবলুম আর সব তাহলে ঠিক হয়েছে। পরের দিন যেটুকু শুধরে নিতে বলেছিলেন তা করে নিয়ে দেখাতেই বললেন হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। কিন্তু আবার সামান্য ভুলের দিকেও নজর দিতে বললেন। এমনভাবে বেশ কিছু দিন সময় নিলেন পুরো বিষয়ের ড্রইংটা শুধরে দিতে। যেটি দেখবার গুণ তাহল কোন কারণেই ছাত্রকে তার কাজের সব দোষগুলি একসঙ্গে ধরিয়ে দিয়ে হতাশায় ঠেলে দেন নি।

কোন বিশেষ বিষয়ের ছবি করতে গেলেই সে বিষয়ে বার বার জানতে পড়তে বলতেন। সে সময়ের ঐতিহাসিক আচরণের দিকে পোশাক পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি দিতে। আর সেই সঙ্গে বিশেষ চরিত্রের ছবি আঁকতে গেলে—সেই চরিত্রের বিশ্লেষণ দরকার। এতে ছবির কাজে যেমন সুবিধা তেমন বিষয়ের ওপর শিল্পীর একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। মহাভারতের বিষয় আলোচনাতেই বলে উঠলেন—আমি মহাভারতের ওপর অনেক ছবি করেছি আর সে বিষয়ে নানানভাবে জানতে চেষ্টা করেছি। নিজেকে ধন্য বলে বোধহয় যখন ভাবি এই মহাভারতের ছবির জন্য যখন বিশেষভাবে ভাবছি তাদের চরিত্র নিয়ে তখন আমায় সেই সব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি পড়িয়ে বুঝিয়ে ছিলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তান পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ স্বামী সারদানন্দ নিজে। বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে উঠলে (শ্রীসারদাদেবী) শরৎ মহারাজ নিজে গীতা পড়ে পড়ে আমায় তার ভাব বোঝাতেন। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কের দিকটি। কুরুক্ষেত্রের বিষয় নিয়ে অনেক ছবি করেছি। তার মধ্যে পার্থসারথির ছবিও করেছি নানানভাবে কিন্তু এই পার্থসারথির (কুরুক্ষেত্রে) ছবি আঁকার সময় স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) ঐ বিষয়ে ভাবনা আমায় অদ্ভুতভাবে সাহায্য করেছে—

"শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস? সমস্ত গীতাটা Personified (মূর্তিমান) যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন তখন তার Central Idea (মুখ্যভাব)-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পেছনের পা দুটো প্রায় হাঁটু গাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়ছে—ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় Action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবন বিখ্যাত বীর দু পক্ষ সেনা দলের মাঝখানে ধনুকবাণ ফেলে ভয়ে কাপুরুষের মতো রথের ওপর মাঝখানে বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটাকে বাঁকিয়ে তার সেই অমানুষী প্রেম করুণা মাখা বালকের মত মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে, তার প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন।"

এই ভাবকে ধরে ছবি করার চেষ্টা করেছি। মহাভারতের মত রামায়ণের বিষয় নিয়ে যে সিরিজের ছবি দেখো তারও উৎসাহ পেয়েছি বেলুড়মঠে রামায়ণ পাঠের ভেতর দিয়ে।

আমরা অনেক সময় ভারতীয়ত্ব ও স্বদেশ বোধ বলতে মনে করি পুরাতন ঐতিহ্যের কিছু নিয়ে আবার তাকে অনুসরণ করা। সত্য স্বদেশ ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাবনা কখনই পুরাতনের আবর্তে ঘোরে না। এ বিষয়ে যে দুটি উদগত মহামন্ত্রের আহ্বান মানুষের নিত্য নোতুন পথে চলার প্রেরণা সে দুটির জন্ম এই ভারতবর্ষে। (১) শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা: (২) চরৈবেতি। এই দুটি মোহচ্ছিন্ন অনুরণন মানুষকে মুক্তি দেয় অন্ধকার থেকে আলোতে। স্বদেশ বোধটা তাঁর কাছে কোন ঠুনকো গোঁড়ামী ছিল না। অনায়াসেই বলতেন—পরাধীনতার কি জ্বালা তা তোমরা অনুভব করতে পারবে না। নিজের দেশকে ভালবাসতে না পারলে পরের দেশকে সহজে আপন করা যায় না। এই স্বদেশবোধের ভাবনায় জাতীয়

আন্দোলনে শিল্পী হিসেবে তাঁর সশিষ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা আমরা অনেকেই জানি। স্বদেশবোধের প্রেরণায় তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে হরিপুরা কংগ্রেসে আঁকা চলমান চিত্রগুলির সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। এই যজ্ঞ মণ্ডপের চালচিত্রের ভেতর যে ভারতবর্ষটিকে দেখতে পাই সেই দেখার অন্যতম প্রেরণার উন্মুক্ত ও স্পষ্ট আহ্বানটি ছিল এমনই—

"নূতন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে জেলে মালো মুচি মেথর ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে ভুনিওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। ......এরা রক্ত বীজের প্রাণ সম্পন্ন।"

প্রসঙ্গতার সার্থকতা এইখানেই—বিবেকানন্দ ভারতের শ্রমজীবী, অমিত শক্তির অধিকারী প্রাণগুলিকে ডাক দিয়েছিলেন। নন্দলালের চালচিত্রে সামিল হওয়া প্রতিটি মানুষের ভেতর সেই অমোঘ আহ্বান অনুরণন শক্তির প্রাণবন্ত স্পর্শ স্পষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান আর নন্দলালের চিত্রপট দেখে রবীন্দ্রনাথের নন্দলাল সম্পর্কীয় কবিতার একটি অনবদ্য ছত্র হল—

তুমি বললে দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে—
সেই কথাটিই তুলিব, রেখায় তক্ষণি যায় রটে।

আমরা তাঁর এই পর্যায়ের কাজগুলির চকিৎ বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণ গতিময় রেখার আবেগ আর তার বর্ণের অনবদ্য সামঞ্জস্য প্রলেপে মুগ্ধ হই (বা হই না)। নন্দলাল নিজেকে ভারতের ঐ শ্রমজীবীদেরই একজন মনে করতেন। তাই সেই রসে সেই বেদনার উপলব্ধিতে একাত্ম হয়ে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলেই—সৃষ্টিগুলি আপন স্বভাবসিদ্ধ পথেই সবার সামনে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ ছিল তাঁর দেশ মাতৃকার প্রতি অবশ্য কর্তব্য নৈবেদ্য নিবেদন। পূজা।

ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তৈরী করার কথা বলতেন। নিজেকে তৈরী করার অর্থ কোন আর্থিক বিষয়ে দৃঢ় হওয়ার কথা বলা নয়—চারিত্র্য দিকটি। সব মিলে। যেখানে মানুষ পূর্ণ সে গুণের সমাবেশের জন্য বলতেন। মানুষের নিত্য গুণ দেখার দৃষ্টি অভ্যাস তৈরী করার কথায় বলছেন, মা (শ্রীশ্রীসারদাদেবী) বলতেন কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। ঠাকুর বলছেন মৌমাছি হবার কথা। ঠাকুর যা বলছেন তার যদি আমরা সামান্য কিছু অনুসরণ করতে পারি তা হলে অনেক কষ্ট অনেক বেদনা থেকে মুক্ত হতে পারি। কেবল ঠাকুর ঠাকুর বললেই তো হবে না। দেখ, আমি নিজের হাতে ছোট্ট একটা খাতা করেছি, এতে ঠাকুরের সব উপদেশ লিখে রেখেছি। কেন লিখে রেখেছি ? আর কিছুই নয় মাঝে মাঝে মনে দ্বন্দ্ব আসে বেদনা আসে, অন্য নানান চিন্তা এসে ব্যস্ত করে। তখন এই খাতা খুলে পড়ে তা সরাতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারি কই ? সব সময় অসন্তোষ। কেন এটা হল না, ওটা হল না ? একমাত্র প্রার্থনা করা যায় আমার মন স্থির করে দাও—চঞ্চলতা দূর করে দাও।

কলকাতার বাগবাজারে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে নন্দলালের আসা যাওয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিত্য সঙ্গ সান্নিধ্য ছাড়াও একই বাড়ীতে অন্যসব নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ হৃদয়ের যোগ, ভালবাসা, গভীর শ্রদ্ধা। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে পূজনীয় সত্যেন মহারাজ স্বামী আত্মবোধানন্দ ও ব্রহ্মচারী গণেন ছিলেন তাঁর একান্ত। এই বাড়ীতে বসেই অনেক সময় ছবির পরিকল্পনার চিন্তা করেছেন। আলোচনা করেছেন এঁদের সঙ্গে। শিবের ছবি করার সময় সর্বদা সচেষ্ট হয়েছেন শিবের নিষ্কাম নির্মোহ রূপটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে আর এই ভাবনায় প্রকৃতিকে শিবস্বরূপ রূপে দেখার একটি দৃষ্টির নির্দেশ ইঙ্গিত স্বামী বিবেকানন্দের মায়াবতী আশ্রম থেকে দেওয়া হিমালয়ে একটি অনুভব। "ঐ যে উর্দ্ধে শ্বেতকায় তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গরাজি ঐ হল শিব তার ওপরে যে আলোক সম্পাত হয়েছে তাই হল জগতের জননী" এই মায়াবতীকে দেখেছি, দেখেছি পর পর স্তরে বিস্তারিত বিরাট হিমালয়কে সে চূড়া—কি সুন্দর একেবারে অদ্ভুত। তুমি কি গেছ কখন ? না বলতে বললেন তাহলে বুঝতে পারবে না। আমায় এঁকে দেখালেন পর পর চূড়া কিভাবে গেছে। মায়াবতী থেকে দেখা হিমালয়ের অনুভবে একটা ছবি এঁকেছি সে ছবি উদ্বোধন পত্রিকায় "যোগমূর্তি গিরীশ" নামে বের হয়েছিল। এই ছবিটি আমি স্বামী নির্বেদানন্দজীকে দিয়েছিলুম।

মায়ের বাড়ীতে পূজনীয় সত্যেন মহারাজের সঙ্গে নন্দলালের শিল্প আলোচনার আর একটি বড় দিক ছিল "নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়কে" নিয়ে। সিস্টারের প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলকে কেমনভাবে রুচি সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে পূজনীয় সত্যেন মহারাজ, ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ যেমন ভাবতেন, নন্দলালও সমভাবেই এ বিষয়ে সচেতন হয়েই চিন্তা করতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রুচিবোধ গড়ে ওঠার এক মস্ত দিক, সুন্দরকে ভালবাসার একটা পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার অনুভবও সব

সময় করতেন নন্দলাল। সিস্টারের এই স্কুল আর রুচিবোধের কথায় তিনি প্রায়ই মায়ের (শ্রীসারদাদেবীর) পরিচ্ছন্ন পরিমিত সযত্ন রুচি প্রকাশের কথা বলতেন। নিবেদিতার শিল্পবোধের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। এই স্কুলকে সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ অনুপম করে গড়ে তোলার জন্য প্রাণপাত করেছেন সঙ্গী হিসেবে থেকেছেন নন্দলাল—অসংখ্য ছবিও এঁকেছেন—এই প্রতিষ্ঠানের জন্য।

এই প্রসঙ্গে বলছেন—নিবেদিতা স্কুলকে রুচিসম্মত গড়ে তোলার জন্যে এই শিক্ষা চিন্তা করতে গেলেই স্বামীজীর সিস্টারের স্কুলকে নিয়ে ভাবনার কথা প্রায়ই মনে হত। স্বামীজীর ভারি ইচ্ছা ছিল বিদ্যালয় হবে শিল্প সমারোহে পূর্ণ কিন্তু রুচি সম্মত। "প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন তাঁর সঙ্গে অতিথি আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম"। নিবেদিতা স্কুলে কয়েকবার সুরেনকে (শিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর) নিয়ে গেছি। বাড়ী ঘরের নকসা করার বিষয়ে ওর একটা বিশেষ অনুভূতি আছে। স্কুলের প্রার্থনা ঘরের মায়ের (শ্রীসারদাদেবী) আসন বেদীটির নক্শা করেছি, এছাড়া ওখানে ছবিও এঁকেছি। সামনের পিলারে (Piller)-এ কারুকাজ ও অনেক জায়গায় নক্শাকারী কাজের ব্যবহার করা হয়েছে।

স্কুলের মেয়েরা সরস্বতী পুজো করবে তার মূর্তি দরকার। পূজনীয় সত্যেন মহারাজ আমায় তা এঁকে দেখিয়ে দিতে বললেন—কেমন সে মূর্তি হবে। সে সরস্বতীর নকশাটি নিবেদিতা স্কুল তাদের বিশেষ চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে। ঐ একই ছবি আমার রূপাবলী বইয়ের প্রচ্ছদে ব্যবহার করেছি। এছাড়া স্কুলের জানলায় কাচের প্যানেলে একই সরস্বতীর রেখাচিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে। দরজার মাথায় গোলাকারে ময়ূরের জাফরী নকসা, কিছু কিছু পুরোনো দেবদেবীর মূর্তি লাগান হয়েছে শিক্ষার্থীদের তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরে গড়ে ওঠা শ্রীসারদামঠের মন্দিরে সরস্বতীর অপরূপ রেখাচিত্রটি গর্ভগৃহের সামনেই প্রতিষ্ঠিত।

নন্দলালের সঙ্গে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের যোগ ছিল হৃদয়ের আর নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎটি ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের যোগসূত্রেই। এই প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসাতেই তাঁর প্রথম পরিচয় দিনের কথায় বললেন—সিস্টারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আর্ট স্কুলে। ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ ওঁনাকে নিয়ে এসে ছিলেন আমার ছবি দেখাতে। তখন ছবি আঁকছি 'কালী'র। খুব ভালো ছবি বুঝতে পারতেন, ভালো ছবি চিনতেন। চোখ ছিল। আমার কালীর ছবি দেখে স্বামীজীর Kali the Mother পড়তে বললেন। সেই সঙ্গে রামায়ণের কৌশল্যা দশরথের ছবিতে কৌশল্যার হাতে পাখা দেখে বলে উঠলেন—রানীর হাতে তালপাতার পাখা। রানীর হাতে থাকবে আইভরীর পাখা। আবার একটা ছবি দেখলেন সেটি দেখেই জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা মুখটা কেমন চেনা-চেনা লাগছে। বিষয় ছিল জগাই মাধাই। বললুম গিরিশবাবুকে ভেবে করেছি। এখানে গিরিশের প্রতিকৃতির আদল করার পেছনে একটি ভাগবৎ ভাবনা ও তত্ত্ব লক্ষণীয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনলীলায়

শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পের ওপর আঁকা নন্দলালের স্কেচ

জগাই মাধাইয়ের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনে গিরিশের ভূমিকাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গে নন্দলালের এই চিন্তা মানস একটি বিশেষ মনকেই নির্দেশিত করে।

জগাই মাধাইয়ের ছবি ছাড়া নন্দলাল স্বামী বিবেকানন্দের একটি ছবি করেছিলেন সেটি দেখে সিষ্টার বলেছিলেন এত কাপড় পরিয়েছ কেন? তোমাদের বুদ্ধকে দেখ না। বুদ্ধের প্রতি সিস্টারের ছিল অসীম ভালবাসা। তাঁর কথাবার্তায় থাকত উদ্দীপ্ত করার প্রেরণা। বিষয় বাছতে বলতেন বীরত্বব্যঞ্জক। রামায়ণ-মহাভারতের ছবি আঁকার বেলায়ও সে-কথা বার বার বলতেন। পরে যখন তাঁর বোস পাড়ার বাড়ীতে গেছি কত আপনজনের মত গল্প করেছেন। বলিষ্ঠ দৃঢ় অথচ ভাবপূর্ণ ছবি আঁকলে খুব খুশী হতেন। তাঁর চলা-ফেরা দাঁড়ানোয় কোথাও ঝুঁকে পড়ার ভাব ছিল না। আমার সঙ্গে সুরেন (সুরেন গাঙ্গুলী) যেত। সিস্টারই তো আমাদের অজন্তায় পাঠিয়ে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে দেখিয়ে দিলেন আলো। আমাদের ঐতিহ্য কত মহান কত ঐশ্বর্যবান, কত উজ্জ্বল। আমার ছবি আঁকার বিষয়ে তাঁর প্রেরণা ছিল। তিনি ভালো ছবি কাকে বলে কেমনভাবে হবে এ সমস্ত বলে উদ্দীপ্ত করতেন। সিস্টারকে যে স্বামীজীর ছবি দেখিয়ে ছিলুম সে ছাড়াও আর একটা ছবি এঁকেছিলুম সেটি নিবেদিতা স্কুলে দিয়েছিলুম, জানি না এখন কোথায় আছে।

Santineketan
3. 2. 60.

প্রিয়,

তুমি হয়ত পুরুলিয়ায় চলে গেছ। গৌরীর বিয়ের সময় যেটা এঁকেছি সেটাও বড় বটে তবে সেটা pencil দিয়ে আঁকা। রং দিয়ে আঁকা নয়। যেটা খুব বড় ও সেটা সিল্কের ওপর রং-এর লাইন দিয়ে করা। Dr J. C. Boseএর বাড়িতে তাঁর Lecture Hallএ আছে। সেটাই জানলা কেটে তবে বার করতে হয়েছিল। ছবির inspiration তত গণেনদাদা দিতেন না বরং সেটা sister ও মহিমবাবু দিতেন।

আঃ
নন্দলাল বসু

সিস্টার, তাঁর স্কুল, পূজনীয় সত্যেন মহারাজ, এঁদের নিয়ে কথায় জিজ্ঞাসা করলুম আপনি বাগবাজারে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীর জন্য কিছু করেন নি? করেছি। উদ্বোধন পত্রিকা ও অন্য সব যা বই বের হত তাদের যে গুলোতে আমায় করতে বলতেন আমি করেছি। অন্য কাজের মধ্যে এখনও আছে কিনা জানি না—মা যে ঘরে ঠাকুরের পুজো করতেন তার সামনের বারান্দায় দুটি ছোট মূর্তি করিয়ে দিয়েছিলুম—মূর্তি দুটিরই ড্রইং আমার আর সে সময় উড়িষ্যার বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীধর মহাপাত্রকে দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। শ্রীধর নরম পাথরে কেটেছিল বলে তাকে তুঁষের আগুনে পুড়িয়ে কুচকুচে কালো করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে দেওয়ালে। এছাড়া আমার করা গরুড়ের নকশা নাটমন্দিরে ঢোকবার সময়ই আছে।

একই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছি আপনি তো মায়ের (শ্রীসারদাদেবী) দর্শন পেয়েছেন কিন্তু তাঁর কোন ছবি আঁকেননি কেন? অনেকক্ষণ বাদে বলছেন—মা যখনই দেখা দিয়েছেন তখনই দেখেছি সারা শরীর ঢেকে পা দুটি বার করে বসতেন আর সেই চরণেই প্রণাম করে ধন্য হয়েছি। তাই যখন পূজনীয় সত্যেন মহারাজ মায়ের বিষয়ে বইএর ছবি আঁকতে আদেশ দিলেন তখন কেবলই তাঁর পা দুটিই পদ্মের ওপর এঁকে শেষ করেছি। বেলুড় মঠে মায়ের মন্দিরের ভেতরের সিংহাসনেও নকসাটি আমার ভাবা। তবে মায়ের ছবি এঁকেছি তা একান্ত নিজের মত করে ছোট ছোট আকারে পোষ্ট কার্ডে। তোমার মাসীমা (শ্রীযুক্তা সুধীরা বসু) মায়ের খুব স্নেহ পেয়েছেন। একথা জানার পর আমি মাসীমাকে জিজ্ঞেস করেছি—তিনি সে-কথা বলতে বলতে অন্য জগতে চলে যেতেন। উনি যখন প্রথম সরলাদেবীর সঙ্গে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ী গেলেন তখন মা তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন এ বৌটি কোন্ বাড়ীর গো। সরলাদেবী উত্তর দিয়েছিলেন—যে নন্দলাল এখানে আসে যে ছবি আঁকে এ তারই স্ত্রী। মা দুপুরের খাবারই কেবল খাওয়াননি নিজের হাতে একটি পান খেতে দিয়েছিলেন।

মায়ের জীবনের ওপর একান্ত ছবি যেমন এঁকেছেন নন্দলাল সমভাবেই এঁকেছেন ঠাকুরের কথা ও গল্পের আর জীবনের কিছু কিছু আবেশের। এ প্রশ্ন করাতে বললেন, করেছি তাও একান্ত নিজের মত করে নিজের

জন্যেই। তবে যখনই এ কাজ করেছি তাঁকে ছবির মত করে ভাবতে চেয়েছি মন দিয়ে। দেখতে চেষ্টা করেছি—ঠাকুর কত নজর দিয়ে কত মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। ঠাকুর চমৎকার গল্প বলতে পারতেন মনে হয় যেন সামনে দেখছি। ঠাকুরের সহজ সরল বাহুল্য ছাড়া পোষাক অথচ দেখো কত পরিচ্ছন্ন। খুব পরিপাটি ছিলেন। আমাদের মত নির্গুণ লোকেদের জন্য কেউ কি বলেছেন —তাঁর জন্যে তুমি এক পা এগিয়ে এলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসবেন। কেউ বলেছে—সংসারে থেকেও ঈশ্বরকে ডাকা যায় পাওয়া যেতে পারে। তিনিই একমাত্র যিনি আমাদের জন্য কথা বলেছেন। জ্ঞানীদের জন্য অনেকে আছেন আমাদের জন্য তিনিই ভরসা। আর এই সমর্পণের নির্ভরশীলতায় লিখছেন—কল্যাণীয়াসু . . . ঠিকই বলেছ শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাই আমাদের সম্বল হয়ে থাকুন।

ইতি
আঃ
নন্দলাল বসু
২৬।৪।৫৫

৪. ৯. ৫৪
শান্তিনিকেতন

স্নেহের . . .

তোমার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছি। শরীর ভালো না আর সময়ের অভাব বলে চিঠির জবাব দি নাই।

মহারাজ অপারেশনের পর ভালো আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। . . . ওর মন ভালো। ঠাকুরের ইচ্ছায় ও জীবনে উন্নতি করবে।

আশীর্বাদ করি ঠাকুরের কৃপায় সৎ পথে থেকে শিক্ষক ও আশ্রমের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করে গেলে শিখতে পারবেই। তুমি ও বাড়ীর আর সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ লইবে।ইতি

আঃ
নন্দলাল বসু

নন্দলালের করা ছোট ছোট কাজগুলিকে কেবলই চট্ জলদি কাজের অধ্যায়ে ফেলে দিলে ভুল করব। চিত্রের গুণগত বিচারের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে এর যথার্থতা অনুধাবনে সমর্থ হব। গ্রামীণ ঢেঁকি ঘরের পরিবেশের কাহিনী অবলম্বনে ছোট কাজটি কালি-তুলির একটি অনবদ্য উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যার তীক্ষ্ণ ছন্দায়িত রেখার গতি ও সেই সঙ্গে সুডৌল কালো সাদার অসাধারণ বিভাজন যে-কোন শ্রেষ্ঠ এই ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি রাখতে দ্বিধা হবে না। কেবল তাই নয় একই বিষয়কে অবলম্বন করে একটা রেখাচিত্র ভিন্নতর স্বাদে মন ভরে দেয়। নন্দলালের স্বতঃস্ফূর্ত গুণের অচিন্তনীয় একটি অঙ্গ হল এই ছোট ছোট নানান আঙ্গিকে কাজগুলি একই সময় করলেও কাজের গুণগত ঐশ্বর্যে একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে যায়নি। প্রত্যেকটি রেখাধর্ম নিজের স্বকীয়তা প্রকাশে স্থির থেকেছে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনের ঘটনার ছবিতে ব্যবহৃত রেখার সারল্য ও সাবলীলতা ঈশ্বরপুরুষকেই চিহ্নিত করে। কোথাও কৌশল করে পারদর্শিতা দেখাতে যাননি। দিব্য ভাবনার আশ্চর্য এক সরল ভাগবত পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এই সব ছবিকে দেওয়ালে বড় করে আঁকবার কথা নিজে ভাবছি। আর এ বিষয়ে তাকে যখন জানালুম তিনি আমায় কত সহজে বিনা সঙ্কোচে, বিনা দ্বিধায় লিখলেন—

Santineketan
3.3.60

প্রিয় . . .

তোমার ২৯. ২. ৬০ তাং পত্র পেলাম। আজ বেলুড় মঠে স্বামী বিমুক্তানন্দজীকে ঐ আমার আঁকা শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মায়ের পোষ্ট কার্ডগুলি আমায় পাঠাতে বলে পাঠালাম। তুমি যখন fresco আঁকিবে তোমায় পাঠিয়ে দেব। কেবল মায়ের একটি পোষ্টকার্ড মা নহবদ্ খানার বারান্দায়

বসে আছেন, দক্ষিণেশ্বরে, উহা সিউড়ি মিশনে আছে। সেটি উহারা ছাপাতে নিয়ে গেছলেন কিন্তু ফেরৎ দেন নাই। সেটি যদি উদ্ধার করতে পার বড় ভালো হয়।

আঃ

নন্দলাল বসু

(সিউড়িতে যে আশ্রম আছে তার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন যোগ নেই)

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ঘরে থাকতেন তার দক্ষিণের বারান্দায় কাঠ কয়লা দিয়ে দুটি ছবি এঁকেছিলেন একটা 'আতাগাছে তোতা পাখি' আর দ্বিতীয়টি হল 'জাহাজ'। নন্দলাল যখন দক্ষিণেশ্বরে যান তখন নিজে দেখেন এই ছবি দুটি, তা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়—"ছবি দুটো কাঁচ দিয়ে ফ্রেম করে দেবার জন্যে টাকা দিয়ে এলুম, কিন্তু পরে গিয়ে দেখি সব চুণকাম করে দিয়েছে।" সেই ছবি দুটি নন্দলাল প্রতিলিপি করেছিলেন। আপনার করা ছবি দুটির বেশ বড় প্রতিলিপি পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের (রামকৃষ্ণ মিশন) ছোটদের থাকবার হোস্টেলের বাইরের দেওয়ালে করান হয়েছে। কিন্তু জাহাজের ছবিতে ধোঁয়া যাচ্ছে একদিকে আর পতাকা উড়ছে আর একদিকে। কাজ শেষ করার পরই ছেলেরা সব হৈ হৈ করে ধরছে। হেসে বললেন—ঠাকুর খুব নজর দিয়ে দেখতেন। নরেনকে চাতক পাখি চেনাবার ঘটনা জানো তো। জাহাজের ঐ পতাকা হচ্ছে ধাতু-পতাকা।

১৯৫৭ সালের শীতে পশ্চিম বাংলার পোড়ামাটির মন্দির দেখে বেড়ানোর ইচ্ছে সঙ্গে স্কেচ ছবি এসব করব। যতটা পারি পায়ে হাঁটব। যাবার আগে মাস্টারমশাই-এর কাছে দেখে নিয়েছি কেমন ভাবে মন্দিরের গায়ের কাজ অক্ষত রেখে ছাঁচ নেওয়া যায়। কালি দিয়ে নকসার ছাপ কিভাবে নোব, এই সঙ্গে মন্দিরের কোন ক্ষতি না হয়, পারলে অঞ্চলের মানুষদের যত্ন করতে বলবো।

মন্দির দেখে শান্তিনিকেতনে ফিরে তাকে ছাঁচ, ছাপাই নকশা সব দেখাতে খুব খুশী হলেন। নিজে কাটোয়া লাইনে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গিয়েছিলেন তার গল্পও করলেন। কথায় কথায় তাঁর সময়ে দেখে আসা কামারপুকুরের জয়রামবাটির পথ ঘাটের কোন পরিবর্তন, যুগী শিবমন্দির, হালদার পুকুরের পরিবর্তন না সব তেমনই আছে? এছাড়া লাহাদের আটচালার গঠনের সঙ্গে জাপানী বাড়ীর গঠনের সাদৃশ্যের দিকটি লক্ষ্য করেছি কি না? এমন সব প্রশ্নের মাঝেই জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা আমি বেলের খোলা দিয়ে ফুল কেটে কেটে গোড়ের মালা গেঁথে দিয়েছিলুম ঠাকুরের জন্যে সেটা কি ঠাকুরের ঘরে এখনও আছে?' সেরকম তো কিছু দেখলাম না। তারপরই জিজ্ঞাসা আমার জন্যে কি এনেছ? মাস্টারমশাইয়ের জন্য নিয়ে এসেছি ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন, যেখানে ছিল তাঁর নিত্য চলাফেরা সেইখানকার মাটি। তাঁর হাতে সেটি তুলে দিতেই অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই মাটি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে তা প্রসাদের মত মুখে ফেলে দিলেন। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি। আজও সেই

ন্ময়ে আবিষ্ট সেই বিশেষ সময়টিকে দেখতে পাই। বললেন, কোথায় াখব ? সারা শরীরেই মাখা হয়ে যাক। এই ঘটনা আর কিছু য়—নিবেদিত ভক্তচিত্তের আতিশয্যহীন অনুপম মুহূর্ত চিত্র। বড় াহজেই হয়ত একে খারিজ করা যায় কিন্তু এই বাহুল্যহীন ভালবাসাটি াদয়ে পেতে সমগ্র জীবনটিকে উৎসর্গও করতে হয় স্বার্থহীনভাবে। তাই াব সময় তুচ্ছ সমালোচনার অংশ বিশেষে না দাঁড়িয়ে অনুভব দিয়ে, বাঝা ও বোধের মননে দাঁড়ালে এই ঘটনার তাৎপর্যটিকে উপলব্ধি করতে ারা যাবে।

কামারপুকুরের ঠাকুরের মন্দিরের কথা উঠতেই নিজেই বললেন "মঠ থকে স্বামীজীরা এসেছিলেন ঠাকুরের জন্মস্থান মন্দিরের আকৃতি কেমন বে। আমি বলেছিলুম আমার ভাবনার কথা। ঠাকুরের জীবন ছিল সহজ রল একজন গ্রামের মানুষকে যেমন ভাবে পেয়ে থাকি। একটি বাহুল্য র্জিত অনাড়ম্বর দিব্যজীবন। তাঁর জন্মস্থানের মন্দিরটিও হবে সেই াবমূর্তির পরিপূরক। হয়ত অনেকে বিশাল ভাবে কিছু ভেবে থাকবেন। ানি না। আমার এই সঙ্গে আর একটি কথা বার বার মনে য়েছে—কামারপুকুর যে শান্তশ্রী নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে পূর্ণ আর সখানের ঘরবাড়ির সঙ্গে মানানসই করেই এর নকশা প্রয়োজন। মন্দির বশী উঁচু করলে গ্রামের সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে হঠাৎ খাপছাড়া হয়ে াবার সম্ভবনা থেকেই যাবে।

মন্দিরের নকশা করার আগে কামারপুকুর ঘুরে এসেছি। কামারপুকুর ায়েছিলাম দুর্গাপুরের দিক দিয়ে বাসে, সঙ্গে ছিল পেরুমল। (ছাত্র মরুণাচল পেরুমল) এ পথ দিয়ে কামারপুকুর পৌঁছন এক গল্পের মত। ান্দিরের নকশা করে শ্রীনিকেতন থেকে মাটি আনিয়ে তার মডেল রেছি। প্রথমে করেছি ঠাকুরের ভিটের পুরোনো ঘর পাঁচিল দরজা াসবের ছক। তারপর করেছি আজকের যে মন্দির সেই সমেত বাড়ী ঘর ঘুবীরের মন্দির, যা যেখানে ছিল। রোজ সকালে উঠে এ কাজ করতুম। াজ শেষ হলে শ্রীনিকেতন থেকে পুড়িয়ে নিয়েছি। এই মডেলের মধ্যে াব কিছু Detail এ করেছি। দোতলা খড়ের চালা তুলে নেবার ব্যবস্থা রখেছি যাতে বাড়ীর ভেতরের সব কিছু দেখা যায়। সিঁড়ি খুঁটি যা যখানে যেমনটি আছে। ঠাকুর যে ঢেঁকিঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ওপরেই মন্দির গড়ে উঠেছে। মন্দিরের মাথায় দেখবে শিবলিঙ্গের আভাস আছে। যুগী-শিবমন্দিরের সঙ্গে ঠাকুরের মায়ের ঘটনার কথা মনে রেখে করা।"

আপনার করা এই মডেল আমাদের পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সংগ্রহশালায় রাখা আছে। কিন্তু ঐ মডেলের সঙ্গে আজকের মন্দিরের সামনের দরজার কিছু তফাৎ আছে। হ্যাঁ ঠিকই দেখেছ। আসলে আকারগত পার্থক্য নেই। যেটুকু বাড়িয়ে করতে হয়েছে তা ঠাকুরের ভোগ ইত্যাদি আর ঝড়জলের কথা ভেবে। নাটমন্দির অনেক পরে হয়েছে। তার ছবি দেখে বললেন—গ্রিল দিয়ে ঢাকা কেন ? নাটমন্দির খোলা চত্বরের মত হবে। তীর্থযাত্রীদের জন্য খোলা থাকবে। কিছু কিছু অসুবিধের কথা বললেও তা বেশ মনের মত হয়েছে বলে বোধ হল না।

ঠাকুরের এই মন্দির একটি গোটা চত্বর মোটা ঢালাই নীচে দিয়ে তবে গড়ে উঠেছে। কেননা ঐ অঞ্চলের মাটিতে খুব সহজেই ফাটল ধরে। পাছে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় সেই ভেবে। এখানে ঠাকুরের বেদীতে ঢেঁকির চিহ্ন দিয়েছি। নন্দলাল মন্দিরের ঢোকবার দরজায় একটি গরুড়ের নকশা করেছিলেন। সেই নকশা করার পেছনে তাঁর পছন্দ অপছন্দের একটি মন কাজ করেছে সে বিষয়ে একটি গরুড়ের নকশার ওপর নির্দেশটি পড়লেই বোঝা যাবে—

গরুড়

মন্দিরের সম্মুখে (দক্ষিণে) এই নকশাটার ছাঁচ নাই। এ নকশাটা আমার বেশী পছন্দ। এটা কি কারিগর ছাঁচ ছাড়া চেষ্টা করতে পারবেন ? প্রথম ছাঁচ হতেই এর কাটার ইঙ্গিত পাবেন। যদি অসুবিধা হয় যে ছাঁচ আছে তা হতেই কাটবেন।

(নন্দলাল কারিগরদের সবসময় সম্মান দিতেন। তাঁদের সম্বোধন করে অন্যজনকে নির্দেশ দিচ্ছেন সেখানেও তাঁর শ্রদ্ধার প্রকাশটি দেখবার) প্রকৃতির পরিবেশে মিলেমিশে মন্দিরটিকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন আর স্থাপত্যকলায় পরিবেশ অনুযায়ী স্থাপত্য রচনার যে আলোচনা আমরা শুনে থাকি নন্দলালের কল্পনায় সৃষ্ট এ মন্দির সাকার বাস্তব রূপের এক দৃষ্টিনন্দন ও মনোহারী দৃষ্টান্ত।

আচার্য নন্দলাল যেমন মঠে আর উদ্বোধনে যেতেন তেমন অনেক সময় মঠের সন্ন্যাসীরাও আসতেন নানান কাজে আবার কেবলই সাক্ষাতের

জন্য শান্তিনিকেতনের শ্রীপল্লীর বাড়ীতে। এঁরা এলে নন্দলাল অত্যন্ত খু
হতেন। নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত কেবল নিজে একাই হতেন না এ কা
তাঁর ছাত্রদেরও যুক্ত করতেন। পুরানো উদ্বোধন পত্রিকায় তাঁর কাজে
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের কাজও চোখে পড়বে। দেওঘর রামকৃষ্ণ মি
বিদ্যাপীঠের স্বামী নির্বেদানন্দজীর অনুরোধে নন্দলাল প্রথম শিল্প শিক্ষ
হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর অন্যতম স্নেহধন্য ছাত্র বিনোদকে
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। পূজনীয় আত্মবোধানন্দের কাছে পাঠাতে
ইন্দুসুধা ঘোষকে যিনি পরে স্বদেশী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত ক
কারাবরণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভা
রামকিঙ্করকে দিয়ে করানো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রিলিফ মূর্তিটির স
আমাদের পরিচয় খুবই সামান্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের সঙ্গে নন্দল
কেবল নিজেই যুক্তই ছিলেন না তার সশিষ্য যোগের একটি ছে
বয়ান—"রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে শিল্পীদের যোগ দীর্ঘদিনের—
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ, মণিভূষণ এঁরা সবাই গভীরভা
যুক্ত ছিলেন এই পরিমণ্ডলের সঙ্গে যার যোগ সূত্র ছিলেন গুরু নন্দলাল

কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দিরের আর সেখানে ঠাকুরের বেদীর নকশ
কথা বলতে বলতে বেলুড় মঠে তার করা ঠাকুরের বেদীর প্র
আলোচনাতেই জানতে চেয়েছি বেলুড় মঠের মন্দিরের আঙ্গিকে তি
কোন কাজ করেছেন কিনা?

মঠের মন্দিরের জন্যে কাজ করেছি। মন্দিরের বাইরের দিকে উঁচু
চারপাশে যে নবগ্রহের মূর্তি আছে সে সব তৈরী করা হয়েছে আমার ক
নকশা থেকে। আমি বড় বড় কাগজে কালি দিয়ে কাজ শেষ করে দিয়ে
(কার্টুন) পাথর কাটাই মিস্ত্রিরা তাকে পাথরের ওপর ছাপ ফেলে যেভা
চেয়েছি সেভাবেই কেটে দিয়েছে। সেই কাজের সময়ই গোপেনবাবু ব
ভারী সজ্জন একজন স্থপতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তিনি এসব কা
দেখাশুনা করতেন। তিনি মার্টিন বার্নের তরফের লোক হলেও ম
দীক্ষিত ও হৃদয় সম্পর্ক ছিল মঠের সঙ্গে। গর্ভমন্দিরে ঠাকুরের বেদী
আমার করা নকশায়। এ ছাড়া একটু নজর দিয়ে নাটমন্দিরের জান
দরজার ওপর দিকে দেখলেই দেখবে চারিদিকে প্রায় চার ফুট মত চও
টানা জায়গা ছাড়া আছে। ইচ্ছে ছিল ম্যুরাল করব পদ্ম দিয়ে। স্বামী
চেয়েছিলেন—"দেওয়ালে শত সহস্র কমল ফুটে থাকবে। মন্দিরের ম
একটি রাজহংসের ওপর ঠাকুরের মূর্তি।" আমি তো ম্যুরাল করা

ড়মঠের মন্দিরে নন্দলালের নকশা অনুযায়ী করা নবগ্রহের মূর্তি

পারলুম না তোমরা সম্ভব হলে শেষ করবে। প্রসঙ্গক্রমেই মনে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও রুচি ভাবনার সঙ্গে আমরা এখনও পরিচিত হতে পারিনি। আমরা কেবলই তাঁর মানুষের জন্য অসীম বেদনাবোধের অনুভূতিতেই বিস্ময় বোধে থেমে থেকেছি। কিন্তু এই ভাস্বর জীবনটির মননের গভীরে শিল্প ও রুচি বোধের কেবল একমাত্র উপমা বেলুড় মঠের মন্দিরটিই নয়, এই প্রবাহের সূত্র সন্ধানে দেখতে পাব একটি অবিস্মরণীয় দিনের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণের নজীরবিহীন সুদুর প্রসারী দিব্যভবিষ্যতকে—

(প্রস্তাবের অংশ মাত্র) "১৮৯৭ সালে ১লা মে তারিখে সমুদয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যের এক সমাবেশে বিবেকানন্দ প্রস্তাব করেছিলেন যে গুরুর নামে এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর যে কার্য প্রণালী স্থিরীকৃত হয়।
(তার মধ্যে অন্যতম একটি হল)
শিল্পকলাদির বিবর্ধন ও উৎসাহদান।"

ঐ একটি দিনের প্রস্তাব বিবেকানন্দের রুচি ও শিল্পকলার প্রতি মমতা ও আকর্ষণ বোধের পরিচয় দেবে।

শিল্পের জন্য নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী নন্দলালের বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করার একটি সরল দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট।

নন্দলালের জীবনের অতি অন্তরঙ্গ অনুভূতির কিছু কিছু দুর্লভ ঘটনা আজও আমায় এক অদ্ভুত পরিবেশে উপস্থিত করে দেয়। প্রথমেই বলেছি, এই ভাবনাকে কেবলমাত্র যুক্তি, কেবলমাত্র তর্কজালের মধ্যে জড়িয়ে দিলে মূল অনুভব থেকে বঞ্চিত হব। বিচিত্র মনের মানুষের ভীড়ের ভেতরই বসবাস সবার। সেই বিচিত্র পরিবেশে এমন সব দুর্লভ মনের স্পর্শ ও নাগালের কাছে উপস্থিত থাকলে নিজেকে বড় কৃতার্থ বলে বোধ হয়।

যাওয়া আসার মধ্যে কোনদিন আলোচনা করেন আবার কোনদিন ছবি কেমন হবে তাও ছোট ছোট করে দেখিয়ে দেন। আচার্য নন্দলাল সব সময় সঙ্গে একটি চামড়া ভাঁজ করা একটু বড় ধরনের ব্যাগ রাখতেন। তাতে টাকা-পয়সা থাকত না। থাকত তার নিজের চটজলদি স্কেচ করার চিঠি লেখার, প্রয়োজনে কলম পেনসিল আর সাদা পোস্টকার্ডের সাইজের মোটা কাগজ (কার্ড)। দেখতুম সেই ব্যাগটি বেশ পুরোনো হয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও পরম যত্নে সেটি সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গেই থেকেছে। মাষ্টারমশাইকে কিছু না বলে একই মাপের একটি চামড়ার ব্যাগ তৈরী করে তাঁর হাতে দিলুম পুরোনোটা পাল্টে নেবার জন্যে। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বেশ হয়েছে বলে ফিরিয়ে দিলেন আমায়, গ্রহণ করলেন না। মনে যে আঘাত পাইনি এমন নয়, কিন্তু চুপ করে থেকেছি। এমনই আসা-যাওয়া মাঝেই একদিন হঠাৎ তাঁর ব্যাগটি আমার হাতে দিয়ে একটু পরিপাটি কে গুছিয়ে দিতে বললেন। গুছতে গুছতে দেখলুম ব্যাগের এক জায়গা একটু চেরা মত। সেই চেরা জায়গায়টা একটু ফাঁক করে আঙু ঢোকাতেই হাতে কাগজের মত ঠেকতেই সেটি বার করেই দেখলুম এক কাগজে দুটি ছোট্ট ফটোগ্রাফ—সেটি হল শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর সেই দেখামাত্রই আমার ভেতর থেকে তিনি যে ব্যাগ গ্রহণ করেননি তা সমস্ত খারাপ লাগাটুকু ধুয়ে মুছে গেল। আমার কাছে ঐ প্রত্যাখ্যানে পুরস্কারটি হয়ে রইল চিরদিনের। অক্ষয়। বাহ্যত আচার্য নন্দলালে কেউ কখনও ধর্মের আচরণ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখেননি। এ বিষয়ে তিনি পরিষ্কার করে বলছেন—"শিল্পের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য য তার সঙ্গে লৌকিক আচার ধর্মের বা নীতি ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।"

যখন প্রথম চাকরী নিই সে সময় মাষ্টারমশাই একটি কথ বলেছিলেন—আজকে তার তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারি আর তাই সেকথা সমসঙ্গীদের জন্যেও উল্লেখ করছি। নন্দলাল বলেছিলেন—যে প্রতিষ্ঠানেই থাক সেখানে ঢোকা মাত্রই তার পরিবে যেন বলে দেয় যে এখানে শিল্পী বসবাস করেন। একথা কত সত্য আজ বুঝতে পারি। আমরা কতটুকু পারছি এর থেকেও বড় জিজ্ঞাসা কতটু সচেষ্ট হচ্ছি। যেখানে কাজ করি সেখানকার বার্ষিক পত্রিকার জন্য একটি আশীর্বাদবাণী চাইতে গেলুম। সে সময় মাষ্টামশাই তার কলকাতা বাড়ীতে—লিখলেন—

"শিল্পীর হৃদয়ে ভগবানের
ভক্তি থাকলে চিত্র ভালো আঁকতে পারে"
শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের
নন্দলাল বসু

১০/১/১৯৫৯

এই লিপি আশীর্বাদের উল্লেখের কারণ কি? কারণ আর কিছু না একটি পূর্ণ বিশ্বাসের অসাধারণ উজ্জ্বল নিদর্শন। একথা ভুললে চলবে না প্রেম ভালবাসা আর ভক্তিময় হৃদয় শিল্পী হওয়ার অন্যতম শর্ত। অবশ্য এ ভাবনার ভিন্ন আলোচনা হতেই পারে।

কেমনভাবে কত সুন্দর পরিবেশ কার জন্য যে অপেক্ষা করে থাকে এতো জানা যায় না—। পুরুলিয়া থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছি—মাষ্টারমশাইকে তাঁর বারান্দার বসার জায়গায় না পেয়ে ছবি আঁকার ঘরের দিকে গিয়ে দেখি প্রায় দরজার সামনেই ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসে নিবিষ্ট মনে মুখের সামনে দুহাতে ধরে একটা বই দেখছেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও আমার উপস্থিতি তিনি বুঝতে

াপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচ্ছদ
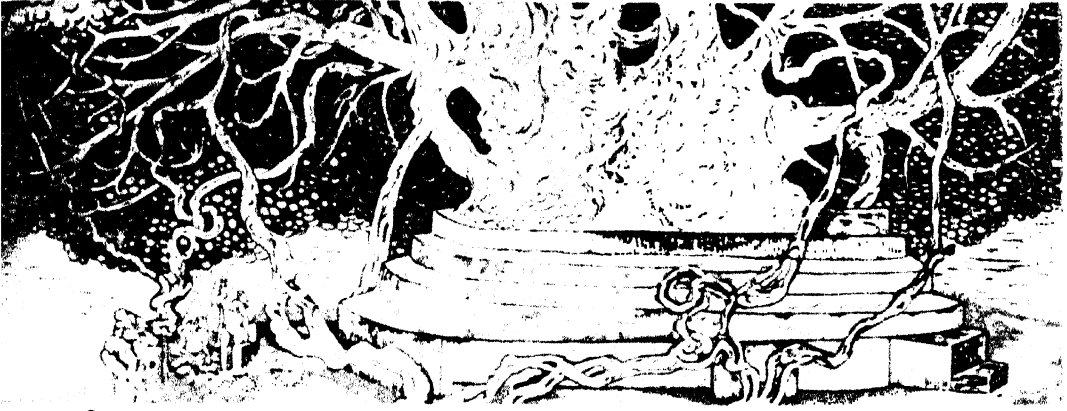
বললেন না। অনেক দ্বিধা সঙ্কোচ নিয়ে আস্তে করে মাথার কাছে গিয়ে ড়াতেই দেখলুম। দেখলুম আচার্য্য নন্দলাল বই দেখছেন না তন্ময় হয়ে ট ছবিকে একত্রে দেখছেন। ছবি দুটি তাঁদের, যাঁদের দেখেছি তাঁর ছবি াকার জায়গায়, যাঁদের চিরসঙ্গী করে রেখেছেন নিজের নিত্য অভ্যাসের াজনামচার ঝুলিতে—সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবী। নিঃশব্দে ক অদ্ভুত অনুভূতির সঙ্গসুধা নিয়ে ফিরে এসেছি কিন্তু আজও আমার ছে সেই ১৯৬৩ সালের ২০ মার্চের সকালটি অম্লান।

কিছুদিন, কিছু মুহূর্ত জন্মগ্রহণ করে যা রোজই নতুন। প্রতিদিনের র্যোদয়ের মত। যাকে প্রতিদিন নতুন করে অনুভব করা যেতে পারে মনি এইসব বিরল ঘটনা আর মুহূর্তেরই অংশমাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার পরিমণ্ডলের অনুষঙ্গ উপহার দিয়েছে এক সাধারণ চরিত্র-জীবন। যাকে চাইলেই পাওয়া যায় না আর ইচ্ছা হলেই তা হওয়া যায় না। এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতি-সাধনা। ই সাধনায় ব্রতী নন্দলাল তাঁর জীবনকে যেভাবে পরিচালিত করেছিলেন র নিজের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রোজ যে মানুষটি কে দেখে খুশী হতেন তাঁর এই অমলিন ঐশ্বর্যগুণে তিনি হলেন ীন্দ্রনাথ। সেই নিত্যদিনের সংশয়াতীত দেখাটি এমন—

প্রথমেই দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয় বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তাহলে সেই পথে অবস্থা উন্নতি হবার সুযোগ যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চা দাম যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্পসাধকের তপস্যার সম্মুখে রজতনূপুর-নিক্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তি বর দেন। সেই মুক্তি লোকে বিরাজ করেন নন্দলাল তাঁর ভয় নেই।

তাঁর মন গরীব নয়। তাঁর সমব্যবসায়ীর কারোর প্রতি ঈর্ষার আভাস মাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য। নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না।"

এই নন্দলাল তৈরী হয়েছেন বিন্দু বিন্দু জীবন সর্বস্ব করে। কেবল রেখায় বর্ণে ছন্দের মনোময় সাবলীল অথচ ঋজু গতিটির প্রাণের সন্ধান পেতে গেলে "রসো বৈ সঃ নন্দলালকে চিনতে হবে যিনি শিল্পের রস গ্রহণ চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে" কথাটি বলেছেন।

আর তীব্র শিল্পাশ্রয়ী অধ্যাত্মবোধে রসপূর্ণ হয়ে সাবলীলভাবে বলতে পেরেছেন—"নিত্যনিয়মিত সাধনার ফলে অবশেষে মনটি হবে পূর্ণ কলসের মত। কোন কারণে এই পূর্ণ কলসটির একটু নাড়াতেই অক্ষয় রসানুভূতি রূপানুভূতিতে ছলকে পড়ে হবে—ছবি-মূর্তি, গান, কবিতা আর নৃত্য। আত্মাকে মানতে পারলেই এর পূর্ণতা।"
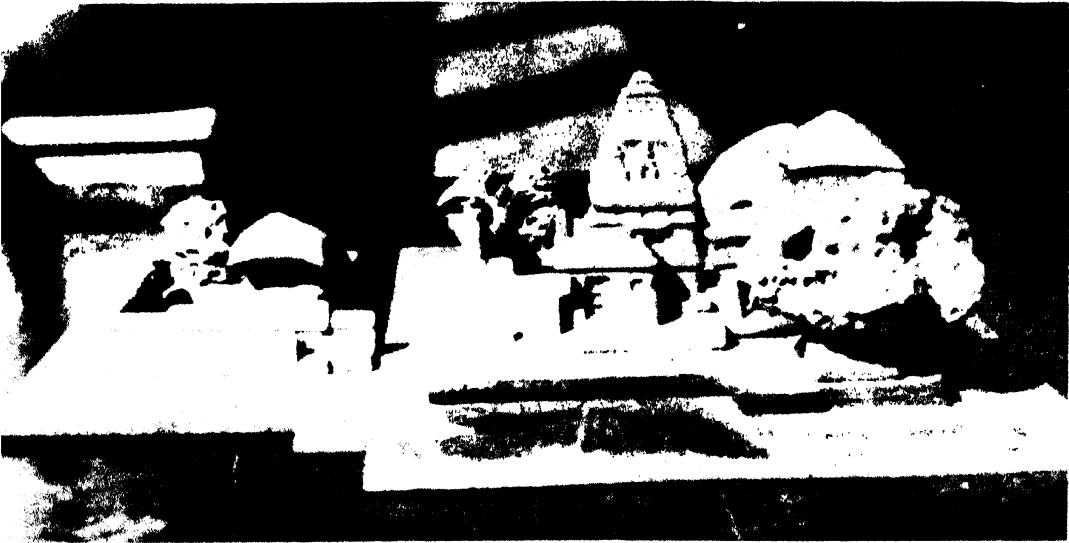
লালের পরিকল্পিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী পোড়ামাটির মডেল

Santiniketan.
3.2.60.

৩-২-৬০ তারিখে লেখা চিঠি

একে একজন সাধকের অক্ষয় উপলব্ধি ছাড়া কি বলা যেতে পারে

ভারত শিল্প ইতিহাসে আচার্য্য নন্দলালের অবদানের একটি বিস্ময়ব দিক যেমন আছে, তেমনই স্বামী বিবেকানন্দের মানসদৃষ্টিতে দে "রামকৃষ্ণ যুগ" জাগরণের আলোকময় উদ্বোধনের প্রথম ও প্রধান শি পুরোহিত বলে সংশয়াতীতভাবে আগামীকালের কাছে সাধক নন্দলা চিহ্নিত হয়ে রইলেন। অনেকের কাছে এটি একটি অতিশয় স্পর্দ্ধার উ মনে হলেও শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে উদ্ভাসিত প্রথম আলোর কিরণচ্ছ সেই জাগরণের বার্তাই বহন করছে।

নন্দলালের প্রান্তজীবনে কিন্তু আত্মবোধের পরিপূর্ণ অনুভব অধ্যা তাঁর কাছে আমার উপস্থিতি। তখন তিনি অন্যান্য চিত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীকে অবলম্বন করে ছোট ছোট নৈবে রচনায় মগ্ন।

আমার দেখা আচার্য্যের সঙ্গে আর অন্যের পূর্বে দেখা নন্দলালে দৃষ্টিকোণের, ভাবনার, গ্রহণের তফাৎ ঘটতেই পারে। তবে আমার দেখ মাঝে মাঝেই পূর্বের নন্দলালকে দেখতে চেয়েছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভে দিয়ে। ঐ একটি জায়গা যাঁর দেখার অন্তরের দৃষ্টির কাছে আমাদে বিশ্বাসকে নির্ভয়ে রাখতে পারি। বিচিত্র মন নানান জিজ্ঞাসা আর সন্দে থাকলেও কোন উপায় থাকে না।

এখন ভাবি কি অপ্রতুল শূন্যতা, অজ্ঞতা কিন্তু কি মুগ্ধ বিস্ময় নি এসেছিলুম দগ্ধ বৈশাখের ভরা দুপুরে। ফিরিয়ে দেননি। মহা-হৃদয়ে গে আর মমতার সঙ্গ দিয়ে, প্রতি আচরণে একটি সৎ দীক্ষার স্পর্শ দিয়েছেন

আমার দেখা, শোনা, চেনা ও নির্জন আলোচনার প্রাসঙ্গিক কথামাল আরও একটি বিস্ময়—শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর কাছে কত তার একটি নির্মল চিত্র পেয়েছি কিন্তু যেখানে তার উত্তরণ ঘটল আর গভীরে আরও ব্যাপ্তির মধ্যে বিস্তারিত সে-হ'ল—

"আমরা হচ্ছি এক পরিবারভুক্ত
রামকৃষ্ণপরিবার"

যাঁদের কাছ থেকে অকৃপণভাবে সাহায্য পেয়েছি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীবিশ্বরূপ ব নিবেদিত বসু, প্রয়াত শিল্পী প্রশান্ত রায়, শ্রীযুক্তা প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মি কনভেনশন কমিটি ১৯৮০, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা, ইন্দুসুধা ঘোষ, নিবেদি বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ,—পুরুলিয়া। গ্রন্থপঞ্জীঃ বিবেকা রচনাবলী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, নন্দলাল সংখ্যা। শিল্পক নন্দলাল বসু।

নিবেদিতার সান্নিধ্যে নন্দলাল

কমল সরকার

গনী নিবেদিতা

॥ এক ॥

শিল্পী নন্দলাল বসু দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁর ওই দীর্ঘজীবনে নানা রণ্য মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। ভারতেতিহাসের সেই বরেণ্য ক্তিবৃন্দের প্রথম মানুষ অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভগিনী বেদিতা, রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধিজির নামও করতে হয়। শিল্পানুশীলনের ধ্যমে ওঁদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর।

তাঁর শিল্পীজীবনের ভিত্তি গড়ে দেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষা আর নির্দেশেই সাভিনিবেশে তাঁর চারুকলা চর্চা। এক কথায় দলালের শিল্পীজীবনের সাফল্যের মূলে অবনীন্দ্রনাথের অবদান অসীম।

নন্দলালের শিল্পীজীবনের সূচনায় তাঁকে প্রভাবিত করেন আরও কজন। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার অনুপ্রেরণা আর ান্তরিকতা তাঁর শিল্পীজীবনের পরম পাথেয়। নন্দলাল বলেছেন : প্রায়ই যেতুম তাঁর কাছে। নানা উপদেশ দিতেন তিনি। আমাদের ঘরের াকের মত হয়ে গিয়েছিলেন যেন। স্নেহভরা ঘরোয়া কথাও কইতেন।"

নন্দলালের সঙ্গে পরিচয় হবার পর মাত্র পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন বেদিতা। কিন্তু ওই পাঁচ বছরে নিবেদিতার যে সান্নিধ্যটুকু পেয়েছিলেন দলাল তা তাঁর শিল্পচেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিল প্রভূতভাবে। নন্দলালের মননশীলতার মূলে নিবেদিতার অবদান অস্বীকারের উপায় নেই।

নিবেদিতার সঙ্গে নন্দলালের প্রথম পরিচয় কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। নন্দলাল তখন ওই আর্ট স্কুলের ছাত্র। অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে একদিন ওই আর্ট স্কুলে গিয়েছিলেন নিবেদিতা। ঘটনাকাল ১৯০৬। নিবেদিতাকে আর্ট স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪—১৯৪১)।

আর্টস্কুলে নিবেদিতাকে দেখানো হয়েছিল নন্দলালের আঁকা কয়েকটি ছবি। ছবিগুলির মধ্যে 'কালী', 'সত্যভামার মান' আর 'দশরথ ও কৌশল্যা' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'কালী'-র ছবি দেখে বিস্মিত হন তিনি। কারণ, 'কালী' কে আঁকার সময় কাপড় পরিয়েছিলেন নন্দলাল। তাই নিবেদিতা নন্দলালকে বলেছিলেন—"একি কালী যে উলঙ্গিনী। কোন আবরণ নেই তাঁর। কাপড় চোপড় দিয়ে এমন কিম্ভূত করেছ কেন। স্বামীজির লেখাটা পড়ে দেখো।" নিবেদিতা সেদিন কালীর ওই ছবি প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের 'কালী দি মাদার' কবিতাটিরই উল্লেখ করেন।

নন্দলালের 'সত্যভামার মান' ছবিতে দেখানো হয়েছিল সত্যভামার পায়ে হাত দিয়ে মানভঞ্জন করছেন শ্রীকৃষ্ণ। ছবিটি দেখে গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নিবেদিতার মনে। তাই ওজস্বিনী ভাষায় শিল্পীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—"তুমি তো পুরুষ মানুষ, তবে স্ত্রীলোকের পায়ে হাত দেওয়া ছবি করেছ কেন ? এতে যে তোমাদের মন খাটো হয়ে যাবে। তোমরা আঁকবে মহাভারতের কৃষ্ণকে, বীর কৃষ্ণকে ; তোমাদের মন সতেজ হয়ে উঠবে তাতে।" 'দশরথ ও কৌশল্যা' ছবিটির বিষয় ছিল দশরথের মৃত্যু। রামচন্দ্রের বনবাসের দুঃখে ও শোকে শায়িত মুমূর্ষ দশরথের পায়ের কাছে হাতে একটি পাখা নিয়ে বসে আছেন কৌশল্যা। ছবিটির শান্ত নির্জন পরিবেশ মুগ্ধ করেছিল নিবেদিতাকে। নন্দলালের ছবির ওই পরিবেশ দেখে তাঁর মনে পড়ে যার সারদামাতার ঘরের কথা। ছবিটি তাই চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছবির কৌশল্যার হাতের তালপাখাটি তাঁর মনঃপূত হয়নি। রানীর হাতে তালপাতার পাখা থাকবে কেন—প্রশ্ন করেছিলেন তিনি নন্দলালকে। তাঁর যুক্তি রানীর হাতে থাকবে আইভরির পাখা। হাতির দাঁতের পাখা কেমন হয় মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এস একবার। শুধু ছবি আঁকলেই চলবে না ইতিহাসও জানতে হবে, পড়তে হবে।

আর্ট স্কুলে নন্দলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তাঁকে যেতে বলেছিলেন সিস্টার। গণেন মহারাজকেও নির্দেশ দেন তিনি এ-বিষয়ে। সেই থেকে শুরু হয় সিস্টারের বাড়িতে নন্দলালের যাতায়াত। চারুকলা বিষয়ক আলোচনার জন্যেই সিস্টারের বাড়িতে তাঁর ওই আসা-যাওয়া। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে থাকতেন তাঁর এক সহকর্মী। তিনি সিস্টার ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল (১৮৬৬—১৯৩০)। নিবেদিতার স্কুলের শিক্ষিকা।

বাগবাজারে সিস্টার সন্দর্শনে যাওয়া এবং ওঁদের কথোপকথনের বিষয় নিজেই বলে গিয়েছেন নন্দলাল। নন্দলালের স্মৃতিচারণ থেকেই জানা যায় নিবেদিতার বাড়িতে সতীর্থ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়েও গিয়েছিলেন তিনি। বাখরগঞ্জ বা বরিশালের সুরেন্দ্রনাথ (১৮৮৫—১৯০৯) অবনীন্দ্রনাথের আর এক প্রিয় ছাত্র। নন্দলালের মত নিবেদিতার সান্নিধ্যেও যান তিনি। তাঁর নানা ছবি ছাপাও হয়েছিল ভারতী, প্রবাসী আর মডার্ন রিভ্যুতে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সঙ্গে ছাত্র বয়স থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন। পত্র-পত্রিকায়

নিবেদিতা (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থ থেকে) নন্দলাল ও সৈয়দ আহমেদের যুগ্মভাবে অনুলিপি করা অজন্তার 'দি গ্রেট বুদ্ধ'

নন্দলালের ছবির যেমন ব্যাখ্যা করেছেন নিবেদিতার ঠিক তেমনি তিনি সুরেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির ব্যাখ্যাও করেন। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা 'ফ্লাইট অব লক্ষ্মণ সেন' (লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন) অবলম্বনে নিবেদিতার লেখনী ধারণ সেযুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে প্রতিভাবান শিল্পী সুরেন্দ্রনাথের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়। বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সিস্টার নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের আলোচনার এক স্কেচও আছে নন্দলালের।

নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে যাবার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে নন্দলাল বলেছেন : "একদিন আমি আর সুরেন গাঙ্গুলী গেলুম সিস্টারের ঘরে দেখা করতে। বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ির একটা ছোট্ট কামরা। আমাদের বসতে বললেন। আমরা বসলুম একটা সোফাতে। নিচে মেঝের কার্পেট পাতা ছিল। সিস্টার বললেন 'তোমার নেমে বস'। বলতে, আমাদের খুব রাগ হল। মেমসাহেব আমাদের অপমান করল। সিস্টার কিন্তু তখনই বললেন, আমাদের ভাব বুঝে, 'তোমরা বুদ্ধের দেশের লোক। তোমাদের সোফায় বসা দেখতে আমার ভালো লাগেনা। তোমরা এই যেভাবে বসেছ ঠিক বুদ্ধের মতো। ভারী ভালো লাগছে আমার দেখতে।"

নিবেদিতার বাড়িতে যাতায়াতের সময়ে তাঁর অনুরোধে বুদ্ধের মত পদ্মাসনে বসা বিবেকানন্দের এক ছবিও এঁকে দেন নন্দলাল। নিবেদিতা বলেছিলেন—"হিমালয় : গঙ্গার ধারা নেমে আসছে : পাশে স্বামীজি বসে আছেন ধ্যানস্থ হয়ে।" নিবেদিতার বর্ণানুযায়ী আঁকা নন্দলালের বিবেকানন্দ পেয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি।

'জগাই-মাধাই' নন্দলালের প্রথম জীবনে আঁকা ছবিগুলির অন্যতম। আনন্দকেন্টিস কুমারস্বামী ছবিটি নিয়ে নেন। আঁকা শেষ হবার পর এ-ছবিটিও নিবেদিতাকে দেখিয়েছিলেন নন্দলাল। ছবিটি দেখে ভাল লেগেছিল নিবেদিতার। ছবিটির জগাই আর মাধাইয়ের মুখাকৃতি অভিভূত করে তাঁকে। তাই নন্দলালকে প্রশ্ন করেছিলেন সিস্টার—"মুখের এ টাইপ তুমি পেলে কোথা থেকে?" নন্দলাল উত্তর দিয়েছিলেন—"গিরীশ ঘোষ মশাই থেকে।"

নন্দলালের নিবেদিতা সন্নিধান প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন অনেকে। সে স্মৃতিচারণগুলির মাধ্যমে নিবেদিতার প্রতি নন্দলালের আনুগত্যের কথা জানা যায়। চিত্রাঙ্কনে নন্দলালকে তিনি যেমন অনুপ্রাণিত করেছেন বারবার তেমনি তাঁকে নিবৃত্তও করেছেন ক্ষেত্রবিশেষে। নিবেদিতার নিষেধাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করার স্পর্ধা কোনোদিন হয়নি নন্দলালের। নিবেদিতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তিনি।

নন্দলালের সতীর্থ শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১—১৯৭৫) নন্দলালের নির্দেশ পালনের এক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন বিশ্বভারতী পত্রিকার 'নন্দলাল বসু সংখ্যায়' (১৩৭৩)। ওই পত্রিকা

াদ্রনাথ লিখেছেন :

একবার তিনি রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকছেন, পিছনে এসে দাঁড়ালেন নী নিবেদিতা। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন বৃন্দাবনের সেই রূপ প্রেমিকযুগলকে ; কিন্তু কৈ, তাঁদের নয়নে স্বর্গীয় সুষমা নেই তো, াকের দিব্যজ্যোতিতে দীপ্ত হয় নি তো সুঠাম শ্যামতনুবর। নিবেদিতা লেন, কার ছবি আঁকছ, আর্টিস্ট ?'রাধাশ্যামের', নন্দলাল বললেন।'তা নীলাভ অঙ্গলাবণ্য দেখেই বুঝেছি, কিন্তু এতে যে যৌবনসুলভ াাচ্ছাস তোমার, আর্টিস্ট। পঞ্চাশ অতিক্রম না করে রাধাকৃষ্ণের লীলা একোনা, বুঝলে ?'

ন্দলাল সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।"

॥ দুই ॥

ামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে উদ্দীপিতা হন নিবেদিতা। ফলে, জির চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। বিবেকানন্দের নির্ভীকতা তাঁর শিল্পচেতনাকেও আত্মস্থ করেন তিনি। স্বভাবতই ভারতের ভাস্কর্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদাসচেতন। তিনি বিশ্বাস তন প্রাচীন ভারতের শিল্পভাস্কর্যের দ্যোতনার মূলে অধ্যাত্মচেতনা মান। অতএব প্রাচীন রীতি-নীতির অনুশীলন ও পুনরুদ্ধার াজন। ওই অনুশীলন ও পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে এ-যুগের শিল্পীদের হবে আরও এক দায়িত্ব। সেটি হলো অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ায়কে চিত্রকলার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে সবার সামনে। সে কারণে, দখা অথবা আলোচনার মাধ্যমে নন্দলাল আর সুরেন্দ্রনাথকে াপিত করতেন রামায়ণ-মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে ছবি তে। এতে ঐতিহ্যময় অতীতকে প্রত্যক্ষ করে আত্মবিশ্বাস ফিরে দেশের মানুষ।- নিবেদিতার এ চিন্তা প্রসঙ্গে নন্দলাল ছেন : "আর বলতেন, রামায়ণ মহাভারত থেকে বীরত্বপূর্ণ সব কাহিনী ছবি আঁকতে। তারপর প্রায়ই যেতুম তাঁর কাছে। নানা উপদেশ ন তিনি।"

ভারতসভ্যতা ও সংস্কৃতির অনন্য নিদর্শন অজন্তা। অজন্তার স্থাপত্য আর চিত্রকলা বিশ্বের বিস্ময়। ভারতীয় শিল্পী ও ভাস্করদের অজন্তার অভিজ্ঞতা অবশ্যই প্রয়োজন। এ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজস্ব 'ক্ল্যাসিক্যাল' ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হবেন শিল্পীরা। অজন্তার স্থাপত্যশৈলী আর চিত্রকলারীতি শিল্পীমনের বিকাশেরও সহায়ক হবে। সেজন্যে তিনি নন্দলাল অসিতকুমার প্রমুখ শিল্পীদের অজন্তায় প্রেরণের জন্যে সচেষ্ট হন। কারণ, ওই সময়ে নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদের অজন্তায় প্রেরণের প্রস্তাবও ওঠে। ফলে, এ-বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন নিবেদিতা।

অজন্তাগুহার বিস্ময়কর অস্তিত্বের কথা ইউরোপ প্রথম জানতে পারে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। অজন্তার অস্তিত্বের কথা জানাজানি হবার পর ওই গুহার দেয়ালচিত্রগুলি অনুলিপি করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অজন্তার চিত্র অনুলিপির জন্যে প্রথম সোচ্চার হন জেমস ফারগুসান (১৮০৮—৮৬)। স্থাপত্যবিদ্যা-বিশারদ ফারগুসনের বক্তৃতা ও লেখালিখির জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ তাঁর প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ফলে, মাদ্রাজ ইউনিটের একজন সৈনিক-শিল্পীকে অজন্তার চিত্র অনুলিপি করার জন্যে প্রেরণ করা হয়। শিল্পীটির নাম মেজর রবার্ট গিল। বিভিন্ন সময়ে প্রায় বারোবছর ধরে সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্যন্ত মেজর গিল অজন্তার চিত্র অনুলিপি করেন। মেজর গিলের অধিকাংশ চিত্রই লণ্ডনের ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে প্রদর্শনীর সময় আগুনে ভস্মীভূত হয় (১৮৬৬)।

রবার্ট গিলের পরে বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টের শিক্ষক জন গ্রিফিথস (১৮৩৮—১৯১৮)-এর নেতৃত্বে অজন্তার দেয়ালচিত্র অনুলিপি করা হয়। গ্রিফিথসই প্রথম ওই কাজে ভারতীয় ছাত্রদের নিযুক্ত করেন। এ ঘটনাও উনিশ শতকের। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রিফিথস-এর উদ্যোগে বার কয়েক অনুলিপি করা হয় অজন্তার চিত্র। সরকারী অর্থের সাহায্যে গ্রিফিথস শেষ করেন কাজটি।

অজন্তার কাজে গ্রিফিথস-এর যে ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁর সহযোগিতা করেন তাঁদের অগ্রণী পেস্টনজি বোমানজি (১৮৫১—১৯৩৮)। স্যার

...লের স্কেচ। বাগবাজারের বাড়িতে ক্রিস্টিন, নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে

নন্দলালের জগাই-মাধাই

জে জে স্কুল অব আর্টের শিক্ষার্থী পেস্টনজি বোমানজি শুধু গ্রিফিথস-এরই ছাত্র নন। স্বনামধন্য রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর পিতা জন লকউড কিপলিংএরও (১৮৩৭—১৯১১) তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ওই আর্ট স্কুলে কিপলিং আর গ্রিফিথস-এর অধীনে তাঁর শিল্পীজীবনের বনিয়াদ গড়ে ওঠে। চিত্রাঙ্কনের জন্যে তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভও করেন।

অজন্তার চিত্র অনুলিপির কাজে গ্রিফিথস-এর সব সময় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। সেজন্যে পেস্টনজিকে অনুলিপির নেতৃত্ব নিতে হত প্রায়ই। তাঁর নেতৃত্বে আর্ট স্কুলের একাধিক ছাত্র অনুলিপির কাজ সম্পন্ন করেন। পেস্টনজির সঙ্গে অন্যান্য যে ভারতীয় ছাত্রেরা অজন্তার চিত্র অনু[illegible] করেন তাঁদের মধ্যে জগন্নাথ অনন্ত, জয়রাও রাঘোবা এবং না[illegible] খোসবার নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু গ্রিফিথস-এরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। রবার্ট গিলের মত ত[illegible] অনুলিপি করা বহু চিত্র নষ্ট হয়ে যায়। অনুলিপি করার পর চিত্র[illegible] (ইংল্যাণ্ডের) সাউথ কেনসিংটনের ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যা[illegible] মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সাউথ কেনসিং[illegible] সংগ্রহশালায় আগুন লেগে তাঁর ওই চিত্রগুলি পুড়ে যায়।

অজন্তার চিত্র ও স্থাপত্যরীতি সম্পর্কে দুই খণ্ডের একটি সুবৃহৎ

রে যান গ্রিফিথস। ললিতকলার ইতিহাসে ওই গ্রন্থটির জন্যেই হয়ে আছেন তিনি। গ্রন্থটির নাম—'দি পেন্টিংস ইন দি বুদ্ধিস্ট টেম্পলস অব অজন্তা : খান্দেশ : ইণ্ডিয়া' (লণ্ডন : ১৮৯৬ ও)। সাউথ কেনসিংটনে সামান্য যে কয়টি চিত্র রক্ষা পেয়েছিল কেই প্রকাশ করা হয়েছে গ্রিফিথসের ওই গ্রন্থে।

থসের পরে এই শতকের গোড়ায় ইংল্যাণ্ড থেকে শিল্পী শ্রীমতী হেরিংহ্যাম অজন্তার চিত্র অনুলিপি করার জন্যে এসেছিলেন। উদ্দেশ্যে ১৯০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী হেরিংহ্যাম প্রথম ভারতে। সে সময় লরেন্স বিনিয়নের পরামর্শে তিনি প্রথম অজন্তা ও পরিদর্শন করেন। অজন্তার কয়েকটি চিত্রও তিনি স্কেচ করেন সে অজন্তার চিত্রকলার আকর্ষণে সেগুলি অনুলিপির উদ্দেশ্যে র তাঁর ভারতে আগমন (১৯০৯)। শ্রীমতী হেরিংহ্যাম 'ইণ্ডিয়া টি'র সদস্য স্যার উইলমোট হেরিংহ্যামের সহধর্মিণী।

দের ওই 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'ই পরে শিল্পী হেরিংহ্যাম-এর নেতৃত্বে করা অজন্তার চিত্রগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে (অজন্তা স: ১৯১৫)।

য়া সোসাইটি' (১৯১০) গড়ে তোলার নেপথ্যে ছিলেন বহু বিশিষ্ট এঁদের মধ্যে স্যার উইলিয়াম রদেনস্টাইন, আনন্দ কুমারস্বামী, টি ডাবলিউ রোলস্টন, স্যার উইলমোট হেরিংহ্যাম, রজার ফ্রাই ল্পী, শিল্পরসিক ও ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখযোগ্য। লন্ডনের ওই সোসাইটি'-ই প্রকাশ করেছিল রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' ২)।

০৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে এসে পৌছন শ্রীমতী ম। একাজে সহায়তা করার জন্যে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আরও শিল্পী। তিনি কুমারী ডেভিস।

ওঁদের দুজনের পক্ষে সব চিত্র অনুলিপি করা সম্ভব নয়। কাজটি পেক্ষ তো বটেই, উপরন্তু কষ্টসাধ্যও। তাই হেরিংহ্যাম ভগিনী তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। র চিত্র অনুলিপির জন্যে কয়েকজন শিল্পীর প্রয়োজন। আর সে র যোগাড় করে দিতে হবে নিবেদিতাকে। ওই শিল্পীরা ম-এর সঙ্গে অজন্তায় গিয়ে অনুলিপি করবেন গুহাচিত্র।

বাহুল্য, নিবেদিতা উপলব্ধি করেন কাজটির গুরুত্ব। সঙ্গে সঙ্গে র হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের দুই শিল্পী নন্দলাল আর সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে পরিচয় ছিল কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তখন আর বেঁচে নেই। অতএব শিল্পগুরু নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি।

গুরুর পরামর্শে ঠিক হয় তাঁর দু'জন ছাত্র যাবেন অজন্তায়। এঁরা আর অসিতকুমার হালদার (১৮৯০—১৯৬৪)। কিন্তু নন্দলাল অজন্তায় যেতে রাজি হননি। অজন্তার দূরত্ব আর দুর্গম পথের নে করে পিছিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু নিবেদিতাও ছাড়বেন না শুধু হেরিংহ্যামের কাজে সহায়তাই নয়, অজন্তার চিত্রকলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এ সুযোগ অবহেলা করা ঠিক হবে না। কারণ, নো শিল্পীর কাছে অজন্তার চিত্রকলা ও স্থাপত্যের রীতি-নীতি বিষয়। সুতরাং অজন্তায় যেতেই হবে তাঁকে। তাই তাঁর ও নাথের আদেশে অজন্তায় যান নন্দলাল।

লাল ও অসিতকুমারের রেলভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ দিয়েছিলেন নাথ। এ ব্যাপারে তাঁর দুই অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথও আসেন। ওঁদের তিনজনের সম্মিলিত সাহায্যে ইন্ডিয়ান সোসাইটি রিয়েন্টাল আর্টের পক্ষ থেকে অজন্তায় গিয়ে অনুলিপির কাজ শুরু নন্দলাল ও অসিতকুমার।

ন্তার কাজে ওঁদের সঙ্গে আরও দুজন অংশ নেন। এঁরা সৈয়দ ও ফজলউদ্দিন কাজি। হায়দ্রাবাদের ইংরেজ রেসিডেন্টের নিজাম সরকারের ওই দুই শিল্পীকে আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

লাল-অসিতকুমারের অনুলিপির সময় নিবেদিতাও গিয়েছিলেন। অজন্তা দেখা এবং চিত্র অনুলিপির কাজ পরিদর্শনের জন্যে সখানে যান। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের ছুটিতে ডঃ জগদীশচন্দ্র ড়ি অবলা বসু এবং ভগিনী ক্রিস্টিন ও ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি অজন্তায় যান। ছিলেন সেখানে কয়েকদিন।

অজন্তায় নিবেদিতা নানাভাবে উৎসাহিত করেন শিল্পীদের। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় শিল্পীর সংখ্যা কম হওয়ায় নিবেদিতা এবং জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আরও দুজন ছাত্রকে পাঠিয়ে দেন অজন্তায়। এঁরা সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও কে ভেঙ্কটাপ্পা। সমরেন্দ্রনাথ (১৮৮৭—১৯৬৪) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র। কে ভেঙ্কটাপ্পা (১৮৮৭—১৯৬৫) মহীশূরের মহারাজার বৃত্তি নিয়ে তখন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে চারুকলা অনুশীলন করতেন।

অজন্তায় তিন মাস ছিলেন নন্দলাল। সেখানে হ্যারিংহ্যামের জন্যে তিনি যে চিত্রগুলি অনুলিপি করেন তার মধ্যে সপ্তদশ গুহার 'মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড অ্যাডোরিং দি বুদ্ধ' উল্লেখযোগ্য। অজন্তার ওই সপ্তদশ গুহাতেই আছে সবচেয়ে বেশি চিত্র এবং ওই গুহার 'রাজকীয় প্রণয়ের দৃশ্য'টির অনুলিপির দায়িত্বও ছিল তাঁর।

অজন্তার অপর অনুপম নিদর্শন 'দি গ্রেট বুদ্ধ' বা 'বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বর'। এ চিত্রটিরও অনুলিপির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাঁকে। তবে একক ভাবে নয়—হেরিংহ্যামের নির্দেশে নন্দলাল ও সৈয়দ আহমেদ যুগ্মভাবে অনুলিপি করেন প্রথম গুহার মনোজ্ঞ ওই চিত্রটি। এগুলি ছাড়াও আরও বহু চিত্র অনুলিপি করেন তিনি।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অজন্তার চিত্র অনুলিপির জন্যে আবার এসেছিলেন লেডি হেরিংহ্যাম। সেবারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিল্পী ডোরোথি লারচার। সেবারে লারচার ছাড়াও কুমারী লিউক নামে আরও এক শিল্পী আসেন। দ্বিতীয়বারের কাজে সৈয়দ আহমেদ ও কাজিও ছিলেন। কিন্তু নন্দলালের সেবারে যাওয়া হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি হিসেবে দ্বিতীয়বারে অসিতকুমার হালদার এবং সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত আবার গিয়েছিলেন অজন্তায়।

নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের সূচনাপর্বে শিল্পীদের আদর্শ ছিল মোগল আর রাজপুত চিত্রকলা। ওকাকুরা, টাইকান, হিসিদার কলকাতায় আসার পর ওঁদের চিত্রাঙ্কন দেখে নব্যবঙ্গীয় শিল্পীরা জাপানী কলা-কৌশলের অনুরাগী হয়ে ওঠেনি। লেডি হেরিংহ্যামের সঙ্গে অজন্তায় গিয়ে ওই ছাত্ররাই আবার ক্ল্যাসিক্যাল রীতি-নীতি অনুশীলনের সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য, সেই থেকে নব্যবঙ্গীয় শিল্পীরা খুঁজেও পায় চারুকলাচর্চার নিজস্ব একটি রীতি বা আদর্শ। ক্ল্যাসিক্যাল রীতির অনুসারী শিল্পীদের ওই ধারাই ক্রমবিকশিত হয়ে আজ হয়েছে 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিং'।

বলা নিষ্প্রয়োজন ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রকলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে প্রথম সুযোগ নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা পান তার মূলে নিবেদিতা। নিবেদিতার পীড়াপীড়িতেই নন্দলালের অজন্তা যাত্রা। পরবর্তী সময়ে বাগগুহাও গিয়েছিলেন তিনি এবং এই সূত্রেই অজন্তা আর বাগের ধ্রুপদী রীতির সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ হয় নন্দলালের। নন্দলালের সমসাময়িক সতীর্থদের কথা মনে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, তাঁর মত কোনো শিল্পীই ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রকলাকে এত মনপ্রাণ ঢেলে অনুসরণ করেন নি। নিজের হাতে গড়া নন্দলাল আর তাঁর সতীর্থদের চিত্রকলায় ধ্রুপদী ওই দ্যোতনা দেখে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন (স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা দেবী) : "ওরা নিল অজন্তার দিক, আমি রইলুম পার্সিয়ানে।" নিঃসন্দেহে এদেশের ধ্রুপদী চিত্রকলা চর্চার শেষ প্রতিভাবান শিল্পী নন্দলাল এবং তাঁর **সে অনুপ্রেরণার মূলে নিবেদিতা।**

তথ্য সূত্র : প্রবন্ধের অ-চিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীতে প্রকাশিত '**নন্দলালের কথা**' রচনাটি (২০ ডিসেম্বর ১৯৫৩) থেকে গৃহীত। তাছাড়াও নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির সাহায্য নেয়া হয়েছে। যথা : History of Indian and Eastern Architecture by Late J. Fergusson(Revised edition by James Burgess London 1910); A Histroy of Fine Art in India and Ceylon by Vincent A. Smith and C. J. Herringham (The Journal of Indian Art and Indusry : Festival of Empire and Imperial Exhibition, 1911: Part iii Vol. Xv 1912): The Expeditin by Sir Wilmot Herringham : Ajanta Frescoes(London 1915); Exhibitions of Modern Art in London and New Delhi by Ramananda Chatterjee: The Modern Review, July 1935; **অজন্তা** (১৩২০) অসিতকুমার হালদার; **ভগিনী নিবেদিতা** (১৯৬৩) প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এবং **শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল** (১৩৬৮) বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী।
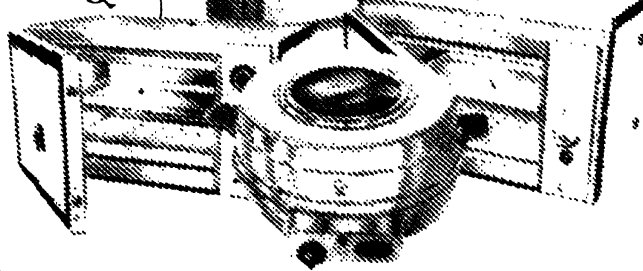
জাপানের প্রেরণা : নন্দলাল বসু

সত্যজিৎ চৌধুরী

। দেশগুলির মধ্যে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সম্পর্ক । বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে Asian mode বা এশীয় পন্থ-এর ষ্টিতা, তার বিকাশ ঘটেছিল ইতিহাসের পর্বে পর্বে এশিয়ার বিভিন্ন র মধ্যে দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে। কিন্তু ইতিহাসের আধুনিক বহমান অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। একটির পর একটি দেশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হল। বিভিন্ন য়ুরোপীয় শক্তির পাঁচিলে ঘেরা এশীয় দেশগুলির বৈষয়িক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বার স্বাভাবিক বিকাশও রুদ্ধ হয়ে গেল। এই দুর্যোগ থেকে জন্য জাপান বাইরের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল। রাধীনতা এড়াতে পারল, কিন্তু প্রতিবেশীদের সঙ্গেও তার কোনো থাকল না। এশিয়ার ইতিহাসে নামল দীর্ঘ অন্ধকার।

'কালরাত্রির অন্ধকার' পেরিয়ে প্রাচীন অত্মীয়তার সম্পর্ক নতুন উপলব্ধির আগ্রহ জাগল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। জাপান পিত বিচ্ছিন্নতা ঘোচায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ৫৪-এ শিমোদা এবং হাকোদাতে বন্দর দুটি খুলে দেয়। কা এবং ক্রমে য়ুরোপের অন্য সব দেশের সঙ্গে তার বৈষয়িক না বাড়তে থাকে। এতকালের বদ্ধ সমাজে বাইরের হাওয়া প্রবেশ প্রবলভাবে। দ্রুত জাপানি সমাজের ধ্যানধারণায় রূপান্তর দেখা সে রূপান্তর সংহত এবং একমুখী হল মেইজি শাসনের সূচনায়, ১৮৬৮তে। য়ুরোপের তুলনায় প্রাচ্যের দেশগুলিতে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে যে ঘাটতি, জাপান সেই ফাঁক পেরিয়ে গেল মাত্র ৫০/৬০ বছরের মধ্যে। এমন রুদ্ধশ্বাস দৌড়ের প্রভাবে তার সমাজের ভিত পর্যন্ত নাড়া খেল। সমৃদ্ধির নতুন যুগে দেশের কর্তৃত্ব যে নব্য ধনিকশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল, তাঁদের য়ুরোপমুখী মানসিকতাই প্রতিফলিত হত শিক্ষা-সংস্কৃতির সরকারি নীতিতে। ফলে সমাজের সমস্ত স্তরে পশ্চিমী-প্রগতির খর স্রোত প্রবেশ করছিল। এর পরিণাম কী দাঁড়াবে, আবহমান ঐতিহ্যের জমি থেকে কি উন্মূল করে দেবে এই প্রগতি, জাপানি জাতি কি আত্মপরিচয় হারাবে—সমাজের মধ্যে এসব প্রশ্নও উঠছিল। শিল্প-সংস্কৃতি জগতের কিছু মানুষ ঐতিহ্যমুখী আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক জুড়ে বিচার-বিতর্ক, মত-সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে ঐতিহ্যমুখী আন্দোলন সংহত হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে নেতা ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষী কাকুজো ওকাকুরা তেনশিন (১৮৬৩-১৯১৩)। তাঁর প্রভাবে অন্তত শিল্পকলার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যরীতি অনুকরণের প্রবণতা বাধা পায়, জাপানি শিল্পীসমাজ ঐতিহ্য-নিষ্ঠ আত্মস্থতা ফিরে পায়।

জাপানে শিল্পকলার চর্চা ছিল বংশানুক্রমিক। শিল্পীর ঘরের ছেলে বাপ-পিতামহের ধারায় কাজ শিখে শিল্পী হতেন। আধুনিক পর্বে এই প্রথা ভেঙে গেল। তোকিয়োয় প্রথম আর্ট স্কুল খোলা হয়েছিল ১৮৭৬-এ।

ইয়োকোআমা তাইকানের বাড়িতে নন্দলালের অভ্যর্থনা। নন্দলালের ডানদিকে তাইকান (১৯২৪)

ইতালির শিল্পী আন্তোনিও ফোন্‌তানেসি (১৮১৮-৮২) এখানে তেলরঙের কাজ শেখাতেন। বংশগত উত্তরাধিকারের সূত্রে নয়, যে কেউ ছাত্র হয়ে আসতে পারত। ছবিতে যেমন, তেমনি ভাস্কর্যের কাজেও পশ্চিমী রীতির অনুশীলন হত। পুরানো প্রথায় কাঠের কাজের বদলে কংক্রিট ও পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। শেখাবার পদ্ধতিতে, উপকরণ ব্যবহারে রীতিমতো য়ুরোপীয় আঙ্গিকে দক্ষ করে তোলার আয়োজন গড়ে উঠল। ছাত্রদের সামনে য়ুরোপীয় মাস্টার পেইন্টারদের ছবি ধরা হত আদর্শ হিসেবে। নিয়ত চর্চার মধ্যে এল ওদেশের শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাস, আঙ্গিকগত উদ্ভাবনের তাৎপর্য। ফোন্‌তানেসির ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন আসাই তাদার্শি। আর-একটু বড়ো আকারে শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৮৯-এ, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিজুৎসু-গাককো। সমকালীন সরকারি নীতি অনুযায়ী এখানকার শিক্ষাবিধিতেও পাশ্চাত্যরীতিই প্রাধান্য পায়। ওকাকুরা তেনশিন রাজকীয় সংগ্রহশালার প্রধান রূপে বিজুৎসু-গাককোয় যোগ দিলেন। জাপানি চিত্রকলার অধ্যাপক পদে এলেন প্রবীণ শিল্পী হাশিমোতো গাহো (১৮৩৫-১৯০৮)। ১৮৯০-এ তেনশিন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হলেন। পরিচালন-কর্তৃত্ব হাতে আসায় তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়। এর অনেক আগেই, ১৮৮৫তে তিনি ঐতিহ্যমুখী শিল্প আন্দোলন সংগঠনের জন্যে কানগা-কাই শিল্পী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন শিল্পকীর্তি রক্ষার ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যগত শিল্পকলা বিষয়ে চর্চা। এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তিনি সেই নীতি রূপায়ণে উদ্যোগী হলেন। নিহোন-গা বা চিত্রকলায় জাপানি শৈলী চর্চার আন্দোলন কানগা-কাই সঙ্ঘের উদ্যোগে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তেনশিন বোঝাতেন, জাপান এশিয়ার মনন-সম্পদ ও সংস্কৃতির মঞ্জুষা, জাপানেই রক্ষা পেয়েছে এশীয় সভ্যতার দুই প্রধান উৎস চীন ও ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আধুনিক জাপান যদি তার ঐতিহ্যের মাটি ছেড়ে যায়, গোটা এশিয়ার পক্ষেই সে হবে সমূহ সর্বনাশ।

বিজুৎসু-গাককোয় বিরোধ চরমে পৌঁছল। সরকারি বিধিব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ কিছু করা যাবে না অনুভব করে তেনশিন ১৮৯৮-এ পদত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন সংস্থা নিপ্‌পোন বিজুৎসু-ইন্। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন মান্য শিল্পী হাশিমোতো গাহো এবং ছাত্রদের একটি দল। নতুন প্রতিষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব নিলেন ইয়োকোইয়ামা তাইকান, হিশিদা শুন্‌সো, সেইগো কোগেৎসু, শিমোমুরা কানজান, তেরাসাকি কোগিয়ো এবং কোকেরি তোমাতো। এঁরাই তখন ছিলেন তরুণ শিল্পীসমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ।

১৮৯৮তেই বিজুৎসু-ইনয়ের প্রথম প্রদর্শনী করা হল। এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি তাইকানের আঁকা চীনের এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ কুৎ-সু-গেনয়ের প্রতিকৃতি। কর্তৃত্বচ্যুত কুৎ-সু-গেন্ অসীম মানসিক শক্তি নিয়ে একাকী চলেছেন—এই হল ছবিটির বিষয়। আসলে তাইকান এই ছবিতে প্রকাশ করেছিলেন ওকাকুরা তেনশিনের প্রতিবাদ, পদচ্যুতি এবং দৃঢ় সংগ্রামের রূপকার্য। অসামান্য এই কাজটির জন্য বিজুৎসু-ইনয়ের মর্যাদা বাড়ল, তাইকানও আধুনিক জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তেনশিনের ব্যক্তিত্বের এবং আদর্শের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেশের মানুষের দৃষ্টিতে। এ যুগের ছাত্র হিসাবে তাইকানরা পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যার মর্ম আয়ত্ত করেছিলেন। এই ছবি থেকে বোঝা যায়, সে শিক্ষা—অস্থিসংস্থান বা অ্যানাটমির জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিতজ্ঞান, বর্ণপ্রয়োগে বিষয়ের মেজাজ এবং টোন ঠিক ঠিক আনবার মাত্রাজ্ঞান কত গভীর তাইকানের। এ শিক্ষা তিনি ব্যবহার করেছেন স্বদেশের ছবির ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তাঁদের গুরু তেনশিন এই সামর্থ্যই জাগিয়ে তুলতে চাইতেন। নিজের জমিতে অবিচল থেকে গ্রহণ করো, ব্যবহার করো নতুন শিক্ষা, তাতেই যথার্থ দেশীয় আধুনিকতার অভ্যুদয় হবে—এই ছিল তেনশিনের শিক্ষানীতির মূল কথা।

বিজুৎসু-ইনয়ের শিল্পীদল নতুন উদ্দীপনায় আঙ্গিকের দিক থেকে একের পর এক সাহসী পরীক্ষা করেছেন। মাথার উপরে ছিলেন তেনশিনের মতো প্রাজ্ঞ অভিভাবক, সংকটে সাহায্য করতেন গাহোর মতো প্রবীণ শিল্পী, সুতরাং এঁরা আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর হয়ে কাজ করে যেতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিজুৎসু-ইন্ জাপানের চিত্রকলার জাপানি আধুনিকতার ভিত্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিজুৎসু-ইনয়ের বাই[রে] অনেক শিল্পী ছিলেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছিলেন কোবোরাই তোমো[তো] তেরাসাকি কোগিয়ো, কাওয়াই গিয়োকুদো; কোনো পক্ষেই যোগ দেন[নি] এমন নিরপেক্ষ শিল্পীরাও ছিলেন, যেমন, কাবুরাগি কিয়োকা[তা] কিক্‌কাওয়া রেইকা। এঁরা নিজেদের মতো কাজও করছিলেন। কি[ন্তু] নতুন যুগের সমস্যার স্বরূপ বোঝা এবং সে সমস্যা উত্তরণের উপযো[গী] পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহস এঁদের ছিল না। একমাত্র বিজুৎসু-ইন গো[ষ্ঠী] পরম্পরা আগত সমস্ত শৈলী এবং বাইরে থেকে পাওয়া প্রকরণ-জ্ঞানে[র] মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের পরীক্ষায় নতুন চিত্রভাষা উদ্‌ভাবন কর[তে] পারলেন। তেনশিনের অধিনায়কত্বে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা যথার্থ জাপা[নি] আধুনিকতার প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন।

১৯০২-এ তেনশিন ভারতে আসেন। পরের বছর আসেন তাইকা[ন] এবং হিশিদা শুনসো। বলা যায়, সমকালীন জাপানি শিল্পকলার জগতে[র] শ্রেষ্ঠ মানুষদের মাধ্যমেই ভারত-জাপান যোগাযোগের নতুন সেতু বাঁ[ধা] হয়েছিল।

ছাত্রবয়সে নন্দলাল সরাসরি কোনো জাপানি শিল্পীর কাছে কা[জ] শেখেন নি। জাপানি শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং আঙ্গিকের জ্ঞান। পাবার পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। কাজের পরিবেশে পরিচ্ছন্নতা, পবিত্র কোনো অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মতো করে পটে তু[লি] ছোঁয়ানো, সামান্য রঙের ব্যবহারে ছবিতে বর্ণাঢ্যতা আনার নৈপু[ণ্য] আবেগ-উদ্দীপনা সংহত করে ধ্যানদৃষ্টিতে পটের সঙ্গে তন্ময়তা—এ[সব] অবনীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেছিলেন তাইকানের সাহচর্যে। তাইকা[নের] আচরণে ছবি সম্পর্কে অদ্ভুত সম্ভ্রমবোধ প্রকাশ পেত—যা জাপা[নি] মানসিকতার সহজাত গুণ। একটা ফুলের তোড়ার বিন্যাস পরীক্ষা ক[রার] আগেও তাঁরা ফুলদানির সামনে একবার নত হয়ে দাঁড়াবেন। সৌন্দ[র্য] সৃজন এবং আস্বাদন লঘু বিলাসিতা নয়; আধ্যাত্মিক নিবিষ্টতা, শুচি[তা] নিয়ে সৌন্দর্যের সম্মুখীন হতে হয়। ওকাকুরা তেনশিন বলতেন, কো[নো] ছবির আবেদনের পবিত্রতা পবিত্র ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আঁকা না-আঁক[ার] উপরে নির্ভর করে না। নির্ভর করে শিল্পীর উপলব্ধির মহত্ত্ব এবং গর্ব[হীন] আত্মোৎসর্জনের মানসিকতার উপরে। শিল্পচর্চায় এই গভীর ভাবাব[েগের] গুরুত্ব নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন এ[বং] সারাজীবন এই উঁচু পর্দায় বাঁধা মানসিকতা নিয়ে কাজ করেছে[ন]। প্রথমবারে তেনশিনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আলাপে কী বিষয়ে ক[থা] মত বিনিময় সম্ভব হয়েছিল বিশেষ জানা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের যেভাবে পরিচালনা করতেন তার [সঙ্গে] বিজুৎসু-ইনয়ে তেনশিনের পরিচালনা পদ্ধতির খুব মিল পাওয়া যা[য়]। ধরে ধরে বিশেষ কোনো আঙ্গিকে ছাত্রদের দক্ষ করে তোলার পা[ঠ] দুজনেই বর্জন করেছেন। নিজের রুচি, প্রবণতা এবং স্বভাবগত দক্ষ[তার] পথ ধরে ছাত্র এগোবে, ঠেকে ঠেকে নিজের পথ তৈরি [করে] নেবে—উভয়েই এই নীতি অনুসরণ করতেন। আঙ্গিকের অনুশীল[নের] চেয়ে উভয়েই বেশি জোর দিতেন ভাবকল্পনার সামর্থ্য বাড়িয়ে তো[লার] উপরে। মনের জমি তৈরিতে স্বদেশের আবহমান ধ্যানধারণার সা[র] ব্যবহার করতে চাইতেন। ইতিহাস এবং জাতীয় পুরাণ থেকে ছাত্ররা [যাতে] পুষ্টি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতেন। কারণ পৃথক হলেও দু দেশে[ই] সময়ে পশ্চিমী প্রভাবে রুচি বিকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি [করার] প্রয়োজন ছিল। মূলহীন উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের মানুষ শেষ পর্যন্ত নি[ষ্ফল] হতে বাধ্য—যতই সে প্রকরণজ্ঞানে পাকা হোক। দু দেশেরই শিল্প[গুরু] তাই তরুণ শিল্পীদের মনের শিকড় স্বদেশের ঐতিহ্যে সংলগ্ন করে [দেবার] প্রয়োজন অনুভব করতেন। অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনী শুনতেন, তাঁর অপরূপ কথন ভ[ঙ্গিতে] বিশেষ কাহিনীর তাৎপর্য মনে গেঁথে দিতেন। তেনশিনের কাছেও [কোনো] ছাত্র ছবির থীম নিয়ে আলোচনা করতে এলে তিনি ইতিহাসের, পু[রাণের] প্রসঙ্গ তুলে থীমটির সঠিক তাৎপর্য ধরিয়ে দিতেন। ভাবের ঘর [তৈরি] করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। ঐতিহ্যের মর্মগ্রহণের পরেই তে[নশিন] গুরুত্ব দিতেন নেচার স্টাডির উপরে। অবনীন্দ্রনাথও বলতেন, [চোখের] ধ্যান আর শিল্পীর ধ্যানে তফাত আছে, শিল্পীর ধ্যান চোখ [মেলে]। এমন-কি পৌরাণিক কোনো চরিত্রের অবয়বের আদল স্থির করার [জন্য] প্রত্যহই প্রয়োজন দেখে বেড়াতে পরামর্শ দিতেন। দৃকশক্তির অনু[শীলন]

রূপচরের রূপের গড়ন ও বৈচিত্রের ধারণা সম্পূর্ণ হয় না। নর সূত্র হল, "আর্ট ইজ নো লেস্ আন্ ইনটারপ্রিটেশন অব ন্যান নেচার ইজ এ কমেন্টারি অন আর্ট।" আর দুই শিল্পগুরুই গুরুত্ব আরোপ করেছেন শিল্পী ব্যক্তির প্রতিস্বিকতার উপরে। সকল আরোপিত বিধিবিধানের বাইরে এসে নিজের সামর্থ্যের একান্তভাবে নির্ভর করতে শেখাতেন। তেনশিনের ভাষায়, "আর্ট ফীয়ার অব ফ্রিডম।" শিল্পীকে এই স্বাধীনতার দায়িত্ব বুঝতে হয়। সমস্যা, আঙ্গিকের সমস্যা পূর্ণত তার নিজেরই সমস্যা। বাইরে কউ এ সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে না। এটা শিল্পী ব্যক্তির সংগ্রামের ক্ষেত্র। অবনীন্দ্রনাথেরও অনেক লেখায় একই ধারণা লত হয়েছে। তিনিও বলেন, স্বভাবের পথে গ্রহণ-বর্জনে শিল্পীর পূর্ণতার দিকে এগোতে যেন বাধা না পায়। নিজ নিজ দেশে ব, রুচির বিভ্রান্তিকর পরিবেশে এঁরা আশ্রিত তরুণদের মনের শুদ্ধতা বাঁচাতেই এমনভাবে শিল্পীর স্বাধিকারের, রুচির য় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছেন। সর্বব্যাপী ভাঙন এবং আবর্জনার র মধ্যে আত্মস্থ শুদ্ধাচার ভিন্ন নতুন কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ল্পের ভবিষ্যৎ যাদের হাতে, তাদের আগলে রেখে, প্রত্যয়ের সঙ্গে রে যাবার সাহস দিতেন। যে ভাবনা নিয়ে, যে নীতি অনুসরণ করে নাথ নন্দলালকে তৈরি করেছেন তার মধ্যে জাপানি শিল্পগুরুর ও নীতির প্রতিফলন যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং লের শিল্পীচরিত্রের গড়নে, তাঁর ধ্যানধারণায় পরোক্ষে হলেও ক জাপানের শিল্পআন্দোলনের প্রেরণা অনেকটাই বর্তেছিল।

নীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ছাত্রদের কাজে জাপানি আঙ্গিক অনুসরণ নানা বিভ্রান্তিকর মন্তব্য দেখা যায়। একথা ঠিক যে অবনীন্দ্রনাথ ক্তিগত আঙ্গিক উদ্ভাবনে জাপানি শিল্পীদের প্রিয় প্রকরণগুলির থেকে গভীর প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই হুবহু জাপানি আঙ্গিক অনুসরণ করেননি। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ওয়াশ জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি থেকে অনেক আলাদা, যদিও তাইকানের দেখেই তিনি ওয়াশ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। জাপানে পদ্ধতির চর্চা দীর্ঘদিনের। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কানো ধারার চীনা ভূদৃশ্য নকল করার চলতি রীতি ছেড়ে দেশীয় বিষয়বস্তু ও ব্যবহারের চেষ্টায় ওয়াশ-এর করণকৌশল নিয়ে মৌলিক পরীক্ষা। তান্যুউর (জন্ম ১৬০২) মতো শিল্পীর হাতে ভিজে কাগজের রঙ নেবার ক্ষমতার মান-পরিমাণবোধ, কালি কিংবা প্রাথমিক রঙের ভিজে কাগজের গুণে কতোটা চারিয়ে যাবে সে বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান, বসে যাওয়া রঙের গাঢ়তা এবং চারিয়ে যাওয়া হাল্কা বিস্তারের ভারসাম্য রাখার কৌশল আশ্চর্য পরিণতি পেয়েছিল। এই চর্চার ঘটেছিল আড়াই শো বছর ধরে। জাপানের আধুনিক শিল্পীদের বিশেষভাবে তাইকান প্রাচীন ওয়াশ আঙ্গিকের উত্তরাধিকার আয়ত্ত লেন। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথ এই ধারায় সবচেয়ে শিক্ষিত শিল্পীর পুরোনো একটি জাপানি আঙ্গিকের প্রয়োগ দেখবার সুযোগ ছিলেন বলা যায়। কিন্তু জলরঙে তাঁর মৌলিক শিক্ষা বিলিতি ত, চার্লস পামারের কাছে। সে শিক্ষার ভিত জীবনে কখনোই বদলায়নি। চওড়া তুলিতে জল টেনে টেনে কাগজ বা কাপড়ের ভাব রেখে কাজ করা বা একবার রঙ দেবার পরে জলের প্রলেপে মালায়েম করার জাপানি পদ্ধতি থেকে অবনীন্দ্রনাথের মাথায় যা ছিল সে হল ছবির বিষয়বস্তুর অন্তর্গত আলোর বিন্যাস যথাযথ করায় কাগজের জমিতে রঙ জমিয়ে বসিয়ে দেওয়ায় এই পদ্ধতির সুযোগ া। সেজন্যে তিনি তুলিতে জল বুলিয়ে দেওয়া ছাড়াও গোটা ছবি ডুবিয়ে রোদে শুকিয়ে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছতে দ্বিধা করতেন না। এই সব প্রক্রিয়ার মধ্যেও কাগজের মূল সাদা বাঁচিয়ে আলোর াতা আনার বিলিতি পদ্ধতিও সমানে অনুসরণ করতেন। নন্দলাল ছেন, নরুন দিয়ে কাগজ একটু ছিঁড়ে আশ্চর্য হাইলাইট বের করলেন ার ছবির খঞ্জনিতে। শুনলেই মনে পড়ে ইংরেজ শিল্পী টার্নারের যিনি ন্যাকড়া বা স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে তো বটেই, দরকার বোধ করলে ালিয়ে রঙের পর্দার নিচের কাগজের সাদা বের করে নিতেন আলোর বাড়াবার জন্যে। অবনীন্দ্রনাথের হাতে ওয়াশের প্রয়োগ প্রয়োজনে

উমার কান্না

বদলেছে এবং একে জাপানি প্রভাবে উদ্‌ভাবিত তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি বলা সঙ্গত। এই বিলিতি-জাপানি প্রক্রিয়ায় মেশানো ওয়াশ পদ্ধতি নন্দলাল গুরুর কাছেই শিখেছিলেন এবং সমর্থ প্রয়োগও করেছেন অনেক ছবিতে। এই রীতিতে তাঁর ভালো কাজের মধ্যে 'পার্থসারথি' (১৯১২) এবং 'শীতের পদ্মা' স্মরণীয়। 'পার্থসারথি' ছবিতে পেছনের রথের কাঠামোর দৃঢ়তা এবং মূল চরিত্রের অবয়বের গড়ন মিলিয়ে বিন্যাস বেশ জটিল, কিন্তু ওয়াশেই এই জটিল বিন্যাস ফোটানোর ক্ষমতায় শিল্পীর নিপুণতা বোঝা যায়। অন্যপক্ষে 'শীতের পদ্মা'য় শূন্যতার দৃঢ় বিস্তার এবং উড়ে চলা পাখিদের গতিময়তার বৈপরীত্য সুদূরের ডাকে যে উদাস করে তোলে—ওয়াশের রীতিতে রঙের পর্দার ঈষৎ হেরফেরে সেই অনুভূতি চিত্রস্থ করেছেন। ছবিদুটির সারফেস কোয়ালিটির জোর বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী, বেঙ্গল স্কুলের শিল্পী বলে পরিচিত অনেকেই জাপানি ওয়াশের মোহে আবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাজে রঙ মজানোর এমন দক্ষতা বিশেষ ফোটে নি। ওয়াশ পদ্ধতিতে অর্জিত নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই আঙ্গিকে নন্দলালের আগ্রহ অবশ্য ক্রমেই শিথিল হয়ে আসে। রঙের সূক্ষ্ম কাজে অবনীন্দ্রনাথ যেমন নিবিড় তৃপ্তি পেতেন, সে মেজাজ নন্দলালে তেমন জমেনি। ধীরে ধীরে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের আকার-নিষ্ঠ, নির্মাণধর্মী বড়ো মাপের কাজের দিকে ঝুঁকেছেন, টেম্পারা পদ্ধতি আশ্রয় করেছেন।

ড্রইং ছাড়াই সরাসরি তুলিতে রেখা বিন্যাসের জাপানি পদ্ধতি কি নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে অনুশীলন করেছিলেন? অনেক পরে তাঁর অজস্র ছবিতে এই ধরনের করণ-কৌশল দেখা যায়। সেটা আরাই কাম্পোর কাছে অনুশীলনের ফলও হতে পারে। উল্লেখ করার মতো

আর-একটি জাপানি রীতি, পটের বড়ো এলাকা ফাঁকা রেখে দিয়ে ব্যঞ্জনা-বিস্তারের কৌশল, তিনি অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে অনেক ছোটো বড়ো কাজে এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

১৯০৭-এ জোড়াসাঁকোয় অতিথি হয়ে আসেন কাতসুতা নামে আর-একজন জাপানি শিল্পী। নন্দলাল তখনো সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র। কাতসুতার কাছে কে কতটা শিখেছিলেন জানা সম্ভব হয়নি। তবে ইনি অজন্তায় গিয়েছিলেন এবং কলকাতায় থাকার সময়ে দু বছরের মধ্যে বৌদ্ধ বিষয় নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। এঁর সব ছবি জাপান সরকার পরে দেশে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেন। দুটি ছবির প্রতিলিপি আছে 'রূপম' পত্রিকায়, 'বুদ্ধ ও সুজাতা' এবং 'টেম্পটেশন অব দ্য বুদ্ধ'। প্রতিলিপিতেও ছবিদুটির আবেদন বেশ ধরা যায়। কাতসুতা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পকলার মর্ম আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন, যদিও আঁকার রীতিপদ্ধতি তাঁর দেশের। নন্দলাল এঁর কাজ দেখে থাকবেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোথাও কোনো বিবরণ পাইনি।

১৯১২-র সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ওকাকুরা তেনশিন দ্বিতীয় এবং শেষবার কলকাতায় আসেন। একমাসের কিছু বেশি এখানে ছিলেন। প্রথমবারে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে একলা কাজ করতে দেখে গিয়েছিলেন। এবারে এসে দেখলেন অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে একদল তরুণ শিল্পচর্চার পথে এসেছেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-ও শৃংখলার সঙ্গে কাজ চলছে। জোড়াসাঁকোর স্টুডিওয় এসে প্রায়ই তেনশিন নন্দলালের সঙ্গে বসে ছবি নিয়ে আলোচনা করতেন। এসব আলোচনার বিস্তারিত কোনো বিবরণ কেউ রেখে যাননি। কানাই সামন্তমশায় নন্দলালের মুখে শুনেছেন, তেনশিনকে দেখে তাঁর, "জ্ঞানের সাগর মনে হত, অপার, অগাধ। পঞ্চাশটা কথা শুনে একটা উত্তর দিতেন, তাতেই খুব ইমপ্রেস করত।" কম কথা বলা কি ভাষার অসুবিধের জন্যে ? অন্যত্র প্রমাণ পাওয়া যায় তেনশিন বেশ নাটুকে স্বভাবের মানুষ ছিলেন, বাকপটুতার অভাব ছিল না। তবে তাঁর সম্ভ্রম জাগানো ব্যক্তিত্বে নন্দলালের মতো তরুণের অভিভূত বোধ করা স্বাভাবিক। ততদিনে তেনশিন ভারতেরও একজন মান্য মনীষী এবং এশিয়ার আত্মমর্যাদাবোধের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তরুণ শিল্পীদের ফেলে দেওয়া ছবি, স্কেচ সব একদিন তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। নন্দলালের "কালাদিঘির পাড়ে ইন্দিরা" ছবি দেখে মন্তব্য করেন, "ভালো, মেয়েটি সুন্দর, ভাব ফুটেছে, কিন্তু রঙ ডারটি।" বলে ফেলে দিলেন। আদৌ অপরিচ্ছন্ন নয়, অত্যন্ত পরিমার্জিত কাজও কিন্তু তখন নন্দলালের অনেক। তবুও, মন্তব্যটি তরুণ শিল্পীর মনে গেঁথে গিয়েছিল। এই পরিচ্ছন্নতার, শুচিতার বোধ নন্দলাল ছাত্রজীবনের শুরুতেই তাঁর গুরুর কাছেও পেয়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই অবনীন্দ্রনাথ ও তেনশিনের রুচির মিল জিজ্ঞাসু, শ্রদ্ধাশীল ছাত্রটির মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। গুরুর শিক্ষার মর্মই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তেনশিনের মন্তব্যে।

সুরেন গাঙ্গুলীর 'কৃষ্ণযশোদা' ছবি দেখে তেনশিন মন্তব্য করেন—রেপটাইল, এ রকম ছবি কেটে দুখানা ছবি করা যায়। উক্তিটির তাৎপর্য, সরীসৃপের মতো কম্পোজিশন শিথিলবদ্ধ। ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাঁধুনির অনিবার্যতা আসেনি। বাঁধুনির অনিবার্যতা এলে সে ছবি হয়ে ওঠে মানুষের শরীরের মতো, পরস্পর নির্ভর প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যে সুঠাম। দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে তেনশিন কম্পোজিশনের মর্ম বুঝিয়ে দেন। তাঁর এই উপদেশে চীনা ও জাপানি শিল্পের একটি মূল নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর চীনা শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিক সিয়েন হো, জাপানে এঁর নামের রূপান্তর শাকাকু, ছবির ষড়ঙ্গ সূত্রবদ্ধ করেন। ছবির ছয় অঙ্গ সম্পর্কে শাকাকুর সূত্র জাপানের শিল্পীরাও মেনে এসেছেন। এর দ্বিতীয় সূত্র 'অস্থি-বিন্যাস এবং তুলির কাজের বিধি'তে শাকাকু ছবির কম্পোজিশন এবং রেখাপাতের রহস্য উন্মোচন করেন। 'আইডিয়ালস্ অব দ্য ইস্ট' বইয়ে তেনশিন বিধিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেছেন, সৃষ্টির উদ্দীপনা ছবির রূপকল্পে আকার পাবার জন্যে জৈব-অবয়বত্ব আশ্রয় করে। মহৎ সেই সংকল্পনা যেন শিল্পকর্মটির [illegible] বিন্যাসে অভিব্যক্তি পায়। রেখা তার স্নায়ু ও শিরা। সমস্ত তেনশিন এই তত্ত্বই বুঝিয়েছিলেন বোঝা যায়। জৈব অবয়বের মতো প্রাণ-ছন্দোময় ক্ষেকাজ—তার কোনো অংশই ছাঁটকাট করা যায় না, তাতে গোটা ছবিখানি আঘাত পায়। প্রত্যঙ্গগুলির এই প্রতিসাম্যকে জাপানিরা বলেন 'ইছি', আর প্রত্যঙ্গ বিন্যাসের ছককে বলা হয় 'ইশো'। 'ইশো'র মর্ম বোঝাতে তেনশিন দেশলাই কাঠি ব্যবহার করে থাকবেন। শুধু ছবিতে নয়, জাপানের স্থাপত্যেও এই নীতির প্রয়োগ ঘটেছে যুগ যুগ ধরে। কোনো স্থাপত্য-প্রকল্প ত্রুটিহীন বিন্যাসে রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজন বোধ করলে আশপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশটিকে পর্যন্ত বদলে নেওয়া হত। গাছপালা কাটছাঁট করা হত। পরিমণ্ডলের বিরূপ প্রভাবে স্থাপত্যের অন্তর্গত ধ্যানটি যেন আঘাত না পায়। এমন-কি মণ্ডন শিল্প বা ডেকরেটিভ আর্টেও জাপানি শিল্পীরা জৈব-সংগঠনের নীতি মানতেন। ১৯১২-র শেষ দিকে নন্দলাল তেনশিনের মুখে ছবির নির্মাণগত এই তত্ত্ব যখন শোনেন তার আগেই তিনি ১৯০৯-এ নিজ হাতে অজন্তার ভিত্তিচিত্রের প্রতিলিপি করেছেন। ফলে তাঁর নিজের কাজে চিত্রগত বিষয়বিন্যাসে অংশগুলির মধ্যে প্রতিসাম্য স্থাপনের দক্ষতা এসে গিয়েছিল। স্নায়ু-শিরার বিস্তারের মতো রেখার বিস্তারে গোটা ছবিতে প্রাণ-ছন্দ স্পন্দিত করার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। নিজের বোধবুদ্ধি নিয়ে তিনি যে পথে এগিয়ে চলেছিলেন তার সমর্থন পেলেন, তার তাৎপর্য ভালো করে বুঝবার সুযোগ পেলেন জাপানি শিল্পগুরুর কাছে। বিভিন্ন স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল দুজনই ছাত্রদের ছবি কেটে দু-তিন টুকরো করে ফেলে কম্পোজিশনের দুর্বলতা বুঝিয়ে দিতেন। তেনশিনের শিক্ষা এঁরা কখনো বিস্মৃত হন নি।

তেনশিন নন্দলালের 'অগ্নি' ছবিখানি দেখে মন্তব্য করেন, "এতে সবই আছে নেই শুধু আগুনের তাপ।" উক্তিটি সম্পর্কে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "যতদূর অনুমান করা যায় বস্তুসত্তার প্রকৃতিভেদে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে ওকাকুরা ইঙ্গিত করেছিলেন।" আর একটা কথা বলেন তেনশিন, "ভারতবর্ষ ভাস্কর্যের দেশ, বিশেষভাবে চিত্রের নয়। ভাস্কর্য ধরলে খুব বড়ো কাজ হবে।"

তেনশিনের ছোটো ছোটো মন্তব্যে চিত্রনীতির যেসব গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পেত, নন্দলালের জীবনে তার প্রেরণা স্থায়ী হয়েছিল। বস্তুর প্রতিরূপ রচনা নয়, বস্তুর গুণ চিত্রগত করায় তাঁর আয়াস অন্তহীন। ছাত্রদেরও বলতেন, গাছ আঁকবে তো গাছের সামনে গিয়ে প্রার্থনা করো—তার স্বরূপ যেন প্রকাশ করে তোমার কাছে। বার বারই বলেছেন, যা আঁকবে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। শুধু আকার-আকৃতির বোধ নিয়ে ছবি করা যায় না, বস্তুর নিহিত প্রাণ-ছন্দ, তাঁর গড়নের মৌল প্রকৃতি উপলব্ধিতে না আসা পর্যন্ত আঁকতে চেষ্টা করা বৃথা। ফুল হোক, গাছ হোক, কোনো প্রাণী হোক, সবেরই মৌল প্রাণধর্ম আছে এবং সেই গুণ তাঁর মতে ছবির বিষয়। সেই গুণটুকু ধরার জন্য ওই বস্তুর মধ্যের প্রাণশক্তির ক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়া করতে হয় তুলির রঙের ব্যবহারে। তিনি বলতেন, গাছের মাথা থেকে গাছ আঁকা ঠিক নয়। গাছ তো মাটি ভেদ করে নিচ থেকে উপরে বাড়ে। তার বাড়ার গতি-ছন্দ ধরার জন্য নিচ থেকেই আঁকতে হয় (সত্যজিৎ রায় ধৃত উক্তি)। নন্দলালের ছোটোখাটো স্কেচ থেকে বিরাট আকারের কাজ পর্যন্ত কোথাও এমন ছবি প্রায় নজরে আসে না যার বিন্যাস শিথিল। ভারতীয় শিল্পের গভীর অনুশীলনে ভাস্কর্য সম্পর্কে তেনশিনের উক্তির মর্মও নন্দলালের উপলব্ধিতে গভীর সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বলতেন, "চিত্রের আগেই এদেশে ছিল ভাস্কর্য, তাই ভলিউম দেখিয়েছে তারা ছবিতেও" (কানাই সামন্ত ধৃত উক্তি); "ভারতীয় ভাস্কর্য অনেক বড়ো জিনিস। ওতে যা করেছে আর-কোনো দেশ আর-কোনো যুগে তা করেনি" ("শিল্পদৃষ্টি")। তিনি ভাস্কর্যের পথে যান নি, কিন্তু ছবিতেই এনেছেন ভাস্কর্যের গুণ। কারো পরামর্শে উপদেশে নয়, নিহিত স্বভাবে নন্দলাল যে পথে এগোচ্ছিলেন, সেই পথে পরিণতির একটা পর্যায়ে তাঁর প্রবণতা এবং বোধ যেন বড়ো সমর্থন পেল সমকালীন জাপানের শ্রেষ্ঠ মনীষীর কাছ থেকে। এই সমর্থনের গুরুত্ব তাঁর কাছে কতো গভীর বোঝা যায় যখন দেখি, চিত্রনীতির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বার বার ওকাকুরা তেনশিনকে স্মরণ করেছেন।

ভারত থেকে বস্টন হয়ে তেনশিন দেশে ফেরেন এবং ১৯১৩-র ২ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ভারত-জাপান যোগাযোগের একটা অধ্যায়

রত-জাপান যোগাযোগের দ্বিতীয় পর্ব সূচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের
হ এবং উদ্যোগে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্যকালে তিনি জাপান
যান। ১৯১৬-র ২৯ মে জাপানে পৌঁছন। এশিয়ার দেশগুলির
সাংস্কৃতিক সেতু রচনার প্রয়োজন বোধ তাঁর চিন্তাতেও ছিল, কিন্তু
নে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সে দেশের পরিস্থিতি দেখে গভীরভাবে আহত
। জাপানের মাটিতে দাঁড়িয়েই সে দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ,
চন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যলিপ্সাকে কবি ধিক্কার দেন।
ানিতও হন। তাঁকে বলা হয়—পরাধীন জাতির অক্ষম কবি।
ায় সেই জাপান, যে দেশে তেনশিনের মতো আদর্শবাদীর জন্ম!
মনে হল, জাপানের বড়ো মাপের মানুষদের মধ্যে ওকাকুরা
শিনের মতো কোনো প্রতিভা আর নেই।"ওকাকুরাকে তাঁর দেশের
তেমন করে চিনতেই পারে নি।" এই দুর্যোগের অভিজ্ঞতার মধ্যে
ভাল লেগেছিল শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে তাইকানের প্রতিষ্ঠা দেখে।
ত হয়েছিলেন শিমোমুরা কানজানের কাজ দেখে। এঁরা তেনশিনের
আঁকড়ে আছেন, তাঁর প্রবর্তনাকে প্রসারিত করেছেন। "জাপানে
নেক শিল্পীদের জন্য ওকাকুরা যে স্কুল করে গেছে তাতে কত কাজ
তার ঠিক নেই।" (জাপান যাত্রী' গ্রন্থপরিচয়) কবি তাইকানের
তেই উঠেছিলেন। ফলে সমকালীন শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর জানবার
গ অবারিত হয়েছিল। খুব তৃপ্তি পেলেন কানজান তাঁর কাছে ছবি
মতো বিষয় পেতে চাওয়ায়। কানজানকে তিনি পৃথিবীর অন্যতম
শিল্পী মনে করতেন। তাই তাঁর এ বিনীত প্রার্থনা সম্মানিত বোধ
ন। এঁদের সঙ্গে সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তবু জাপানের শুদ্ধতর
চয় অনেকটা উপলব্ধি করতে পারলেন। জাপানের 'সর্বজনীন
বোধের সাধনা', দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের মহিমা ও মর্যাদা তাঁকে
ত করেছিল। মনে হয়েছিল, শিল্পের এ সামাজিক মূল্য ভারতে
ত নয়। খুব আক্ষেপ বোধ হল, গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র এঁরা একবারও
শে এলেন না! বাংলার শিল্পীদের প্রতি দায়িত্ববোধে তাইকানের সঙ্গে
র্শ করে শিল্পী আরাই কামপোকে বছর দুয়েকের জন্যে কলকাতায়
নোর ব্যবস্থা করলেন। তাইকান বা কানজানের কাজ দেখে তাঁর মনে
ল "নব্যবঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার
" (পূর্বোক্ত সূত্র)। জাপানী শিল্পীদের সাহচর্যে সেই জোর, সাহস
ত্ব আসতে পারে। শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে-কে তিনি সঙ্গে নিয়ে
ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর মনে পড়ছিল নন্দলালের কথা।
লালরা যদি এঁর কাছে থেকে খুব বড়ো আয়তনের পটের উপরে
লি তুলির কাজ শিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি
উঠবে . . . ." (পূর্বোক্ত সূত্র)।

বীন্দ্রনাথ জাপানে যাবার আগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রা নামে
া-সংস্কৃতির কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। এখানে আঁকা
াবার দায়িত্ব ছিল নন্দলালের উপরে। আরাই কামপো বিচিত্রায় যোগ
ান। তাঁর জন্য একশো টাকা মাস মাইনের ব্যবস্থা করা হল। কামপো
ড়ো শিল্পী ছিলেন তা নয়, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে খুব নির্ভরযোগ্য।
দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কানজান এবং তাইকানের দুখানি বড়ো ছবি কপি
য়েছিলেন, সে দুটি কলাভবন (শান্তিনিকেতন) সংগ্রহে আছে।
ত্রার কর্মী হিসেবে নন্দলাল এবং কামপোর মধ্যে সহজেই ঘনিষ্ঠতা
ছিল। এই প্রথম নন্দলাল একজন জাপানি শিল্পীর কাছে হাতে কলমে
শেখার সুযোগ পেলেন। নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে কামপো যত্ন
নানা রকমের জাপানি তুলির ব্যবহার নন্দলালকে শেখাতেন।
পো নন্দলালের সঙ্গে পুরী-কণারক যান, কণারকেও এই অনুশীলন
। জাপানি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা কামপো জানতেন না। তাতে
ানোয় কোনো অসুবিধে হত না। প্রায় দু বছর নন্দলাল এই জাপানি
র সঙ্গ পেয়েছিলেন। ১৯১৮য় কামপো দেশে ফিরে যান। বিদায়ের
তাঁরই তুলি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন—

একদিন
অতিথির
প্রায়
এসেছিলে দ্বারে,
আজ তুমি যাবার বেলায়
এলেও অন্তরে।

বৈশাখ
১৩

তলোয়ারে চড়ে সাধু শোরিকেন সমুদ্র পার হচ্ছেন। শিল্পী মোতোনোবু

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত, জয়া আপ্পাস্বামী—সকলেই বলেছেন, আরাই কামপোর কাছে জাপানি শৈলীর অনুশীলন নন্দলালের নিজস্ব আঙ্গিকে গভীর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। একথা সত্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু কামপোর সঙ্গে পরিচয়ের আগের কিছু কাজেও, বিশেষ করে কালি-তুলির কাজে এমন পরীক্ষার নজির আছে যা জাপানি শৈলীর সঙ্গে খুব মিলে যায়। যেমন ১৯১২ এবং ১৯১৩-য় করা এই দুটি ছবি—আদরা না ছকে সরাসরি তুলিতে কালির টোনের হেরফের বা স্বল্পতম রেখা বিন্যাসে ছোটো আয়তনের (পোস্ট কার্ডে) এইসব কাজের নজিরে মনে হয়, ভেতরে ভেতরে একটা নতুন পথ তৈরির গরজ তৈরি হয়ে উঠছিল। এ রকম কাজের নমুনা আরো পাওয়া যায় ১৯১৩-য় করা নানা ধরনের গাছের স্টাডিতে। যেমন—হয়তো তখনো জাপানি তুলির উপকরণগত সুযোগ কাজে লাগাবার কৌশল তাঁর ভালো করে জানা ছিল না। টাচ মেথডে যাকে নন্দলাল বলতেন ছাপ-ছোপের কাজ, হয়তো সেই পদ্ধতিতে বস্তুর ভর ও স্পর্শ-গুণ এক ঝোঁকে ধরে দেবার জন্য তুলির ডগায় চাপের তারতম্য ঘটানোর দক্ষতা তখনো আয়ত্তে আসে নি। কিন্তু

প্রবণতাটা এসে গিয়েছিল। সেই সময়ে কামপোর সাহচর্যে এদিকে এবং জাপানি করণ-কৌশলের আরো কিছু কিছু বিশিষ্টতায় শিক্ষিত নৈপুণ্যের অধিকার এল।

ম্যাকমিলন কোম্পানি (লণ্ডন) থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি অ্যাণ্ড ফ্রুট গ্যাদারিং' (১৯১৮) বইয়ের বেশ কিছু ছবিতে কালি-তুলির ব্যবহারে নতুন অর্জিত সামর্থ্যের পরিচয় আছে। যেমন গীতাঞ্জলি অংশের ১১, ৬৭ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে ছবি বা ফ্রুট গ্যাদারিং অংশের ৬১ সংখ্যক কবিতার ছবি। এই বইয়ের কোনো কোনো কাজে ফাঁকা জমির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো যেমন, গীতাঞ্জলির ৭, ১৩, ফ্রুট গ্যাদারিং-এর ৪২ সংখ্যক।

রেখার সামর্থ্য নিয়ে পরীক্ষায় নন্দলালের আগ্রহ উদ্দীপনা ছিল অফুরন্ত। এইখানে গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটা চাপা বিরোধও ছিল। তিনি নন্দলালকে বলতেন, "রেখার ভিতর আমি দেখি যেন খাঁচার ভিতর বন্ধ পাখি।" রেখায় রূপটুকু ছাঁদা যায়, কিন্তু রূপের মুক্তি রঙে। রঙই রাজা—অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়। তাঁর হাতে তাই রেখার বাঁধুনি উপচে যায় রঙ। নন্দলালকে বরাবর টেনেছে আকারবদ্ধ রূপের প্রবণতা। রেখার মাহাত্ম্য তাঁর নিজস্ব শৈলীর ভিত্তি। আরাই কামপোর কাছে অনুশীলনে রেখার শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল।

জাপানি ছবির ইতিহাসের পর্বে পর্বে চীনা প্রভাবে রেখানুশীলনের বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে। ক্যালিগ্রাফি বা লিপিচিত্রের —যাকে জাপানিরা বলেন সেন—দীর্ঘ চর্চায় জাপানি শিল্পীদের হাতে তুলির স্বচ্ছন্দ অথচ শক্তিমন্ত চাল ছবির জগতে এক বিস্ময়। বিখ্যাত কানো শৈলীর শিল্পীরা লিপিচিত্রকলায় চরম উৎকর্ষে পৌঁচেছিলেন। যেমন উল্লেখ করা যায় মোতোনোবুর (১৪৭৬-১৫৫৯) নাম, যাঁর নমনীয় কোমল রেখার অসামান্য সৌন্দর্যময় বিন্যাসে চিত্রিত পট অপরূপ ছন্দোময় হয়ে উঠত। জাপানের ক্ল্যাসিকাল ক্যালিগ্রাফিক কাজের চমৎকার দৃষ্টান্ত মোতোনোবুর "তলোয়ারে চড়ে সাধু শোরিকেন সমুদ্র পার হচ্ছেন" এই ছবিটি। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ওগাতা কোরিন-এর (১৬৬১-১৭১৬) নাম, যাঁকে বলা হয় জাপানি শিল্পীদের মধ্যে জাপানিতম। তাঁর হাতে মণ্ডনধর্মী রেখা বিন্যাসের নৈপুণ্য চরম উৎকর্ষ পেয়েছিল। আলংকারিক রেখার সুষমা বিপর্যস্ত না করেও তিনি প্রচণ্ড প্রাণাবেগ প্রকাশ করতে পারতেন। তীক্ষ্ণ গতিময় রেখায় বস্তুর বাস্তবগুণ শুদ্ধ চিত্ররূপ পেত। তাঁর আঁকা সমুদ্র দৃশ্যগুলি, সোনালি পটে নীল রঙে উত্তাল সমুদ্রের ভয়ংকর রূপ—সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জাপানি ছবির মধ্যে স্থায়ী কীর্তি। সেন-রীতির এই ধারাবাহিক বিকাশ এবং অসীম প্রকাশ ক্ষমতার নিহিত কলাকৌশল নন্দলাল আরাই কামপোর কাছে বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারতীয় মূর্তি শিল্পের অলংকরণ এবং রাজপুত ছবির আলংকারিক রীতি সম্পর্কে নন্দলালের আগ্রহ এবং অনুশীলন অনেক আগে থেকেই সূচিত হয়েছিল, সেই চর্চায় একটা নতুন আয়তনযুক্ত হল জাপানি ক্যালিগ্রাফি অনুশীলনে। ডিজাইন বা নকাশির নির্বস্তুক সৌন্দর্য রচনা ছাড়াও বস্তুর গড়ন ও গুণ চিত্রগত করায় আলংকারিক পদ্ধতির অন্তহীন সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর বোধের বিকাশে এই অভিজ্ঞতা খুব গুরুত্বময়। জাপানের শিল্প বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা 'কোক্কা' কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে নিয়মিত আসতো। এই পত্রিকায় ওদেশের ক্ল্যাসিকাল ছবির অতি চমৎকার প্রতিলিপি থেকে বড়ো শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে সাক্ষাৎ ধারণা তৈরির সুযোগও পেয়েছেন। নন্দলালের উত্তরকালীন নানা ধরনের কাজে জীবজন্তু মানুষজনের রূপ রচনায় বা প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনায় তীক্ষ্ণ ও কোমল রেখার বুনোটে যে বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত শৈলীর প্রয়োগ দেখা যায়, আবহমান প্রাচ্য চিত্রকলার আলংকারিক রীতি পদ্ধতির গভীর অনুশীলনেই সেই শৈলী গঠিত হয়েছিল।

জাপানি অঙ্গিকের অভিজ্ঞতার সংহত, সৃষ্টিময় প্রয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত এই পর্বের 'উমার ব্যথা' (১৯২১) ছবি। ছিন্ন রুদ্রাক্ষের মালা, ছিন্নদল পদ্ম, প্রত্যাখ্যাত উমার বেদনা-আনত দেহভঙ্গির কারুণ্য ঘিরে আছে পাহাড়ি প্রকৃতি। ওয়াশে নয়, টেম্পারায় করা হলেও এই ছবির তুলির চালে, গাছ পাতা পাথর আঁকার ধরনে কতটা জাপানি শৈলীর কাছাকাছি গেছেন, তাইকানের কাজটির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে উপলব্ধি করা যাবে। এ রকম ছবি অবশ্য একটিই পাওয়া যাচ্ছে এই সময়ে। কালি-তুলির কাজও বেশি নয়। জাপানি শৈলী অনুসরণের প্রবণতা বেড়েছে আরো পরে।

নন্দলালের জীবনে একটা বড়ো পর্বান্তর এল ১৯২০-তে। কলাভবনের দায়িত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে এলেন। বিশ্বভারতী প্রাচ্যবিদ্যা এবং প্রাচ্য শিল্পকলা চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথ এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। শান্তিনিকেতনে সূচনা কাল থেকেই তিনি এজন্য কিছু কিছু প্রাথমিক আয়োজন করে এসেছেন। এখানকার শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ জাগাবার জন্যে তিনি নিজে মাঝে মাঝে জাপানি সাহিত্য পড়ে শোনাতেন, জাপানি শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। চীন-জাপানের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সর্বদাই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। চীন-জাপান সম্পর্কে তাঁরও আন্তরিক আকর্ষণের মূলে ছিল ওকাকুরা তেনশিনের চরিত্র এবং মতামতের স্মৃতি। ১৯১৬-য় তিনি তেনশিনের স্ত্রীর আমন্ত্রণে ইদ্‌জুরায় তাঁদের বাড়িতে বাস করে এসেছেন। তেনশিনের স্মৃতিতে একটি ফার গাছের চারা রোপণ করে এসেছিলেন। ১৯২৪-এ আবার চীন-জাপান ভ্রমণের সুযোগ এল। এবারে তিনি অন্যদের সঙ্গে নন্দলালকে সঙ্গে নিয়ে যান। এই প্রথম নন্দলাল এশিয়ার দুটি প্রাচীন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ পেলেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক চীন এবং জাপানের পক্ষে দুঃসময়। অব্যবস্থিত রাজনৈতিকপরিবেশ। সমাজের মধ্যেও মত সংঘর্ষ, রুচির সংঘর্ষ আবর্ত সৃষ্টি করছে। পশ্চিমী প্রভাব খুব তীব্র সাধারণ জীবনে। নির্মোহ সুস্থির দৃষ্টিতে নন্দলাল এই পরিস্থিতির ভালো মন্দ দিক খুঁটিয়ে দেখেন। ৮ মে ১৯২৪ তারিখে চীন থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠিতে (রবীন্দ্র ভবন সংগ্রহ) তাঁর অভিজ্ঞতার বেশ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। বলছেন, উচ্চ অঙ্গের শিল্পের গোড়ায় পশ্চিম দেশীয় কীট প্রবেশ করেছে। সাধারণের মধ্যে রুচির কোনো মান নেই। পোশাক-পরিচ্ছদে তীব্র মার্কিন প্রভাব। মার্কিনী কায়দায় মিউজিয়ম তৈরি করে শিল্পবস্তু সংরক্ষণের চেষ্টায় তবুও দুর্লভ সামগ্রী দেশের বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়েছে দেখে খুশি হন। সংখ্যায় কম হলেও সত্যকার শিল্পের কদর বোঝে এমন কিছু লোক ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর মতো সোসাইটি খুলে বড়ো আকারে কাজ করছেন দেখে ভালো লাগে তাঁর। 'ছোকরাদের' মধ্যে না ভেবেই পুরাতনিকে ছেড়ে যাবার প্রবণতায় উদ্বেগ বোধ করেন। এই পরিবেশের মধ্যে উদ্যোগী হয়ে তিনি যথার্থ গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন এবং চীনের পরম্পরাগত শিল্পকলার সাক্ষাৎ জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন।

এই যাত্রায় নন্দলাল জাপানে ছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহ। জাপানের শিল্পীসমাজের কাছে নন্দলাল অপরিচিত ছিলেন না। তাঁর 'সতী' ছবির প্রতিলিপি জন উডরফের আলোচনার সঙ্গে 'কোককা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৯০৮)। ১৯১৯-এ তোকিয়োয় বাংলার শিল্পীদের যে প্রদর্শনী হয় সেখানে তাঁর ছবিও ছিল। বহুশ্রুত ইয়োকোইয়ামা তাইকান, শিমোমুরা কানজান—এঁদের সঙ্গে এবারে নন্দলালের পরিচয় হল। এখানে নতুন করে কিছু অনুশীলনের মতো সময় বা সুযোগ পাননি অনুমান করা যায়। তবে বিখ্যাত শিল্পীদের মূল কাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ অবশ্যই পেয়েছিলেন। বিজুৎসু-ইনয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তেনশিনের মৃত্যুর পরে এই প্রতিষ্ঠান ঝিমিয়ে পড়েছিল। ১৯১৮-য় তাইকান নতুন উদ্দীপনায় এখানকার কাজের তত্ত্বাবধান শুরু করেন এবং অনেক তরুণ শিল্পী যোগ দেন। সাধারণের রুচির বিশৃঙ্খলা চীনের মতো জাপানেও ক্রমেই প্রকট হচ্ছিল। শিল্পীদের মধ্যেও অনেক দল উপদল। রেনোয়ারের ছাত্র উমেহারা রিয়ুজাবুরো পিসারো এবং সেজানের অনুগামী ইয়াসুই সোরতাতো বিশেষভাবে আধুনিক ফরাসি শিল্প আন্দোলনের প্রভাব আত্মস্থ করে জাপানে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। এঁরা শক্তিমান শিল্পী ছিলেন এবং সমকালীন শিল্পী সমাজে এঁদের প্রভাব কম ছিল না। ফলে বিংশ শতাব্দীর ফরাসি চিত্রকলার বিভিন্ন আন্দোলন, ফোভিজম-কিউবিজম ফিউচরিজমের প্রভাব জাপানি শিল্পীদের মধ্যেও এইসব রীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় উৎসাহ জাগিয়েছে। গড়ে উঠেছে ছোটো ছোটো গোষ্ঠী। নন্দলাল অবশ্যই সমকালীন জাপানি শিল্পজগতের বিরোধী প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে যে সমস্ত ধারা উপধারা তৈরি হয়ে উঠেছিল সেসব কাজের মূল্য সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা কিছুই আমরা জানি না। অনুমান করা যায়, য়ুরোপীয়

আধুনিকতা সম্পর্কে শিল্পীদের এই ব্যাকুলতা তাঁর ভালো লাগে নি। কিছু পরে আমাদের এখানেও নতুন করে য়ুরোপীয় আঙ্গিকে চর্চার ঝোঁক যখন দেখা দেয় সে প্রবণতা তিনি অনুমোদন করতে পারেননি। নানা স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও বর্ষীয়ান তাইকান নতুন নতুন কাজে নিজেকেক বিকশিত করছেন, একটি বড়ো গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করছেন দেখে নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তেনশিন প্রবর্তিত জাপানি আধুনিকতার মূল ধারাটি তখনো প্রাণবন্ত ছিল। তাইকান এই সময়েই তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ, ৪০ মিটার দীর্ঘ রেশমের উপরে সাদা কালোয় ছবিটি করেন।

জীবনের সব শিক্ষা, সব অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিয়ে আঁকা এই বিশাল কাজটিতে তাঁর নিজের শিল্পী জীবনে যেমন, তেমনি বিজুৎসু-ইনয়ের চর্চার ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। নন্দলাল পরবর্তী জীবনে সাদাকালোয় যেসব ছবি করেছেন তার কোথাও কোথাও তাইকানের এই ছবির খুব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে।

ছাত্র বয়স থেকে জাপানি শিল্পরীতি সম্পর্কে আকর্ষণ এবং বিভিন্ন সময়ের সঞ্চিত জ্ঞান বোধহয় চীন-জাপান ঘুরে আসার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় ক্রমে আত্মপ্রকাশের একটি বড়ো পথ তৈরিতে কার্যকর হল নন্দলালের জীবনের উত্তর পর্বে। রঙের কাজের পাশাপাশি কালি-তুলির কাজের একটা ধারা অনেক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু ক্রমে রঙের বৈভবের চেয়ে সাদাকালোর কাজে তাঁর অভিনিবেশ গাঢ় হতে থাকে। রঙ দিয়ে ধরা যায় বস্তুর যে আকারবদ্ধ রূপ তার চেয়ে বস্তুর স্পর্শগ্রাহ্য গড়নের গতি-রেখার রহস্য নন্দলালকে অনেক বেশি আকর্ষণ করেছে চিরদিন। এইখানে তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তা। এই স্বভাবের টানেই তিনি ভারতীয় মণ্ডনধর্মী শিল্পের চর্চায় গভীর আনন্দ পেতেন। একই প্রবণতায় চীন-জাপানের লিপিচিত্রের রেখার ছন্দে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অকস্মাৎ বাইরের প্রভাবে কোনো বড়ো প্রতিভার আত্মপ্রকাশের ভাষা বদলায় না কখনো। প্রতিভা নিজস্ব স্বভাবে বাইরে থেকে নিজের ভাষা তৈরির উপাদান আকর্ষণ করে নেয়। 'প্রভাব' কথাটা এখানে তাই অবান্তর। নন্দলালের আত্মবিকাশে জাপানি অভিজ্ঞতা এইভাবেই গভীর ফলদায়ক হয়েছিল। পরিণত বয়সে ক্রমে তিনি বর্ণমায়া থেকে নিজেকে সংবৃত করে নিয়েছেন। আশ্রয় করেছেন সাদা এবং কালো, যে সাদায় কালোয় সব রঙ সংবৃত। তাঁর শিল্পীমনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক বদলে অবশ্যই জাপানি অভিজ্ঞতা থেকে জেগে ওঠা ভাবনা কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ভারতবর্ষ রঙের গমক ভালোবাসে—জাপানের আর্টে কালা-গোরার মিলনই প্রধান।" (পূর্বোক্ত সূত্র)। পটের সমতল জমি ভেঙে চিত্রগত বস্তুর নানা আয়তনের মায়া জাগানো রঙে যতো সহজ শুধু কালোয় তেমন অনায়াস হতে পারে না কখনো। এই আঙ্গিকে শিল্পীকে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। শুধু কালোয় বস্তুর গড়ন ধরতে গেলেই পটের অলাঞ্ছিত অবকাশ বা স্পেস-এর সঙ্গে গড়নটির দ্বন্দ্বময় সম্বন্ধপাতের মাত্রাবোধ ভিন্ন এক চিত্রভাষা গড়ে তুলতে হয়। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রটিতে নন্দলালের মতো বিপুল পরিমাণ পরীক্ষা আমাদের আর-কোনো শিল্পী করেননি। চিত্রগত বস্তুর ঘনতা, ভর, অন্তর্গত গতির তীব্রতা শুধু সাদা কালোর দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাসে ধরা প্রচণ্ড সাহসের এবং শক্তির কাজ। অথচ এ বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে প্রায় প্রত্যহ আয়াসহীনভাবে একটানা অনেক কাজ করে যেতেন। ভোরবেলার প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ সময়টুকু নিবিষ্টভাবে কালি-তুলির কাজে মগ্ন থাকতেন। যখন যেখানে গেছেন সেখানকার পরিবেশের যাকিছু অভিজ্ঞতা—ধরে এনেছেন এই আঙ্গিকে। বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে নন্দলালের যথার্থ ভূমিকা এবং নানামুখী আদর্শের টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁর স্থির অবিচল বিকাশশীল প্রতিভার তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন পূর্ণাঙ্গ বিচার এখনো হয় নি, তেমনি ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় তাঁর এই বিশিষ্ট দানের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা হয় নি। আক্ষরিকভাবেই তিনি কালি-তুলির ছবি এবং স্কেচ মিলিয়ে সংখ্যাতীত কাজ করেছেন এবং সব কারো পক্ষে দেখে ওঠাও সম্ভব নয়। যেটুকু দেখার সুযোগ আছে তাতেই বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে যে দেশীয় প্রকৃতি, দেশীয় জীবজন্তু এবং দেশীয় মানব সমাজের কী এক বিশাল অভিজ্ঞতাবোধ এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। কতো বিচিত্রভাবে তাঁর প্রতিভা স্বদেশের মাটিতে শিকড় মেলেছিল। বাস্তবতার তত্ত্ব নিয়ে আমাদের সাহিত্যে এবং শিল্পতত্ত্বের
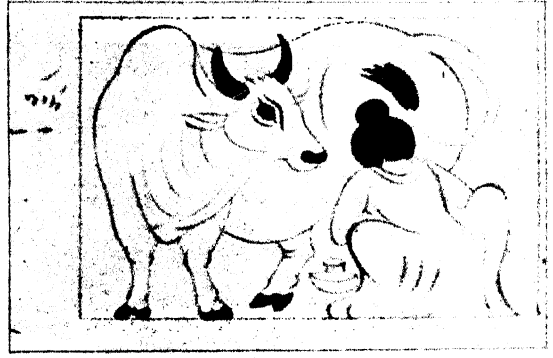
এলাকায় নানা তর্ক উঠেছে তাঁর জীবিতকালে। সে সব তর্কে তাঁর বিশেষ কিছু ভূমিকা ছিল না, নির্লিপ্তই ছিলেন বলা যায়। কিন্তু শক্ত কব্জিতে বাস্তবের মোকাবিলা করেছেন অক্লান্তভাবে।

চলমান জীবনের সর্বায়ত রূপ ধারাবাহিক চিত্রমালায় এভাবে ধরে যাওয়ায় তাঁর অভিনিবেশ জাপানের উকিইয়োয়ী ধারার শিল্পীদের কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিষয় ভাবনায় পৌরাণিক-আধ্যাত্মিক বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বস্তু থেকে এঁরা দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন দৈনন্দিন সাধারণ-জীবনের দিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধারার শিল্পীরা বিষয়-ভাবনার আভিজাত্য ভেঙে দেওয়ায় বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হন। বলা হত, ক্ল্যাসিকাল জাপানি ছবির পরিশীলিত সূক্ষ্ম আঙ্গিক এঁদের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু এঁদের ছবিতে প্রবল প্রাণময় রেখা ও বর্ণ বিন্যাসের ক্ষমতা কেউ অস্বীকার করেন না। জাপানি চিত্রকলার ইতিহাসে উকিইয়োয়ী ধারার শিল্পীরা একটি স্বতন্ত্র প্রাণবন্ত চিত্র-প্রজাতি সৃষ্টি করে গেছেন, যার আর-এক গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল নিশিকি-ইয়ে বা সিল্ক-প্রিন্ট শিল্পে। উকিইয়োয়ী শিল্পীরা পরিবারগত ভাবে এক-একটি বিষয় নিয়ে চর্চা করতেন এবং বিশেষ বিষয়ের ছবিতে পারদর্শিতা এক-একটি পরিবারের অধিকারে ছিল। নন্দলালের হাতে উকিইয়োয়ী তুল্য একটি চিত্র-প্রজাতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে—বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি অবশ্য কোনো একটি বিষয়ের ব্যবহারে সীমাবদ্ধ পারদর্শিতার চর্চা করেন নি, চারপাশের প্রকৃতি ও চলমান জীবনের রূপগত বৈচিত্র্যের সব-কিছুতেই তাঁর সমান আকর্ষণ। আর, তাঁর, এই বাস্তবজীবনমুখী বিপুল কাজে রঙের ব্যবহার করেছেন কম, কালি-তুলির ছবিই সংখ্যায় অনেক বেশি। কোথাও কোথাও কালিতে আঁকা ছবিতে বিশেষ প্রয়োজনে সামান্য রঙের ছোঁয়া দিয়েছেন। যেমন রাতের শালবনের পথে গোরুর গাড়িতে কেঁদুলি মেলায় যাবার ছবিটিতে পথের উপরে কালোর মধ্যে সোনালি রঙের স্পর্শ। বা, জলে উজিয়ে চলা পুঁটিমাছের ছবিতে মাছগুলির কান্‌কো এবং চোখে লালের ছোঁয়া। কালির মধ্যে সোনালি বা অন্য রঙের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল অথবা মৃদু প্রভা খেলানোর এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন জাপানি শিল্পী সোতাৎসু (সপ্তদশ শতাব্দী)। জাপানি কালি-তুলির ছবিতে এই পদ্ধতি পরে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। ইঙ্গিতটি নন্দলাল জাপানি ছবি থেকে পেয়েছেন সম্ভবত।

এই প্রসঙ্গেই নন্দলালের প্রকৃতি-চিত্র, ভূদৃশ্য, সমুদ্রদৃশ্য রচনায় ধারাবাহিক আগ্রহের কথাও মনে আসে। আমাদের ঐতিহ্যে প্রকৃতি-চিত্রের চর্চা ছিল না। আধুনিক পর্বের গোড়ায় প্রকৃতি-চিত্রের আদর্শ এসেছিল দুই উৎস—ইংরেজ শিল্পী টার্নার-কনসটেবলদের ছবি এবং চীনা ও জাপানি ছবি—থেকে। চীনা প্রকৃতি-চিত্রের ঐতিহ্য প্রাচীনতম। চীনের চিত্রনীতি গড়ে উঠেছিল কনফুশিয়স, লাও-ৎজু, মহাযান বৌদ্ধ বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তিতে। সুঙ সম্রাটদের আমলে (৯৬০-১২৭৯) চীনা প্রকৃতি-চিত্র উৎকর্ষের বিস্ময়কর স্তরে উন্নীত হয়েছিল। বস্তুর চাক্ষুষ রূপ মাত্রেই প্রাচীন চীনা শিল্পীদের দৃষ্টিতে গভীর বিশ্বসত্যের প্রতীক। স্বর্গ ও মর্তের সৌষম্যে বাঁধা বিশ্বপ্রকৃতিতে মেঘ-কুয়াশা-জল স্বর্গের প্রতীক, —য়িয়াঙ ; পাহাড়-গাছপালা পার্থিবতার প্রতীক,—য়িঙ। জলধারায়, নুয়ে আসা মেঘ বা কুয়াশায় তাঁরা দেখেছেন মর্তের সঙ্গে মিলনে স্বর্গের অনুকাঙ্ক্ষা। তাঁদের তুলির স্পর্শে পটের

উপরে যা-কিছু ফুটে ওঠে সবই এই বিশ্ব-ব্যাপারের মহিমা সম্পর্কে শিল্পীর ধ্যানের প্রতিরূপ। এই আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর চীনা প্রকৃতি-চিত্রের প্রশান্ত সৌন্দর্য অনেক দিন জাপানের শিল্পীদের আদর্শ ছিল। তাঁরা প্রকৃতি-চিত্রে চীনা দৃশ্যাবলীই আঁকতেন। প্রকৃতি-চিত্রে জাপানি স্বাদেশিকতার বোধ প্রথম দেখা দিয়েছিল কানো ধারার অন্যতম শক্তিমান শিল্পী তান্‌য়িউ-র (১৬০২-৭৪) চেতনায়। তিনি চীনা দৃশ্যাবলীর বদলে চোখে দেখা দেশীয় দৃশ্যের আদলে আঁকা শুরু করেন এবং চীনের প্রভাব মুক্ত জাপানি প্রকৃতি-চিত্রের বিকাশ শুরু হয়। অত পুরানো কাজ আমাদের এখানে কতটা পৌঁছেছিল বলা শক্ত। কিন্তু আমাদের শিল্পীরা এক সময়ে উকিইয়োয়ী ধারার হোকুসাই (১৭৬০-১৮৪৯) এবং আরো বড়ো মাপের প্রকৃতি-চিত্র শিল্পী হিরোশিগের (১৭৯৭-১৮৫৮) কাজ অবশ্যই দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। উকিইয়োয়ী কলমের প্রকৃতি-চিত্রে আদর্শায়িত দৃশ্যের বদলে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থানীয়তা এল। জাপানের ইতিহাসে আধুনিক পর্বের ঠিক আগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সমাজের মধ্যে রুচির বদল ঘটে যাচ্ছিল। হিরোশিগের কাজে সেই নতুন মেজাজ ফুটেছিল। তাঁর ছবির মেঘ-বৃষ্টি-জল, পাহাড়-গাছপালা থেকে প্রতীকের রেশ কেটে গিয়ে বাস্তব, নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বিশিষ্টতা জোরালো ভাবে প্রকাশ পায়। আসন্ন যুগান্তরের উল্লাসের পূর্বাভাস ফুটেছে তাঁর আঁকা আতশবাজির আলোয় উদ্‌ভাসিত সুমিদার আকাশের চিত্রাবলীতে। পশ্চিম জগতে তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, মার্কিন শিল্পী হুইস্‌লার তাঁর ছবির থীম অনুসরণ করে আঁকতেন। বিজুৎসু-ইনয়ের শিল্পী তাইকান-শুন্‌সো-কানজানদের প্রকৃতিচিত্রে এই উত্তরাধিকার বর্তেছিল। নন্দলালের পরিণত পর্বের ছবিতে এমন বহু ভূদৃশ্য-সমুদ্রদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় যার আঙ্গিকে এই সব জাপানি শিল্পীর আঙ্গিকের মিশ্রণ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই পর্যায়ের কিছু ছবির পাশে সমকালীন কয়েকটি জাপানি তুলনা করলে আঙ্গিকের সমীপতা বোঝা যাবে।

নন্দলাল যখন বলেন, "শালগাছ তালগাছ যদি আঁকি, তার মধ্যেও শিবকেই আঁকব" (কানাই সামন্ত ধৃত উক্তি), তখন চীনা শিল্পীদের উপলব্ধির কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি-চিত্রে প্রতীকের মাহাত্ম্য কখনোই বড়ো কথা নয়। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে যাওয়া আদর্শায়িত প্রকৃতি তাঁর ছবির বিষয় নয়। শিলাইদহ, শান্তিনিকেতনের আশপাশ, রাঁচী, পুরী, গোপালপুর—আলাদাভাবে চেনা যায়। ১৯২৫-এর পর থেকে নন্দলালের প্রকৃতি-চিত্রে কালি-তুলির ব্যবহার ক্রমে বেড়েছে। রঙের সাহায্য ছাড়াই কালি টোনের হেরফেরে আঞ্চলিক প্রকৃতির অনন্যতা এবং বিশিষ্ট মেজাজ ফুটিয়েছেন। অবশ্য জাপানি শিল্পীরা যত বিরাট পটে প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য ধরতেন তেমন বড়ো মাপের কাজ নন্দলাল করেননি। ভাঁজ খুলে খুলে পর্যায়ক্রমে দেখতে হয় এই দীর্ঘ পট, একে জাপানিরা বলেন মাকিমোনো। তাইকানের হাতের মাকিমোনোর ছাপা কপি দেখেও বিস্মিত হতে হয়। এমন অনুভূতি হয় যেন হেঁটে হেঁটে চলেছি জলা-জঙ্গল, নতোন্নত জমি, ফেলে যাওয়া পোড়ো বসতি, গাছপালার নিবিড় জটলা পেরিয়ে পেরিয়ে—যেতে যেতে শেষ প্রান্তের দিগন্তে চোখে পড়ল আকাশে এক ফালি চাঁদ। ওই আলো যতদূর পৌঁছয় সবটা পটে এনেছেন সাদা কালোয়। রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ মনে পড়ে, আমাদের শিল্পীরা এই বিরাটত্বের দিকে গেলেন না। কালি-তুলির কাজে নন্দলাল যে অসামান্য নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, তাতে মনে হয় তিনি পারতেন চেষ্টা করলে।

ছাত্র বয়সে অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসে তাঁর কাজের পরিবেশ থেকে, তাঁর ভাবনা পরিমণ্ডল থেকে নন্দলালের চেতনায় জাপানের শিল্পকলা সম্পর্কে যে আগ্রহ জেগেছিল, এইভাবে জীবনের পর্বে পর্বে তার বিকাশ ঘটে। তাঁর বিশিষ্ট প্রাচ্য-প্রতিভার পূর্ণতার জন্য, চিত্রকলায় ভারতীয়-আধুনিকতার পরিণতির জন্য জাপানি উৎস থেকে যা নেবার নিয়েছিলেন।

কলাভবন সংগ্রহের ছবিগুলি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ছাপা হল।

শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ বসুর সঙ্গে আলোচনায় আমি উপকৃত হয়েছি। বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীসুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। এঁদের উদ্দেশে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল

পঞ্চানন মণ্ডল

অবনীন্দ্রবাবুর 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' আর 'সুজাতা ও বুদ্ধ' ছবি দুখানি কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হয়ে 'প্রবাসী'তে বের হয়েছিল ১৩০৯ সালে। তাঁর এই ছবিগুলির উৎকর্ষ নিয়ে গুঞ্জন তখন চারদিকে। এই রকম প্রতিভাধর শিল্পীর এই মৌলিক ছবিগুলি দেখে দেখে নন্দলাল অবনীবাবুকেই মনে মনে গুরু বলে বরণ করে নিলেন।

পাড়ার ছেলে বন্ধু সত্যেন বটব্যালের কাছে অবনীবাবুর মজলিসী মেজাজের কথা অনেক শুনেছিলেন। একটা শুভদিন দেখে সব ঠিকঠাক করে সত্যেনের সঙ্গে গিয়ে অবনীবাবুর সকাশে হাজির হলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন বটব্যাল। অবনীবাবু সকৌতুকে দেখলেন, কাঁচুমাচু মুখে গোলোপানা একটি ছেলে। হাসি চেপে মুখ গোমড়া করে বললেন—লেখাপড়া হল না বুঝি, তাই স্কুল পালিয়ে ছবি আঁকতে আসা হয়েছে।' নন্দলাল বললেন, "আজ্ঞে, স্কুল পালিয়ে আসিনি। আমি এফ এ পর্যন্ত পড়েছি।' অবনীবাবু বললেন—'বিশ্বাস হয় না, সার্টিফিকেট দেখতে চাই।'

সার্টিফিকেট আর ছবির তাড়া নিয়ে আর্ট স্কুলে গেলেন একদিন সত্যেনের সঙ্গে। ছবির তাড়ায় ছিল তাঁর আঁকা রাফেএলের ম্যাডোনার কপি, সস্ পেন্টিং, গ্রীক মূর্তির কপি, স্টীল লাইফ পেন্টিং আর কাদম্বরীর চিত্রাবলী। অবনীবাবু ছবি দেখে তাঁকে পাঠালেন হ্যাভেল সাহেবের কাছে। তিনি পছন্দ করলেন নন্দলালের মৌলিক ছবি 'মহাশ্বেতা'। বিদেশী ছবির নকলগুলি টেবিল থেকে মেঝেয় ফেলে দিলেন।

নন্দলালের কাজ খুঁটিয়ে দেখে হ্যাভেল সাহেব খুশি হলেন। হুকুম ও নিয়ম মোতাবেক নানা পরীক্ষা হলো। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন থেকে কিছু আঁকতে বললেন। নন্দলাল আঁকলেন 'সিদ্ধদাতা গণেশের ছবি'। অবনীবাবু পরীক্ষকের মতামত জানতে চাইলে ঈশ্বরীপ্রসাদ বললেন—"হাথ পুখ্‌তা হৈ।" তবে পনরো মিনিটের কাজ পাঁচ মিনিটে সারায় ওঁদের ধন্দ জেগেছিল। তাতে অবনীবাবু বললেন, 'ঠিক হয়েছে, সবই তো রয়েছে। তা ছাড়া, উপস্থিত বুদ্ধিও তো বেশ খাটিয়েছে।'

এতো করে বিড়ে-কষে দেখে, পরে, অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কি শিখবে তুমি। —দিশি, বিলিতী, শৌখিন, ব্যবহারিক, জলরং, তেলরং—অনেক কিছু শেখবার আছে। একটা বেছে নাও।" নন্দলাল বললেন, "আপনার কাছে এসেছি, যা শেখাবেন তাই শিখবো।"

কিছুদিন পরে অবনীবাবু নন্দলালকে নিলেন তাঁর নিজের ক্লাসে। অবনীবাবুর ক্লাস সেই থেকে শুরু হল, আর নন্দলাল হলেন তাঁর ক্লাসের প্রথম ছাত্র। কাশী থেকে তাঁত শিখে এসে এই ক্লাসের দ্বিতীয় ছাত্র হলেন সুরেন গাঙ্গুলী। অবনীবাবু তাঁদের দেখিয়ে বলতেন—"এই আমার ডান হাত আর বাঁ হাত।"

ওদিকে নন্দলালের শ্বশুরকুল ভেবে অস্থির তিনি বয়ে গেলেন বলে। শ্বশুর মশায় খড়্গপুর থেকে এসে দেখা করলেন অবনীবাবুর সঙ্গে। অনেক আলোচনার পর অবনীবাবু তাঁকে বললেন—"আমি নন্দলালের সব ভার নিলেম।"

আর্ট স্কুলে নন্দলাল প্রথম ছবি আঁকলেন—'সিদ্ধার্থ ও আহত হংস'। ছবিটার আদ্রা করা হয়েছিল একটু আগেই। তিনি সিদ্ধার্থের পা এঁকেছিলেন গোল করে। অবনীবাবু সেটা শুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে হ্যাভেল সাহেব বললেন—"না, থাক। বেশ অর্নামেন্টাল ছবি হয়েছে, এ্যানাটমির দরকার নেই।"

আর্ট স্কুলে অবনীবাবু নিজের ছোট্ট স্টুডিওটিতে চৌকির উপর বসে ইজেলের সামনে ঝুঁকে পড়ে, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে ছবি আঁকতেন। প্রায়ই নন্দলালরা গিয়ে তাঁর কাজ দেখতেন। ছাত্রদের কাছে তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। বাইরের লোকের জন্যে দরজায় লেখা ছিল—'তাজিম মাফ'।

ওখানে অবনীবাবুর 'ফিনিশ' করা প্রথম বিখ্যাত ছবি 'বঙ্গমাতা'। এই 'বঙ্গমাতা'ই 'ভারতমাতা' হলেন ১৯০৫ সালে। নাম দিলেন সিস্টার নিবেদিতা। সে হল গিয়ে স্বদেশীযুগের 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সময়। 'ভারতমাতা' নাম দিয়ে সে ছবি তখন স্বদেশী পতাকাতে ব্যবহার করা হতো। অবনীবাবু বলতেন—"আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি, হাতে অন্ন বস্ত্র বরাভয়। টাইকোয়ান সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলেন। কোথায় যে গেল পরে পতাকাটা জানিনে।" এই বঙ্গমাতার ছবিখানির রেখাচিত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ জগদীশবাবুর বৈঠকখানায় এঁকে দিয়েছিলেন।

অবনীবাবু 'বঙ্গমাতা' শেষ করে 'ওমর খৈয়মে'র ছবি আরম্ভ করলেন। অর্ডার পেয়েছিলেন Studio ম্যাগাজিন থেকে। সেই ছবি তখন করছেন, আর নন্দলালরা দেখছেন। খুব মজা লাগতো তাঁদের দেখতে। সেই রং-ভেজানো আর তুলির মুভমেণ্ট।

তিনি নন্দলালদের উৎসাহ দিতেন মৌলিক ছবি করবার জন্যে। 'ইনস্ট্রাকশন' দিতেন কমই। ছাত্রেরা ছবি আঁকার 'লড়াই ফতে' করতে না পারলে, আখেরে তিনি আছেন, এই ছিল তাঁর কথা। ক্লাসে বসে বসে

গুরু অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করছেন নন্দলাল

মজার মজার গল্প করতেন, যেন আড্ডা। কিন্তু, আসলে তিনি যে শেখাচ্ছেন—সেটা নন্দলালরা বুঝতে পারতেন না। এই রকম ছিল ক্লাসে তাঁর শিল্পবিদ্যা শেখানোর পদ্ধতি। নন্দলালদের মৌলিক শিল্পচিন্তায় খোদকারী করতে চাইতেন-না তিনি পারতপক্ষে। হাত ধরে ধরে দেখিয়ে দেখিয়ে কখনও শেখাননি নন্দলালদের। ওদিকে রজনী পণ্ডিত মশায় রামায়ণ-মহাভারত থেকে পাঠ করে শোনাতেন নিয়মিত। আর তাই থেকে ছবির আইডিয়া পেতেন তাঁরা—মাস্টার ছাত্র সবাই।

হ্যাভেল সাহেব চলে গেলে অবনীবাবু আর্টস্কুলের Officiating Principal হলেন চার বছরের জন্যে। ঐ সময় কোন দিশি লোককে এই পদ দেওয়া ছিল নিয়মবিরুদ্ধ। অবনীবাবুর জায়গায় ভাইস প্রিনসিপাল হলেন হরিনারায়ণ বসু। সেকেণ্ড মাস্টার বরদাকান্ত দত্ত। আগের রুটিন মতই আর্ট ইস্কুল চলতে লাগল। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়ার কাজ ও ক্লাসও হত আগের মতো। ক্লাসে Model আনা হত পূর্ববৎ। পুরুষ আর মেয়ে দুই-ই আনা হত। Model হবার জন্যে রাস্তা থেকে 'সাধু' ধরে আনা হত। মেয়ে Model আনা হত চিৎপুর থেকে। এ নিয়ে অনেক মজার ঘটনা আছে।

Art ইস্কুলে exhibition হলে বা drama হলে অবনীবাবু নন্দলালদের নিমন্ত্রণ করতেন।

নন্দলাল আর্ট ইস্কুল ছাড়ার সময় Percy Brown এলেন Havell-এর জায়গায় অধ্যক্ষ হয়ে। এসে চার্জ নিলেন। কিন্তু অবনীবাবুর সঙ্গে তাঁর মতের গরমিল হতে লাগল। ঠিকিমিকি চলতেই লাগল। 'ফ্রিকশনে'র ব্যাপারটা ছাত্ররাও বুঝতে পারত। ছুটি চেয়ে পাননি। তখন 'থোড়াই কেয়ার করি' বলে অবনীবাবু চাকরি ছেড়ে দিলেন। তিনি রিজাইন করলেন পেনশন পাবার আগেই। 'মেজমা' জ্ঞানদানন্দিনীদেবীকে বলেকয়ে Havell সাহেব অবনীবাবুকে রাজি করিয়ে আর্ট ইস্কুলে এনে ভাইস-প্রিন্সিপাল করেছিলেন। তাঁর মাসিক বেতন বরাদ্দ ছিল তিনশো টাকা করে। কিন্তু জাতশিল্পীর ধাতে সে সব সইল না।

অবনীবাবু রিজাইন করে চলে গেলেন। নন্দলালকে তিনি বললেন—"তুমি বাড়ি যাও, কিংবা আমার কাছে এসো।" নন্দলাল তাঁরই বাড়িতে গিয়ে কাজ করবেন স্থির করলেন। আর্ট ইস্কুলের অধ্যক্ষের অনুরোধ রাখতে পারলেন না। অবনীবাবু তাঁকে তখন মাসে ষাট টাকা করে বৃত্তি দিয়েছিলেন তিন বছর। এই সময় নন্দলাল সিস্টার নিবেদিতার Indian Myths of Hindoos and Buddhists বই-এর জন্যে ছবি আঁকছিলেন।

সেই সময় কুমারস্বামী দ্বিতীয়বার যখন এলেন, এসে উঠলেন অবনীবাবুদের বাড়িতে। প্রায় দুতিন মাস ছিলেন তিনি ওঁদের পরিবারে। তিনি যেন ঘরের লোক হয়ে গেলেন ওঁদের ওখানে। যেমন গগন, সমর, অবন, তেমনই যেন আর এক ভাই হলেন কুমারস্বামী। উঠতেন, বসতেন, খেতেন, বেড়াতেন—একসঙ্গে। একই সঙ্গে তামাক টানতেন গড়গড়াতে। এই রকম মেলামেশা। বেশ বাবরি চুল, বড়ো বড়ো আর কটাকটা। অবনীবাবু পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন কুমারস্বামীর। 'প্রবাসী'তে ছাপান হয়েছিল তাঁর সে ছবি।

অবনীবাবুর লাইব্রেরীতে যত ছবি ছিল কুমারস্বামী তার ক্যাটালগ তৈরি করেছিলেন। নন্দলাল তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁর নির্দেশমতো কপিও করে দিতেন। অবনীবাবুদের রাজপুত (জয়পুর কাঙড়া) আর মোগল (দিশি) আর্টের ছবির এ্যালবাম ছিল অনেক। সেগুলো অত্যন্ত রেয়ার জিনিস। সেই এ্যালবাম থেকে কুমারস্বামী ক'গ্রন্থ বই ছাপালেন।

অবনীবাবুর ওখানে কাজ করতে করতে নন্দলাল দেশের বাড়ি রাজগঞ্জ-বাণীপুরে প্রায়ই আনাগোনা করতেন।

অবনীবাবু একবার বললেন—"কালীঘাটের পট কিছু কর তোমরা। নতুন করে করতে হবে। অর্থাৎ আঁকবার বিষয় হবে নতুন, কিন্তু টেকনিক হবে পুরাতন, অর্থাৎ ট্র্যাডিশন্যাল। যাতে লোকে ছবি নেয়, লক্ষ্য রাখবে সেদিকে।"

বাণীপুরে বসে পটের ছবি আঁকতেন নন্দলাল। আঁকতেন বালির কাগজে। সাবজেক্ট ছিল প্রবাদ প্রবচন—'বেল পাকলে কাকের কি', 'সাপে নেউলে', 'নেড়া বেলতলায় ক'বার যায়'—এই রকম সব। গ্রামের লোকে আনন্দ পাবে এই সবে। দাম কত? চার পয়সা করে। বিক্রিও হত বেশ। নন্দলালের শিল্পখেলা জমেছিল ভালোই। মাসে মাসে আসতো তা প্রায় পনেরো কুড়ি টাকার মতন। আরো আঁকতে পারতেন কিন্তু, আঁকা হয়নি।

সহসা একটা ঘটনায় এ্যাটিটুড বদলে গেল নন্দলালের। হাত গুটিয়ে গেল। অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন—অনেক দিন পরে। বগলে তাঁর অ-বিক্রি ছবির তাড়া। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দক্ষিণের বারান্দায় বসে বসে তিন ভাই একসঙ্গে গড়গড়া টানছেন। একসঙ্গে বসেই তামাক খেতেন তিন ভাই—অবনীবাবু, গগনবাবু, আর সমরেন্দ্রবাবু। ছবিও আঁকতেন তাঁরা একসঙ্গে বসে।

ছবি থাকলে, নন্দলাল গুরুর কাছে হট্ ক'রে প্রথম দেখাতেন না। মন মেজাজ বুঝে তবে মেলে ধরতেন। সেদিন দেখলেন, খুশী বটে। তাঁকে দেখামাত্র অবনীবাবু বললেন,—"ভাবছি এতোদিন ছিলে কোথায়? কালিঘাটের পট নতুন ক'রে আঁকবার জন্যে লিস্ট করেছি, বাঙ্গালা প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়গুলো নিয়ে। এই যে লিস্টি।"—বলে অবনীবাবু নন্দলালের সামনে তাঁর করা লিস্টি মেলে ধরতেই নন্দলালের বগল থেকে বেরিয়ে গেল তাঁর-করা ছবির তাড়া। "অ্যাঁ, তুমিও এই করছিলে নাকি!"—থমকে গেলেন অবনীবাবু। ছবি দেখে বললেন,—'এখনও রং হয়নি। বিক্রী করছো?' নন্দলাল বললেন,—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' —'দাম কত?' 'চার পয়সা ক'রে।' 'এক টাকা করে আমি কিনে নিলুম।' বলেই, তিরিশ টাকা তিরিশখানি ছবির জন্যে দিয়ে অবনীবাবু কিনে নিলেন নন্দলালের সব ছবি।

ব্যস্, নন্দলালের মন কুঁচকে গেল —লজ্জাবতী লতার মতন। আর্টে ঘা পড়লো। এ্যাটিটুড বদলালো। সেই ধারা সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ও-খেলা ছেড়ে দিলেন। কেন যে এ্যাটিটুড বদলালো, সে রহস্য বরাবর নন্দলালের অজানা।

ঐ রকম এক্সপেরিমেন্ট আর একবার করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৪১ সালে গুরুদেবের মৃত্যুর পরে অবনীবাবু বিশ্বভারতীর আচার্য হয়ে সেখানে যাবার আগে। লোকে বলতো, —তাঁদের ছবির দাম বড়ো বেশী। মধ্যবিত্ত লোকে কিনতে পারে না। যারা ছবি ভালোবাসে তারা। সুতরাং নন্দলালের মাথায় এলো, ছবির দাম তিরিশ টাকার বেশী করবেন না। অথচ যেমন আঁকেন তেমনি আঁকবেন।
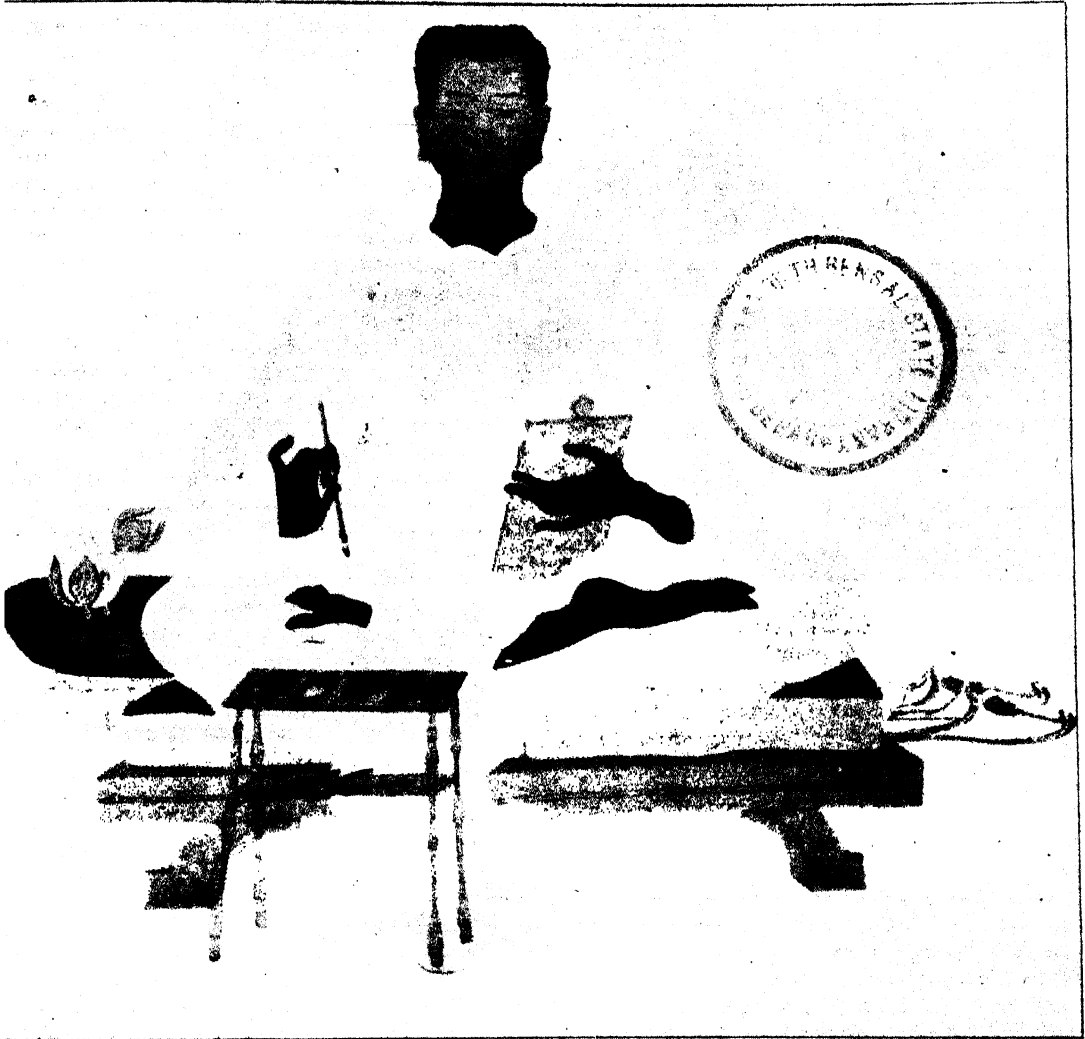
আমার গুরু' নন্দলালের অঙ্কিত টেম্পেরার ছবি।

সে সময়ে পাঁচখানা ছবি আঁকলেন তিনি। তিরিশ টাকা করে দাম বাঁধলেন প্রত্যেকটার। এই পর্যায়ের একখানি ছবি ছিল— 'কালী', কালী নাচছেন, হাতে তাঁর পদ্মের মৃণাল ধরা। পরিবেশ সূর্যের আলোর—বালার্কের ছায়ামণ্ডল। প্রবাসী-তে ছাপা হয়েছে ছবিখানি। এই কালীর' ছবিখানি তখনও বিক্রী হয়নি। অবনীবাবু ছবিখানি দেখেছিলেন দাম শুনে চটেও ছিলেন। "দুশো টাকা দিয়ে কিনে নিলুম" —বললেন গুরু তাঁর। অবনীবাবুর সংগ্রহ থেকে কিন্তু সে ছবিখানা চলে যায় আহমেদাবাদ কস্তুরভাই-লালভাই-সংগ্রহে।

মধ্যবিত্তের উপকার করতে গিয়ে, কেবল ঠকলেন আর্টিস্ট। লাখপতির ঘর থেকে সে ছবিগুলো আবার চলে যাবে কোটিপতির ঘরে। আর এই ঠকা হ'ল কেবল মিডলম্যানের জন্যে। দুনিয়ার অর্থনীতির কাঠামো না বদলালে, শিল্পীদের এই এক্সপেরিমেণ্ট অর্থহীন। —সুতরাং ও পথ ত্যাগ করলেন নন্দলাল।

আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন আরম্ভের কারণটি অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষনজরে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভরে আছে।

সেই শুভক্ষণেই নবজন্ম হল একালের ভারতকলালক্ষ্মীর। সেই সময়ে অবনীবাবু তাঁর ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন মেমসাহেব বন্ধুর কাছ থেকে একটা এ্যালবাম পেলেন। তাতে ছিল খৃষ্টের জীবন নিয়ে বুকইলিউমিনেশনের নকশা-চিত্রাবলী। একই সময়ে তাঁর এক আত্মীয় দিশি ছবির একখানি অ্যালবাম পাঠালেন তাঁকে—সেটা ছিল পাটনা স্কুলের নকশা করা।

এ দুটো পেয়ে অবনীবাবু লেগে গেলেন দিশি-পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচিত্র আঁকতে। সেইসব মূল্যবান ছবির অধিকাংশ এখন 'রবীন্দ্রভারতী'র সংগ্রহে আছে। সে সময়ের অনুভূতির কথা বলতেন তিনি,—"রোজই আরম্ভ করতুম ছবি, রাত্রে স্বপনের মতন দেখে রাখতেম। আর সকালে উঠে শেষ করতেম।" সেই সব ছবির সঙ্গে পরিচয়ে, বৈষ্ণবপদাবলীর পদাংশ জুড়ে জুড়ে দিতেন। পরিচয়ের বাঙ্গালা হরফ লেখা হতো পার্শিয়ান কায়দায়।

অবনীবাবু বুদ্ধচরিতের ওপর অনেক ছবি এঁকেছিলেন। 'বুদ্ধ-সুজাতা', 'বজ্রমুকুট'—এই সব আঁকলেন। 'ঋতুসংহার' থেকেও ছবি করলেন পাঁচ-ছখানা। 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল অনেক ছবি।

এই সময় এসে গেলেন জাপানী শিল্পীরা। ওকাকুরার দল আসতে

লাগলেন। হিসিদা এলেন, টাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবুর স্টাইলও কিছু বদলে গেল। জাপানী পদ্ধতিতে 'মেঘদূতের' ছবি আঁকলেন অবনীবাবু। 'বকের পাঁতি', 'গন্ধর্বের আকাশ পথে গমন'—এই রকম পাঁচ-ছখানা ছবি আঁকা হল ওঁর নতুন স্টাইলে। তবে, একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারা যায়, অবনীবাবু জাপানী-পদ্ধতিতে ছবি আঁকলেন বটে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিয়ে দিলেন। ফলে, ভারতশিল্পের ধারা খানিকটা প্রসারিত হয়ে গেল।

অবনীবাবুর হাতে ক্রমশ এই পদ্ধতিরও বদল হতে লাগলো। স্বদেশীযুগে অবনীবাবু 'বঙ্গমাতা'র ছবি আঁকলেন। সে ছবি আঁকা হয়েছিল ওয়াশে। সেই বছর টাইকান চলে গেলেন জাপানে। নন্দলাল তখন যাননি আর্টস্কুলে। তখনও দেখা হয়নি অবনীবাবুর সঙ্গে। তিনি যখন আর্টস্কুলে ভরতি হন, অবনীবাবু তখন 'বঙ্গমাতা'র ছবি ফিনিশ করছেন। কিন্তু সে ছবিখানা দু'টুকরো হয়ে গেছে। মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক হয়েছে। জাপানী পদ্ধতি আর তাঁর অনুসৃত আগের পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু 'বঙ্গমাতার' ছবি করেছিলেন।

এই পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করলেন 'ওমর খৈয়মে'র চিত্রাবলীতেও। সে অদ্ভুত এক স্টাইল। সব সময়েই একটা স্ট্রাগল দেখা গেছে তাঁর মনে। এবং বার বার তা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। একঘেয়েমি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না কিছুতেই। বিশেষ করে, তাঁর আগেকার আঁকা বিলিতী স্টাইল যখন এসে পড়তো, সেটা অতিক্রম করতে গিয়ে, তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন।

অবনীবাবু আগে বিলিতী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। প্যাস্টেল, ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং—এই সবে তাঁর হাত পেকেছিল। সেই সঙ্গে মিশলো তাঁর নিজস্ব স্টাইল। জাপানী স্টাইল, তিব্বতী স্টাইল, পার্শিয়ান স্টাইল, রাজপুত স্টাইল—এই সব। সব মিলেছিল অদ্ভুত রকমে তাঁর তুলিতে। মাঝে মাঝে ওলোট পালটও হ'য়ে যেত। এই যেমন, প্রথম আরম্ভ করলেন তিনি দিশি পদ্ধতিতে আঁকতে। অথচ কম করে পাঁচ-ছ'খানা ছবিতে অয়েল পেন্টিং প্যাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের আদল এসে গেল। তাঁর এক একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায় নানাভাবের মিশ্রণ। যাই হোক, বিলিতী, চীনে, জাপানী, মোগল— এই সব পদ্ধতি নিয়ে হ'ল ভারতশিল্পের রেনেসাঁর চেহারা।

নন্দলালরা মুগ্ধ হলেন। কিন্তু, অবনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলেন না। তাঁদের ঝোঁক হ'ল অজন্তার দিকে। কাঙ্গড়া, রাজপুত—এই সবও করতে লাগলেন। তাঁদের ছবি জাপানে গেল এগজিবিশনে। সেখানকার লোকেরা ঐসব ছবি দেখে নিন্দে করলে, জার্মানীতে গেল তারাও ছবির নিন্দে করলে। জার্মানরা বললে,—ছবি ভাল, তবে হাত বড়ো উইক ; আর মোগল বা রাজপুতের মতো রঙ্গেরও জেল্লা নেই। বিলিতী রং দিয়ে আঁকার দরুণ ম্যাজমেজে।

এ-সব শুনে তখন শিল্পীদের সোসাইটির উডরফ, ব্লান্ট প্রমুখ সদস্যগণ বললেন,—"দিশি পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করো।" দিশি ছবি সব গ্যালারীতে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল। মোগল, কাঙ্গড়ার ছবিও টাঙ্গানো হলো। নন্দলালরা কিছু কিছু কপিও করেছিলেন। 'বিচিত্রা'য় কাম্‌পো আরাই জাপানী-পদ্ধতিতে তাঁদের শেখাতে আরম্ভ করলেন। সে কালি-তুলির কাজ। দিশি-পদ্ধতি ঈশ্বরীপ্রসাদ শেখাতে লাগলেন আর্ট স্কুলে।

বিদেশে এইরকম বিরূপ সমালোচনার ফলে, নন্দলালরা তাঁদের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলেন। তাঁরা সব পুরাতন পদ্ধতি শিখতে লাগলেন। তখন তাঁদের প্রতিজ্ঞা হ'ল, বিদেশী ছবির অনুকরণ করবেন না। মন থেকে ঝেড়ে ফেলবেন সে-সব।

এদিকে পুরাতন পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় তত না থাকাতে, নিজস্ব ধারায় নন্দলালদের ছবি হতে লাগলো। তবে, তাঁদের ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। নন্দলাল আরম্ভ করলেন পৌরাণিক ধারায় ছবি আঁকতে। অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য আর ইসলামি কাহিনী-কেচ্ছা থেকে রাজা-বাদশাহের ছবি। এ-সব তিনি করতেন অতি অদ্ভুতভাবে। সেটা নন্দলালরা পারেননি। অবনীবাবু বলতেন,—"তোমরা পারবে না এ-সব ছবি করতে। এই রকম মোগলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই সব কায়দা। তোমরা করো স্রেফ দিশি ছবি।"

অবনীবাবু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাৎ করেছিলেন। নন্দলালরা তা পারেননি। কিন্তু, তাঁরা যা পেলেন, সে হল নিজেদের ধারার বৈশিষ্ট্য। নন্দলালের ধারা অবনীবাবুর মতো হ'ল না। সে-ধারা মোগল পদ্ধতি নয়, পার্শিয়ান-পদ্ধতিও নয়। অজন্তা, রাজপুত আর দিশি-পদ্ধতি মিলিয়ে এ হ'ল তাঁর নিজস্ব ধারা—তাঁর গুরু অবনীবাবুর থেকে আলাদা।

আর রং খুঁজেছেন নন্দলাল সব সময়। মোগলদের মতো ব্রাইট র করা যায় কি করে সে-চিন্তা ছিল বরাবর। কালি দিয়ে করেছেন লাইনে ছবি, চীনেদের মতো। এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পার্শিয়া কালি-তুলির কাজে হাত শক্ত করতে হয়েছে। আর করা হ'ল—ইণ্ডিয়া স্থাপত্যাচারের আদর্শে অলঙ্করণের ছবি।

আর্টস্কুলে অবনীবাবুর সঙ্গে নন্দলালের শিক্ষক ছাত্রের বা তার চেয়েও বেশী গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল। ঘরোয়া সংস্রবে নন্দলাল ওঁদের বাড়ীর লোকের মতন হয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বারভাঙ্গায় নন্দলালের পিতৃবিয়োগ হয়। সে ১৯১৭ সালের কথা। বাবার অসুখ শুনেই নন্দলাল দ্বারভাঙ্গায় গেলেন। সেখানে বাবা মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ করলেন এসে বাণীপুরে। অবনীবাবু সাহায্য করেছিলেন। নেমন্তন্ন নন্দলাল তাঁকে করেছিলেন যথারীতি। তিনি এসেছিলেন বাণীপুরের বাড়ীতে স্টীমারে ক'রে—নেমন্তন্ন রাখতে। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। —অবনীবাবু বললেন— "প্রথমে ভেবেছিলুম, যাব না। রাত্রে দেখি কি, স্বপ্নে মা বলছেন,—ওর বড়ো দুঃসময়, যাওয়া দরকার তোমার অবন। —তাই এসে গেলুম।" —শ্রাদ্ধের খরচও দিয়ে গেলেন কিছু।

গৌরীর বিয়েতে কিরকম হবে—ঠিকঠাক হ'ল। পাত্রের খুড়ো রায়বাহাদুর। ছেলে এম. এ. পড়ছে। ওর শ্বশুর আর্টিস্ট কিশোরীবাবু বলছেন, 'এতো নগদ টাকা আর গহনা লাগবে।' আইটেম দিয়েছে—নগদ টাকা সে প্রায় দু' আড়াই হাজার চাই। —কোথায় পাবেন নন্দলাল? অবনীবাবু তাঁকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে চেক দিয়ে দিলেন।

একবার জোড়াসাঁকোর দোতলায় দেখা করতে গেছেন নন্দলাল। অবনীবাবু বললেন, —"একটা বাইসিকল কিনেছি, —আমার দরকার নাই, —তুমি নিয়ে যাও।" নন্দলাল বললেন, —"চড়তে জানি না ; নিয়ে কি করবো ; দরকার নাই।" অবনীবাবু পাশের একটি লোককে বললেন, —"দেখ নিতে চায় না। অর্থাৎ দরকার না হলে নেবে না।"

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীবাবুরা দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতেন। সেখানে একদিন নিয়ে গেলেন নন্দলাল তাঁর শ্বশুরমশায়কে দেখা করাতে। তিনি দেখা করে বললেন, —"এ তো আপনারই ছেলে। তবে, ও আট বছর বয়সে আপনার কাছে এসেছিল, —একথা ঠিক নয়।" বাইশ বছর বয়সে নন্দলাল গেছেন আর্ট স্কুলে। নন্দলাল বললেন, —"আপনি আপনার লেখাতে এই ভুল করেছেন।" শুনে, অবনীবাবু বললেন,—"আমি সংশোধন করবো না।" নন্দলালকে তিনি ছেলের মতম মনে করতেন বলেই, এই ভুল সংশোধন করতে চাইলেন না। তাঁর কাছে নন্দলাল যেন বরাবরই তাঁর ছেলে—সে বাইশেই হোক আর আটেই হোক।

ওঁদের বাড়ির মেয়েরা নাচ শিখবে, অবনীবাবু তার বিরোধী ছিলেন। উঁচু গলায় মেয়েদের গান শেখারও তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁর ওসব গোঁড়ামি ভেঙ্গে দেন। শুধু গান আর নাচ নয়, স্টেজে গিয়েও নেচেছিল মেয়েরা। এই নাচগান নিয়ে তখন তিন ভাইয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়েছিল। একবার উপস্থিত ছিলেন গুরুদেব আর ছিলেন নন্দলাল। সেদিন গুরুদেব কথাটা পাড়লেন। তাঁকে সাপোর্ট করছেন গগনবাবু আর সমরবাবু। আর অবনীবাবু একদিকে একলা। নন্দলাল সঙ্কোচের সঙ্গে এই ফ্যামিলি কোয়ারল শুনলেন।

নন্দলালের দেশের ইলিশ মাছ ফি বছর মরশুমে যখন খুব ধরা পড়তো, অবনীবাবুদের বাড়ির জন্যে ছ'সাতটা ক'রে টাটকা ইলিশ মাছ জেলেদের মারফৎ নিয়ে যেতেন। ওঁরা বকশিস দিতেন জেলেদের। আর খাওয়াতেন। ওই রকম ইলিশ মাছ আর তপসে মাছ নিয়ে যাওয়া নন্দলালের বরাদ্দ ছিল।

পুজোর সময় অবনীবাবু নন্দলালদের নতুন কাপড় আর মিষ্টি পাঠাতেন। সে আত্মীয় সম্পর্কে। মা (অবনীবাবুর স্ত্রী) পাঠাতেন কাপড়, সন্দেশ—এই সব। নন্দলালরা যখন ওখানে বসে খেতেন বা বসে খাওয়াতেন। আর খাওয়ার শেষে আঁচানো হলে, 'ডাবা' থেকে পান বের

"পার্থসারথি" (নন্দলালের অঙ্কিত রেখাচিত্র)

করে দিতেন। অবনীবাবু তাঁর স্ত্রীর ছবি এঁকেছেন।

ওঁদের বাড়ীতে পুরাতন আমল থেকে পাল-পার্বণে যে-সব উৎসব-টুৎসব হতো—রাস, দোল, কীর্তন, নৃত্য ইত্যাদি ইত্যাদি তখনই ওদের ছাত্রদের নেমন্তন্ন করতেন। সেই সঙ্গে খাটের ব্যবস্থা থাকতো প্রচুর। পারিবারিক বিবাহাদিতেও নেমন্তন্ন থাকতো। আসল কথা তাঁদের বদান্যতা হয়েছিল।

যখন খেতেন, অবনীবাবু ঘুরে ঘুরে এসে দেখতেন। —"আজে বাজে জিনিস দিয়ো না ওদের ; গরম গরম বেগুন ভাজা, পটল ভাজা আর লুচি দাও।" —বলতেন "তোমরা কিন্তু খেতে পারো না। বয়সকালে আমি খুব খেতে পারতুম। একসময় এক ধামা চপ খেয়েছিলুম একলাই।"—খুব খেতে পারতেন তিনি।—"একটা, দুটো করে কি দিচ্ছ, একেবারে গামলা উল্টে দাও।"—ঢালাও হুকুম দিতেন তিনি বসে বসে।

আবার তিনি মহর্ষির কাছে যখন বসে খেতেন, তখন খুব আতান্তরে পড়তেন। "মহর্ষি নিজে বসে খাওয়াতেন। কাছেই বসে থাকতেন সোফায়। মহর্ষির তরকারি খাওয়া—সে এক ভয়ানক ব্যাপার। সমস্ত তরকারি তিনি খুবই মিষ্টি দিয়ে খেতেন। সব শেষে আসতো পায়েস। সে এক জামবাটি ঘন পায়েস। আর স্থির হয়ে তিনি বসে থাকতেন,—খেতেই হবে। সেখানে সে-খাবারের কাছে আমার খাওয়ানো কিছুই নয়। মহর্ষি একাই দিনে দুধ খেতেন সাত সের করে। যেদিন মহর্ষি আমাদের খেতে ডাকতেন, আমাদের হৃৎকম্প হতো।" —অবনীবাবু খাওয়াবার সময় গল্প করতে করতে বলতেন এইসব।

কোনো উৎসব-টুৎসব হলে মহর্ষি এবাড়ির ছেলেদের আর ওঁদের

বাড়ির সকলকেই ডাকতেন কিরকম সাজগোছ হয়েছে, দেখবার জন্যে। কেতা-দুরস্ত সাজগোছের ওপর তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। চাপকান, চোস্ত, পাজামা, টুপি—আর ধুতি হলে, পাঞ্জাবী চাদর-টাদর চাই। এলোমেলো বেশ বা, ঠিকঠিক কেতা মতো বেশ না-হলে মহর্ষি খুশী হতেন না—বলতেন অবনীবাবু। গুরুদেবের ছিল ঠিক ঐরকম ভাব।

অবনীবাবু তাঁদের বাড়ির একটি বিয়েতে নন্দলালদের হাতীবাগানের বাড়ীতে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি নেমন্তন্নের চিঠি দিলেন না। বাড়ীতে এসে মুখে বললেন। —ঐ সময় একটা ঘটনা হল। —তখন 'দোহন' ছবিটি নন্দলালের আঁকা হয়ে গেছে। ঐ ছবিটা দেখেই অবনীবাবু বললেন,—খামে ভরতি ক'রে দাও। —পকেটে পুরলেন। বললেন, —"আমি যে ঘটনাটা দেখেছিলুম সেটা আমি আর আঁকতে পারবো না।" —কিন্তু নন্দলাল সেটা অবনীবাবুর মুখ থেকে শোনা ঘটনা নিয়ে করেছিলেন।

অবনীবাবু মুঙ্গেরে 'পীর পাহাড়ে' ছিলেন একবার। তখন তিনি পাহাড়ের নীচে আশে পাশে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি গোয়ালাদের একটি গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন গোয়ালা গোয়াল ঘরে সকালবেলা ধোঁয়া দিয়ে গাই দুইছে। তখন হেমন্তকাল। হেমন্তের সকালের ধোঁয়া সোজা আকাশে ওঠে না। কুণ্ডলী বেঁধে ওপরে ঘোরে। অবনীবাবু গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দুধ দোয়ার শব্দ শুনছেন। গোয়ালা দুধ দুইছে—চ্যাঁক-চৌক শব্দ শুনে তিনি তা বুঝতে পারলেন। কল্পনার ক্ষেত্রে শিল্পীর কাছে দেখা আর অদেখার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। শিল্পী ইচ্ছা করলে দুই রাজ্যেই থাকতে পারে। আবার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—তিন কালেও থাকতে পারে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, কল্পনার দ্বারাই শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

যাই হোক ঐ ঘটনা ছবির মতন দেখে ঐ রকম একটি ছবি আঁকবেন বলে অবনীবাবু যখন কল্পনা করছেন—তখনই গল্পটি তিনি বললেন নন্দলালকে। আর এই গল্পটি ধরেই নন্দলাল 'দোহন' ছবিটি এঁকে ফেললেন। তিনি কিন্তু আঁকবার সময় মনে মনে সেকালের গোয়ালিনী সুজাতাকে যেন দেখে এঁকেছেন। সুজাতা দুইছেন, তিনি দেখলেন ভেতর থেকে। ছবি আঁকলেন 'দোহন'। তাঁর এই 'দোহন' ছবিটিরই পরে নাম হল—'সুজাতা'।

ছবি আঁকা বা কবিতা লেখার আগে নিজের কল্পনার কথা কারুর কাছে বলতে নেই। তাতে শিল্প সৃষ্টি করার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভস্রাব হয়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা এটা। বা যেমন জন্মাবার আগে ভ্রূণকে দেখবার চেষ্টা। অবনীবাবু বললেন, "আমার আর ছেলে হবে না।" অর্থাৎ ওঁর কল্পনা শক্তি হারিয়ে গেল।—এই 'সুজাতা'—সম্পর্কেই তিনি বললেন, সেটা পকেটে পুরে।

এই রকম আর একটি নন্দলাল এঁকেছিলেন, Parallel বা সদৃশ ঘটনা নিয়ে। সে আর এক ধরনের ঘটনা। —গরু হারিয়ে যাবার ছবি। সেটা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর নিয়েছিলেন। সে ঘটনাটা এই রকম ঃ খড়গপুরে থাকতে নন্দলাল একদিন সন্ধ্যে বেলায় বনের ধার দিয়ে যাচ্ছেন। আর বনের ভেতর একটা গরু হারিয়ে গেছে। পথ ভোলা গরু। রাখাল চেঁচাচ্ছে, মানে হাঁক দিয়ে ডাকছে। আর গরুটাও 'হাম্বা' 'হাম্বা' করে সাড়া দিচ্ছে বন থেকে। গরুর গলায় ঘণ্টাটা বাজছে। বাঘের ভয়ে ভীত গরু ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে যেন সাড়া দিচ্ছে।

গরু তখন নন্দলালের চোখে দেখার বাইরে। কিন্তু, তিনি যেন গরুটাকে প্রত্যক্ষ করলেন। গরুকে নিজের চোখে দেখতে পেলেন। যেন গরুটার নিকটে গিয়ে তার আতঙ্কিত ভাবটাকে প্রত্যক্ষ দেখলেন। ছবিটা আঁকা সেই অবস্থায়। গরু হারিয়ে গেলে কি রকম অবস্থা হয়, তার ভয়, তার ব্যাকুলতা সব যেন চোখে দেখে নিলেন। পরোক্ষে শব্দ শুনে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করলেন। পরোক্ষে যা ছিল অদেখা তাকে দেখতে পেলেন। সেই অবস্থায় তার ছবি আঁকলেন।

আর একটি ঘটনা—গুরুদেব যেদিন মারা গেলেন সেই দিনই অবনীবাবু একখানা ছবি আঁকেন—'ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।' এতো তাড়াতাড়ি প্রেরণা এসেছিল তাঁর মনে, জুতোর পিজবোর্ডের বাক্সর ডালার উপরে ঐ ছবিখানা এঁকে ফেলেছিলেন অবনীবাবু। কাগজ খোঁজবার সময় হয়নি। নন্দলালকে পাঠালেন। বললেন—'কলাভবনে রেখে দেবে।' প্রথম ছবিখানি কলাভবনে আছে। দ্বিতীয় ছবি যেটা ভালো করে আঁকলেন, সেটা পরে কাগজে ছাপা হয়।

ঐ সময় নন্দলালও কল্পনা করেছিলেন, গুরুদেবের 'যাবার সময়' ছবি আঁকবেন। অনন্ত সমুদ্রে গুরুদেবকে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এই রকম কল্পনা করলেন, যেন ঢেউয়ের মাথায় একটি পদ্মফুল—জনতার ঢেউয়ের ওপর দিয়ে —মাথার উপর দিয়ে একটি পদ্মফুল ভেসে যাচ্ছে।

এক কল্পনা দুবার ছবিতে করা যায় না। করা গেলেও তার বেগ বা জোর কমে যায়।

'পীর পাহাড়ে' থাকার সময়ে মুঙ্গেরের ছবি অবনীবাবু অনেকগুলি এঁকেছিলেন।—'বন্য হরিণীর' কয়েকটি ছবি বিলিতী জল-রং-এর পদ্ধতিতে এঁকেছিলেন। আর একটি ছবি ছিল—গঙ্গাঘাটে চাঁদোয়া খাটিয়ে রামলীলা গান হচ্ছে।

অবনীবাবুর সঙ্গ নন্দলাল পেতেন সদা-সর্বদা। আত্মীয়ের মতন, বন্ধুর মতন। অবনীবাবু নইলে মুষড়ে পড়তেন। কেউ আর্ট সম্পর্কে চিন্তা করতো না তখন। একা একা ঘরে থাকতেন অবনীবাবু। নন্দলালের সঙ্গ পাওয়াতে অবনীবাবুর মন খুব খুশী থাকতো।

গুরুদেব নন্দলালকে আনলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজের জন্য। সোসাইটি তখন চলছে, নন্দলালকে আবার ডেকে পাঠালেন অবনীবাবু। গুরুদেবকে তিনি বললেন,—"তুমি যখন ডেকেছো তখন ও নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু আমার ক্ষতি হবে।" যখন নন্দলাল সোসাইটিতে ফিরে গেলেন অবনীবাবু বললেন—"মন চাঙ্গা হল আমার।"

যখন শান্তিনিকেতন থেকে নন্দলালকে নিয়ে গেলেন সোসাইটিতে, বললেন— "তোমাকে ফিরে পেয়ে কেমন মনে হচ্ছে জান? যেন এক বোতল ব্রাণ্ডি খেয়ে মনটা চাঙ্গা হল।" তখন কলকাতায় গিয়ে অবনীবাবুকে নন্দলাল সঙ্গ দিলেন বটে, ওখানে থাকতে, কিন্তু কলকাতা নন্দলালের খুব বদ্ধ মনে হত। আবার সোসাইটি থেকে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

অবনীবাবু একটা দিশি পাকুড় গাছকে নিয়ে জাপানী প্রথায় 'বামন গাছ' (dwarf tree) করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। কারণ, তার ধর্ম বড়ো হওয়া। তার ডাল-পালা, পাতা কিছুতে ছোট করতে পারেননি। কাজে কাজেই তিনি হতাশ হয়ে সেটাকে আর চেষ্টা করেননি বামন করতে।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে যখন নন্দলাল পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে এলেন, তিনি বললেন, —"তুমি এটা নিয়ে যাও। শান্তিনিকেতনের মাঠের মধ্যিখানে ছেড়ে দাও।" নন্দলাল সেটাকে নিয়ে এসে শান্তিনিকেতন কলাভবনের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে দিলেন। আর সেটা অতি শীঘ্র বড় হয়ে উঠল। সে গাছ এখনও (১৯৫৬) আছে তার ডালপালা ছড়িয়ে।

ছবি ও ছন্দ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

"তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ !
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।"
—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পাচার্য নন্দলালের অঙ্কিত চিত্রাবলী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিকট কাব্য-কবিতা ও সংগীত রচনায় কতখানি যে প্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছিল— সে বিষয়ে অনুসন্ধান করলে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টির কাজেও নন্দলালের প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্যের সুদীর্ঘকালের নিকট-সান্নিধ্য কবিকে কলম ছেড়ে তুলি ধরতে অনুপ্রাণিত করেছিল। নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকে খুবই সংশয় ছিল, ছিল যথেষ্ট দ্বিধাও। তবে 'নন্দলালদের প্রশংসা পেয়ে কাজটার পরে শ্রদ্ধা' জন্মায় কবির। কবিও যে নন্দলালদের মতই ছবি আঁকতে পারেন— এ কবির পক্ষে ছিল এক নূতন আবিষ্কার। বিশেষত নন্দলালের সমর্থন ও স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথকে চিত্রসৃষ্টিকর্মে উদ্‌বোধিত ও উৎসাহিত করে।

চিত্রী নন্দলাল ও কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯০৯ সালে, জোড়াসাঁকোতে। নন্দলালের বয়স তখন সাতাশ, কবির আটচল্লিশ। এইসময় রবীন্দ্রনাথের কবিতাসংগ্রহ 'চয়নিকা' সম্পাদনার কাজ চলছে। সম্ভবত কবি ও চিত্রীর মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধে প্রকাশিতব্য 'চয়নিকা'র জন্য নন্দলাল ছবি আঁকলেন কয়েকটি।

কবির সঙ্গে নন্দলালের প্রথম আলাপের বিবরণ স্বয়ং চিত্রকরের মুখ থেকেই শোনা যেতে পারে—

"কবির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে। যোগাযোগ হলো কি করে সে-কথা বলি। আমাদের হাতিবাগানের
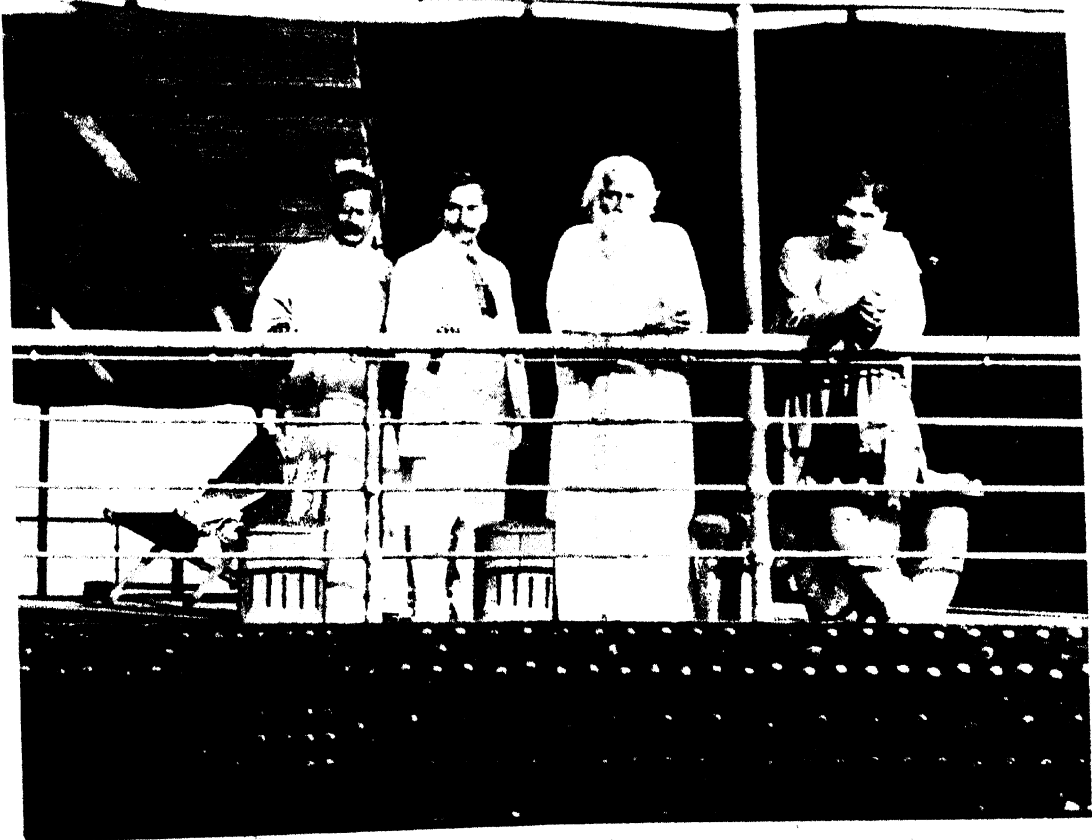
চীনযাত্রার পথে কবির সঙ্গে চিত্রী নন্দলাল

চীনদেশে রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল ও অন্যান্য সঙ্গীরা

বাড়িতে এসেছিলেন বাঁকুড়ার এক সাধু। ··পূজার জন্যে তাঁকে 'তারা' মূর্তি করে দিয়েছিলুম। তিনি তো আশীর্বাদ করে সে ছবি নিয়ে চলে গেলেন। তার কিছু দিন পরেই কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সহসা ডাক পড়লো আমার। সসংকোচে গেলুম আমি দেখা করতে। কবি বললেন, 'তোমার তারামূর্তি আমি দেখেছি। বেশ হয়েছে। তা, তোমাকে এখন আমার কবিতার বই (চয়নিকা) ইলাস্‌ট্রেট্‌ করতে হবে।' শুনে প্রথমটা আমি চম্‌কে গেলুম। আমার তারামূর্তি ইনি দেখলেন কি করে! ভাবলুম, নিশ্চয় অবনীবাবু তাঁর রবিকাকাকে দেখিয়ে থাকবেন। সে খোঁজ আর করা হয়নি। কবিকে, আমি বললুম, 'আমি আপনার বই পড়িনি বললেই হয়। পড়লেও মানে কিছু বুঝিনি।' কবি বললেন, 'তাতে কি, তুমি পারবে ঠিক। এই আমি পড়ছি, শোনো।' বলে, তিনি তাঁর চয়নিকার কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন— পরশপাথর ঝুলন মরণমিলন —এইসব কবিতা। আর দেখ, তাঁর পড়বার ভঙ্গিতেই আমার মনে যেন নানা ছবি বসতে লাগলো। আগে পরে ছবি এঁকেছি— 'খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর' 'শিবের তাণ্ডব' 'অন্নপূর্ণা ও শিব' 'নকল বুঁদি'— আরও সব। 'শিবের তাণ্ডব' ছবিখানা ছিল বর্ধমান রাজের ঘরে। 'নকল বুঁদি' ছিল পূরণচাঁদ নাহারের গ্যালারিতে।"

নন্দলালের এই আত্মকথনটি উদ্ধারের সুযোগ পেয়েছি শান্তিনিকেতনে আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের লেখা মহাগ্রন্থ 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' থেকে।

সেবার 'চয়নিকা'য় নন্দলালের আঁকা মোট সাতটি ছবি মুদ্রিত হয়। এরমধ্যে 'শিবতাণ্ডব' ও 'নকল বুঁদি' পূর্বে আঁকা; বাকি পাঁচখানি কবির কথামতো আঁকা। নিম্নলিখিত সাতটি ছবি ছিল 'চয়নিকা'র প্রথম সংস্করণে—

১। কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
২। ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
৩। যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
৪। খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর
৫। হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ (শিব তাণ্ডব)
৬। ভূমির পরে জানু গাড়ি তুলি ধনুঃশর (নকল বুঁদি)
৭। আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়

পরবর্তী কালে 'চয়নিকা'র যে-সকল সংস্করণ প্রকাশিত হয় তা চিত্রসংবলিত ছিল না। নন্দলালের আঁকা প্রথম সংস্করণের সাতটি ছবির বিবরণ নীচে দেওয়া গেল—

১। দু'জন পথিক নরনারী চলেছে অজানার সন্ধানে।

২। একটি মেয়ের হাতে-ধরা ধূপদানী থেকে ধূপের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে, আবার নেমে আসছে।

৩। একটি মেয়ে পুকুরে স্নান করতে নেমে কলসী ভাসিয়ে দিয়েছে জলের ঢেউয়ে।

৪। নেঙটি-পরা, কোমরে শিকল-আঁটা একজন পাগল— তাকে দেখা যাচ্ছে পিছন থেকে— সাগরবেলার পরিবেশে।

৫। শিবতাণ্ডব (রঙিন)।
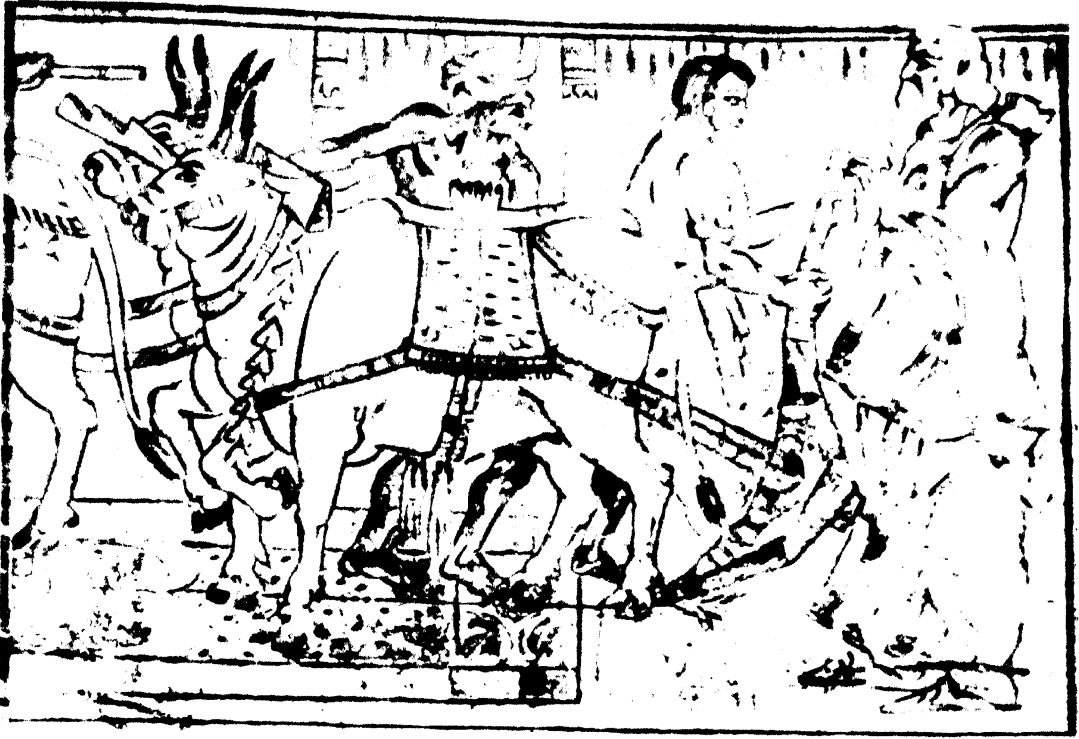
নন্দলাল অঙ্কিত হলকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ

৬। ধনুকে শর জুড়ে বসেছে রাণার ভৃত্য কুম্ভ— তার পিছনে মাটির নকল কেল্লা দেখা যাচ্ছে (রঙিন)।

৭। নদীর কিনারায় একটি লোক বসে আছে পারের প্রতীক্ষায়।

'চয়নিকা' সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাজে কবিকে সাহায্য করেছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী। নিজের কবিতা ছাড়াও নন্দলালের আঁকা ছবিগুলির প্রতিও কবির ঔৎসুক্য ছিল খুব বেশি। নন্দলালের তুলি থেকে সুন্দর ছবিগুলি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি। প্রতীক্ষা করতে থাকেন —ছাপা বইয়ের পাতায় এগুলি কেমনভাবে আসে, কি রকম চেহারা নেয়। শেষ পর্যন্ত, ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে 'চয়নিকা' কবির হাতে এসে পৌঁছায়। বইয়ে ছবিগুলির মুদ্রণরূপ দেখে কবি খুশি হতে পারলেন না কিছুমাত্র। ছবির রিপ্রোডাকশন খারাপ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বেশ অসন্তোষের সঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯) লিখলেন—

"চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কি না তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জানাব। কিন্তু ছবি ভাল হয়নি সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জন্যেই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম। কারণ এগুলি আমার রচনা নয়। নন্দলালের পটে যে-রকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না। বরঞ্চ একটু খারাপই লাগলো।"

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত নন্দলালের অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে প্রথম কবিতা লেখেন 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে। ছবিটি নন্দলাল এঁকেছিলেন ১৯০৯ সালে, কার্টিজ পেপারে, ওয়াটার কালারে। ছবিতে ছিল— মন্দিরের ভিতরে গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিচ্ছেন। এই ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার আজ লব তাঁর দেখা
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে!
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয়নি আমার শেখা।..."

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে এটি লেখেন ১৭ পৌষ, ১৩১৬ তারিখে; ১ জানুয়ারি, ১৯১০। এটি ছাপা হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। রচনার সঙ্গে স্বতন্ত্র কাগজে মুদ্রিত হয় নন্দলালের আঁকা ছবি। 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' যে নন্দলালের চিত্র অবলম্বনে রচিত, সে-কথা 'ভারতী'তে উল্লেখ আছে।

সিসটার নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের ইংরেজি অনুবাদ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন ১৯১২ জানুয়ারিতে। এই গল্পের সঙ্গে পূর্ণ পাতা জুড়ে ছাপা হল নন্দলালের আঁকা ছবি— কাবুলিওয়ালা ও মিনি। ছবির নীচে লেখা ছিল— 'By Nandalal Bose By The courtesy of Babu Rabindranath Tagore.' প্রবাসীতে ছবিটি পরে ছাপা হয় ১৯১২ জুলাইয়ে (শ্রাবণ ১৩১৯)।

এই বছর প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র'। এই বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য চিত্ররচনা করে দিয়েছিলেন নন্দলাল। এখনকার 'ছিন্নপত্রাবলী'তে সে ছবি নেই। ছবিটা ছিল— একটি পদ্মফুলের পাপড়ি খসে পড়ার। প্রথম সংস্করণে সবুজের উপরে সোনার রঙে এম্‌বস্ করা ছিল এই ছবিটি।

১৯১২ জুন মাসে পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে আসেন। সেখান থেকে কবি ২১ আগষ্ট মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে যে চিঠি দেন, তাতে দেখি নন্দলালের কথা বিশেষভাবে লিখেছেন। কবির পত্র—

"আমি 'শিশু'র গোটাকতক কবিতা তর্জমা করেছি, সেগুলো এঁদের খুব ভাল লেগেছে। Rothenstein-এর ইচ্ছা অবন কিংবা নন্দলাল যদি গোটা তিন-চার ছবি করে দিতে পারেন তাহলে একটি ছোট বই করে ছাপতে দেন। অবনের হাত থেকে চটপট ছবি বের করা শক্ত, অতএব নন্দলাল যদি শীঘ্র গোটা কয়েক ছবি করে পাঠাতে পারেন ভাল হয়। অকটোবরের মধ্যে আমাদের পাওয়া চাই। Reproduction খুবই ভাল হবে। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি তর্জমা করা হয়েছে— ১ জগৎ পারাবারের তীরে, ২ জন্মকথা, ৩ খোকা, ৪ অপযশ, ৫ বিচার, ৬ চাতুরী, ৭ নির্লিপ্ত, ৮ কেন মধুর, ৯ ভিতরে ও বাহিরে, ১০ প্রশ্ন, ১১ সমব্যথী, ১২ বিজ্ঞ, ১৩

রবীন্দ্রনাথের 'পদ্মা' বোটে চিত্রাঙ্কনরত নন্দলাল ও মুকুল দে

ব্যাকুল, ১৪ সমালোচক, ১৫ বীরপুরুষ, ১৬ রাজার বাড়ি, ১৭ নৌকাযাত্রা, ১৮ জ্যোতিষশাস্ত্র, ১৯ মাতৃবৎসল, ২০ লুকোচুরি, ২১ বিদায়, ২২ কাগজের নৌকা। এরমধ্যে থেকে যে-কটা খুশি দেখতে বোলো।"

রবীন্দ্রনাথের তর্জমা ও কয়েকজন চিত্রীর আঁকা মোট আটটি ছবি নিয়ে ম্যাকমিলান থেকে ছাপা হল নতুন বই 'The Crescent Moon'; প্রকাশিত হল ১৯১৩ নভেম্বরে। কবির এই বইয়ের জন্য ছবি এঁকেছিলেন নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অসিতকুমার হালদার। নন্দলাল এঁকেছিলেন দুটি ছবি— 'The Home' এবং 'The Hero'। এ বইয়ের সব কটি ছবিই রঙিন। নন্দলালের ছবি-দুটি অসাধারণ। একে ইলাসট্রেশন বলে না— এ যেন আর-এক নূতন কবিতা, নূতন সৃষ্টি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিল্পাচার্যের প্রথম পদার্পণ ১৯১৪ এপ্রিল মাসে, বঙ্গাব্দ ১৩২১। শিল্পীর বয়স তখন বত্রিশ; ছবির জগতে তখনই তিনি যথেষ্টই খ্যাতি অর্জন করেছেন। আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রশিল্পীর সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন। গ্রীষ্মের ছুটি পড়ার পূর্বে নন্দলালকে নিয়ে এই আনন্দ-অনুষ্ঠান। সকালে চিত্রশিল্পীর সংবর্ধনা, সন্ধ্যায় অভিনয় হবে 'অচলায়তন' নাটকের। কবি স্বয়ং অবতীর্ণ হচ্ছেন রঙ্গমঞ্চে। এই উপলক্ষে আশ্রমের অনেক বন্ধু এসেছেন শান্তিনিকেতনে।

১ মে বা ১২ বৈশাখ সকালে নন্দলালকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সংবর্ধনা জানালেন রবীন্দ্রনাথ। নন্দলাল তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিনটির কথা বিস্মৃত হতে পারেননি কখনো। নন্দলাল বলেছেন—

"সকালে একটু বেলা হলে, আশ্রমে আমার অভ্যর্থনার আয়োজন হলো। অসিত ছিলেন, পিয়ার্সন ছিলেন। এনড্রুজ, ক্ষিতিবাবু, ভীমরাও শাস্ত্রী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, আরও অনেকে সব ছিলেন। ...এখানকার পাকা 'কারমাইকেল-বেদী'র সামনে তখন একটি কাঁচা-মাটির বেদী ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, পদ্মপাতা পেতে রাখা হয়েছে; আর মাটির ওপর গাঁইতি দিয়ে ডোবা কেটে, পদ্মের পাপড়ির ডিজাইন এঁকে, সেই গর্তগুলো লাল কাঁকড় দিয়ে ভরতি করে, পদ্ম এঁকে রেখেছে। বেদীর সামনে আলপনা আঁকা। ...কবি এলেন। ওখানে আমি বসতেই শাঁখ বাজানো হলো। অসিত কিংবা ছেলেদের কেউ মালা দিলে আমার গলায়। কবি আমার হাতে অর্ঘ্য দেবার পরে খানিক বললেন। আমি বললুম অল্প। বিশেষ করে বললুম— 'আমি ধন্য হয়েছি'।" ('ভারতশিল্পী নন্দলাল')

এই সভায় রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের উদ্দেশে লেখা এই কবিতাটি পাঠ করেন।—

"শ্রীমান নন্দলাল বসু—
পরম কল্যাণীয়েষু
তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।
ভাগ্যবিধাতা আশিষমন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে—
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে!
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ!
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।
চিরসুন্দরে কর গো তোমার
রেখাবন্ধনে বন্দী!
শিবজটাসম হোক্ তব তুলি
চিররস-নিষ্যন্দী!"

কবিতার শেষে লেখা 'শান্তিনিকেতন/১২ই বৈশাখ/১৩২১'।

অনুষ্ঠান শেষ হলে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত কবিতাটি নন্দলালের হস্তগত হলো। এই অভিনন্দনের পরে নন্দলালের কিরকম অনুভূতি হয়েছিল তা চিত্রীর নিজের কথাতেই শোনা যেতে পারে—

"এই অভিনন্দনের পরে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঘটনা হলো। গুরুদেব আমাকে বরণ করলেন অর্ঘ্য দিয়ে, আশীর্বাদ করলেন কবিতা পড়ে। অনুষ্ঠানের শেষে আমি চলে এলুম আমার ডেরাতে। কবির দেওয়া অর্ঘ্য তখনও আমার হাতে। সহসা আমার মনে হলো, আমাতে যেন আমি নেই। আমার দেহটা আছে বটে, তবে অতি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। আমার রক্ত-মাংসের স্থূল শরীর ভেদ করে যেন আলো বাতাস খেলে যাচ্ছে। অপূর্ব অনুভূতিতে আমার সমস্ত চেতনা আনন্দে ডগমগ করে উঠলো। কবির ভেতর দিয়ে মহর্ষির আশীর্বাদ আমাকে যেন ছুঁয়ে গেল। আমি যেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করলুম।" ('ভারতশিল্পী নন্দলাল')

নন্দলালের উদ্দেশে যে-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ১২ বৈশাখ পড়লেন, সেটি ক'দিন পরেই জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হল।

১৩২২ বঙ্গাব্দে বা ১৯১৫ সালে দেখি কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবি তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর জন্য শিল্পী নন্দলালকে চিত্রবিদ্যার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। বস্তুত অবনীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই তাঁর নিজের বাড়ির ছেলেমেয়েদের চিত্রণবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য আর্টস্কুলের পাশ করা কৃতী শিল্পী নন্দলালকে নিযুক্ত করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ সুরুলের বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে এলে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে সর্বতোভাবে সুশিক্ষিত করবার জন্য শিক্ষার ভার দিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে, আর চিত্রবিদ্যা শেখানোর দায়িত্ব দিলেন নন্দলালের উপরে।

প্রতিমা দেবী পরবর্তীকালে তাঁর 'শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহাশয়ের স্মরণে' লিখেছিলেন, "তাঁর চিত্রশালায় গেলে তিনি কতরকম ছবি দেখাতেন— এবং বিষয়গুলি সহজ ও সরলভাবে আমাদের বোঝাতেন, যা দেখে আমরা মনের খোরাক সঞ্চয় করতুম। তিনি এক-একটা ছবির লাইন বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষাপ্রণালী ছিল খুবই আশ্চর্যজনক, অপূর্ব ছিল তাঁর হাতের লাইনের টান। এক-একটা লাইনের টানে তিনি রূপ ও ভঙ্গী

এনে দিতেন। তার লাইন টানার ক্ষমতা দেখে আমার মামা ভারি খুশি হতেন।" ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', নন্দলাল বসু সংখ্যা, ১৩৭৩)

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৩২২) রবীন্দ্রনাথকে দেখি শিলাইদহে। এখানে এসে কবির নন্দলাল-মুকুল দের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। কবির ইচ্ছা, শিলাইদহের পদ্মা ও নিসর্গসৌন্দর্যের কিছু মনোরম চিত্র নন্দলালদের তুলিতে ধরা হয়ে থাক। তাই কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে সেখান থেকে চিঠিতে লিখলেন—

"নন্দলাল কিংবা মুকুলকে আনতে পারলে বেশ হয়— আমার ইচ্ছা শিলাইদহের অনেকগুলো ছবি আঁকা হয়ে থাক।"

কবির বাসনানুসারে সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীরা রঙ-তুলি নিয়ে শিলাইদহে যাত্রা করেন। ওই ফেব্রুয়ারি মাসেই রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর একখানি পত্র থেকে জানতে পারি, সেখানে "তিনজন artist খুবই আনন্দে আছে।" এই তিন চিত্রশিল্পী হলেন নন্দলাল, মুকুল দে ও সুরেন কর।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর তিন চিত্রীসঙ্গীর বিস্তৃত বিবরণ পাই শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ' গ্রন্থে। শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তাঁরা তিনজন থাকতেন চিত্রা বোটে নিজেদের তুলি কলম নিয়ে আর রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তাঁর পদ্মাবোটে হানিফ চাচার ঘাটে। নন্দবাবুরা অনেক ছবি এঁকেছিলেন সে বারে। তাঁরা ছিলেন বোধহয় একমাসের উপর। ঐ পর্বে শান্তিনিকেতনের অনেক কর্মী, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দবাবু প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আনন্দলোক শিলাইদহে আমন্ত্রণ করে আনতেন শিলাইদহের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। নন্দবাবু বলেছিলেন, 'সন্ধ্যাবেলায় আমাদের জলখাবারের জন্য প্রায় প্রত্যহ গোপীনাথ মন্দির থেকে শীতলীপ্রসাদ আসত। ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, কলা, নারকেলকোরা, তরমুজ, মুগডাল ভেজা ইত্যাদি খেয়ে আমাদের শরীর বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। টাটকা ইলিশমাছ প্রায় প্রত্যহ খেতাম; কাছিমের ডিমও বরকন্দাজরা এনে দিত। বোট থেকে তীরে নামা-ওঠার জন্য দু'খানা তক্তা পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া হত। অনভ্যাসবশত নামতে উঠতে আমাদের পা টিকটিক করত। তাই দেখে একদিন গুরুদেব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "এ কিন্তু সহুরে জোড়াসাঁকো নয়, পাড়াগেঁয়ে নদীর জোড়া সাঁকো— সাবধানে নামা-ওঠা করো।" তখন তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম ঘরের মানুষের মত। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, গান-কবিতা অনর্গল চলত। তখন কবি-প্রিয়া পরলোকে, তাই আমাদের খাওয়াদাওয়ার অসুবিধার জন্য কবি অনুযোগ করতেন। কিন্তু আমাদের আহারের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল খুবই। কিন্তু তিনি নিজে খুব মিতাহারী ছিলেন। নিজে খেতেন মাগুর বা কইমাছের ঝোল ভাত, বুনোরা এনে দিত। ফটিক ফরাস তাঁর রান্না করত। গুরুদেবের বোটে প্রায়ই প্রজাদের খুব ভিড় হত, মহালেও ঘুরতেন। রাত্রে প্রায়ই— বিশেষ জোছনা রাতে চরে বেড়াতেন, আমরাও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গী হতাম। ঐ ছবি আমি এঁকেছি একখানা।'"

নন্দলালের আঁকা পদ্মার চরে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের ওই অসামান্য ছবিটি শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছিল।

এনড্রুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে-কে সঙ্গে নিয়ে কবি জাপানে আসেন ১৯১৬ সালে। কোবে বন্দরে তোসামারু জাহাজ এসে থামে ২৯ মে (১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩)। জাপানে কবি এবার তিন মাস কাটান। এদেশে চিত্রী নন্দলালের কথা কবির বিশেষভাবে মনে পড়ে। এখানকার চিত্রকলা দেখে কবি বিস্মিত ও মুগ্ধ। জাপানী জাতির স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যপ্রিয়তার সঙ্গে তুলনায় স্বদেশবাসীর দৈন্য সহজেই তাঁর মনে উদিত হয়। কবি বেশ কঠিন সুরে অবনীন্দ্রনাথকে লেখেন—

"এখানে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে, তোমাদের আর্ট ষোলো আনা সত্য হয় নি। আমাদের দেশের আর্টের পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্য এখানকার সজীব আর্টের সংস্রব যে দরকার সে তোমরা বুঝতে পারবে না। আমাদের দেশের আর্টের হাওয়া বয় না, সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোনো নাড়ির যোগ নেই—ওটা একটা উপরি জিনিস, হলেও হয়, না হলেও হয়, সেইজন্য ওখানকার মাটি থেকে কখনোই তোমরা পুরো খোরাক পেতে পারবে না।"

এ-চিঠি কবি লেখেন ৮ ভাদ্র ১৩২৩-এ। সেদিনই তিনি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপর একটি পত্রে লিখলেন—

"আর্টকে জাপানীরা জীবনে স্বীকার করেছে; জীবনটা সকল রকমে এরা সুন্দর করে তুলেছে—নিতান্ত ছোটখাটো বিষয়েও এদের লেশমাত্র অনাদর নেই—আমাদের সঙ্গে এইখানেই এদের সবচেয়ে তফাৎ।"

দুদিন আগে ৬ ভাদ্র তারিখে রথীন্দ্রনাথকে যে-পত্র লিখেছিলেন; তাতেও দেখতে পাই জাপানী চিত্রকলার প্রশংসা। কবির মনোভাব, এই চিত্রকলার শিক্ষণীয় দিকটা আমাদের দেশের শিল্পীদের গ্রহণ করা উচিত। সেই প্রসঙ্গেই চিত্রশিল্পী নন্দলালের নামটি সর্বাগ্রে তাঁর মনের মধ্যে বাজতে থাকে—

"টাইকান, শিমোমুরার ছবি একদিকে খুব বড় আয়তনের, আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশপাশের বাজে জিনিস নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবলমাত্র সেইটেকেই খুব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই; কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি ঝাপসা কিংবা পাঁচমিশেলি রং চং দেখা দেখা যায় না। ধবধবে প্রকাণ্ড সাদা পটের উপর অনেকখানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবিটি ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দলাল যদি আসত তাহলে এখানকার এই দিকটা বুঝে

নন্দলাল অঙ্কিত পদ্মার চরে রবীন্দ্রনাথ

আমাদের আর্ট একটু কুনো রকমের হবার আশঙ্কা আছে। গগন অবনরা ত কোথাও নড়বে না, কিন্তু নন্দলালের কি আসবার সম্ভাবনা নেই? এখানে এসে একটা কথা বেশ বুঝতে পেরেছি যে চিত্রবিদ্যায় এদের সমকক্ষ কেউ নেই। . . . দুতিন মাস পরে 'আরাই' বলে এখানকার একজন ভাল আর্টিস্ট কলকাতায় যাবেন। তাঁকে অন্তত ছমাসের জন্যে বিচিত্রায় রাখবার বন্দোবস্ত করিস। নতুন বাড়ির একটা কোণের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিস্ আর খাওয়া দাওয়া তোদের সঙ্গেই চলবে। মাসে ১০০ টাকা মাইনে দিতে হবে। অবনকে বলিস্ ছমাসের ছশো টাকা বেশি কিছু নয় কিন্তু নন্দলালরা যদি এঁর কাছ থেকে খুব বড় আয়তনের পটের উপর জাপানী তূলির কাজ শিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি বেড়ে উঠবে।"

১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বই 'The Parrot's Training'। এটি রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র-কৃত অনুবাদ। প্রকাশিত হল কলকাতার 'Thacker, Spink & Co' থেকে। বৃহৎ আকারের এই বইটির প্রচ্ছদচিত্র রচনা করে দেন চিত্রশিল্পী নন্দলাল। 'The Parrot's Training' হল 'তোতাকাহিনীর'র তর্জমা।

ম্যাকমিলান থেকে ১৯১৬ অক্টোবর 'Fruit-Gathering' প্রকাশিত হয়। ১৯১৯-এ ওই বই 'Gitanjali and Fruit-Gathering' নামাঙ্কিত হয়ে বেরলো। সঙ্গে যুক্ত হল নন্দলাল বসু, সুরেন কর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইলাসট্রেশন।

শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র কার্যারম্ভ ১৯১৯ সালে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ শুরু হয় ১৩২৬-এর (১৯১৯) আষাঢ় মাস থেকে। রবীন্দ্রনাথ তার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৪ বৈশাখ ১৩২৬ (২৭ এপ্রিল ১৯১৯) তারিখে লেখা পত্রে আশ্রমের জন্য কিছু ছাত্র সংগ্রহ করতে বলেছেন। কবি লিখছেন—

"ওখানকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এই খবরটি জানিয়ে দিতে পারো যে, ছুটির পর অর্থাৎ আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে এখানে বৌদ্ধদর্শন শেখাবার জন্য আমাদের মহাস্থবির ক্লাস খুলবেন। যাঁদের সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশাধিকার আছে তাঁরা এখানে যদি শিক্ষা করতে চান তাহলে আমাদের শাস্ত্রীমশায়ের কাছে পালি ও মহাস্থবিরের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র খুব ভাল করে শিখতে পারবেন। শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শিক্ষারও ভার গ্রহণ করবেন। এনড্রুজ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শেখাবার ভার নেবেন। নন্দলাল ও সুরেন চিত্রকলা শেখাবেন। আর যদি কেউ বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিখতে চান তারও উপায় হবে। সমস্ত ব্যয়ের জন্যে কুড়ি টাকা লাগবে। ইংরেজি ও সংস্কৃতে যাঁদের উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষা আছে তাঁদেরই সাহায্য করা হবে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমাণে শিক্ষা দেওয়া হবে। নন্দলালের কাছে মদনপল্লি থেকে একজন ছাত্র আসবার কথা হয়েচে।"

১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে চিত্রবিদ্যার শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার পর ১৯১৯ জুনে এলেন শিল্পী অসিতকুমার হালদার। পূজাবকাশের পরে এলেন নন্দলাল বসু। এই তিন চিত্রশিল্পীর সম্মিলনে শান্তিনিকেতনে "কলাভবনে'র পত্তন হল।

স্বদেশে বা বিদেশে, কোথাও ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ চিত্রী নন্দলালকে সঙ্গী হিসাবে পেতে ভালবাসতেন। চীন দেশে কবি এলেন ১৯২৪ এপ্রিল মাসে। সঙ্গে এলেন নন্দলাল, ক্ষিতিমোহন সেন ও কালিদাস নাগ। ভ্রমণপর্যায়ে কবির সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন এলমহার্স্ট। নন্দলাল আর্টিস্টের চোখ দিয়ে চীন দেশের সব কিছু তন্ন তন্ন করে দেখে নিলেন।

পিকিঙে ৮ মে কবির জন্মদিন পালিত হল। উৎসব শেষে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'চিত্রা' ('চিত্রাঙ্গদা')। নাট্যভূমিকায় চীনা তরুণ-তরুণীরা নেমেছিলেন। রূপসজ্জায় তাঁদের কিছুটা সাহায্য করলেন নন্দলাল। জন্মদিন উপলক্ষে কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর হাতে নিজের আঁকা ছবি উপহার দিলেন নন্দলাল।

এপ্রিল থেকে মে চীন দেশে কাটিয়ে মে মাসের শেষে জাপানে এসে পৌঁছলেন কবি। সঙ্গে নন্দলাল বসুও আছেন। জাপানে রবীন্দ্রনাথের এবার দ্বিতীয়বার আসা হল। প্রথমে এসেছিলেন ১৯১৬ সালে। সেবার নন্দলাল কবির সঙ্গী ছিলেন না। আমরা সেই সময়কার কবির চিঠিপত্রে

নন্দলাল অঙ্কিত রবি-বাউল

দেখেছি—কবি জাপানী চিত্রকলা দেখতে দেখতে বারে বারেই নন্দলালের কথা ভেবেছেন। নন্দলালের জাপানে আসার প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভব করেছিলেন। এবারে নন্দলাল জাপানে আসায় কবির ইচ্ছা পূরণ হল

এই চীন-জাপান ভ্রমণ পর্যায়ে এলমহার্স্ট একদিন নন্দলাল প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন।" কথাটা রবীন্দ্রনাথ খুবই সমর্থন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাঁর [এলমহার্স্টের] সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ।"

জাপানে এক মাস কাটিয়ে কবিরা স্বদেশে ফিরলেন জুলাই মাসে। নন্দলালের লেখা 'চীন-জাপানের চিঠি' প্রবাসীতে প্রকাশিত হল ১৩৩১ আশ্বিনে (১৯২৪); আর কবি-কর্তৃক স্বাক্ষরিত 'চীন ও জাপানে ভ্রমণবিবরণ' ছাপা হল প্রবাসীর ১৩৩১ কার্তিক সংখ্যায়। নন্দলালের লেখায় রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের লেখায় নন্দলালের কথা আছে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। নন্দলালকে কবি সঙ্গী রূপে নিয়ে যেতে চান ১০ জানুয়ারি তারিখে রমেশচন্দ্র মজুমদারকে কবি পত্রে লিখলেন—

"সঙ্গে কে কে যাবেন তার পুরো তালিকা যথাসময়ে পাবে। আপাতত এইটুকু বলে রাখছি আমাদের চিত্রকলাকুশল নন্দলাল বসুকে নিয়ে যাব কালীমোহন ঘোষও যাবেন। আমার পুত্র রথীরও যাবার কথা আছে, কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারছি নে।"

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-নন্দলাল

এই যাত্রায় কবির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নন্দলাল বসুর যাওয়া সম্ভব হয় নি।

আমরা প্রবন্ধের সূচনাতেই বলেছি, নন্দলালের অনেক আঁকা ছবি রবীন্দ্রনাথ কবিতায় রূপায়িত করেছেন। কার্সিয়াং থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথকে কার্ডে একটি দেবদারুর ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলেন। তারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'দেবদারু' কবিতা। একটি হল ছবির দেবদারু, আর একটি ছন্দের দেবদারু। ছবি ও ছন্দে যুগলমিলন। রবীন্দ্রনাথ সিঙ্গাপুর থেকে অমল হোমকে ২১ জুলাই ১৯২৭ (৫ শ্রাবণ ১৩৩৪) তারিখে এই প্রসঙ্গে লেখেন—

"শিলঙে থাকতে নন্দলালের সেই পাহাড়ের উপর দেবদারু আঁকা কার্ডের উত্তরে যে কবিতাটি লিখেছিলাম তার একটা রূপান্তর পাঠাচ্ছি—যুগলমিলন ঘটিয়ে দিয়ো। চিত্রটি তো তোমারই হাতে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন এ চিঠি লেখেন, তার দু মাস পূর্বে গ্রীষ্মের ছুটির সময় শিলঙ পাহাড়ে এসেছিলেন বিশ্রাম করতে। এই সময়েই কবি নন্দলালের ছবির উত্তরে ছন্দের মালা উপহার দিয়েছিলেন। পরে ওই কবিতার একটি রূপান্তরিত পাঠ পাঠালেন অমল হোমকে। ছবি ও ছন্দের যুগলমিলন ঘটলো অনতিকাল পরেই সাময়িকপত্রের পাতায়। 'বিচিত্রা' পত্রিকার প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৩৪) মুদ্রিত হল নন্দলালের ছবি দেবদারু ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'দেবদারু'। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি কবির হস্তাক্ষর ব্লক করে ছাপা হয়েছিল। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থে পরে সংকলিত হয়। গ্রন্থমধ্যে কবিতার শিরোদেশে কিঞ্চিৎ ভূমিকায় কবি বলেন—

"আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্সিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোট একটি পত্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হল, ওই একটি দেবদারুর মধ্যে যে-শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, ওই দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে-প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।"

শিলঙে থাকতে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের আরও একখানি ছবির কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। কবিতার নাম 'শুকসারী'। এটি ১৩৩৪-এ লেখা হলেও ছাপা হয়েছিল চার বছর পরে—'উত্তরা' পত্রিকায় ১৩৩৮ আশ্বিন সংখ্যায়। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের সংযোজনে 'শুকসারী' সংযোজিত। কবিতার শিরোনামের পরেই লেখা—'শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পাহাড়-আঁকা চিত্র-পত্রিকার উত্তরে।'

'জাভা-যাত্রীর পত্র' গ্রন্থে ২৮ জুলাই ১৯২৭ তারিখে মলাক্কা থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র আছে। সেই চিঠিতে নন্দলালের আঁকা আরও একখানি কার্ডস্কেচের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ থেকে পোস্টকার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চার দিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এঁটে গয়না গড়ছে। ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরা কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর। এই কাজের দ্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ করছে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ করছে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্তি দিচ্ছে। মুখ্যত এ কাজটি তার আপনারই, গৌণত যে মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে করে ফলকামনাটা হয়ে গেল লঘু, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল, কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে। এক কালে বণিককে সমাজে অবজ্ঞা করত, কেননা বণিক কেবল বিক্রি করে, দান করে না। কিন্তু, এই স্যাকরা এই-যে গয়নাটি গড়লে তার মধ্যে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিশে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েছে, বাইরে থেকে জোগায় নি।"

নন্দলালের স্যাকরার ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ 'স্যাকরা' নামে কবিতা লিখলেন 'বিচিত্রিতা'য়। কবি লিখলেন—

"কার লাগি এই গয়না গড়াও
যতনভরে।

স্যাকরা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।
শুধাই তারে, প্রিয়া তোমার
কোথায় আছে।
স্যাকরা বলে, মনের ভিতর
বুকের কাছে।
আমি বলি, কিনে তো লয়
মহারাজাই।
স্যাকরা বলে, প্রেয়সীরে
আগে সাজাই।
আমি শুধাই, সোনা তোমার
ছোঁয় কবে সে।
স্যাকরা বলে, অলখ ছোঁওয়ায়
রূপ লভে সে।
শুধাই, এ কি একলা তারি
চরণতলে।
স্যাকরা বলে, তারে দিলেই
পায় সকলে।"

নন্দলালের আঁকা পত্রপট বা কার্ডস্কেচ সম্পর্কে অতি সুন্দর ব্যাখ্যান পাই কানাই সামন্তের 'চিত্রদর্শন' বইটিতে। আলোচকের মন্তব্য, "নন্দলালের কার্ডস্কেচের প্রকৃতি একটু ভিন্ন। সেগুলি সম্ভবপর পূর্ণাঙ্গ চিত্রের আভাস এবং অভ্যাস হোক বা না হোক, নিজেরাও এক-একটি নিখুঁত ছবি। অবশ্য, কখনো রঙ, কখনো রেখা, কখনো ছাপছোপ, কখনো গড়ন, বিচিত্র উপায়-উপকরণে তাদের নির্মিতি—কাজেই বিচিত্র তাদের রূপ। যত রূপ শিল্পীর ছবিতে তত তাঁর স্কেচে, তবে আরও ক্ষণ-উদ্‌ভাসিত অপ্রস্তুত বেশে। সাধকেরা বলে থাকেন, যেমন নিত্যকার মাজাঘষায় ধাতুপাত্র ঝক্ ঝক্ করে তেমনি নিত্য-নিয়মিত ধ্যানের অভ্যাসে চিত্ত থাকে অকলঙ্ক উজ্জ্বল। এই স্কেচের ছলে শিল্পীর চোখ-চাওয়া সেই ধ্যানের অভ্যাস। ধ্যানের যা বৈশিষ্ট্য সেও এখানে অনুপস্থিত নয়। স্কেচ করার সাধারণ প্রতীচ্যরীতি থেকে তাতেও তার পার্থক্য আছে। বহু স্কেচ করেন নন্দলাল স্মৃতি থেকে। ভোর রাত্রির নিষুপ্ত নির্জনতায় বাইরে যখন অন্ধকার, একটি আলো জ্বালেন মনের গহনে, আরেকটি জ্বালেন লণ্ঠন কোলের কাছটিতে, পরে একটির পর একটি কার্ড এঁকে চলেন—কত চকিত মুহূর্তের কতকিছু দেখা। এ তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। হাতে দেন বা ডাকে পাঠিয়ে দেন স্বজন বন্ধু এবং ছাত্রছাত্রীদের।"

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের সৌভাগ্যের একটি কথা সবিনয়ে বলি। আমার নিজের সংগ্রহে আছে তাঁর আঁকা এ-রকম একটি দুর্লভ ছবি। তবে সেটি কার্ডে নয়, শিল্পাচার্য এঁকেছিলেন আমার অটোগ্রাফের খাতার পাতায়। প্রথমে পেন্‌সিলে ও পরে কলমের মুখে ফুটিয়ে দিলেন দুটি ফোটা ফুল। ছবির গায়ে লিখে দিলেন—"মহাপ্রাণ রূপে রূপে ছন্দিত হচ্ছে।" তারপরে সই করে তারিখ দিলেন ৪-৮-৬৩।

জুন মাসের শেষে (১৯২৭) কবি শিলঙ্ থেকে কলকাতায় ফেরেন। পরের মাসের ১২ তারিখে বৃহত্তর ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করলেন। কবির সঙ্গে এবারে চললেন সুরেন কর, চিত্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ ও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবির এবারেও ইচ্ছা ছিল নন্দলালকে সঙ্গী করার। কিন্তু নন্দলাল সম্ভবত কোনো কারণে কবির সঙ্গে যেতে পারেন নি।

কলকাতায় নতুন মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' বেরলো ১৩৩৪ আষাঢ়ে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নন্দলালের অজস্র চিত্রভূষণে বিভূষিত হয়ে প্রকাশিত হল 'বিচিত্রা'র ৯ পাতা থেকে ৭০ পাতায়।

'প্রবাসী'তে ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আলাপ-আলোচনা' ছাপা হল। এ আলাপ-আলোচনা মুখ্যত চিত্রী নন্দলালের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের। রচনাটির শিরোনামের পাশে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় কবি লেখেন, "সমস্ত আলোচনাটি সম্পূর্ণ নিজের ভাষাতেই লিখতে হয়েচে। ইপো [মালয়]। ১১ আগস্ট ১৯২৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" লেখাটি শুরু হয়েছিল এইভাবে—

"শিল্পকলার উদ্দীপনা নিয়ে নন্দলালের সঙ্গে আমার যে কথাটা হয়েছিল সেটা ভেবে দেখবার।" শিল্পকলা সম্পর্কে নন্দলালের কিছু জিজ্ঞাসার কবিপ্রদত্ত উত্তরই হল 'আলাপ-আলোচনা'। নানা কারণে এই রচনাটি মূল্যবান ; কিন্তু পুরাতন পত্রিকার পাতায় এ-লেখাটি অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বালিদ্বীপের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বারে বারেই রবীন্দ্রনাথের যাঁর কথাটি মনে পড়েছে তিনি নন্দলাল বসু। বালিদ্বীপ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কবি লেখেন—

"নন্দলাল এখানে এলেন না বলে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হয় ; এমন সুযোগ তিনি আর-কোথাও কখনও পাবেন না ; মনে আছে, কয়েক বৎসর আগে একজন নামজাদা আমেরিকান আর্টিস্ট্ আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, এমন দেশ তিনি আর-কোথাও দেখেননি। আর্টিস্টের চোখে পড়বার মতো জিনিস এখানে চারদিকেই। অন্নসচ্ছলতা আছে বলেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘরদুয়ার আচার-অনুষ্ঠান আসবাবপত্রকে শিল্পকলায় সজ্জিত করবার চেষ্টা সফল হতে পেরেছে। কোথাও হেলা-ফেলার দৃশ্য দেখা গেল না। গ্রামে গ্রামে সর্বত্র চলছে নাচ, গান, অভিনয় ; অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে, গ্রামের লোকের পেটের খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। পথে আশেপাশে প্রায়ই নানাপ্রকার মূর্তি ও মন্দির। দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই, ভিক্ষুক এ পর্যন্ত চোখে পড়ল না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হল, এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন।"

১৯২৭-এর সেপ্টেম্বরে বালিদ্বীপে বসে কবির নন্দলাল ও শ্রীনিকেতনের কথা মনে পড়েছিলো। আর তারপর একটা বছর পার হবার পূর্বেই দেখি শ্রীনিকেতনে কবি অতি সমারোহ সহকারে হলকর্ষণ-উৎসব করছেন। ১৯২৮-এর ১৫ জুলাই (১৩৩৫) এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী হলকর্ষণ-উৎসবে প্রাচীন সংস্কৃত থেকে কৃষিপ্রশংসা পাঠ করেন ; আর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হলচালনা করেন। নন্দলাল বসুর পরিচালনায় সভামণ্ডপ নূতনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল—গ্রামের বিবিধ সামগ্রী ও নানা শস্যাদি দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। এই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে নন্দলাল শ্রীনিকেতনের একটি প্রাচীরগাত্রে হলকর্ষণ উৎসবের একখানি বৃহৎ ফ্রেস্‌কো রচনা করে দেন।

এই উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে ১৩৩৫ ভাদ্র সংখ্যায়। আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে নন্দলালের আঁকা হলকর্ষণ উৎসবের ছবি ছাপা হল। 'প্রবাসী'র মন্তব্য, "শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু উৎসবের কিছুদিন পরে তুলি দিয়া উহার যে একটি ছবি আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিলিপি স্বতন্ত্র ছাপিয়া এই মাসের প্রবাসীর সহিত দিলাম। যাহাতে ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়িয়া না যায় উহা এইরূপ শক্ত কাগজে ছাপা হইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে ছিদ্রশ্রেণীর বরাবর ছিঁড়িয়া উহা বাঁধাইয়া রাখিতে পারিবেন।"

রবীন্দ্রনাথও কলম ছেড়ে মাঝে মাঝে তুলি ধরতে শুরু করেছেন এখন। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল ও অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের সাহচর্য ও সান্নিধ্য কবিকে চিত্রাঙ্কনকর্মে আরো বেশি উৎসাহিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"এক সময়ে আমি ছবি আঁকতে বসলুম। আমার অবশ্য একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল—অবন, নন্দলাল ছবি আঁকত—দেখেছি তাদের। কিন্তু আমার মনের ভিতর যেটা এল সেটা কোনো নোটিশ দিয়ে আসেনি।" ('আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ')

আবার বলেছেন—

"আমি কি আর ছবি আঁকি। শুধু আঁচড়-মাচড় কাটি। নন্দলাল তো আমাকে শেখালে না ; কত বললুম। ও হেসে চুপ করে থাকে।" ('আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ')

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ পত্রে লিখছেন—

"আমি কিছু কাজ করি কিছু ছবি আঁকি। ছবি আঁকতে পারি এ একটা নতুন আবিষ্কার তাই প্রত্যেকবারে সেটাতে নতুন উৎসাহ পাচ্ছি। নন্দলালদের প্রশংসা পেয়ে কাজটার পরে শ্রদ্ধা জন্মেচে।"

এই কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ পরে একদিন কবিতায় লিখেছিলেন—

“এমনি করে, মনের মধ্যে
অনেকদিনের যে-লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে
তার সাহস গেছে বেড়ে।
সে আঁকছে, ভাবছে না সংসারের ভালোমন্দ,
গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দা প্রশংসা।”

৮ ডিসেম্বর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে কবি যে পত্র লেখেন তাতেও ই মূল প্রসঙ্গ নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন—

“নন্দলালরা কলাভবনের নতুন ঘরগুলি সাজিয়ে তোলবার ব্যাপারে ত্যন্ত ব্যস্ত। তাই কোনো কাজে হাত দিতে পারছেন না। চেষ্টা করবেন গীতাঞ্জলির কোনো কবিতার সঙ্গে ছবি এঁকে কনগ্রেস উপলক্ষে রীর জন্যে পাঠাতে পারেন। একটু বড় সাইজে দেয়ালে ঝোলাবার তা। আর আর ছবি প্রায় সবগুলিই প্রবাসী মডারন্ রিভিয়ুতে ছাপা হয়েছে। সেগুলি বাছাই করে নতুন ব্লকে ছাপানো যেতে পারে কি না ভাবছেন। ৭ই পৌষের [১৩৩৫] ব্যাপারটা চুকে না গেলে মন স্থির করতে পারছেন না।”

১৩৩৫-এর ২৭ পৌষ (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর আঁকা একখানি ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে তারপরে লিখলেন ‘মহুয়া’র ‘প্রত্যাগত’ কবিতাটি। এই কবিতাটি লেখার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে বলেছেন—

“আমি একদিন আমার লিখবার টেবিলে বসে লিখছি হঠাৎ নন্দলাল ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সামনের দেওয়াল জুড়ে ছবিখানা এঁটে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। তখন ওর ঘরে ‘গৌরীদান’ আসন্ন—সেই সময় বসে ছবিখানা এঁকেছে। বোধ হয় কন্যার বিচ্ছেদ-দুঃখ মন থেকে সরিয়ে রাখবার জন্যে এই সময় বসে ছবি আঁকা। ওর ঐ রকম কিছু না বলে শুধু ছবিখানা আমার চোখের সামনে ধরে দিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতটুকু বুঝতে দেরি হলো না—আর্টিস্ট জানতে চায় আমার

মনোভাবটা। চেয়ে চেয়ে ছবিখানা দেখলুম আর তখনি কবিতাটা তৈরি হয়ে গেল। খুশি হলুম এইটুকু ওকে দিতে পেরে, কারণ, ওর একটা ধরন আছে কখনও আমার কাছে কিছু চায় না ; তাই এই নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানানো ইচ্ছেটুকুর প্রকাশে মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছিলুম। আর্টিস্ট জোর করে চাইলেই পারতো, খুশি হয়েই দিতুম, কিন্তু তা ও নেবে না। ভারি মজার মানুষ আমার নন্দলাল। এইজন্যে ওকে আমি এত ভালোবাসি।" ('দেশ' ২৫ চৈত্র ১৩৬৭)

নন্দলালের আঁকা সাঁওতাল যুগলের ওই পূর্ণায়তন রেখাচিত্রের প্রেরণায় কবি 'প্রত্যাগত' কবিতায় লিখলেন—

"হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভৎসনা তোমায় ;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর ; আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব-আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা-বলা।"

১৩৩৭-এর গোড়ায় (১৯৩০) কবির লেখা শিশুপাঠ্য বই 'সহজ পাঠ'এর দুই খণ্ড ছাপা হয়ে বেরোল। এই বইয়ের অন্তর্গত সমস্ত ছবি এঁকে দেন নন্দলাল। নন্দলালকে তাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ'এর ছবিগুলি আঁকিয়ে নেন। ১৯২৯-এর কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে লেখেন—

"কল্যাণীয়েষু নন্দলাল, প্রশান্ত অনেকবার আমাকে জানিয়েচে যে, সব ছবিগুলি পায় নি বলে সহজ পাঠের ব্লক তৈরি সমাধা হল না—সামনে পূজোর ছুটি। ইতিমধ্যে শিশুদের জন্যে প্রথম বাংলা পাঠ্য বই আরো একখানা Longmanরা প্রকাশ করেছে। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। সহজ পাঠের দ্বিতীয় খণ্ডের ছবি যদি দীর্ঘকাল দেরি হয় তাহলে এ বই প্রকাশের উপযোগিতা ও উৎসাহ চলে যাবে—এবং এর নকল বেরোতে আরম্ভ হলে ক্ষতি হবে। ইতি বুধবার শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

'সহজ পাঠ'এ নন্দলালের আঁকা ছবি প্রসঙ্গে রানী চন্দ 'সহজ পাঠে ছবি' শীর্ষক একটি লেখায় বলেছেন, "সহজ পাঠের ছবিগুলি—এক-একখানি ছবি, ইলাসট্রেশন বলতে যা এগুলো তা নয়। কলাভবনে তখন আমরা উডকাট, লিনোকাট করি। নন্দদা সেই টেকনিকেই আঁকলেন সহজপাঠের ছবিগুলি। এক-একখানা আঁকেন আর আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি। ছাপাছবি ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেখি, আজো দেখি। ঐ ছবির বর্ণনা কি দেবো ? নন্দদার হাত দিয়েই শুধু বের হয় এ ছবি।" (অতনু শাশমল সম্পাদিত 'সপ্তপর্ণী' সহজ পাঠ বিশেষ সংখ্যা, বিশ্বভারতী)

১৯২৮ ডিসেম্বরে কবি বলেছিলেন—ছবি আঁকতে পারি এ একটা নতুন আবিষ্কার। নন্দলালদের প্রশংসা পেয়ে কাজটার পরে তাঁর শ্রদ্ধা জন্মায়। এরই দেড় বছর পরে কবিকে দেখতে পাই য়ুরোপে ; প্যারিসে ৩০ সালের ২ মে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী হল সর্বপ্রথম। অক্সফোর্ড থেকে ২৭ মে ইন্দিরা দেবীকে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"এখানে আমার কীর্তি সম্বন্ধে বেশি কিছু বলব না। কেন না বিশ্বাস করবি নে। ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে—কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সে কথা বিস্তারিত করে বলতে সংকোচ বোধ করছি।"

ইংলণ্ডের ডার্টিংটন হল থেকে ২৯ জুন তারিখে চিত্রী রবীন্দ্রনাথ চিত্রী নন্দলালকে যে সুন্দর চিঠিখানি লিখেছিলেন তার সবটাই এখানে উদ্ধারযোগ্য :

"কল্যাণীয়েষু নন্দলাল, আমার ছবিগুলি শান্তিনিকেতন-চিত্রকলার আদর্শকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেচে। এই খ্যাতির প্রধান অংশ তোমাদের প্রাপ্য। কেননা তোমরা নানা দিক থেকে তোমাদের আলেখ্যে উৎসবে আগ্রহে আনন্দে অন্তরে অন্তরে আমাকে উৎসাহিত করেচ। তোমরা রূপকলার প্রাণনিকেতন ওখানে গড়ে তুললে—এ তো আর্ট স্কুল নয়—এ খাঁচা নয়, এ যে নীড়, তোমাদের জীবন দিয়ে এ রচিত। সেইজন্যে এই হাওয়াতে আমার বহুকালের অফলা একটি শাখায় হঠাৎ ফল ধরল। তোমরা তো জানো বাঁশ গাছ সুচিরকাল পরে কোন অপ্রত্যাশিত অবকাশে তার শেষ ফুল ফুটিয়ে আপন জীবনলীলা সাঙ্গ করে—আমারও সেই দশা—রঙের ভাণ্ড পশ্চিম দিগন্তে উজাড় করে দিয়ে তবে অস্তসমুদ্রে ডুব দেওয়া। আমার বাঁশ থেকে এতদিন কেবল বাঁশিই তৈরি হয়েছিল ; আজ তোমাদের কলা-বাসন্তীর স্পর্শ-পুলকে তাতে পুষ্পমঞ্জরী মূর্তিমতী। দীর্ঘ সময় ছিল অগোচরে, আজ সংকীর্ণ সময়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েচে। তার পরে, বাস্, হয়ে গেল—বার্মিংহামের প্রদর্শনী সাঙ্গ হল—এবার ছবিগুলি নিয়ে যেতে হবে জর্মানিতে।

দেশে বেধে গেছে লঙ্কাকাণ্ড। এখানকার সংবাদপত্রে তার আগুনের আঁচ অল্পই দেখা যায়, তবু কল্পনায় তার শিখা বিস্তার দেখতে পাচ্চি। এই সময়ে আশ্রমে বর্ষা উৎসবের কথা স্মরণ করে আনন্দ পেতে বাধা ঠেকচে। কিন্তু মালতী ফুলের উৎসাহ তো ম্লান হয় না, আর সপ্তপর্ণের পত্রপুঞ্জে সংবাদপত্রের আন্দোলন নিষিদ্ধ।

অমিয়র দুখানা চিঠি এই সঙ্গে পাঠাই। তাতে এখানকার ভাবগতিক অনেকটা বুঝতে পারবে। ভয় ছিল ইংলণ্ডে ছবিগুলি উপেক্ষিত হবে—তা হয়নি। সবচেয়ে আশঙ্কা আমার স্বদেশে। অন্তঃপুরে থাকতে থাকতেই তাদের লাঞ্ছনা সুরু হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলুম দেশে আমার ছবি ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। এ সব জিনিস বস্তুত তাদেরই, যারা স্বীকার করে, যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে—এদের কাছে দেশ বিদেশ নেই।

আশ্রমে তোমরা সকলে আমাদের আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ২৯ জুন ১৯৩০ শুভানুধ্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

নন্দলালকে লেখা চিত্রী রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রখানি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত এবং সেখান থেকেই উদ্ধৃত।

রবীন্দ্র ভবনের অন্য একটি ফাইল থেকে উদ্ধার করা গেল আরো কিছু মূল্যবান উপাদান। তখনো তো হাতে হাতে টেপ রেকর্ডার চালু হয়নি ; ২৪ এপ্রিল ১৯৩১ তারিখে কলাভবনে আর্ট-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা তখনই দ্রুতলিখনে একটি খাতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। শ্রীসনৎকুমার বাগচী লিখিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি পরিচয়' প্রবন্ধে ('সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ১৩৮৯ বৈশাখ) এই খাতাটির সংবাদ পাই। এ খাতায় আর্ট সম্পর্কে কবি ও চিত্রীর অনেক আলোচনাই অমিয় চক্রবর্তী মহাশয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ফাইলবন্দী ওই খাতা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি—

"নন্দলাল। সুন্দর—objective না subjective ?

গুরুদেব। সম্ভোগের ভিতরে সুন্দর আবদ্ধ হতে পারে—কিন্তু যেখানে বাহিরের দৃষ্টিতে যে সুন্দরের বিশিষ্ট গুণ (ঐক্য সুষমা) আছে আপনিই তাই হল সুন্দর। আমারই মধ্যে সব এ বললেই চরম মায়াবাদী হতে হয়। বীণার তারেই সংগীত তা নয়, আমার আঙুলের যোগে তার সংগীত। বীণার তার না হয়ে কাঠ হলে আবার সংগীত হবে না। দুয়ের যোগ—সৌন্দর্য তাই বাহিরে কি ভিতরে আছে এটা একান্তভাবে বলা যায় না—দুয়েই আছে।

নন্দলাল। কষ্টের মধ্যে রূপসৃষ্টির প্রেরণা হতে পারে।

গুরুদেব। যে কোনো অভিজ্ঞতা আমার চৈতন্যকে জাগায়—অহেতুক ভাবে চৈতন্য জাগায়—ব্যাকুলতা জাগে—সুখ হোক দুঃখ হোক—যা হোক—তাতেই মূল আর্টের। সুখদুঃখ বড়ো কথা নয়—Character-এর response."

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে নন্দলালকে দেখি ভূপালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। উভয়ে সাঁচির স্তূপ দেখলেন যত্ন করে। ২১ জুলাই (৫ শ্রাবণ ১৩৩৮) তারিখে অসিত হালদারকে কবি লেখেন—"এখানে সাঁচির কীর্তি দেখে খুবই খুশি হয়েছি। নন্দলাল আমার সঙ্গী হয়ে এসে দেখে গেল।"

শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠিত হয় ১৯২৯ সালে। এই সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা

ানাসভা ও বার্ষিক হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়—যে পত্রিকার স্বয়ং কবিও নতুন কবিতা দিতেন নিজের হাতে লিখে বা স্বাক্ষর 'রবীন্দ্রপরিচয় পত্রিকা' তিন বছরে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত া। তার মধ্যে কেবল দ্বিতীয় সংখ্যাটি কালের হাত থেকে রক্ষা ়। এটি ১৩৩৯ শারদীয়া সংখ্যা (১৯৩২)। অর্ধশতাব্দীর পুরাতন লিখিত পত্রিকাটির সংবাদ আমরা ইতিপূর্বে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্তের রবিচ্ছবি' বইতে পেয়েছিলাম ; এখন এটি আমার চোখের সামনে রলেন রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারের সুযোগ্য কর্মী শ্রীআশিসকুমার । পত্রিকার এই সংখ্যার সম্পাদক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। এই 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা'র কার্যবিবরণী লেখেন সভাপতি ক্ষিতিমোহন কার্যবিবরণী থেকে দেখতে পাই 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা'র প্রথম শনের আলোচক ছিলেন নন্দলাল বসু। তাঁর আলোচনার বিষয় রতশিল্পে রবীন্দ্রনাথ'। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন অবনীন্দ্রনাথ সভার তৃতীয় অধিবেশনেও নন্দলাল ছায়াচিত্র সংযোগে এই নিয়ে অধিকতর আলোচনা করেন। 'রবীন্দ্রপরিচয় পত্রিকার' শারদীয়া সংখ্যায় নন্দলাল লেখেন 'শিল্পপরিচয়' শিরোনামে সচিত্র এই প্রবন্ধে সাধারণভাবে চিত্রশিল্পের আলোচনা আছে ; প্রসঙ্গত াথের কথা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রধান ছবির নিদর্শন হিসাবে অঙ্কিত চিত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি নন্দলালের প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত । প্রবন্ধটি নন্দলালের স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত। এই পত্রিকায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের। একটি কবিতা। এটিও কবির স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত। খ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নন্দলাল ছাড়া আর যাঁরা লিখেছিলেন কয়েকজন হলেন—হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নিতাইবিনোদ গোস্বামী, নাথ ঠাকুর, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সাগরময় ১৯৩২ অক্টোবরে 'Visva Bharati News' লেখেন, nbihari Bhattacharya, the editor of the Patrica, is to ongratulated on the production of the excellent nn issue of the journal, with beautiful illustrations valuable contributions from the able pens of the of Dinendranath Tagore, Nandalal Bose and s."

লাল বসুর আঁকা আর-একখানি রঙিন চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'গোধূলি' কবিতাটি রচনা করেন। রচনাকাল ঘ ১৩৩৮। কবিতাটি প্রথমে নন্দলালের আঁকা ছবির সঙ্গে ছাপা ন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৯ কার্তিক সংখ্যায়। তখন কবিতার ল 'প্রাসাদভবনে'। কবিতার শেষে সম্পাদকের মন্তব্যে লেখা ছিল, বিতা নন্দলালবাবুর ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। পঞ্চাশটি ছবি ও তদদৃষ্টে লিখিত কবির পঞ্চাশটি নূতন কবিতা শীঘ্রই ত্রতা' নামে বই আকারে বাহির হইবে।" এখানে বলা যায়, ১৩৪০ ওই কবিতাগুলির একত্রিশটি 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। কবিতার অধিকাংশই 'বীথিকা'য় চিত্রবিহীন আকারে মুদ্রিত হয়। চিত্রিতা' ১৩৪০ শ্রাবণে (১৯৩৩) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই যাঁদের অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি লেখা, মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ; আর আছেন গগনেন্দ্রনাথ, ন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুরেন কর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট রা। এই একত্রিশটি কবিতার মধ্যে নন্দলালের আঁকা তিনটি ছবি নে রচিত তিনটি কবিতা সংকলিত। সেই তিনটি কবিতা 'পসারিনী', 'স্যাকরা' ও 'কন্যাবিদায়'।

চিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন নন্দলাল বসুকে। পিত্রটি এইরূপ—

"আশীর্বাদ

। বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি
বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগাল কে যে নয়নপাতে
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা।

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের লীলালিখন-ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি,
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি।

যে-মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি যে হাসে
রঙজাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়াল ভালে।

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত।

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকনপটের 'পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয়।

চিরবালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম-পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা-'পরে।

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।"

শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখেছিলেন। রচনাকাল ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

দু বছর পরের কথা। তারিখ ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৩ নভেম্বর ১৯৩৩। শান্তিনিকেতন থেকে এক বিরাট দল নিয়ে বোম্বাই নগরীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন কবি। এই মহানগরীতে এবার রবীন্দ্রসপ্তাহ উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে, শান্তিনিকেতন-কলাভবনের চিত্র ও শিল্পের প্রদর্শনীর, প্রদর্শনী রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলীরও। তাছাড়া ব্যবস্থা হয়েছে 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ' নাটকের অভিনয়ের। কবির সঙ্গে এই সফরে এসেছেন নন্দলাল, সুরেন কর, কালীমোহন ঘোষ, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। নন্দলাল বসু সেবার এলিফ্যান্টা কেভের ডাকঘরে বসে কিভাবে একটির পর একটি কত অজস্র পোস্টকার্ড-স্কেচ এঁকেছিলেন, তার বিবরণ শুনেছি আমি আমার পিতৃদেব অধ্যাপক বিজনবিহারীর মুখে।

অভিনয়ের রূপসজ্জায় নন্দলালের অবদান ছিল অসামান্য। শান্তিদেব ঘোষ 'রূপকার নন্দলাল' বইতে 'তাসের দেশ' অভিনয়ের রূপসজ্জা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মাথায় পাগড়ী বাঁধা ভারতবর্ষের একটা চিরন্তন রীতি। কিন্তু নন্দলাল যে পাগড়ী বাঁধেন অভিনয়ের সাজে তা সম্পূর্ণ নতুন। তাই দেখি পাগড়ী বাঁধতে গিয়েও তিনি তাঁর রচনাশক্তির বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন। অল্প খরচে সামান্য পিসবোর্ডের উপর সোনালী রূপালী ও নানা রঙের কাগজের সাহায্যে 'তাসের দেশে'র তাসেদের যে অপূর্ব সাজ তিনি

নন্দলালের এই ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'প্রাসাদভবনে'।

রচনা করেছিলেন তা কখনো ভুলবার নয়। তাসের দেশেই প্রথম বুঝেছিলুম যে বড় কবি ও বড় শিল্পীর রচনা যখন একসঙ্গে মিশে যায় তখন সে রচনা কত সুন্দর হতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে নন্দলালের অঙ্কিত ছবি অবলম্বনে কবিতা রচনা করেছেন অনেক—আমরা দেখেছি। নন্দলালের সম্পর্কে দুটি কবিতাও আমরা পেয়েছি কবির কলম থেকে ইতিপূর্বে। এবার রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে মুখ্যত নন্দলাল ও তাঁর ছবি নিয়ে আলোচনা করলেন। কবির লেখা 'নন্দলাল বসু' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৪০ চৈত্র সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ২৩ ফাল্গুন ১৩৪০ তারিখে (৭ মার্চ ১৯৩৪) সকালে শান্তিনিকেতনে। এ সংবাদ জানতে পাই সেদিন মধ্যাহ্নে নির্মলকুমারীকে লেখা কবির পত্র থেকে।

'নন্দলাল বসু' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"...নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীন জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এলমহার্স্ট। তিনি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন। তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচারশক্তি অন্তর্দর্শী। একদল লোক আছে আর্টকে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এইরকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মতো, একটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার করা। এইরকমের যাচাই-প্রণালী মুজিয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিস মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতিভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে ; সে চলছে, সে এগোচ্ছে, তার সম্ভূতির শেষ হয়নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়েনি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেইজন্যই তাঁর সঙ্গ এডুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি— তাঁর এমন কোনো ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না। সেই শক্তিকে, তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য হন যেহেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।...

যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয়শক্তি কেবলই তার পথ তৈরি করতে থাকে। সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পৌঁছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যলিপিতে তা লেখে না। যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হত তাহলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা খরিদ্দার তাদের বিচারবুদ্ধি অচল শক্তিতে খুঁটিতে বাঁধা। তাদের দর-যাচাই প্রণালী অভ্যস্ত আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভালো-লাগার পরিমাণ জনশ্রুতির পরিমাণের অনুসারী। আর্টিস্টের কাজ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবর্তন করলে আর্টিস্টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক, হাটে-বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তো হোক। অমুক বই বা অমুক ছবি পর্যন্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকর্ষের সীমা— বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে লোকের অভ্যস্ত বরাদ্দে বিঘ্ন ঘটেছে। সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর যাই হোক, সেই পাপ লোভের আশঙ্কা নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অতীত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিণী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার অন্তহীনের আহ্বানে।

আর্টিস্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তাঁর জীবনে। আমরা বারংবার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে। প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তাহলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চা দাম-যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্প-সাধকদের তপস্যার সম্মুখে রজতনূপুরনিক্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তিবর দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।...

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি হৃদয় নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা এ কথা অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর ঔদার্যে ও চিত্তের গভীরতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমার এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব করি।"

বোম্বাইয়ের মত আবার একটি বড় দল নিয়ে কবি এবারে যাত্রা করলেন সিংহলের পথে। ৯ মে ১৯৩৪ জাহাজ পৌঁছলো কলম্বো বন্দরে। কবির সঙ্গে এবারেও এসেছেন তাঁর নিত্যসহযাত্রী শিল্পী নন্দলাল। বোম্বাইয়ের মত এখানেও ব্যবস্থা হয়েছে নৃত্যনাট্য অভিনয়ের এবং ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীর। এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী, নন্দলাল ও তাঁর কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত চিত্রসম্ভার

বিচিত্রা

[illegible] | কার্তিক, ১৩৩৪ | পঞ্চম সংখ্যা

দেবদারু

[illegible] হিমাদ্রির প্রস্তরবন্ধ ভেদ করি চুপে
ছিল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্যের যে জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য উদ্বোধন
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে গোপন
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী,— তপস্যার [illegible]
সে বাণী ধ্বনিল শাখায় শাখায়; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।
অয়ি দীর্ঘ দেবদারু — [illegible] করে যেন
আপনার মহিমারে; অন্তরে ছিল যে তব দীপ্তি
বাহিরে তা সত্য হোলো; ঊর্ধ্ব হতে পেয়েছিল ঋণ
ঊর্ধ্বপানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিলো একদিন।
আপন দাহের মূল্যে স্বর্গ তব রহিল না দূর,
সূর্যের সঙ্গীতে মেলে মৃত্তিকার মুরলীর সুর।।

২৪ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪
শিলঙ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]লের ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'দেবদারু'

, অন্যান্য ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়।
২১ মে (১৯৩৪/১৩৪১) তারিখে সিংহল থেকে চিত্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্মণকে কবি যে চিঠি দেন তাতে নন্দলালের প্রসঙ্গ পাই। কবি [illegible]ন্দ্রকৃষ্ণকে লেখেন—
'এখানে একটা বড়ো মন্দির ভিত্তি চিত্রিত করবার ভার এরা [illegible]লালকে দিয়েছে। অনেকখানি কাজ— পাঁচ ছ' মাস লাগবে— সেই [illegible]জ তোমাকেও আহ্বান করবেন স্থির করেছেন। যদি সম্মত হও, তাহলে [illegible]ও হবে অর্থও হবে। নন্দলাল জুনের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ দেশে [illegible]হবেন। তাঁর সঙ্গে মোকাবিলায় সকল বিবরণ সুস্পষ্ট হবে।"

রবীন্দ্রনাথের শেষবেলাকার ঘরখানিকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজে নন্দলালের প্রয়াস ও পরিশ্রম কম হয়নি। কবির ইচ্ছা বা ভাবনাকে রূপদানের কাজে নন্দলালের উৎসাহ আগ্রহ ও আন্তরিক প্রয়াস সর্বদাই আমরা লক্ষ্য করেছি।

শ্যামলী—তাঁর শেষবেলাকার ঘরখানি নির্মিত হয় কবি স্থপতি ও ভাস্করের সম্মিলিত প্রয়াসে। মাটির ঘর করবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের, স্থাপত্য পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের, আর ভাস্কর্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নন্দলাল বসু। ২৮ মার্চ ১৯৩৫ প্রতিমা দেবীকে শান্তিনিকেতন থেকে কবি লিখছেন—

'ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে, এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চৈশ্রবা ত্যেজে।'

"আমার মেটে কোঠার ছাদ আরম্ভ হয়েছে। নন্দলালরা রোজ একবার করে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে যান। জিনিসটা যথেষ্ট সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠবে এখন থেকে তার নিদর্শন পাচ্ছি।"

পরে ১২ মে (১৯৩৫/১৩৪২) জোড়াসাঁকো থেকে বিলেতে রথীন্দ্রনাথকে কবি পত্রে লেখেন—

"২৫শে বৈশাখের হাঙ্গাম চুকে গেল। ওর সঙ্গে গৃহপ্রবেশ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। মাটির বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে— রাত্রে আলো জ্বালিয়েও কাজ চলেছিল।"

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালে নন্দলালের শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। দু বছর পরে 'Visva-Bharati Quarterly'তে (১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে নন্দলাল বসুর প্রবন্ধ 'The Paintings of Rabindranath'। পরবর্তী কালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে আরও কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। তবে 'The Paintings of Rabindranath' কবির জীবৎকালে রচিত নন্দলালের লেখা প্রবন্ধ বলে মূল্যবান খুবই। নন্দলালকৃত চিত্রসমালোচনা পড়ে কবির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও আমরা জানার সুযোগ পাই। পুরনো জার্নাল থেকে নন্দলালের এই প্রবন্ধটি আমাকে সংগ্রহ করে দেন শ্রীরামচন্দ্র রায়। নন্দলালের লেখা ওই প্রবন্ধ থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি—

"Now, it appears that artists, in the vast majority of cases, both here and elsewhere, begin the creative process with the subject or idea, and then proceed to execute the rest. But Rabindranath, it seems, often begins creating even before the subject has taken any conscious form in his mind and might easily lead one to suppose that mere craftmanship or mere architectural design or the mere effect of colours were his end, but when the picture is complete we discover all the essential constituents of a work of art in it, all blended in one subject and pervaded by that rhythm of life which the hand of genius alone can impart. And that is why his paintings are always real, though rarely realistic. ..When I said that Rabindranath's art is real, though not realistic, I was conscious of having exposed myself to the challenge to define what exactly I meant by 'real'. If I am unwilling to take up the challenge, it is not because of want of conviction on my part but because I know only too well that even geniuses with gift of literary expression have not succeeded in difining this must elusive of all concepts. I am only an humble artist to whom words have never been his medium of expression. But I should like to quote here what Rabindranath once said in a private talk, that whatever might be the definition of Reality, one of its characteristics was that it always compelled attention, and the more one looked at it the more surely was the recognition compelled. It is true what is merely curious and odd also draws attention, but while the attraction of the merely novel and fanciful wears off, that of the 'real' grows. And though, I am willing to admit, there is an element of the curious and even of the grotesque about Rabindranath's pictures, there is so much of the 'real' in them that the attention instead of wearying gains in intensity and in
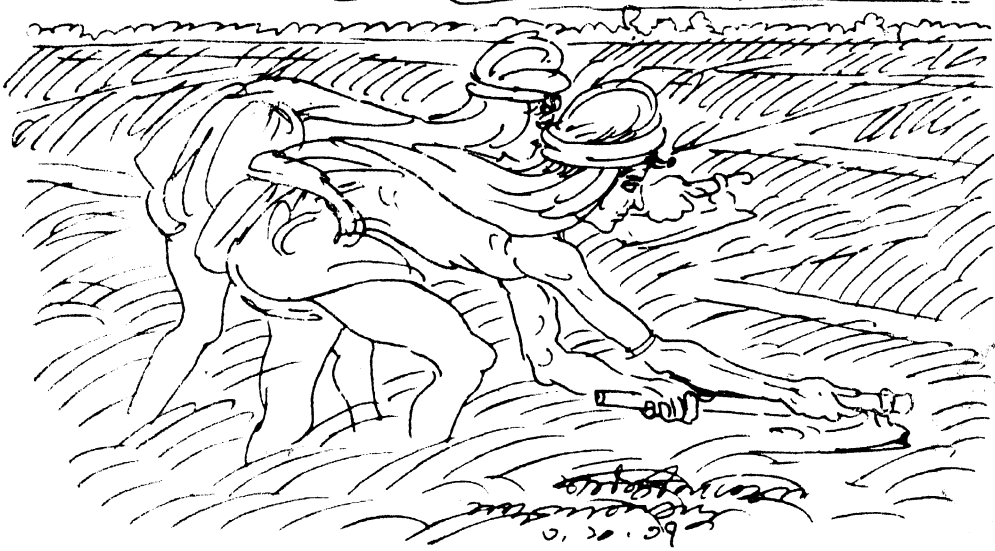
rstanding. The pictures begin to explain themselves. is why I am eager that our young artists should ' his works with heart, though I am indifferent to the critics, addicted to theories, may say of them."
ীন্দ্রনাথ বিশু মুখোপাধ্যায়কে ২৩ জুন ১৯৪১এ যে-পত্র দেন, তার একস্থানে কবি লিখেছেন— "অল্প দিন হলো, নন্দলাল যখন চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, আমি তার সম্পূর্ণ অর্থ করতে পারি নি।"

ন হয় নন্দলালের লেখা ওই প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করেই কবি া বলেছিলেন।

দলালের আঁকা চিত্রাবলী রবীন্দ্রনাথকে কবিতা রচনায় যে কী বিপুল । দিয়েছিল তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন রয়েছে 'ছড়ার ছবি' (আশ্বিন ৪/ ১৯৩৭) গ্রন্থে। এই বইয়ের অন্তর্গত সব ক'টি কবিতা (৩২টি) লের অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে রচিত। এই বইয়ের অভ্যন্তরে লের আঁকা মোট ৩৮খানি ছবি মুদ্রিত হয়েছে।

বীন্দ্রনাথ নন্দলালের অঙ্কিত অনেকগুলি স্কেচ সাঁয়ত্রিশ সালের সর শেষে আলমোড়ায় আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন। এগুলি ন করেই কবি এখানে বসে একটির পর একটি কবিতা লিখে যান। আঁকিয়ে' নামে একটি কবিতা নন্দলালকে উদ্দেশ করেই কবি ন। বস্তুত, এই কবিতার মধ্যে কবির কৃতজ্ঞতাই স্বীকৃত হয়েছে ল্পীর প্রতি। আর্টিস্টের দৃষ্টিশক্তির অপরূপ রহস্যের কথা ব্যক্ত ই এই ছোট কবিতাটির অভ্যন্তরে। কবি লিখছেন—

"ছবি আঁকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে,
চলছ তুমি আশেপাশে দৃষ্টির জাল ফেলে।
পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে এঁকে
পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিদেশের থেকে।
যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।

ওই যে কারা পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম,
নেই বললেই হয় ওরা সব, পৌঁছে না কেউ নাম;
তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনো;
অমনি বলি, তাই বটে তো, সবাই চেনো-চেনো।
ওরাই আছে, নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব;
এই ধরণীর মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব।
অনেক খরচ করে রাজা আপন ছবি আঁকায়,
তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়।
সে-সব ছবি সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধা,
আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।"

এই কবিতাতেই শেষ স্তবকে নন্দলাল-অঙ্কিত একটি ছাগলের চিত্র দেখে কবি চিত্রীকে সম্বোধন করে বলছেন—

"ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে,
এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা ত্যেজে।
জন্তুটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে,
সবাই ওঠে হাঁ হাঁ করে সবজি-খেতে দেখলে।
আজ তুমি তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই দেহে
এক মুহূর্তে চমক লেগে বলে উঠলেম, কে হে।
ওরে ছাগলওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার—
আমি জানি, একজনের এই প্রথম আবিষ্কার।"

কবিতার নীচে স্থান কাল দেওয়া আছে—'আলমোড়া/ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪'।

আলমোড়ায় বসে, নন্দলালের প্রেরিত ছাগলের ছবিটি পেয়ে, কবি ১৭ মে (১৯৩৭/ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) তারিখে চিত্রশিল্পীকে পত্রে লেখেন—

"তুমি আমাকে যে ছাগলের ছবি পাঠিয়েছ এ উর্বশীর সহোদর ভাই নয় কিন্তু এর বাসা অমরাবতীতে। এর থেকে প্রমাণ হয় আর্টে সুন্দর হবার জন্যে সুন্দর হবার কোনো দরকারই হয় না। আর্টের কাজ মন টানা, মন ভোলানো নয়। তোমার পোষ্টকার্ডের ছবিগুলির প্রতি মাঝে মাঝে কলমের লক্ষ্য স্থির করি। যে হাল্কা চালের পথ-চলতি লেখা লিখব মনে করেছিলুম সে হয়ে উঠল না। কিছু ওজন-ভারী চাল হচ্ছে; সেটা আমার বয়সোচিত কিন্তু আমার বয়সের কবিতার পাঠক সংসারে বেশি নেই।"

আগেই বলেছি 'ছড়ার ছবি' বইতে কবিতা আছে ৩২টি কিন্তু ছবির

সংখ্যা ৩৮। আমার মনে হয় কোনো কোনো কবিতায় নন্দলাল পরে হয়তো অতিরিক্ত এক-আধখানি ছবি যোগ করে দিয়েছিলেন। যেমন ধরা যাক 'মাধো' কবিতাটির কথা। এই কবিতার সঙ্গে আছে দুটি ছবি। প্রথম ছবিটি 'রায়বাহাদুর কিষণলালের স্যাকরা জগন্নাথ'-এর। এটি কবিতার মূল ছবি, প্রথম ছবি। অর্থাৎ এই ছবিটি দেখেই এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'মাধো' কবিতা রচনার প্রেরণা। ছবির প্রাথমিক বিবরণ পাই কবিতার প্রথম কয়েকটি ছত্রেই—

"রায়বাহাদুর কিষনলালের স্যাকরা জগন্নাথ,
সোনারুপোর সকল কাজে নিপুণ তাহার হাত।
আপন বিদ্যা শিখিয়ে মানুষ করবে ছেলেটাকে
এই আশাতে সময় পেলেই ধরে আনত তাকে;
বসিয়ে রাখত চোখের সামনে, জোগান দেবার কাজে
লাগিয়ে দিত যখন তখন; আবার মাঝে মাঝে
ছোটো মেয়ের পুতুল-খেলার গয়না গড়াবার
ফরমাশেতে খাটিয়ে নিত; আগুন ধরাবার
সোনা গলাবার কর্মে একটুখানি ভুলে
চাপড়টা পড়ত পিঠে, টান লাগাত চুলে।"

ছবিতে স্যাকরা-পিতাই ছিল শিল্পীর মূল লক্ষ্য। ছবির বেশি অংশটা সেই জুড়ে বসেছে। ছবির বাঁ পাশে তার ছোট্ট একরত্তি ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে—হাতুড়ি হাতে যেন কাজে বসে গেছে। পিতা জগন্নাথ নয়, তার শিশুসন্তানটিই মাধো নাম নিয়ে কাব্যরঙ্গমঞ্চে নায়ক হয়ে বসেছে। কবিতা শেষ হয়েছে বিশ পঁচিশ বছর পরবর্তী কালের ঘটনা দিয়ে—

"পেরোলো বিশ-পঁচিশ বছর; বাংলা দেশে গিয়ে
আপন জাতের মেয়ে বেছে মাধো করল বিয়ে।
ছেলে মেয়ে চলল বেড়ে, হল সে সংসারী;
কোনখানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি।
এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার
মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই, মজুর হাজার হাজার
ধর্মঘটে বাঁধল কোমর; সাহেব দিল ডাক;
বললে, "মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক।
দশের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি-যে মার খেয়ে।"
মাধো বললে, "মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।"
শেষপালাতে পুলিশ নামল, চলল গুঁতোগাঁতা;
কারো পড়ল হাতে বেড়ি, কারো ভাঙল মাথা।
মাধো বলল, "সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।"
চলল সেথায় যে-দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে,
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।
পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি,
ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি।"

কবিতার শেষে ছাপা হয়েছে দ্বিতীয় ছবি। কাহিনীর নায়ক মাধো পাটকলের কাজ ছেড়ে তার বউ ও তিন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে নিজের দেশের পথে এগিয়ে চলেছে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়ে। পাঁচটি প্রাণীই ক্ষুধায় কাতর এবং শীর্ণ; তবুও 'অপমানের অন্ন' মাধোর সহ্য হবে না। প্রথম ছবিটিতে স্যাকরা জগন্নাথকে পাওয়া গিয়েছিল সপরিবারে। দ্বিতীয় চিত্রে তারই পুত্র মাধোকে পাচ্ছি সপরিবারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পটভূমিতে। রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে জগন্নাথ জন্ম নিয়েছিল নন্দলালের ছবি দেখে; আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েই সম্ভবত তিন সন্তানের জনক মাধো দ্বিতীয়বার চিত্রিত হয়ে পাঠকের সামনে আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে নন্দলালের তুলিতে।

কলকাতায় সাহিত্য পরিষৎ-এর হলঘরে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের একটি চিত্র-প্রদর্শনীর ববস্থা হয়েছে সাত দিনের জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে। সাল ১৯৩৯। এতে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও কলাভবনের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের কাজ দেখানো হবে। এই প্রসঙ্গে বাগবাজারের ৫/ ৫এ, বীরচাঁদ গোঁসাই লেন থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথকে যে পত্রখানি লেখেন সে এখানে উদ্ধৃত হল—

"শ্রদ্ধাভাজনেষু—কলাভবনের ছবির exhibition-এর ব্যবস্থা শ্রীযু গনেন মহারাজ সাহিত্য পরিষৎ-এ ঠিক করেছেন। ৪ঠা হতে দৈনিক ৩ট সময় হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। পরিষদে একটি নূতন হল হয়েছে সেখানে ছবি ভাল ভাবে সাজান যাবে। Exhi আমাদের অভি যে কদিন হবে সে কদিন খোলা থাকবে। এখন বিশিষ্ট লোকদিগ আমন্ত্রণ করার জন্য একটি পত্র ছাপতে হবে। আমার ইচ্ছা আপনি য একটি পত্র নিজের হাতে লিখে দেন তা হলে সেটি ব্লক করে ছে তাহাদের পাঠাব। আপনি পত্র পেয়েই যদি লিখে পাঠান ত ঠিক সময় ম ছাপা হবে। আপনার নামে নিমন্ত্রণ হলে ভাল হবে। পত্রে এই মর্মে লি থাকলে চলবে। বিশ্বভারতীর কলাভবনের তরফ হতে অভিনয় চিত্রশিল্পের একটা প্রদর্শনী কলিকাতাবাসিদের জন্য করা হচ্ছে চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীটা সাহিত্য পরিষদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ৩টার সময় খো হবে। ৭ দিন খোলা থাকবে। ইহাতে আপনার আধুনিক কাজ, আমার কলাভবনে প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের কাজ দেখান হবে। আপনি যাহা ভ বুঝেন সেইরূপ লিখে পাঠাবেন। আপনার শরীর আশা করি ভাল আছে আমি ভালই আছি। সেবক নন্দলাল বসু।"

নন্দলালের লেখা মূল চিঠিখানি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। রবীন্দ্রন নন্দলালকে এই চিঠির উত্তর দেন পরের দিনই।

কবির লেখা 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বইটি প্রকাশিত হ ১৯৪১-এ; আষাঢ় ১৩৪৮-এ। এ বইতে আশ্রমের কয়েকজন বি শিক্ষকের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে নন্দলালের কথাও বিশেষভাবে উল্ল করেন রবীন্দ্রনাথ—

"আশ্রমের সাধনা ক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোট বড় সম ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। ত আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রে রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশি উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।"

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'ই কবির জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ গ্র এই শেষ বইটিও নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

আষাঢ়ে বেরুলো বই, আর তারপরেই এলো সেই বাইশে শ্রা (১৩৪৮)।

নন্দলালের উদ্দেশে লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতাটি মুদ্রিত হ কবির তিরোধানের ক' মাস পরে মাঘের 'প্রবাসী'তে। নন্দলালের জ এটি কবি লিখেছিলেন ৩ ডিসেম্বর ১৯৪০-এ (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ অর্থাৎ কবির মৃত্যুর মাত্র মাস কয়েক পূর্বে। 'প্রবাসী'তে কবিতাটির মুদ্রি পাঠ এইরূপ—

"কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু—
রেখার রহস্য যেথা আগলিছে দ্বার
সে গোপন কক্ষে জানি জনম তোমার।
সেথা হতে রচিতেছ রূপের যে নীড়,
মরুপথশ্রান্ত সেথা করিতেছে ভীড়॥
৩/১২/৪০

রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লিখেছিলেন তাঁর ডায়রির একটি পাতায় পরে কপি করে নন্দলাল বসুকে দেন। এই চার ছত্রের কবিতাতেও মুদ্রি পাঠ ও পাণ্ডুলিপির পাঠের মধ্যে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। আদি পা 'আগলিছে' স্থলে 'আগলিয়া' ছিল এবং 'সে গোপন কক্ষে জানি' স্থলে ছি 'জানি সে গোপন কক্ষে'।

শিল্পীর জন্মদিনে স্ফুটিত এই কবিতাকুসুমটি নন্দলালের প্রতি গুরু রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রীতি-অর্ঘ্য এবং অশেষ আশিষমন্ত্র।

গান্ধীজি ও নন্দলাল

মনোরঞ্জন গুহ

ানো মহৎ কীর্তির সামনে দাঁড়ালে আমাদের ভাবতে ইচ্ছা করে যে
ীর্তি তিনিও মহৎ অর্থাৎ মানুষ হিসাবে মহৎ, যদিও মানুষ হিসাবে
চরিত্রের এবং তাঁর কীর্তির মহত্ত্বকে এক মাপকাঠি দিয়ে বিচার না
ভাজগতের বহুদিনের অভ্যাস। কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে
থাই নেই, এমনকি তত্ত্বজ্ঞান-ব্যাখ্যাতার কৃতিত্ব বিচারের সময়েও
ীবন বা চলতি কথায় যাকে নৈতিক চরিত্র বলা হয় তার সঙ্গে
দেখার রেওয়াজ উঠে গেছে বল্লেই হয়। কেবল নীতি বা
ার যিনি বৃত্তি হিসাবে নিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধেই লোকে খোঁজ করে
কেমন। যে ক্ষেত্রেই হোক প্রতিভার বিচার কেবল সেই ক্ষেত্রেই
াগী মাপকাঠি দিয়ে করতে হবে। কবি যদি ধর্ম বা নীতি নিয়ে কবিত্ব
তাহলেও তাঁর কবিকৃতির বিচার কবিত্বের মাপকাঠি দিয়েই করতে
সেখানে তাঁর ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি অবান্তর।
র মানে প্রতিভা স্বজাত এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বপ্রধান; একটির সঙ্গে
একটির মিল বা সঙ্গতি দাবি করা যায়না। আর পাঁচজনের মতো কবি
ীকে দৈনন্দিন জীবনে সমাজস্বীকৃত ধর্ম বা নীতির আওতায় থাকতে
যেতে পারে কিন্তু তাঁদের সৃজন প্রতিভার অনন্যাপেক্ষ
ত্ব—autonomy মানতে হয় কারণ বাস্তব জগৎ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে
লে স্বীকৃত শিল্পের স্রষ্টার ব্যাক্তিগত জীবন সাধারণ অর্থে মহৎ বলা
না।

ুও মনে হয় হয়তো এটাই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞান যেমন এমন
সূত্রের অন্বেষণ করছে যার দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শক্তির বিভিন্নতা
ত হবে তেমনি ভাবজগতেও বোধহয় মানুষের একটি একসূত্রী
ied field"-এর চিরন্তন সন্ধান চলছে। তারই জন্যে বোধহয়
সত্য-শিব-সুন্দরের যুগপৎ একাধারী কল্পনা। মানুষের মন এমন একটা স্তরে পৌঁছতে চায় যেখানে যা সত্য তাই শিব ও সুন্দর হবে, শিব যা তাই সত্য ও সুন্দর হবে, সুন্দর যা তাই সত্য ও শিব হবে। এই তিনের একটি অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাভূমি আবিষ্কারের চেষ্টা মানুষ করছে। অসাধারণ সাধক বিশেষের চিত্তে তার উপলব্ধি হয়ে থাকলেও তা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বস্তু হয়ে ওঠেনি যদিও এটা সাধারণ মানুষেরও চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু যে শিল্পীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও তাঁর সৃষ্টির মহত্ত্ব এক রেখায় মিলে যাবে।

তার জন্যে আমাদের সত্যের মাপকাঠি শিবের মাপকাঠি সুন্দরের মাপকাঠি প্রত্যেকটাই হয়তো আরও বিবর্তনসাপেক্ষ। সেই বিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের-moral sense-নৈতিক চেতনার সঙ্গে মানুষের aesthetic ideal-নান্দনিক আদর্শের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়তো একদিন সম্ভব হবে। কোনো মহৎ শিল্পকৃতির সঙ্গে শিল্পীর জীবনের মিল দেখলে আমাদের মন যে বিশেষভাবে খুশি হয়ে ওঠে সেটা বোধহয় এই আশারই ইঙ্গিত।

শিল্পী নন্দলালের শিল্পকৃতি এবং মানুষ নন্দলালের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে এরূপ মিলের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পিনোজার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে লেখেন: "স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ববিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে তবে যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ....তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবল তার্কিক বুদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়, তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব থেকে তার উপলবধি ও প্রকাশ।

"শিল্পকলার রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার সম্বন্ধ বোধ করি আরো ঘনিষ্ঠ। সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। যদি পাওয়া যায় তবে তাদের কর্মে তাদের অকৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। স্বভাব কবিকে স্বভাব শিল্পীকে কেবল যে দেখি তাদের লেখায়, তাদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের ব্যবহারে, তাদের দিনযাত্রায়। তাদের জীবনের প্রাত্যহিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে। ...নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিশক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।....

"আর্টিস্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার চরিত্রে তার জীবনে। আমরা বারম্বার তার পরিচয় পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে। প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয় বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তাহলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চা দাম যাচাইয়ের পরীক্ষায় ইন্দ্রদেব শিল্পসাধকের তপস্যার সম্মুখে রজত-নূপুর-নিক্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শে সেই লোভ থেকে রক্ষা করে দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তি বর দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

"তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর একটি লক্ষণ দেখা যায় যে তাঁর অবিচলিত ধৈর্য্য। বন্ধুর মুখের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয়নি দেখেছি। যারা তাঁকে জানে, এমনতর ঘটনায় তারাই দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তিনি সহজেই ক্ষমা করেছেন। এতে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করে।...শিল্পী ও মানুষকে জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি হৃদয় নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়...।"

গান্ধী-নন্দলাল সম্পর্কের প্রসঙ্গে মানুষ নন্দলাল ও শিল্পী নন্দলালের মধ্যে এই চারিত্রিক মিলের উল্লেখ গোড়াতেই করে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ হয় আছে কারণ যদি এই মিল না থাকত তাহলে উভয়ে পরস্পরের প্রতি অতটা আকৃষ্ট হতেন কিনা সন্দেহ। উভয়ের চরিত্রের কতকগুলি গুণের মূলগত সমতা ছিল। তার কিছুটা স্বভাবজ কিছুটা নন্দলালের গঠনে গান্ধীজির প্রভাবজনিত। নন্দলালের ব্যক্তি ও শিল্পী জীবনের উপর তিনটি প্রভাবের কথা বলা হয়। তার একটি গান্ধীজি। অপর দুটি-রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। এই তিন প্রভাবের কোনোটিই কেবল শিল্পী জীবন অথবা কেবল ব্যক্তিগত জীবনের সহিত সম্পর্কিত একথা বলা যায় না। প্রত্যেকটি নন্দলালের ব্যক্তিগত ও শিল্পীজীবনকে স্পর্শ করেছে যদিও তার মধ্যে তারতম্য ছিল। স্বর্গত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নন্দলালের জীবনের ১৯৩০—১৯৫০ দশকের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা ("the most significant event of Nandlal's life between 1930 and 1940 was his meeting with Mahatma Gandhi.")। বিনোদবিহারী অবশ্য একথা নন্দলালের শিল্পকর্মে নবরূপ প্রকাশের দিক থেকে বলেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি নন্দলালের উপর গান্ধীজির প্রভাব অনেক আগে থেকে এবং সে-প্রভাবের চিহ্ন শিল্পী নন্দলালের আচরণেও ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

নন্দলালের জীবন আদ্যন্ত দেশপ্রেমে ভরপুর ছিল। স্বদেশী আন্দোলন তাঁর কৈশোর ও যৌবনের ঘটনা। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগের প্রমাণ নেই তবে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি ও সময় সময় সাহায্য দানের প্রমাণ আছে। ভগিনী নিবেদিতার প্রবল প্রভাবের দ্বারা নন্দলালের শিল্পী জীবন ও ব্যক্তি জীবন উভয়ই স্পন্দিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাব ও ভারতপ্রেম নানাধারায় প্রবাহিত হয়ে নন্দলালের জীবনে প্রবেশ করে তার একটি ধারা এসেছিল ভগিনী নিবেদিতার ভিতর দিয়ে। (সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর আর একজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর শিল্প ও ধর্মভাবনার দ্বারা নন্দলাল প্রভাবিত হয়েছিলেন।)। তারপর গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন এসে নন্দলালকে একটা নূতনভাবে প্রবল নাড়া দিল। এক্ষেত্রেও দেশপ্রেমের ডাকের ভিতর এমন একটা আধ্যাত্মিকভাবের স্ মেশানো ছিল যে তাকে ধর্মের ডাকও বলা যায়। স্বদেশী আন্দোলনে ভিতরেও এ ভাবটা ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীতে যেন ধর্ম ও সত্যাশ্রি দেশপ্রেম মূর্তি ধরে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। নন্দলাল অভিভূ হলেন, গান্ধী চরিত্রের মহিমায় তিনি বিমোহিত হলেন, জীবনান্ত পর্য বিমোহিত ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটাও তাঁকে অবিচলি থাকতে দেয়নি। নন্দলালের দ্বিতীয়বার অর্থাৎ পাকাপাকিভাবে ইণ্ডিয়া সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর কাজ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুল আহ্বা ছাড়া আর একটি শক্তির ক্রিয়াও ছিল। প্রথমবার ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে যোগ দেওয়ার কিছুকাল পরে গুরু অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে আবার কলকাতায় ডাকলেন। নন্দলাল শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসতে চাননি কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথকে এই বলে চাপ দিতে লাগলে যে নন্দলালকে না পেলে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। নন্দলাল কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ রেখে চলতে লাগলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহ শেষে শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন, আবার সোমবার কলকাতায় ফিরে আর্ট সোসাইটির কাজে লাগতেন। এব বছরের ওপর এভাবে চলল। পরে কিছু কথা ওঠে-নন্দলাল প্রতি সপ্তাহে শান্তিনিকেতনে যান, অনেক সময় সোমবার যথা সময়ে ফিরতে পারেন ন ইত্যাদি নিয়ে। নন্দলাল তখন সোসাইটির কাজ ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি শান্তিনিকেতনের কর্মী হতে মনস্থ করলেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পিছনে আরো একটি বড়ো প্রেরণা ছিল। নন্দলালের মন তখন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা আন্দোলিত। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট মুখ্যত সরকারী টাকায় চলত। সরকারী টাকায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে জীবিকা অর্জন তখন নন্দলালের একটুও ভালো লাগছিল না। প্রতিমা দেবী লিখেছেন: "তিনি যখন আমার মামার কাছ থেকে আর্ট স্কুল ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আসবার অনুমতি চাইলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে মত দিতে পারেন নি, পরে গুরুদেবের অনুরোধে রাজী হলেন। নন্দলালবাবু তখন গান্ধীজির স্বদেশী কাজের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই জন্যে গবর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের কাজ করবেন এটা তাঁর মনোমত হচ্ছিল না এবং স্বাধীন ভাবে গুরুদেবের প্রেরণায় নতুন আদর্শের মধ্যে তাঁর চিত্রকলার কাজ করবেন এই তাঁর ইচ্ছা। সেই কারণেই মনে হয় তিনি কলকাতা ছেড়ে আশ্রমের শান্তিময় জীবনে ফিরে আসবেন স্থির করলেন।"

কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসেও নন্দলালের মনের অস্থিরতা সম্পূর্ণ দূর হল না। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ-এ তাঁর মন তখনও আন্দোলিত। এমন সময় অন্যমনস্ক হবার একটা উপলক্ষ এবং সুযোগ উপস্থিত হল। সেই সময়ের কথা নন্দলাল লিখেছেন: "১৯২১ সাল। শান্তিনিকেতনে কাজ নিয়ে স্থির হয়ে বসার চেষ্টা করছি। কিন্তু সারা দেশময় রাজনৈতিক তোলপাড় চলছে। তাতে আমার মনও বেশ বিক্ষিপ্ত। এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ এল গোয়ালিয়র রাজ দরবার থেকে- ভগ্নোন্মুখ বাঘ গুহার ভিত্তি চিত্রগুলি কপি-করার আমন্ত্রণ। আমার তখনকার মানসিক অবস্থার পক্ষে কাজ এবং পারিপার্শ্বিকের এরূপ একটা সাময়িক পরিবর্তনের সুযোগলাভের খুবই প্রয়োজন ছিল।"

বাঘ গুহার ভিত্তিচিত্র কপি করার কাজ পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনজনিত মনের উত্তেজনা প্রশমিত হল। কিন্তু গান্ধীজির নেতৃ এবং নৈতিক আদর্শের প্রতি নন্দলালের শ্রদ্ধা অটুট রইল, কোনোদিন তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। শান্তিনিকেতনে যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গীভূত রচনাত্মক কর্মসূচির যথাসম্ভব রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নন্দলাল ছিলেন। সূতাকাটা, গ্রাম সাফাই, আর্ত সেবা এসব কাজের নন্দলাল উৎসাহী নায়ক ছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কতকগুলি চারিত্রিক গুণে গান্ধীজির সঙ্গে নন্দলালের মিল ছিল। কী আচার ব্যবহারে কী পারিপার্শ্বিক রচনায় পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে গান্ধীজির মতো নন্দলালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং সেজন্য স্বহস্তে সবরকম কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

াক্ষণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে সারা দেশ ঘুরে দেশের চেহারা
লোকজনের অভ্যাস আচার ব্যবহার দেখে গান্ধীজির মনে হয়েছিল
তে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রধান কাজ হবে
venger"-এর—ঝাড়ুদারের কাজ। শান্তিনিকেতনের সভা সমিতি
বাদিতে প্রবর্তিত আঙ্গিক সজ্জা আচার শৈলীর ভারতীয়তা ও
দর্যে গান্ধীজি মুগ্‌ধ ছিলেন কিন্তু শান্তিনিকেতনের sanitation সম্পর্কে
জির যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ছিল। গান্ধীজির প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শনের
ক বছর পরের কথা। কেউ একজন শান্তিনিকেতন দেখে যাবার পরে
কাছে শান্তিনিকেতনের অন্যান্য খবরের মধ্যে গান্ধীজি জানতে চান,
itation-এর অবস্থা কেমন দেখলে ? আগের চেয়ে কিছু উন্নতি
ছে ?" কবি চিত্রকর প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় পাই :
সময়ে আশ্রম সম্মার্জনার জন্য প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় ছুটি থাকত,
লমেয়েদের ঝুড়ি ঝাঁটা নিয়ে নিজেদের বাসগৃহের কাছাকাছি এলাকা
করতে হত সেদিন। অনেক সময় মাষ্টার মশাই [নন্দলাল]। সঙ্গে
তেন, হাতে কলমে কাজ শেখাতেন। বিশেষ করে গান্ধী পুণ্যাহে।
কসময়ে গান্ধীজির প্রেরণায় শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের
বাসী শিক্ষক ও ছাত্রগণ ভৃত্য নির্ভরতা পরিহার করে নিজেরা সব
করার নিয়ম চালু করেন। সেটি অধিককাল স্থায়ী হয়নি। সেই
চেষ্টার স্মরণে আশ্রমে প্রতিবছর ১০ই মার্চ 'গান্ধী পুণ্যাহ' পালিত
। সেদিন ভৃত্যদের ছুটি।] ও পৌষমেলার আগে আশ্রম পরিষ্কারের
জে তিনি হতেন স্বেচ্ছাসেবকদের দলপতি। মাথায় গামছা বেঁধে ঝুড়ি
দাল নিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজে তাঁর মতো অক্লান্ত পরিশ্রম
তে আমরাও পারতুম না।"

গান্ধীজির মতো রোগী সেবার আগ্রহ নন্দলালের ছিল। সাঁওতাল
মে দরিদ্রের কুটিরে রোগীর পথ্য নিয়ে নন্দলালকে অনেক সময় যেতে
খা যেত। সামনে কাউকে আর্ত বা বিপন্ন দেখলে নন্দলাল নিশ্চেষ্ট
কতে পারতেন না। নিজের বিপদের কথা মনে থাকতনা। এক প্রচণ্ড
ক্রমণকারী ক্রুদ্ধ মৌমাছির ঝাঁকের মধ্যে থেকে একটি বালককে
াবার জন্যে নন্দলালের আত্মভোলা দুঃসাহসের কাহিনী শান্তিনিকেতনে
সিদ্ধ হয়ে আছে।

অথচ নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা এই মানুষটির প্রকৃতিবিরুদ্ধ
ল। একটা দৃষ্টান্ত : শান্তিনিকেতনের নৃত্য নাটক অভিনয় প্রভৃতির
র্থক সাজসজ্জা যাঁর সৃষ্টি তাঁকে কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানে কখনো সামনে
খা যেত না। খুঁজলে হয়ত দর্শকদের মধ্যে পিছনের সারিতে তাঁর দেখা
লত। পারতপক্ষে কোনো সভার সামনের দিকে তিনি বসতেন না।
মজাদা লোকের কাছে যাঁর সান্নিধ্য স্পৃহনীয় ছিল তিনি নিজে অজ্ঞাত
খ্যাত সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেকে আদৌ বেমানান মনে করতেন
। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের যে "স্বাভাবিক আভিজাত্যের" কথা বলেছেন
টিকে তার আর একটি লক্ষণ বলা যায়। কোনো মানুষকে যেমন ছোটো
াবতেন না তেমনই অতি সামান্য ক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল না।
াধারণ মানুষের চোখে যা মূল্য হীন এমন সব ক্ষুদ্র "অকেজো" জিনিস
ড়িয়ে আনতেন। শিল্পীর হাত লাগবার পরে বোঝা যেত সেগুলির মধ্যে
ী ছিল যা আমরা আগে দেখতে পাইনি। ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎ সম্ভাবনার
ন্ধান পাওয়ার অর্ন্তদৃষ্টি নন্দলালের ছিল এবং তাকে প্রত্যক্ষে ফুটিয়ে
তালার কৌশলও তিনি জানতেন। এ-বিষয়েও স্ব স্ব ক্ষেত্রে গান্ধীজির
ঙ্গে নন্দলালের মিল ছিল।

ফ্যাসান বলেই কোনো জিনিসকে মানা বা আদর করা গান্ধীজির ধাতে
ছিল না। যে-বিষয়ে নিজে যতটুকু বুঝেছেন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত
তাতে অটল থাকতেন কিন্তু নিজের জ্ঞান বা অনুভূতির বাইরে কোনো
কথা বলতেন না। নন্দলালকে গান্ধীজি তৎকালের ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ
চিত্রশিল্পী বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে গান্ধীজির কি
শিল্পের গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা ছিল ? ছিল। অনেক কালচার
বিলাসীদের চেয়ে হয়ত বেশীই ছিল। গান্ধীজির নিজের কথা : ঈশ্বর
আমাকে শিল্প রচনার শক্তি দেননি কিন্তু শিল্পবোধ-"sense of art"
দিয়েছেন।

গান্ধীজির এই দাবির পক্ষে শিল্পী নন্দলালের সাক্ষ্য আছে। লখ্নৌ
শিল্প প্রদর্শনী সাজানোর ভার গান্ধীজি নন্দলালকে দেন। গান্ধীজির সঙ্গে
নন্দলালের ঘনিষ্ঠতার সেই থেকে শুরু। সেই সময়কার কথা নন্দলাল

ডাণ্ডি অভিযান (রঙিন টেম্পেরা, মার্চ ১৯৩০)

লিখেছেন : "লোকেরমুখে শুনতাম যে আর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে গান্ধীজির
বিশেষ উৎসাহ নেই। আমি দেখলাম এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। লক্ষ্নৌ
প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি ছবি তিনি অতি যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং
শিল্প সমাজদারের চোখ দিয়েই দেখেছেন।" গান্ধীজি প্রতিদিন প্রদর্শনীতে
আসতেন এবং অনেকক্ষণ থাকতেন। এক একটা ভাল ছবির সামনে
অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতেন। প্রদর্শনীর হলটির অলংকরণের উপাদান
ছিল অতি সাধারণ জিনিস-বাঁশ, খড়, কাঠ। গান্ধীজি চমৎকৃত। শিল্পীরা
অনুভব কবলেন তাঁদের উপাদানরুচি ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে গান্ধীজির
সম্পূর্ণ মনের মিল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নন্দলাল গান্ধীজির তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও
সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রদর্শনী
সাজানো সম্পূর্ণ হয়েছে, খুঁটিনাটি সব কিছু সারা। খোলার আগে গান্ধীজি
দেখতে এসেছেন। হলে টেবিলের নিচে একটা বালতি পড়ে রয়েছে,
কারো খেয়াল হয়নি। কিন্তু গান্ধীজির দৃষ্টি এড়ালো না, তিনি ঘরে ঢুকেই
বললেন, "বালতিটাতে কি হলের সৌন্দর্য একটু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না ?"
বলাবাহুল্য তৎক্ষণাৎ বালতিটাকে সরিয়ে ফেলা হল।

একবার সেবাগ্রামে গান্ধীজির সঙ্গে আর্ট সম্বন্ধে নন্দলালের যে
কথাবার্তা হয় তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ নন্দলাল রেখে গেছেন।
ওয়ার্ধার নিকটবর্তী গ্রামের একটি মন্দির মেরামত করিয়ে তাতে
নন্দলালকে দিয়ে কিছু ভিত্তিচিত্র আঁকিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা যমুনালাল
বাজাজের হয়। গান্ধীজি নন্দলালকে মন্দিরটি দেখে আসতে বলেন।
নন্দলাল মন্দিরটির অবস্থা দেখে এসে গান্ধীজিকে বলেন যে ওটি
মেরামতের অযোগ্য। নন্দলাল লিখেছেন : "এই আলোচনাকালে গান্ধীজি
বললেন, 'তাহলে একটা নতুন মন্দির তৈরী করলে কেমন হয় ?' আমার
মত সেই সময়ে যেমন ছিল আমি বললাম : 'অনেক মন্দিরতো রয়েছে,
আর নতুন তৈরী করা কেন,' আমার কথা শুনে গান্ধীজি বেশ কিছুক্ষণ
চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, 'মন্দির নতুন করে বারবার তুলতে

১৯৩০-৫০ দশকের সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তা বোধ হয় তিনি বিশেষ করে নন্দলালের হরিপুরা প্রাচীর চিত্র (Haripura posters) নামে খ্যাত ছবিগুলির কথা মনে করেই বলেছেন।

লখনৌ কংগ্রেস ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তার বেশ কিছু দিন আগেই নন্দলাল ওয়ার্ধায় গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে গান্ধীজি কী চান তার একটা ধারণা নিয়ে আসেন। তার পরে লখ্নৌ গিয়ে কংগ্রেসে জায়গা দেখে প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ করে বাইরে টিন দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা করে কলকাতায় ফিরে আসেন। সঙ্গে বিনোদবিহারী ও প্রভাত মোহন ছিলেন। কংগ্রেসের জন্য কাজে নন্দলাল কলাভবনের কয়েকজন ছাত্র-সহকর্মীকে সঙ্গে নিতেন। এঁদের মধ্যে বিনোদবিহারী, বিনায়ক মাসোজি, প্রভাতমোহন, বিশ্বরূপ বসু, অরুণাচলম পেরুমল, সুখময় মিত্র প্রভৃতি থাকতেন। সকলেরই প্রত্যেকবার নন্দলালের সঙ্গী হবার সুযোগ হত না। পেরুমল বোধহয় তিন কংগ্রেসেই নন্দলালের সঙ্গী ছিলেন। নন্দলালের হাত লাগায় লখ্নৌ কংগ্রেসের রূপসজ্জা যে ভারতীয় ভাব ও সুরটির প্রকাশ পেল আগের কোনো কংগ্রেসে জনসাধরণের তা অনুভবের সুযোগ হয় নি। প্রদর্শনীটিকে আদি যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় কারু ও চারু শিল্পের একটি ধারাবাহিক প্রদর্শনীর রূপ দেওয়া হয়। প্রদর্শনী সংগঠনের সমস্ত ভার নন্দলাল ও তাঁর সহকর্মীরা নেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা ধনীগৃহ, রাজরাজড়ার প্রাসাদ এবং অন্যান্য সংগ্রহশালা থেকে ছবি জোগাড় করা হয়। শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে অজন্তার রঙ্গিন কপি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শিল্পী যামিনী রায়কে দিয়ে অনেকগুলি বড়ো বড়ো পট আঁকিয়ে নেওয়া হয়। সেগুলি দিয়ে প্রদর্শনীর বাইরের দেয়াল ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। সমকালীন চিত্রকরদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদর, মুকুল দে, মাসোজি প্রভৃতির ছবি ছিল। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নমুনা বিশেষ সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় বহু ফটোগ্রাফ কালানুক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়।

এই শিল্প প্রদর্শনী সম্বন্ধে গান্ধীজির অসাধারণ ঔৎসুক্য ছিল এবং যাতে নন্দলালের কাজে কোনো প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে তিনি প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন। প্রায় প্রত্যহ গান্ধীজি প্রদর্শনীর কাজ দেখতে এসে অনেকক্ষণ থাকতেন এবং মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখতেন একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রদর্শনী খোলার দিন (২২ মার্চ) গান্ধীজির উদ্‌বোধনী বক্তৃতার এক অংশের (১৯৩৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলের "হরিজন" পত্রিকার ইংরেজি থেকে) অনুবাদ : "প্রদর্শনীর সকল বিভাগের, এমন কি একটি বিভাগেরও সম্যক্ বর্ণনা আপনারা আমার কাছ থেকে আশা করবেন না, আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। শুধু বলতে পারি যে আপনারা যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে প্রদর্শনী গৃহের দিকে তাকালেই তার ভিতরটার কিছু আভাস পাবেন। সামনে দেখুন কোনো বিজয় তোরণের সমারোহ নেই কিন্তু দেয়ালের অলঙ্করণ দেখুন কী সহজ সুন্দর কী সুকুমার। একাজ শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর এবং তাঁর সহকর্মীদের। তাঁরা চারু শিল্পের প্রতীকে আমাদের কারু শিল্পের সত্যকে আপনাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। আর আপনারা যখন ভিতরে আর্ট গ্যালারি দেখবেন তখন আমার মতো আপনাদেরও ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে কাটাতে ইচ্ছা করবে।"

পরের সপ্তাহের (১১ই এপ্রিলের) "হরিজন" এও প্রদর্শনী সম্পর্কে দীর্ঘ উল্লেখ ছিল, তাতেও নন্দলাল ও তাঁর সহকর্মীদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা ছিল।

১৯৩৫ সালে কোনো কংগ্রেস অধিবেশন হয় নি, ১৯৩৬ সালে দুবার হয়। মার্চ মাসে লখ্নৌতে হল, ডিসেম্বরে ফৈজপুরে। লখ্নৌতে প্রধানত শিল্প প্রদর্শনী সংগঠনের ভার নন্দলালের উপর ছিল। ফৈজপুরে শুধু প্রদর্শনী নয় কংগ্রেস নগর (ফৈজপুর কংগ্রেস নগরের "তিলকনগর" নামকরণ হয়) তৈরীর অনেকটা ভারও নন্দলালকে দিতে চাইলেন। গান্ধীজি নন্দলালকে লিখলেন, "কিছুটা পাবার পরে হৃদয় এখন সবটা পেতে চায়।" গান্ধীজি সেই চিঠিতেই নন্দলালকে সেবাগ্রামে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখলেন। উত্তরে নন্দলাল লিখলেন যে তিনি চিত্রকর মাত্র, তিনি তো স্থপতি নন, সুতরাং গান্ধীজি যে-কাজের ভার তাঁকে দিতে চান তার জন্য তিনি নিজেকে উপযুক্ত মনে করেন না। এর উত্তরে গান্ধীজি যা লিখলেন তার পরে নন্দলাল আর 'না' বলতে পারেন না। গান্ধীজি লিখেছিলেন, "আমি ওস্তাদ পিয়ানো-বাদক চাই না, যার আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এমন একজন বেহালাবাদক হলেই আমার চলবে।"

সেবাগ্রামে পৌছলে নন্দলালকে মহাদেব দেশাই গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে যে ঘরে নিয়ে বসালেন তার দুই কোণে দুই বিছানায় দুই রোগী, তারমধ্যে একজন হলেন মীরাবেন। গান্ধীজি তাঁদের ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন। নন্দলাল লিখেছেন : "আমি মহাত্মাজির বেশ কাছেই বসেছিলাম, তাহলেও তিনি আমাকে তাঁর আরো কাছে এগিয়ে বসতে বললেন এবং বললেন ঘরে রোগী আছে, কথাবার্তা নিচু গলায় চালাতে হবে।" গান্ধীজির সরল নিঃসংকোচ মনখোলা ভাষা, তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব নেই, ফাঁকে ফাঁকে আশ্চর্য সুন্দর মৃদু হাসি। নন্দলাল অনুভব করলেন তাঁরও যেন মনের কপাট খুলে গেছে, তিনিও নিঃসংকোচে মনের কথা সব বলতে পারেন, যেন বলার দরকারও নেই, গান্ধীজি যেন তার মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন, নন্দলালের বলার আগেই গান্ধীজি বুঝে নিয়ে উত্তর দিচ্ছেন। ওঁদের কথাবার্তা যখন চলছে একটি মার্কিন মিশনারী যুবক এলেন। মিশনারী যুবকটি গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর ধর্মবিশ্বাস কী এবং প্রশ্ন করলেন ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের ধর্ম কী রূপ নেবে বলে গান্ধীজি মনে করেন। গান্ধীজি রোগী দুটির দিকে ইশারা করে বললেন, "সেবা করাই আমার ধর্ম, ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

গান্ধীজি নন্দলালকে ফৈজপুর দেখে আসতে বললেন, মহাদেব দেশাইকে বললেন যমুনালাল বাজাজকে অনুরোধ করতে সঙ্গে একজন লোক দিয়ে নন্দলালের ফৈজপুর যাওয়া আসার ব্যবস্থা করে দিতে, ওদিককার কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীদের কাছে পরিচয় পত্রও নন্দলালকে দিলেন। নন্দলালকে বিশেষ করে বিনোবাজির সঙ্গে পরিচয় করতে বললেন। বললেন, "তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে আপনি খুব আনন্দ পাবেন। বিনোবা বিদ্বান, সাধু, ভক্ত। দেশের জন্যে সর্বত্যাগী।" ফৈজপুরে কংগ্রেসের প্রথম পল্লী পরিবেশে অধিবেশন। এটা গান্ধীজিরই পরিকল্পনা। গান্ধীজি কী চান নন্দলালকে বুঝিয়ে দিলেন : "এই কংগ্রেস বিশেষ করে গ্রামবাসীদের জন্যে, সহুরে মানুষের জন্যে নয়। এর পত্তন ও সন্নিবেশ এমন হওয়া চাই যাতে গ্রামের মানুষের মনের সঙ্গে মিল থাকে। গ্রামের কারিগুর এবং সহজপ্রাপ্য গ্রামীণ উপাদান দিয়ে এর নির্মাণ ও সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য কংগ্রেস কর্মীদের যার কাছে যে-সাহায্য চাইবেন পাবেন। আমি যা চাই ঠিক তা-ই আপনি সৃষ্টি করতে পারবেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

নন্দলাল গান্ধীজির আশা ষোল আনা পূর্ণ করেছিলেন। "তিলকনগর" সৃষ্টিতে নন্দলালের কৃতিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গান্ধীজি করেন। গান্ধীজির বক্তৃতার একাংশ (১৯৩৭ সালের ২রা জানুয়ারীর "হরিজন" পত্রিকার ইংরেজি থেকে অনুবাদ) : "এখানকার (তিলকনগরের) ব্যবস্থাদির কৃতিত্বের দাবি স্থপিত শ্রীযুক্ত মাহত্রের এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর। দুমাস আগে নন্দবাবু যখন আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন তখন আমি কী চাই তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে রূপদানের ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনি রূপদক্ষ শিল্পী, তাঁর সৃষ্টির শক্তি আছে। ঈশ্বর আমাকে শিল্পের বোধ (Sense of art) দিয়েছেন কিন্তু তাকে বাস্তবে প্রত্যক্ষীভূত করার হাতিয়ার দেন নি। ঈশ্বরের প্রসাদে নন্দবাবুর দুইই আছে। প্রদর্শনীর শিল্পকর্মের দিকটার সমস্ত ভার নিতে তিনি স্বীকৃত হলেন সেজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি এখানে এসে আস্তানা গেড়েছেন যাতে নিজে দেখে শুনে সব কিছু করতে ও করাতে পারেন। তার ফল দেখুন গোটা 'তিলকগনরটাই' একটা প্রদর্শনী হয়ে উঠেছে। আমি যেখানে প্রদর্শনীর দোর খুলতে যাচ্ছি প্রদর্শনী সেখান থেকেই শুরু হয় নি, শুরু হয়েছে 'তিলকনগর'-এর প্রবেশ দ্বার থেকে যার তোরণটি গ্রামীণ শিল্পের একটি চমৎকার সৃষ্টি। অবশ্য শ্রীযুক্ত মাহত্রেও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র যিনি সমগ্র নগর পরিকল্পনাটির রূপায়ণ সম্পূর্ণ করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আপনারা স্মরণ রাখবেন যে এখানে যা কিছু তৈরী হয়েছে সমস্তই স্থানীয় শ্রমিক ও স্থানীয় জিনিসপত্র দিয়ে নন্দবাবু করিয়েছেন।"

ফৈজপুরের বক্তৃতায় যে-ভাষায় এবং যে-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে গান্ধীজি নন্দলালের প্রতিভাকে অভিনন্দিত করেন ছাপা রিপোর্টে তার ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়। নন্দলালভক্ত যাঁরা সে দিন উপস্থিত ছিলেন এবং আজও

জীবিত আছেন তাঁদের সেদিনের পুলকের অনুভূতি এখনও অবিস্মৃত। তাঁদের ফৈজপুরের আরো দু একটা আনন্দ-স্মৃতির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। প্রদর্শনীর আলয়ের মাঝখানের খুঁটিটা উপর দিকে ছাউনি ফুঁড়ে উঠেছিল। তার গোড়ায় চারদিকের খানিকটা জমিতে নন্দলাল যথাকালে কিছু গম বুনে দিয়েছিলেন। প্রদর্শনী খোলার সময় যখন হল তখন খুঁটির চারদিকের সেই জায়গাটুকু একটি সুকুমার সবুজ আস্তরণে আবৃত হয়েছে। খুঁটির মাথার দিকে ছাউনিতে কিছুটা ফাঁক রাখা হয়েছিল। গান্ধীজি যখন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে এলেন তখন সেই সবুজ আস্তরণের উপর একফালি সোনালি রোদ এসে পড়েছে। গান্ধীজি চমৎকৃত।

ফৈজপুরে কংগ্রেস সভাপতিকে তিনজোড়া প্রকাণ্ড বলদে টানা "ঝুলা" দিয়ে তৈরী এক রথে বসিয়ে শোভাযাত্রা হয়। তার আগে একদিন গান্ধীজি এসে নন্দলালকে বললেন, "দেখুন, আমার নাতনীস্থানীয়া একটি বালিকার সঙ্গে আমি একটা বাজি রেখেছি। আমি বলেছি আমি দুদিনের মধ্যে আপনাকে দিয়ে ঠিক সভাপতির রথের মতো একটি রথ-তিনজোড়া বলদ শুদ্ধ- তৈরী করিয়ে কংগ্রেসের হাতার মধ্যে রাখব, লোকে দেখবে। অবশ্য বলদগুলো খেলনার বলদ হবে কিন্তু আকারে আসল বলদের মতো হওয়া চাই।" নন্দলাল ও তাঁর সহযোগীদের ক্ষমতায় গান্ধীজির বিশ্বাস অমূলক ছিল না। বালিকার সঙ্গে বাজিতে গান্ধীজি হারেননি।

কর্মযোগী গান্ধীজির অপরের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়ার ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল। তিনি নিজেকে রেহাই দিতেন না এবং অপরের কাছে যা চাইতেন তা কখনও নিজের জন্য নয়। কড়া টাস্কমাস্টারের আসল জোর ছিল তাঁর অনাসক্তির জোর। তার সঙ্গে ছিল sense of humour এবং কৌতুকপ্রিয়তা যার স্পর্শ ভরী কাজ হাল্কা করে দিতে পারত। গান্ধীজির কৌতুকপ্রিয়তার মধ্যে কখনো কখনো নির্দোষ দুষ্টামি অর্থাৎ "ক্ষ্যাপানো" বা tease করার দিকে একটু ঝোঁক যে থাকত না তা নয়। কিন্তু এত মিষ্টি এবং অসূয়াশূন্য যে তার পরিণাম ফল হাস্য ছাড়া কিছু হত না। গান্ধীজির কৌতুকপ্রিয়তার মজাদার অনেক উদাহরণ নন্দলালের মুখে শুনে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল গ্রন্থস্থ করেছেন।

পরের বার (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) গুজরাটে বরদৌলির নিকটবর্তী হরিপুরা গ্রামে কংগ্রেস হয়। তার তিন-চার মাস আগে বরদৌলিতে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রাথমিক আলোচনাদি করার জন্যে নন্দলাল আমন্ত্রণ পেলেন। নন্দলালের শরীর তখন অসুস্থ ছিল। টেলিগ্রামে গান্ধীজিকে অসুস্থতার কথা জানিয়ে মাপ চাইলেন। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে নন্দলাল বরদৌলিতে গান্ধীজির কাছে হাজির। গান্ধীজি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত। নন্দলাল গান্ধীজিকে জানালেন যে তিনি আশা করেননি অত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন। যেদিন সুস্থ বোধ করেছেন সেই দিনই বরদৌলি যাত্রা করেছেন। কয়েকদিন বরদৌলিতে থাকার পরে নন্দলাল হরিপুরায় গেলেন এবং চারপাশের লোকের বিশেষ করে কৃষকদের জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করলেন কারণ কংগ্রেস মণ্ডপাদি এমন করে সাজাতে হয় যাতে তার সঙ্গে চারপাশের মানুষের জীবনযাত্রার সুর মেলে। ফিরে এসে গান্ধীজিকে বললেন যে তিনি তাঁর কাজ সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়েছেন, কাজ শুরু করতে প্রস্তুত। গান্ধীজি বললেন, "না, আমি দেখছি আপনি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হননি, আপনার আরো কয়েকদিন বিশ্রাম আবশ্যক। আমার সঙ্গে সমুদ্রতীরে টিথলে চলুন না?" গান্ধীজি নিজে কিছুকাল পূর্ব থেকে অসুস্থ ছিলেন, রক্তের চাপ খুব বেড়েছিল। নন্দলাল গান্ধীজির সঙ্গে টিথলে গেলেন। টিথলে নন্দলালের কোনো কাজ ছিল না। গান্ধীজী বুঝলেন দিনগুলি নন্দলালের একঘেয়ে লাগছে। তিনি একদিন নন্দলালকে বললেন, "ছবি আঁকার জন্যে রঙ আনেননি বলে আপনি ছবি আঁকতে পারছেন না। মাটি দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন না।" নন্দলাল ভাবলেন কথাটা মন্দ নয়। তিনি বিভিন্ন রঙ-এর মাটি সংগ্রহ করে পোস্টকার্ডে পোস্টারের স্টাইলে অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন।

টিথলের একটি ঘটনার কথা নন্দলাল তাঁর একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন। সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসে একদিন জুতো খুলে রেখে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে যান। কিছু সময় পরে ফিরে এসে দেখেন গান্ধীজি তাঁর জুতো পাহারা দিচ্ছেন। নন্দলালকে বললেন, "এইখানে তোমার জুতো রয়েছে।" সামান্য ব্যাপারেও কী তীক্ষ্ন দৃষ্টি...পাছে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় বা অন্য কোনোভাবে খোয়া যায় তাই গান্ধীজি জুতো পাহারা দিচ্ছেন। নন্দলালের তো লজ্জায় মাথা হেঁট। তারপর অনেকদিন পর্যন্ত নন্দলাল জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

নন্দলাল বলেছেন, "আমাদের কাজের বিষয়ে [হরিপুরা কংগ্রেস সম্পর্কে] বাপুজীর নির্দেশ ছিল যে প্রদর্শনীর কাজ এমন হবে যে গ্রামবাসীরা রাস্তায় চলতে চলতে শিল্পীদের শিল্পকর্মের একটার পর একটা নমুনা দেখতে পাবে। তার মানে গোটা কংগ্রেস নগরটাকেই একটা প্রদর্শনীতে পরিণত করা আমাদের কাজ হবে। ৪০০ পট ধরনের ছবি এঁকে তাই দিয়ে আমরা কংগ্রেস নগরের তোরণগুলি এবং অন্য বাড়িগুলি সাজিয়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য ছবির একটা আলাদা প্রদর্শনীও ছিল। ছবিগুলি এমন করে সাজানো হয়েছিল যাতে একদৃষ্টিতে দর্শক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চারুকলা-সংস্কৃতির একটা ধারণা পেতে পারে। গান্ধীজি যখন হরিপুরায় এলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি এই বলে আমাকে সম্ভাষণ করলেন, "আচ্ছা, আপনি তাহলে এখনো বেঁচে আছেন।" এই শব্দ কটিতে আমার কাজের প্রতি তাঁর আদর ও আমার প্রতি প্রতি ভালোবাসার কী সুন্দর প্রকাশ।"

আর্টের ইতিহাসে হরিপুরা কংগ্রেস স্মরণীয় হয়ে থাকবে Haripura Posters বলে খ্যাত নন্দলালের ছবিগুলির জন্যে। এই ছবিগুলির সংখ্যা নিয়ে একটু গোলমাল বোধ হতে পারে। নন্দবাবু নিজে প্রায় "৪০০" খানা পটের কথা বলেছেন। সুতরাং "প্রায় ৪০০" খানা আঁকা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই মূল ছবির একাধিক কপিও ছিল যেগুলি নন্দলাল তাঁর ছাত্র-সহযোগীদের দিয়ে করিয়েছিলেন। কারণ সারা কংগ্রেস নগর সাজাতে অনেক ছবির প্রয়োজন ছিল। হরিপুরা পোস্টার সম্বন্ধে বিনোদবিহারীর একটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধে ছবির সংখ্যা ৬০ বলা হয়েছে। হতে পারে বিনোদবিহারী হরিপুরা পোস্টারের যে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের এবং নন্দলালের আর্টের পক্ষে তার যুগান্তকারী তাৎপর্যের কথা ভেবেছেন ঐ ৬০ খানা ছবিকে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন। World Window ম্যাগাজিনের (Vol. I No.3) নন্দলাল সংখ্যায় হরিপুরা পটের বিষয়বস্তুর উল্লেখ সহ ৮১ খানি ছবির একটি তালিকা আছে। ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ছবির বিষয়বস্তু আহৃত হয়েছে। ছবিগুলিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জীবনযাত্রার আভাষ পাওয়া যায়। গান বাজনার জগতের (বীণাবাদক, বাউল ইত্যাদি) ১৬ খানা ছবি ; কুস্তিগীর, শিকারী, ডোম, যোদ্ধা প্রভৃতির ৮ খানা ছবি, গৃহপরিবার সম্পর্কিত (প্রসাধন, মায়ের কোলে স্তন্যপায়ী শিশু ইত্যাদি) ১৬ খানা ছবি ; গ্রামীণ কারিগরি সম্পর্কিত (ছুতোর, কামার, সুতোকাটা, ধানভানা ইত্যাদি) ২২ খানা ছবি ; চিরাচরিত কাল্পনিক বিষয়ের (পরী, উড়ন্ত মানুষ ইত্যাদি) ৬খানা ছবি ; এবং জীবজন্তুর ১৩ খানা ছবি। চিত্রগুলিতে প্রাণবন্ত কর্ম এবং সুকুমার বৃত্তি উভয় দিকের (গ্রামীণ জীবনই বেশি প্রতিবিম্বিত হলেও ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরের) জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায়। ছবিগুলিতে নন্দলাল যেন গান্ধীজীর মনের কথা টেনে বার করে এঁকে তাকে রূপ দিয়েছেন। ছবিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বিদগ্ধ শিল্পরসিকরাও এগুলির মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধির খোরাক পাবেন। বিনোদবিহারী বলেছেন, "পরম্পরা ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার অনবদ্য সংযোগ এই চিত্ররাজির সর্বত্রই বর্তমান। শিল্পী কোনো একটি বিশেষ প্রাচীন বা নবীন শিল্প আদর্শকে স্বীকার না করে সাময়িক মতিমেজাজ অনুযায়ী এই চিত্রগুলি রচনা করেন। রূপে বর্ণে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন হয়েও হরিপুরা চিত্রাবলীর অন্তরে যে প্রবাহের ভাব সেটি রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণের পরিমাণ ও অবস্থানের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। বিষয়নিরপেক্ষ রূপরঙের প্রবাহ থাকার কারণেই এই ছবিগুলিকে নন্দলাল রচিত ভিত্তি চিত্রের সগোত্রীয় বলা যায়।"

আর্ট সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে গান্ধীজির কাছে নন্দলালের মত সর্বাগ্রগণ্য ছিল। পুরীতে একবার কংগ্রেস অধিবেশন হবার কথা উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত হয়নি। সেই সময়ে পুরী, কোণারক, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে উৎকীর্ণ কামকলার মূর্তিগুলি নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের দুশ্চিন্তা হয়। চিত্রগুলি দেখে বিদেশীরা কী ভাববে ? একদলের মত হল অস্তর দিয়ে ঢেকে চুনকাম করে দেওয়া হোক। একজন শিল্পপতি খরচ দিতেও রাজি ছিলেন। এঁরা গান্ধীজিকেও প্রায় সম্মত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি

ত্রিকালেশ্বর : বরোদায় কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র

ছিল। অবনীন্দ্রনাথ আর ভগিনী নিবেদিতার সনির্বন্ধ আদেশে তিনি যেতে বাধ্য হন। এই যাত্রার অভিজ্ঞতা কিন্তু জীবনভোর তিনি ভুলতে পারেননি। কারণ এই প্রথম এমন কাজ দেখলেন যা আকারে এবং সৃজনসংবেদে তার আগেকার অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল। এত বড়, এমন গভীর, সূক্ষ্ম কুশলী কাজ তিনি আগে দেখেননি। বস্তুত দেশীয় শিল্পকলার ভাষার সংকেত খনন করা তাঁর মতো যাঁদের একান্ত বাসনা, তাঁদের কাছে অজন্তা এক মহা অভিধান বলে মনে হবেই। তার ব্যাপ্তি, আকার, সূক্ষ্মতা জীবনবোধ এবং রুচির সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ- সবই অভিভূত করবে এতো অজানা নয়। লেডি হ্যারিংহামের মতো একজন শিল্পবোদ্ধা অজন্তার রহস্য নন্দলালের কাছে তুলে ধরলেন। তিনি ফ্রেস্কো এবং টেম্পেরার বিশেষত্ব তাঁকে বোঝালেন। টেম্পেরার বিষয় নন্দলাল অবশ্য ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে একটা ধারণা পেয়ে থাকবেন' এবং তিব্বতী টাংকা এবং ভারতীয় অণুচিত্র (মিনিয়েচার) আর্ট স্কুলে এবং ঠাকুরবাড়িতে তাঁর না দেখার কথা নয়। কিন্তু অজন্তায় গিয়ে তাঁর এই অভিজ্ঞতায় একটা বড় রকমের অদলবদল ঘটলো। এতদিনের অভ্যস্ত ধোয়া ছবির আবছা রোমেন্টিক আবেশ থেকে যেন সরে এলেন তিনি। তাঁর রঙ হল অধিকতর সদর্থক, রেখা হল আরও নিশ্চিত এবং রচনার গড়ন হল কাজের। ভিত্তিচিত্র আঁকার সুযোগ পেলেন এরও বহু পরে, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দেওয়াল চিত্রিত করার সময় (১৯১৭), যেন চেষ্টা করলেন, সাফল্যের বিষয় মাথা না ঘামিয়ে, অজন্তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে। এমন কি তাঁর ছোট কাজেও ভিত্তিচিত্রের বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে।

সকলেই এখন জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে জাপানে গিয়ে সেখানকার শিল্পকলার পরিবেশ দেখে একাধিক কারণে মুগ্ধ হন'। জাপানীদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিল্পের স্পর্শ যে রুচিশীল আবহের সৃষ্টি করেছে তা দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন। তিনি দেখে মোহিত হয়েছিলেন যে তাঁরা ব্যবহারিক জীবনে এবং শিল্প সৃষ্টিতে কেমন সমান ভাবে নন্দনবোধকে প্রয়োগ করতে পারেন। জাপানী শিল্পকলায় বক্তব্যের সংযম তাঁকে চমকে দিয়েছিল। ওঁদের সংক্ষিপ্ত এবং সরাসরি অভিব্যক্তির ধরন এবং অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ভ্রূকুটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। জাপানী ঘরোয়া যবনিকা (স্ক্রিন) এবং জড়ানো পটের অরূপণ বিস্তারের তিনি প্রশংসা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথকে তিনি লিখলেন, বাংলা কলমের শিল্পীরা জাপানীদের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারেন। নব্যরীতির ভারতীয় শিল্পীদের কাজ যে বড় ছোট, খুঁটিনাটির বর্ণনায় মশগুল, আখ্যানের ন্যাকড়ায় এমন করে জড়ানো যে দুর্বল হবারই কথা। জাপানীদের মতো বক্তব্যের স্বচ্ছতা এবং রেখার নিখুঁত্বের চর্চা করলে যে দোষমুক্ত হওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। জাপানী শিল্পকলার প্রশংসা করতে গিয়ে একথাও অবশ্য তিনি বলেছিলেন যে, ভারতশিল্পের নিজস্ব বিশেষত্ব, ভাব গভীরতা, বর্ণিকাভঙ্গের নাটকীয়তা এমন যে জাপানীরা তা না পারবে বুঝতে, না অনুকরণ করতে। সে যাই হোক তিনি চেয়েছিলেন যে তখনকার শিল্পকলা আন্দোলন যেন নতুন মোড় নেয়। তিনি এর উপমা দিয়েছিলেন কেয়ারী করা সাজানো বাগানের সঙ্গে। অথচ তাঁর মতে যেটা দরকার সেটা হল বনজঙ্গল আর জলঝড়। অণুচিত্রের আকার থেকে বেরিয়ে এলে বড় ছবির অভিঘাতের শক্তি যে বাড়বে সেটা তিনি জানতেন। সেইজন্যে তিনি আরাই কাম্পোকে ভারতে আনার ব্যবস্থা করলেন। তিনি কাম্পোকে তাইকানের দুটি বড় ছবি এবং কেনজানের একটা বড় ঘরোয়া যবনিকা নকল করে আনার অজুরা দিলেন। আরাই কাম্পো এগুলি এঁকে নিয়ে এলে এখানকার শিল্পীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কি বলছেন সেটা পরিষ্কার হবে[১১]। আরাই কাম্পোর সংস্পর্শে এসে যে নন্দলালের ছবির ধরন পালটে গেল এ নিয়ে আর তর্ক চলে না। তিনি যে তাঁর কাছে কয়েকটা আঁকার কৌশল তুলে নিলেন তাতো শুধু নয়। আরাই কাম্পো যেন রাসায়নিক অনুঘটকের কাজ করলেন। তিনি নন্দলালকে খুলে দেখালেন দূর প্রাচ্যের শিল্পাদর্শ। সমান্তরালভাবে আরাইকে যখন নন্দলাল ভারতীয় শিল্পকৃতি দেখাতে নিয়ে গেলেন (যেমন একসঙ্গে ওড়িশা যাওয়ার কথা ধরা যাক) তখন এমন নতুন সব দিক তাঁর চোখে পড়ল যা তার আগে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন এবং জাপান ভ্রমণের সময় নন্দলাল যা দেখলেন তা এবিষয়ে তাঁর ধারণাকে দৃঢ় করলো। এসব তাঁকে রোমেন্টিকতার রেশমী গুটির বুক চিরে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল। এর ঠিক পরের কাজগুলিতে তাঁর বক্তব্য মাপে ছোট হলেও তা খুবই পরিষ্কার, বর্ণক্রমে উদ্ভাসিত এবং ছন্দবন্ধনে সবল।

১৯২১-এ নন্দলাল সহকর্মীদের সঙ্গে বাঘগুহার ছবি নকল করতে গেলেন। দ্বিতীয়বার ভারতীয় গুহায়িত ভিত্তিচিত্রের পরম্পরার সংস্পর্শে এলেন। নিজের মতো করে বড় আকারের কিছু করার ইচ্ছা হল। এ বিষয় শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে কারিগরী দিকটা নিয়ে সংক্ষেপে লিখে পাঠালেন[১২]। এসব হাতেতুলিতে পরীক্ষা করে দেখতে বললেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে নিজেই তিনি পুরনো পাঠাগারের দেওয়ালে ছবি আঁকা শুরু করে দিলেন। বাঘ অজন্তার ফুললতাপাতার নকাশাকারী কাজ অবলম্বনে তিনি এসব কাজ করলেন। দেখাদেখি শিল্পকলাকে লোকচক্ষুর সামনে আনার জন্য একটা সাড়া পড়ে গেল শান্তিনিকেতনে দেওয়ালে, স্থাপত্যে এবং খোলা আকাশের তলায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কি-না, বা ইচ্ছায় কি-না বলতে পারি না। কিন্তু সাধারণ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শিল্পকলা সৃষ্টির পরিমাণ এই সময় থেকে শান্তিনিকেতনে বৃদ্ধি পেল। আকারে প্রকারে বড়, প্রতিমাকল্প স্পষ্ট এবং রেখা জোরালো হল।

১৯২২ সালে অধ্যক্ষ হিসাবে নন্দলালের ওপর কলাভবন নিয়ন্ত্রণের সব ক্ষমতা ন্যস্ত হল। ভারত শিল্পের মূল খোঁজার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হলেন। কারণ কলকাতার আর্ট ইস্কুলে হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথের এ কাজ করার আয়োজন সাধারণ্যের প্রতিকূলতায় ততদিনে পণ্ড হয়ে বসেছে। নন্দলাল সম্ভবত বুঝেছিলেন যে ভারতশিল্পের পরম্পরার প্রকরণের ভিত্তি, পদ্ধতি, দৃশ্যভাষা, কৌশল, রীতিনীতি, ব্যবহারিক বিশেষত্ব এবং পরিবেশগত সম্পর্ক নির্ণয় করে সেই আলোকে নতুন কাজ করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের জনক। হ্যাভেলের সমর্থন লাভ করে তিনি তার একটা জাতীয় চরিত্র দিতে পেরেছিলেন। এসবের দার্শনিক ভিত্তিটাও তাঁর রচনা। কি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ তিনি শিষ্যদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা যখন যুদ্ধ করছে তখন সমরকৌশল তাঁদের উদ্ভাবন করতে হবে। পরবর্তী ইতিহাস থেকে আমরা জানি এর জন্য প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি এ

নিষ্ঠা একমাত্র নন্দলালের ছিল। অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে কাজে লাগাবার জন্য (১৯১৯-২০ নাগাদ[১১]) যেভাবে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করেছিলেন তা দেখেই ধরা যায় যে ওঁরা দুজনে এটা প্রথম থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে স্থিতু হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে নন্দলাল তাঁর স্বপ্ন রূপায়ণের কাজে নেমে পড়লেন। এর জন্যে অন্যান্য অনেক ব্যবস্থার সঙ্গে তিনি কিছু লোকশিল্পী ডেকে আনলেন কাজের সাহায্য করার জন্যে। এঁদের মধ্যে একজন হলো জয়পুরী পঙ্কের ভিত্তিচিত্রকর নরসিং লাল মিস্ত্রী।

১৯২৭ সালে কলাভবনের ছাত্রদের নরসিং লাল দেখালেন পঙ্কের কাজ কিভাবে করতে হয়। এর কায়দাকানুন, রীতিপদ্ধতি- প্রক্রিয়া। কলাভবন তখন ছিল শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর ওপর তলায়। এর সামনের দেওয়ালে তিনি ভিত্তিচিত্র আঁকলেন পঙ্কের কাজ করে। এর কিছুটা পরম্পরাগত প্রতীকলেখ (মোটিফ) এবং অংশত নন্দলাল এবং সুরেন করের[১২] পরিকল্পনা অনুযায়ী করা। এতে কারিগরের হাতই বেশী, কারণ জয়পুরী পঙ্কের করণকৌশলের সীমার মধ্যে কি করা সম্ভব বা অসম্ভব তা শিল্পীদের তখন পর্যন্ত জানা ছিল না। তখন পর্যন্ত এর সঙ্গে নিজেদের পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু ফলাফল দেখে শিল্পীরা খুব খুশি। লাল, হলুদ, সবুজ এবং কালো সমতল বর্ণের অঞ্চলগুলি যেন বাড়ির ভারী স্থাপত্যের মধ্যে নাটকীয়ভাবে জ্বল জ্বল হয়ে উঠে পরিবেশটাকেই যেন ঝলমলিয়ে দিল। যেন জীয়নকাঠির স্পর্শে জ্যান্ত হল প্রস্তর কঠিন পুরী।

দেশী ভিত্তিচিত্র আঁকার কায়দাকানুনের পাঠ নেবার পর, নন্দলাল তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিচিত্রের কাজে মনোনিবেশ করেন ১৯২৮ সালে। সে বছরের শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসবের স্মারক রচনা করলেন খোলামেলা একটা দেওয়ালে। এটা অবশ্য ইতালীয় ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে করা। দেওয়ালের ভেজা পলেস্তরা অধিকতর অমসৃণ হওয়ার ফলে এতে প্রত্যেকটি বর্ণের ক্রম নিয়ে খেলা যায় বেশি। কারণ জয়পুরী রীতিতে রঙগুলি পেটাই করে, ছোবড়া আর নারকেল তেল দিয়ে পালিশ করে, দেওয়ালের স্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে চকচকে করা হয়। নন্দলাল বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যাতে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ এক জোড়া জবরদস্ত বলদে হাল জুতে চাষ করছেন। তাঁর চারপাশে গায়ক, নর্তক এবং ঢোল বাদকদের দল নেচে গেয়ে বাজিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছেন। এক্ষেত্রে নন্দলালের স্বাভাবিক আলতো স্পর্শ, জমাট এবং গতিশীল রৈখিক কারুকাজ এবং হালকা ও সজীব বর্ণের ধৌত প্রকরণ কাজে এল খুব। এর সূচারু জেল্লা চীনা জাপানী জড়ানো-পটের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারে। দুঃখের বিষয় মূল কাজটা এখন আর দৃষ্টিতে পড়ে না। কারণ পরবর্তীকালে মোটা দাগে অদক্ষ হাতে এর সংস্কার করতে গিয়ে কাজটি নষ্ট করা হয়েছে। যদি তাঁর জীবদ্দশায় সংস্কারের প্রয়োজন পড়তো তাহলে স্বয়ং নন্দলাল ইতস্তত করতেন, কারণ এমনই সূক্ষ্ম ছিল এই কাজ।

১৯৩৯-এ নরসিং লালের ডাক পড়ল আবার। পুরনো পাঠাগারের একতলায় নন্দলাল ভিত্তিচিত্র আঁকবেন বলে স্থির করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিজের হাতে এটা করলেন। নরসিং লাল শুধু প্রযুক্তির দিকটায় নন্দলালকে সাহায্য করলেন। ফলাফল হল অতি উত্তম। যে কজন সমকালীন ভারতীয় চিত্রকর জয়পুরী রীতিতে ভিত্তিচিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে নন্দলালের এই শিল্পকৃতি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। যদিও আকারে এ কাজটি তেমন বড় নয়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে নন্দলাল একটি গতি-সম্পন্ন রচনা খাড়া করে স্পষ্ট রঙে কাজ করার ক্ষমতা রাখতেন। ছোটোখাটো কাজেও বিশালতা আরোপ করতে পারতেন অনায়াসে।[১৩] এই কাজে রেখা এবং তুলি ব্যবহারে তাঁর সংযম এবং মুনশীয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। রঙীন অঞ্চলগুলিতে যেন প্রাণবায়ুর স্পর্শে বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সজীব হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রকল্পের মধ্যে খুব বড় কিছু এক্ষেত্রে করার ইচ্ছা বা চেষ্টা নেই। সমগ্র পটভূমিকে তিনি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলেছেন। খুব যে একটা ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে ভেঙ্গেছেন তা নয়। প্রতিমাকল্প এবং বিষয়ে গরমিল থাকলেও, টুকরো রঙীন কাপড় জুড়ে বিলিতী কাঁথার মতো রঙের জোরে, গোটা পটভূমি একটা সামগ্রিকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি বিভাগে তিনি কিন্তু খুব সূক্ষ্ম কাজ করেছেন। ওপরের অংশে অনুভূমিক-ভাবে তিনি "খোয়াই"-এর বিস্তার এঁকেছেন। অপর অংশে গরুর পাল এবং রাখাল। নীচের অংশে একটা ঝুরিওয়ালা বট গাছ লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যিখানে শ্রীচৈতন্যের জন্মবৃত্তান্ত। বাঁ দিকে দুটি দরজার ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের "শাপমোচন" এমন সুন্দর ভঙ্গিতে এবং এত সংযম নিয়ে এঁকেছেন যে সৈয়দ মুজতবা আলী তা দেখে স্তুতিপাঠ করে ফেলেছেন।[১৪] ডান দিকে শান্তিনিকেতনের নানা কার্যের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন। এরই এক কোণে নন্দলালকে নরসিং লাল এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় ছবি আঁকতে দেখা যায়। আকারে যত ছোটই হোক কাজটি অসামান্য। অনন্য মুনশীয়ানা মূল দ্রষ্টব্য স্থানটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং চারপাশটিতে বর্ণ এবং দেশ (স্পেশ) সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেছেন। ছবির দুই প্রান্তে তিনি মানুষী অবয়বকে তুলনায় বড় করে এঁকেছেন। একদিকে একটি নটীর সুঠাম দেহ এবং অন্যদিকে একটি সাঁওতাল মেয়েকে দেওয়াল চিত্রিত করতে দেখা যায়।

বিষয়ের এবং ছন্দের বৈপরীত্য সত্ত্বেও প্রত্যেকটি ভাগই খুব জীয়ন্ত। ভিত্তি চিত্রের সামগ্রিকতা বিচারে অতীব সজীব। এখনও রঙগুলি পঞ্চাশ বছর আগের মতোই উজ্জ্বল। নন্দলাল পরবর্তী ভিত্তিচিত্রগুলিতে এমন রঙ আর ব্যবহার করেননি। ব্যতিক্রম শুধু বলা যায় বোধহয় হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য আঁকা মণ্ডপসজ্জার ছবিগুলি (১৯৩৭)। সত্যি কথা বললে এই ছবিগুলিকে (তাঁর নিজের হাতে আঁকা তিরাশীটা) ভিত্তিচিত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। এগুলি মণ্ডপের দেওয়ালে পর পর লাগাবার জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। কাগজে এঁকে সস্তা বোর্ডে সাঁটা হলেও এগুলির ধরনটা ভিত্তিচিত্রের মতো, যদিও "পোস্টারই" এগুলিকে বলা হয়। পোস্টার বলতে যদি বক্তব্য প্রধান ছবি বোঝায় তাহলে এগুলি তো ঠিক তা নয়। মণ্ডপের স্থাপত্যের সঙ্গে মিলিয়ে ভারতীয় জীবনের নানা দিক নিয়ে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে। এ দেশের মানুষজন, শিল্পকলা, ধর্ম, শ্রমিক এবং বণিক, পশু-পাখি। শিল্পী নন্দলালের চূড়ান্ত সংবেদ এবং শক্তি এগুলিতে স্বপ্রকাশ। দক্ষতায় তিনি এক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। এ ক্ষেত্রে নন্দলাল পরম্পরাগত রূপবন্ধ এবং করণকৌশল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রাজ্ঞ দার্শনিকের মতো আদিরূপাত্মকভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে করে তাঁর দেখা জগৎটা সহজেই ছবির ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর ঢুলি, নাচনদার, দোকানদার পুরাতনী ছবির থেকে কুম্ভীলকবৃত্তির ফল তা কিন্তু মোটেও নয়। এ সব যে তাঁর স্বচক্ষে দেখা এটা বোঝা যায়। তাঁর বর্ণ এবং রেখা গভীর এবং সুন্দর কথা বলে ওঠে এবং ভঙ্গিমার অভিব্যক্তি এমনই ইঙ্গিতবহ যে বাস্তব "মুদ্রায়" রূপান্তরিত হয়। এই ছবিগুলির সোজাসুজি সরল প্রকাশভঙ্গিমা পরম্পরাগত শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কাজের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, যদিও নন্দলালের রূপবন্ধের বহুধা বৈচিত্র্য এবং নানাবিধ করণকৌশল নিঃসন্দেহে এঁদের চেয়ে বেশি। দুঃখের বিষয় হরিপুরা পোস্টারগুলি কংগ্রেস অধিবেশনের পরে প্রদর্শিত হয়নি বা এর সবগুলির প্রতিচিত্র ছাপা হয়নি। বোদ্ধা এবং সাধারণ উভয় শ্রেণীর দর্শকের হৃদয়হরণ করতে এগুলি পেরেছিল সেইসময়, সেকথা সকলেরই জানা। এর ফলে দেশঘরে তাঁর খ্যাতি রটে গেল। তিনি জাতীয় শিল্পী বলে পরিগণিত হলেন।

এর কিছু পরে বরোদার মহারাজা কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র আঁকার ভার নন্দলালের ওপর অর্পণ করলেন। বরোদা রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের দেহাবশেষ এবং অন্যান্য স্মরণচিহ্ন রাখার জন্য মন্দিরটি নির্মিত হচ্ছিল। বড়-ধরনের কাজ অবশ্যই। যতদূর অনুমান করা যায়, নন্দলালকে খুশি মতো কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। মন্দিরের বহিরঙ্গ, স্থাপত্য হিসাবে, আদৌ আহা মরি নয়, ভেতরটা যেন তার চেয়েও অসুবিধাজনক। এর সাধারণ মাপজোক, স্তম্ভ, জাফরি এবং দেওয়ালগুলো সস্তা রুচির। বিশেষত্বহীন বাড়িটা। বর্ণসংকর এমন স্থাপত্য এই শতাব্দীর গোড়ায় কিন্তু ভারত জুড়ে তৈরী হয়েছিল। কারণ পরম্পরাগত স্থপতি এবং রাজমিস্ত্রীরা নতুন কালের হাওয়ার দাপটে চুপ করে গিয়েছিলেন এবং ঐতিহ্যহীন ভূঁইফোড়রা এসব ব্যাপারে ছিল পুরোপুরি অজ্ঞ। যাই হোক, রুচিহীনতার পরিবেশে নন্দলাল যেন তাঁর ভিত্তিচিত্রগুলি গোপনে সন্তর্পণে চালান করলেন। লোকচক্ষুর আড়ালে ওপরের তলায় এগুলি রয়েছে। কাছ থেকে দেখতে গেলে একটু উদ্যোগী না হলে উপায় নেই। দারোয়ানকে বলে ওপরের তলার পাশের দরজা খুলিয়ে ঢুকে পড়তে হবে।

সাত বছরে চার বার এসে নন্দলাল কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্রগুলি করেছিলেন। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ১৯৩৯-এ প্রথমবার এসে আঁকেন "গঙ্গাবতরণ"। ১৯৪০-এ গিয়ে এর উল্টোদিকের দেওয়ালে তিনি আঁকেন মীরাবাঈয়ের জীবন এবং গান নিয়ে ছবি। তারপরের বারে ১৯৪৩-এ তিনি হাত দিলেন পূর্ব দিকের দেওয়ালে। বিষয় "নটীর পূজা"। এতে তিনি ১৯৪৩এ আঁকা চীনাভবনে তাঁর "নটীর পূজা" ভিত্তিচিত্রের কাছাকাছি থেকেছেন। ১৯৪৫-এ তিনি পশ্চিম দিকের দেওয়ালে মহাভারতের চারটি দৃশ্যের মালা গেঁথে একটি ভিত্তিচিত্র আঁকলেন। প্রথম ছবি "গঙ্গাবতরণ"। যেন মনে হয় প্রতীচ্যের গির্জার বেদিতে অঙ্কিত ছবির মতো মহিমময়, বা তিব্বতী টাংকার পরিবর্ধিত রূপ। এর মধ্যস্থলে অবস্থিত যেন রাজার খ্যাতিলাভের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য দিব্য ভাবসম্পন্ন দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে আছেন(একথা ভেবেই নন্দলাল ছবি এঁকেছিলেন তা বলছি না)। মীরাবাঈয়ের জীবন নিয়ে ছবিটি নানা রকম কৌতূহলোদ্দীপক খুঁটিনাটির সমাহারে অঙ্কিত। কিন্তু মূল দৃশ্যে মরমী গায়কদের সমাবেশ দেখা যায় এবং অনেকটাই কেন্দুলীর জয়দেব মেলার সঙ্গে মেলে। তৃতীয়টি আবার চীনাভবনের ভিত্তিচিত্রের সম্ভাব্য পালিশ করা সংস্করণ। প্রথম কাজটির দেওয়ালের ওপরিভাগের কারিকুরি এবং ছন্দিত সাবলীলতা এতে প্রায় নেই। কিন্তু আখ্যানভাগ এখানে আরও বেশি ধারালো। চতুর্থটিতে মহাভারতের চারটে উপাখ্যানকে একত্রে গ্রথিত করা হলেও, আলাদা এবং ধারাবাহিক নয়। মানবজীবনের নানারকম অভিজ্ঞতার নির্যাস মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, যুদ্ধ, পূর্বকথা স্মরণ, স্মৃতিতর্পণ। মানুষ যেদিকই বেছে নিক না কেন, যে দলে পড়ুক না কেন, তার আচরণ হবে ক্ষাত্রবীরের মতো। নন্দলাল এই ছবিটির মধ্যে মর্মস্পর্শী নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করে ছবিটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র ছ শ বর্গফুট দেওয়াল জুড়ে আঁকা এবং নন্দলালের জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। তাঁর অন্যান্য কাজের মতো এগুলি বৈশিষ্ট্যে অনন্য নয়। কিন্তু যেন মনে হয় অনুকূল পরিবেশ পেলে তিনি নিশ্চয়ই প্রতিভার অধিকতর সদ্ব্যবহার করতে পারতেন। নকশা সম্বন্ধে তাঁর নিখুঁত জ্ঞান, রূপবন্ধ বিষয়ে বলিয়সী প্রজ্ঞা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্কন ক্ষমতা এবং করণকৌশলের চমৎকারিত্ব নিয়ে তিনি এমন ভিত্তিচিত্র করতে অবশ্য পারতেন যা উপস্থাপনের গুণে এবং পারিবেশিক আনুকূল্যে ভারতীয় ভিত্তিচিত্রের শ্রেষ্ঠ কাজগুলির সমকক্ষ হতে পারতো। এমন একটা কাজ করার গোপন বাসনা তাঁর ছিল। সারনাথের মূলগন্ধকুঠি বিহারে এবং বেলুড়ের রামকৃষ্ণাশ্রমে[১৭] তিনি ভিত্তিচিত্র আঁকায় অনিচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু অন্যপক্ষের প্রতিক্রিয়া মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। সত্যি ব্যাপারটা দুঃখের। যাই হোক, শান্তিনিকেতনের পরিচিত পরিবেশে তিনি যেন আপন মনে কাজ করে আনন্দ পেতেন বেশি। এই কারণে চীনা ভবনের "নটীর পূজা" যেন বরোদা সংস্করণের চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ এবং বাস্তব। এখানে যেন ছবি দেওয়ালের অঙ্গাঙ্গী এবং রঙ যেন কেটে বসানো, যতদূর সম্ভব মুক্ত এবং আটপৌরে করার জন্যে, ন্যাকড়া এবং দাঁতনকাঠির মতো ডাল (আগা ছেঁচে বুরুশ তৈরী করে) তিনি ব্যবহার করেছেন। সমস্তটা মিশিয়ে পরিবেশের সঙ্গে কোথায় যেন খাপ খেয়ে গেছে। বুঝিবা এখানকার বাড়ি ঘরদোর গাছপালার মধ্যে এই পালা নামিয়েছিল স্থানীয় ছেলেমেয়েরা। সকল আশ্রমিকই এ ছবিতে এমন অন্তরঙ্গ মুহূর্ত খুঁজে পান বলেই এত আবিষ্ট হয়ে পড়েন। যদিও মুখর নয় ছবির নাটক, বরং মূকই বলা চলে, উজ্জ্বল নয় বর্ণ বা প্রতিমাকল্প এবং পটভূমির বিস্তার ঢিলেঢালা, তবুও এই কাজটি খুব প্রাণবন্ত এবং সূক্ষ্ম কাজগুলি নরম ও দুর্লভ জাতের।

নন্দলাল দেখিয়ে দিয়েছেন যে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে থাকলে তিনি কি করতে পারতেন, তা সে রবীন্দ্র নাট্যের প্রয়োজনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক, বা হোক না কেন আশ্রমের উৎসবের স্থান নির্বাচন ও সজ্জা বা ফৈজপুরে কিংবা হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের মস্ত প্রাঙ্গণ। আশ্রমের বাড়িঘর চিত্র বিচিত্র করার কাজে তিনি যখন সহকর্মী এবং ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে নেমেছেন তখনও তাঁর এ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। যথা "শ্যামলী" এবং "কালো বাড়ি"[১৮] চিত্রণে। প্রত্যেকটিকে তিনি হৃদয়স্পর্শী এবং স্মরণীয় দৃশ্যশিল্পে সাজিয়েছেন। আধুনিক ভারতীয় শিল্পে তাঁর অবদান তাই এমন অনন্য, দ্বিতীয় রহিত। তিনি সম্ভবত একমাত্র শিল্পী যিনি শিল্পকলা এবং পরিবেশের মধ্যে এমন একটা অঙ্গাঙ্গী, পরিপূরক, জীবন্ত এবং গতিশীল মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও তিনি এমন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে বিশিষ্ট শিল্পীদের করা যেসব ভিত্তিচিত্র রয়েছে, যেমন ধরা যাক বিনোদবিহারীর করা ভিত্তিচিত্র এবং রামকিংকরের করা খোলা আকাশের নীচে ভাস্কর্য যা এখানকার জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে একাকার। নিশ্চয় তার উৎস নন্দলাল। তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতান্তর এবং রুচির ব্যাপারে ছোট ছোট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মূল কৃতিত্ব যে নন্দলালের প্রাপ্য, আজ আর বোধহয় কেউই একথা অস্বীকার করবেন না। সমকালীন ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে এখন যে অনেকেই শিল্পকলা এবং পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন সেটা অতীব সুখের কথা। কিন্তু পথিকৃৎ নন্দলালের কাছে এঁদের ঋণও যে অপরিশোধ্য তাও অবশ্য স্বীকার্য।

নির্দেশিকা

১ কলাভবনে বক্তৃতাটি দেন ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ অবনীন্দ্র জন্মোৎসবে। পরে তা "দেশে" ছাপা হয়েছিল।
২ শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ প্রকাশিত এ্যালবামে নন্দলালের জীবনী অংশটুকু দ্রষ্টব্য, পৃ ১৪, ১৯৫৬।
৩ বিনোদবিহারীর "আধুনিক শিল্পশিক্ষা", বিশ্বভারতী ১৯৭২, পৃঃ ৫৬।
৪ দ্রঃ "বাঙ্গলার ব্রত" অবনীন্দ্রনাথ।
৫ অন্যান্য কাজের ফাঁকে আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথ "কচ ও দেবযানী" অবলম্বনে একটি ভিত্তিচিত্র আঁকেন।
৬ দ্রষ্টব্য "মিডিয়াভেল সিনহালিস আর্ট," আনন্দ কুমারস্বামীর ভূমিকা।
৭ নন্দলালের জীবনী অংশ, আশ্রমিক সংঘের এ্যালবাম, ১৯৫৬।
৮ ঈশ্বরীপ্রসাদ পরম্পরাগত অণুচিত্রকর, পাটনাই কলমচী। নন্দলাল তিব্বতী টাংকা, মুঘল রাজপুত অণুচিত্র যে আর্ট স্কুলের দেওয়ালে ঝোলানো থাকতো তা বলেছেন। ঠাকুর বাড়ির সংগ্রহে এমন কাজ ছিল।
৯ রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী ১৯৬১, পৃঃ ৫৬৪, ৫৬৫ দ্রঃ।
১০ ঐ
১১ ঐ
১২ "ভারতীয় শিক্ষায় কলাভবন", ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, দেশ বিনোদন ১৯৭৯, পৃঃ ৪৫ দ্রঃ।
১৩ অবনীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি দ্রঃ, পরিশিষ্ট "আধুনিক শিল্পশিক্ষা", বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।
১৪ দ্রঃ "ফ্রেসকো পেনটিং এ্যাণ্ড শান্তিনিকেতন", জয়ন্তীলাল পারিখ, বিশ্বভারতী নিউজ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৩৩।
১৬ দ্রঃ কবিগুরু ও নন্দলাল, সৈয়দ মজুতবা আলীর রচনাবলী- ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২।
১৭ কানাই সামন্ত রচিত "জীবনের রূপরেখা"
১৮ শ্যামলী (উত্তরায়ণের বাড়িগুলির একটি। গান্ধী এলে এখানে উঠতেন), "কালো বাড়ি"-তে (কলাভবনের উচ্চ ক্লাসের ছাত্রদের আবাস)। দুটি বাড়িই মাটির তৈরী। বাইরেটা আলকাতরা রাঙানো। বাড়িগুলো এবং গৃহসজ্জা খুবই রীতিবহির্ভূত হলেও, করণকৌশল কিন্তু পরম্পরাগত।

নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যের কিছু স্মৃতি

চিন্তামণি কর

যে কোন সার্থক শিল্পী ও তাঁর রচনা প্রায় অভিন্ন বলা চলে। শিল্পীর মৃত্যুর পর তাঁর শিল্পরচনা যতকাল নষ্ট না হয় ততকাল তাতে নিহিত শিল্পীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব ও অভিব্যক্তি, তাঁর মানবীয় সত্তাকে বিলীন হ'তে দেয়না। শিল্পীর পরিচিত জনের কাছে তাঁর চাক্ষুষ স্বরূপ যেভাবে তাঁদের স্মৃতির পটে আঁকা থাকে, পরে সেই ছবির রূপ অন্তত আংশিক ভাবেও থেকে যায়। তাঁদের মুখের কথায় বা লেখার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

শিল্পীচার্য নন্দলাল বসুর জন্ম হয়েছিল ১৮৮২ সালের ৩রা ডিসেম্বর। তাঁর গুণমুগ্ধ বহুজন তাঁর শতায়ু কামনা করলেও শিল্পীর জীবনান্ত ঘটেছিল ১৯৬৬ সালের ১৬ই এপ্রিল। সতেরো বছরের জন্য শতায়ু অপূর্ণ হলেও তাঁর জন্মশত বর্ষে এমন বহুজনই আছেন যাঁরা শিল্পীর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের হৃদয় থেকে নন্দলালবাবুর স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি। শিল্পী সম্পর্কে তাঁদেরই রেখে যাওয়া কাহিনীর টুকরোগুলি ভবিষ্যতের নন্দলাল জিজ্ঞাসুর কাছে মানুষটির রূপালেখ্যের কিছুটা উদ্ভাসিত করতে থাকবে।

নন্দলাল বসুর সঙ্গে আমার প্রথমবার দেখা হয়েছিল ১৯৩০ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের ভবনে। তখন সেখানে আমি ছিলাম শিল্পশিক্ষার্থী। সোসাইটির আর্ট স্কুলে একদিন উপস্থিত হয়ে দেখলাম আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় সতরঞ্চীতে বসে আর একজনের সঙ্গে মশগুল হয়ে আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই বল্লেন, "নন্দদা এই আমার ছাত্র চিন্তামণি।"

মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চিত্র প্রতিলিপি মারফৎ শিল্পী নন্দলালের পরিচিতি, তখন শুধু শিল্পী ও শিল্পরসিক মহলে নয়, দেশের কৃষ্টিবানদের কাছেও ছড়িয়ে পড়েছে। এমন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় এক তরুণ ছাত্রের কাছে সহসা এক তোলপাড় করা ঘটনা। আমার করা ছবি দেখতে চাইলেন। অতি অপরিণত ছবি ছাড়া কি আর দেখাব ? তবু উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, "নিষ্ঠায় ছবি এঁকে গেলে আনন্দ পাবার ও আনন্দ দেবার মত ছবি তুমি একদিন নিশ্চয়ই করতে পারবে।"

১৯৩৫ সালে আমি সিউড়িতে বীরভূম জিলা স্কুলে শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে গেলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলাম। শান্তিনিকেতনে যাবার কথা লিখলেই বিচিত্র পোস্টকার্ড-এ জবাব আসতো তাঁর সাদর আহ্বান সতর্ক বাণীসহ "সঙ্গে মশারি ও বিছানা আনিতে ভুলিও না"।

ভুবনডাঙ্গার লাল ধুলোয় ভূষিত হয়ে খালিহাতে উপস্থিত হলে বলতেন "একবার মাটিতে শুয়ে এখানকার মশার কামড় খেয়ে সাজা পেলে দ্বিতীয়বার আর মশারি আনতে ভুল হবেনা"।

কিন্তু প্রতিবারই তাঁর এই আদেশ অমান্য করলে ও রাত্রে শোবার বিছানা ও মশারির বন্দোবস্ত ঠিকমত হয়ে যেত।

নন্দলালের ছাত্রজীবনে করা নৃত্যরতাদের 'বা-রিলিফ' (প্লাস্টার)

তাঁর অপার স্নেহ কিভাবে তাঁর ছাত্রদের অভিভূত করতো তা তাঁদের অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন আমি তাঁর সতীর্থের ছাত্র হলেও তাঁর স্নেহ কিছু কম পাইনি।

নন্দলাল বসু তাঁর ছাত্রজীবনে গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় "পঞ্চপাণ্ডবের" শুধু একজনই নয়, ছিলেন তাঁর অতি নিকটতম শিষ্য ও সতীর্থ সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। আমার মাস্টারমশাই ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ছাত্রজীবনের অনেক গল্প শুনেছি এবং নন্দবাবু সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

তখন পার্সি ব্রাউন আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁর নিয়মতান্ত্রিক কড়া শাসনে ছাত্রকুল রীতিমত ত্রস্ত থাকতেন। তাঁর আদেশ অনুযায়ী ছাত্ররা ঠিক নিদ্ধারিত সময়ে স্কুলে হাজির হ'তে বাধ্য হতেন। কিন্তু উপাধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথের আপন ছাত্রদের প্রায়ই ঠিক সময়ে স্কুলে হাজির হওয়ার ব্যতিক্রম ঘটতো। একদিন তাঁরা স্কুলে এসে দেখেন আসবার দরজাটি বন্ধ। তাঁদের নেতৃস্থানীয় নন্দলাল রেগে বল্লেন "সাহেব যদি ভেবে থাকেন যে দরজা বন্ধ করে আমাদের প্রবেশ অধিকার কেড়ে নেবেন এস তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করি। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে একত্রে কাঁধ লাগিয়ে মারো ধাককা—হেইয়ো"। ধাককা লাগামাত্র দরজার কপাট দুটি ছিটকে খুলে গেল কারণ অর্গলবদ্ধ ছিলনা। শুধু ভেজান ছিল। সেই মুহূর্তে তাঁরা দেখলেন সামনে পার্সি ব্রাউন দণ্ডায়মান। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছাত্ররা এক দৌড়ে অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসের ঘরে গিয়ে তাঁদের অপরাধের শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ক্ষণকাল পরে অধ্যক্ষের আরদালি অবনীন্দ্রনাথকে এসে জানাল "সাহেব আপকো সেলাম ভেজা"। অবনীন্দ্রনাথ পার্সি ব্রাউনের অফিসে গেলে ছাত্ররা হিসাব করছিলেন প্রাপ্য দণ্ডটা কত কঠিন হ'তে পারে।

তিনি ফিরে এসে বল্লেন "ও নন্দ ও দুর্গেশ তোমরা কি কাণ্ড করেছো! সাহেব তো রেগে আগুন"।

নন্দলাল কৈফিয়তের গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করতেই তিনি বল্লেন "আর ব্যাখ্যা করতে হবেনা সব শুনেছি ব্রাউনের কাছে। তবে এযাত্রা বেঁচে গিয়েছো। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম যে তোমরা স্কুলে আসতে ইচ্ছাকৃত দেরী করো না বা কাজে ফাঁকি দিতে চাওনা।অন্য ছাত্রদের থেকে তোমাদের কাজের ধারা অন্যরকম। সকালে ওঠে বাড়িতে ছবিতে "ওয়াস" দিয়ে কাগজ শুকিয়ে ওদের ক্লাসে আসতে দেরী হ'য়ে যায়। এই শুনে সাহেব তোমাদের দেরী করে আসা মাপ করে দিয়েছেন এবং এখন থেকে তোমাদের দেরী করে আসা মঞ্জুর"।

নন্দলাল বসুর পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবে গুরুর আশীর্ব্বাদ পেয়েছিলেন "আমি এই কামনা করছি যে তোমাকে পেয়ে আমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ পেয়ে যাও তুমি তোমার সহপাঠী ও তোমার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে"। শিল্পীর জীবনে গুরুর এই আশীর্বাণী পরিপূর্ণতা পেয়েছিল সর্বতোভাবে। গুরুর মতই নন্দলাল চিহ্নিত হয়েছেন তাঁর বহু সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বে ও প্রতিষ্ঠায়। অবনীন্দ্র শিষ্যদের মধ্যে নব্যবঙ্গীয় শিল্পকলার প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আচার্য নন্দলালের অবদান সর্বাধিক বলা চলে। সময়ের ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাবে বৰ্দ্ধিত, আজীবন নন্দলাল বসুর স্বাদেশিকতার ধারণার ও অভ্যাস-এর ভিত্তি ছিল রীতিমত স্থাণু কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের দ্বিধা থাকলেও আপন ছাত্রছাত্রীদের শিল্প প্রচেষ্টায় বিদেশী ধারা ও শৈলীর অনুশীলন বা অনুসরণে তাঁর বিবাদ ছিলনা।

রামকিঙ্কর বলতেন "আমার অয়েলপেন্টিং-এ ছবি আঁকা মাস্টারমশাই মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু আবার চুপি চুপি দেখতে আসতেন কি আঁকছি-এবং ধরা পড়ে গেলে বিনা মন্তব্যে বার কয়েক "হুঁ" ছেড়ে চলে যেতেন। তার মানে তাঁর পছন্দ কি অপছন্দ হোল, তা বোঝা যেতনা"।

পরশাসন থেকে স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামজাত স্বদেশীয়ানার জাত্যাভিমান তাঁর শিল্পসৃজন ভাবনা ও ক্রিয়াকে বিশেষভাবে অভিভূত রেখেছিল চিরকাল। মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্যে আসায় আরো প্রগাঢ় হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া।

একটি ঘটনায় একবার মনে হয়েছিল, প্রত্যাশিত স্বদেশীয়ানার মান থেকে পদস্খলনের অপরাধে বোধহয় তাঁর বিরাগভাজন হয়ে পড়লাম। বেশ কয়েক বৎসর লণ্ডন প্রবাসের পর আগে না দেখা স্বাধীন ভারতে এলাম ১৯৫৩ সালে। কলকাতায় সরকারি আর্ট কলেজে তখন নন্দলাল বসুর শিল্পকলার একটি প্রদর্শনী চলছিল এবং সেদিন আর্টকলেজে রমেনদার (রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। দেখল তিনি নন্দবাবুর সঙ্গে প্রদর্শনী হল থেকে বেরিয়ে আসছেন।

আচার্য নন্দলালকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি প্রায় রূঢ়স্বরে আ দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন "রমেন এ কে?"

কয়েক বৎসরের ব্যবধানে আমার চেহারার এমন কোনো পরিবর্ত হয়নি যে তিনি দেখলে চিনবেন না, কাজেই শুধু আমি যে এ প্রশ্নে হতবা তাই নয় হতবম্ব রমেনদাও বলে উঠলেন "সেকি মাস্টার মশ চিন্তামণিকে চিনতে পারছেন না!" সেই একই স্বরে তাঁর জবাব এ "চিনব কি করে ও তো এখন সাহেব হয়ে গেছে"।

ভাবলাম আমার পরা সাহেবী পোশাকের জন্যই বোধহয় পেলাম তা ভর্ৎসনা। কিন্তু ভৎসনার আসল কারণ জানা গেল বহু বৎসর পরে। তা মহাপ্রয়াণের বোধ হয় বছর দুই আগে কলকাতায় অসুস্থ থাকাকালীন সংবাদ পেয়ে দেখা করতে গেলাম। জন্মতারিখের দিন থাকায় কিছু ফু নিয়ে যাবার সংকল্পে হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে শান্তিনিকেতনে একদি ফুলের কথা বলতে তিনি বলেছিলেন "দ্যাখো অনেকরকমের ফুল এ পরিতৃপ্ত হওয়া যায় কিন্তু যে ফুলকে আমি সবচেয়ে ভালবাসি তাকে তুলিতে কালিতে আঁকতে আমার সংকোচ এসে যায়"।

কি ফুল সে? জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন "আমি একেবারে মনেপ্রাণে মুগ্ধ হই গোলাপ দেখে বিশেষ করে রক্তগোলাপ"।

ভাগ্যক্রমে পেয়েছিলাম একগুচ্ছ সদ্যপ্রস্ফুটিত রক্তলাল গোলাপ এবং তাই নিয়ে তাঁর বাসায় পৌঁছে স্মরণে এল তাঁর সাহেবী পোশাকের প্রতি ঘৃণার প্রতিক্রিয়া আর এসেছি সেই বেশে। তাঁর কাছে যাবার আগেই পু বিশ্বরূপ জানালেন "ডাক্তারের আদেশ সাক্ষাৎকারীদের কেউ দু'মিনিটের বেশী থাকবে না এবং বাবাকে কথা বলাবেন না"।

ফুল রেখে প্রণাম করতেই হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন "সেই ফুলের কথা আজও মনে রেখেছো"।

ভাবলাম তাঁর প্রিয় ফুলের অর্ঘে বোধহয় আমার সাহেবী পোশাকের অপরাধ এবার মাপ হয়ে গেল। স্ত্রী ও পুত্রের একযোগে কথা না বলার ইঙ্গিত উপেক্ষা করে তিনি বল্লেন "বহুকাল ধরে প্রশ্ন জমা হয়ে আছে আজকে না বললে হয়ত আর বলার সময় হবেনা। আমাদের ধারার আপনজন ও উত্তরাধিকারী শিল্পী হিসাবে তোমাকে দেখে এসেছি কিন্তু সে ধারা শুধু নয়, ছবি আঁকাও একেবারে ছেড়ে দিয়ে আমাদের নিরাশ করলে কেন!"

এ প্রশ্নের জবাবে বললাম "মুখ্যত ভাস্কর্য শিখতে গিয়েছিলাম ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর স্কুলে। কিন্তু বেশ কিছুকাল কাজ করে যখন বুঝলাম যে গিরিধারী মহাপাত্র মহাশয়ের শিক্ষাদেবার পদ্ধতিতে আমাকে শিক্ষানবিশী করতে দশবছর কিংবা তার বেশী সময় দিতে হবে তখনই উপায়ান্তর না দেখে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের গ্রাহ্য শিষ্য হয়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করেছিলাম। পরে ইয়োরোপে পারী সহরে গিয়ে যখন ভাস্কর্য শিখবার অবাধ সুযোগ পেয়ে গেলাম তখন থেকেই আমার ঈপ্সিত শৈলীকে অবলম্বন করেছি। আপনি কি মনে করেন তাতে আমার অপরাধ হয়েছে?"

আমার কৈফিয়ৎ শুনে আচার্য নন্দলাল হেসে বললেন, "আরে কি আশ্চর্য! এ ব্যাপারটা প্রায় আমারই দশার মত। আমিও গিয়েছিলাম আর্টস্কুলে ভাস্কর হবার বাসনা নিয়ে। কিন্তু তখন ওখানে ভাস্কর্য শেখাবার মত উপযুক্ত লোক কোথায়? ভাগ্যক্রমে এমন গুরু পেয়ে গেলাম যিনি শিখিয়ে দিলেন তুলিকে ছেনি করে ছবিতে ভাস্কর্য রচনার সাধ মেটানর কারিগরি। দেখতে পেয়েছো কিনা জানিনা—আমার প্রথম পর্বের ছবিতে তুলি রচনা করে গিয়েছে ভাস্কর্য রূপায়ণ।"

রামকিঙ্কর রচিত সাঁওতাল পরিবার মূর্তিগুচ্ছে পুরুষ মূর্তিটির মাথা এবং ছাত্রাবস্থায় গড়া নৃত্যোন্মত্ত নরনারীর সুষমাবেশিত 'বা-রিলিফ' (সরকারী আর্টকলেজে সংরক্ষিত) আচার্য নন্দলালের অনাস্বাদিত ভাস্কর্য স্পৃহার অভিজ্ঞান কণামাত্র।

নন্দলাল বসুর চিত্রসম্ভারের অবদান মহিমায় গৌরবান্বিত ভারত ভাগ্য বিড়ম্বনায় হয়ত হারিয়েছে অসম্পাদিত ও অকীর্তিত এক বিরাট ভাস্করকে।

নন্দলাল বসু

নীরদ মজুমদার

নন্দলাল বসু মানুষটি কত কাছের ছিলেন, অথচ সেইসঙ্গে কত দূরের—অনেক দূরের। ১৯২০ সাল অবধি নন্দবাবু যুক্ত ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ প্রথিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়াণ্টাল আরট স্কুলের সঙ্গে। এই স্কুলে আমি ভর্তি হই ১৯২৯ সালে। আমার বয়স তখন তের। নন্দবাবু ততদিনে চলে গেছেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতন এমন কিছু দূরে নয়। তবু ওঁর সঙ্গে পরিচয় হতে আমার কয়েক বছর লেগেছে। যতদূর মনে পড়ে ওঁকে প্রথম দেখি তিরিশ দশকের গোড়ায়। তখনও আমি শ্রীকালীপদ ঘোষালের কাছে রঙ, তুলি, রেখার বিষয় নবিশী করছি। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আরটের স্কুলটা সমবায় ম্যানসনে ছিল। ইস্কুল বলতে এক মস্ত হল ঘর। ঠাকুরবাড়ির সব ভারি সৌখিন আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। ইস্কুলের আলমারীতে ছিল ঠাসা বই। চীন, জাপান, এশিয়া, ইয়োরোপ, মিসর, গ্রীসের ললিতকলা বিষয়ক কিতাব। দুনিয়ার আর্ট বই। কিছু বই ছিল আবার দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য। অবনবাবু ও গগনবাবুর সংগৃহীত। একধারে টেবিল চেয়ারে ঘেরা অফিস। আর হলঘরের কোণায় কোণায় ছোট ছোট ডেস্ক। মাটিতে বসেই ছাত্ররা চিত্র কর্মে লিপ্ত হতো। ওপাশে লম্বা চুল, গলায় কণ্ঠিপরিহিত পরম বৈষ্ণব শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ছবি এঁকে চলেছেন নিজের মনে। অন্য কোণে ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ, ও অনবদ্য মূর্তিকার শ্রীগিরিধারী মহাপাত্র মহাশয় কাঠ বা পাথর খোদাই করায় নিমগ্ন। মস্ত মস্ত জানালাগুলোর বাইরে টানা লম্বা বারান্দায় পাত্রশোভন টবের ফুল গাছ। কি সুন্দর পরিবেশ। গুরু গম্ভীর ও গির্জার মত স্তব্ধ। ভাবলে এখনও মন কেমন করে। ইচ্ছে করে ফিরে পেতে, আবার ছাত্র অবস্থার সেই সব দিন।

কিন্তু ঐ ঘরই মাঝে মাঝে চঞ্চল ও হতচকিত হয়ে উঠতো। দেশের মনীষী ব্যক্তি ও জগৎ বরেণ্য মানুষের আবির্ভাবে। কত নাম করবো? আবার কখনও কখনও সন্ত্রস্ত ও তটস্থ হয়ে উঠতো সকলে যখন অবনীন্দ্রনাথ সিরাজের মত ঘরে প্রবেশ করতেন। গগনেন্দ্রনাথও আসতেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে।

অবন ঠাকুর কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বিনয় নম্রতা বা শিষ্টাচারের ধারও ধারতেন না। আর্টের পরিবেশে নিষ্কোশিত অসির মত ঝলসে উঠতেন। শ্রদ্ধা, ভয়, ভালবাসা সব মিলিয়ে ওঁকে আমরা ঘিরে ধরতাম। তারপর বকাঝকার মধ্যে আমাদের ছবির দোষগুণ বিচার করতেন। মনটা প্রায় খারাপ হয়ে যেত। পরমুহূর্তে আবার ওঁর কথায় সবাই আমরা হাসি খুশীতে ফিরতাম। আরট সংক্রান্ত কত না দেশ-বিদেশের কাহিনী উনি আমাদের সামনে বিছাতেন। কত গল্প আর বলার কি অনবদ্য কায়দা! সকলেই মুগ্ধ হতাম ওঁর পাণ্ডিত্যে। সকলেই আমরা হতচকিত। গল্পে গল্পে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। একদিন ঐ আর্টের কথায় কথায় বললেন, "দেখ, আমার রচনা ও নন্দর রঙ রেখা নিয়ে একজন মস্ত বড় আর্টিস্ট হতে পারে।"

কথাটা প্রায় ধাঁধার মত কেন কানে বেজেছিল। এ কথায় আমরা পরে আসবো।

সেইসময় নন্দবাবু টেম্পারায় কাজ করতেন। আমরা কিন্তু তখনও অবনীন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ওয়াসপেন্টিং করি। হয় কাগজে নয় সিল্কের উপর। সূক্ষ্ম, মিনিয়েচার ধাতের কাজ। প্রায়শ রোম্যান্টিক। এ কারণেই অবনবাবুর কথাটা মনে হয়েছিল যেন খাপছাড়া কথা।

একদিন ছবি ঘষামাজার কালেই নিরহঙ্কার ও দম্ভহীন পদক্ষেপে এক ভদ্রলোক হলঘরে প্রবেশ করলেন। অনুভব করলাম আমাদের সকলের মধ্যেই এক চঞ্চলতা। আমি সবিস্ময় কালীপদ ঘোষালের দিকে তাকাতে কালীবাবু জনান্তিকে বললেন, ইনিই সেই নন্দলাল বসু। আমরা রঙ তুলি ফেলে সবাই ওঁকে ছেঁকে ধরলাম। উদ্গ্রীব হয়ে শুনতে লাগলাম ওঁর কথাবার্তা। কথা দেওয়া নেওয়া হচ্ছিল ক্ষিতীনবাবু ও নন্দবাবুর মধ্যে। দুজনেই সরলতার প্রতীক। সহজ হাসি খুসিতে মশগুল। অনেকদিন বাদে দেখা হল দুই বন্ধুর। ডজনখানেক বিড়ি ক্ষিতীনবাবুর পুড়ে শেষ হল। আমরা সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি; আমাদের পক্ষে ঠাওর করা শক্ত ছিল, অন্তত আমরা আশা করিনি যে নন্দবাবুকে ঐখানেই ছবি আঁকতে দেখব। আসলে হয়েছিল কি ক্ষিতীনবাবুর এক গুণমুগ্ধ ওঁকে শাক্ত মতে ত্রিপুরা সুন্দরীর ছবির বায়না দিয়েছেন। ক্ষিতীনবাবু পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব বিষয়বস্তু হলে অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। ত্রিপুরাসুন্দরী ভাবনায় ক'দিন দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে ওঁর।

স্বর্ণকুম্ভ

ইতিমধ্যে নন্দবাবুর আবির্ভাবে ক্ষিতীনবাবু যেন চাঁদ হাতে পেলেন। কাগজ, পেন্সিল, ড্রইং বোর্ড বাবার নিয়ে এসে সরাসরি নন্দবাবুর কাছে ঘটনাটা বলে আবেদন করলেন, দয়া করে আমার ত্রিপুরাসুন্দরীর ড্রইংটা তুমি করে দাও।

সেই প্রথম নন্দবাবুকে ছবি আঁকতে দেখলাম। আশ্চর্য কি সুনিশ্চিত রেখা আর কি নিক্তি মাপা পরিসর। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী হাতে ধনুক আর বাণ নিয়ে কাগজে ভেসে উঠলেন। ওঁকে রাবার ব্যবহার করতে দেখলাম না। কোন একসময় নন্দবাবু লেখনরেখ রেখার (ক্যালিগ্রাফির) প্রয়োগ করেছেন ছবিতে। কিন্তু ত্রিপুরাসুন্দরী ড্রইং-এ তা করেননি। যেন রেখার বাঁধনে বাঁধা দেবীমূর্তি। লীলায়িত ছন্দবদ্ধ রেখা। সে ঘটনা কোনো দিন ভোলবার নয়। কি জোরদার অঙ্কন।

নন্দবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়, শান্তিনিকেতনে। সেই শেষবার। ১৯৩৮ সালে আমার কনিষ্ঠ ভগ্নী বাণী (মজুমদার) চৌধুরী সবেমাত্র ইয়োরোপ সফর করে ফিরেছে চৌনৃত্য দলের সঙ্গে। ফিরে এসে সে শান্তিনিকেতনে নৃত্যনাট্যের দলে যোগ দেয়। ওরই আমন্ত্রণে গেলাম শান্তিনিকেতনে। অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। তা হলো নন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করা। আর মনে মনে আরেকটা বাসনাও ছিল। যদি সম্ভব হয় রবিবাবুর ছবি দেখার। বস্তুত খ্যাতনামাদের যন্ত্রণা সাধারণের তুলনায় অতুলনীয়! শান্তিনিকেতনেও মনে হলো যেন রবি ঠাকুর ফেরারী আসামী। সন্ধান পাওয়া দায়। বাণী তখন ওখানকার আটঘাট সব চেনে, অভয় দিয়ে সন্তর্পণে, "শ্যামলীর" দরজায় আমাকে নিয়ে উপস্থিত।

ঠাকুর মহাশয় তখন আরামকেদারায় বসে পিছন ফিরে একটি ইংরাজী বই পড়তে ব্যস্ত। আমাদের পদশব্দে বইটা নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বাণীকে দেখেই বললেন, "আরে এসো এসো, আমি বিমুখ হয়ে বসে আছি।" ওঁকে প্রণাম করে বাণী আমার পরিচয় দিল, "আমার দাদা, ছবি আঁকে"।

"তাই নাকি ?" এক জাত আর্টিস্ট-এর দৃষ্টি দিয়ে বললেন। "আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আমি এসেছি আপনার ছবি দেখতে।" আমি বললাম।

ঠাকুর মহাশয় কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কোথায় শিখেছো ?" উত্তর করলাম, "আজ্ঞে অবন ঠাকুরের স্কুলের ছাত্র আমি।"

বলবা মাত্রই উনি বললেন, "ওরে বাবা তুমি মস্ত বড় আর্টিস্টের ছাত্র, তোমাকে কি ছবি দেখাব"— তারপর দ্বিতীয় দফায় বললেন, "দুঃখের বিষয় আমার ছবি সব এলমহার্স্ট মহাশয় বিদেশে নিয়ে গেছেন, তা নাহলে তোমাকে দেখাতে পারতাম।" এযেন আঁকিয়ের সঙ্গে আঁকিয়ের কথাবার্তা। হঠাৎ কি ভেবে বললেন, "তোমার সঙ্গে নন্দলাল বসুর আলাপ আছে ?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে না সরাসরিভাবে তেমন নেই তবে আমি ওঁকে ছবির মারফতে চিনি। বেশ চিনি।" উনি যেন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন—চেননা ? সে কি কথা ! যাও আলাপ কর। তারপর এক নিশ্বাসে বললেন, অমন লোক হয় না ! অমন মানুষ হয় না ! অমন আর্টিস্ট হয় না !" এক নিশ্বাসে।

অতঃপর, কয়েকটি ছবি নিয়ে উপস্থিত হলাম নন্দবাবুর বাড়ির ফটকে। সূর্য তখন পিছন দিকে হেলতে শুরু করেছে। বেশ বেলা। ফটক পার হয়ে পড়লাম এক ছোট ফুল পাতার বাগানে, কোন এক গেঞ্জিপরা মহাশয়ের মুখোমুখি, প্রশ্ন হল, "কাকে চাই ?"

ওঁর কাছে আমার ইচ্ছে প্রকাশ করল্যাম। উনি বললেন, এখনতো "উনি ঘুমোচ্ছেন দেখা হওয়া সম্ভব নয়।

ব্যাড লাক !

অগত্যা ফিরতি পথ নিলাম, হঠাৎ বারান্দার উপর থেকে নারীকণ্ঠের স্বর কানে এলো, "আপনার কাকে চাই ?"

ঘুরে দেখলাম ভদ্রমহিলার বয়স বেশী নয়। কে যেন, প্রমাদ গুণলাম। অবশেষে ওঁকে জানালাম, "আমি এসেছিলাম নন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে আমি অবন ঠাকুরের স্কুলের ছাত্র। শুনলাম উনি ঘুমোচ্ছেন। ঠিক আছে আমি আর একদিন আসবো, আমি চলি। ধন্যবাদ।"

ভদ্রমহিলা আমার কথায় মনে হল যেন জেদ করে বললেন, "না, না আপনি যাবেন না। আসুন ভিতরে এসে বসুন, আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।"

কি বিপদ !

আমি বিব্রত হয়ে প্রতিবাদ করলাম, "না, না ওঁকে জাগাবেন না, আমি আর একদিন আসবো…"

ভদ্রমহিলা আরো দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "না না আপনি এসে বসুন," তারপর যোগ করলেন, "এ ওঁর নির্দেশ। যে কোন সময় যেই আসুক না কেন ওঁকে যেন ডেকে দেওয়া হয়। না হলে উনি ক্ষুব্ধ হবেন'। একথা বলে চলে গেলেন উনি ভিতরে।"

আমি অপরাধীর মতো ঘরে ওঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ বাদে নন্দবাবু মনে হল মুখ হাত পা ধুয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার পরিচয় দিয়ে ওঁকে প্রণাম করলাম। খুব যত্ন সহকারে আমার ছবি দেখলেন। ঐ সময় আমি নন্দবাবুর মতোই টেম্পারার কাজ করি দেখে খুশী হলেন। তারপর বহুক্ষণ আমরা কথা দেওয়া নেওয়া করেছি, তবে ওর সব কথা অক্ষরে অক্ষরে আমার মনে নেই। ওঁর বক্তব্য কথার মর্ম, ছাপ আমার মনে ছিল। পরবর্তীকালে ওঁর লেখা শিল্প কথায় ও চিঠিতে সব পড়েছি, ওঁর সব কথাই আবার আমার ঘরে ফিরে মনে উদয় হয়। তাই ব্যক্তিগ্যত সামান্য পরিচয়ের কথা চিত্রকর নন্দলাল বসু স্বনামধন্য নন্দবাবুর কথা এইখানে শেষ করে ওঁর ছবির প্রসঙ্গে যাচ্ছি।

॥ ২ ॥

প্যাস্কাল বলেছেন, "আমরা গ্রন্থতো চাই না, গ্রন্থের পিছনে মানুষটিকে চাই" তাতে শিল্প ও শিল্পী দুই আলোকিত হয়।

নন্দবাবুর বিষয় আমাদের আর একটু তলিয়ে ভাবার প্রয়োজন সেই কারণে। এই শতাব্দীর শুরুতে দেশাত্মবোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সংস্কৃতিগতভাবে একমাত্র শিল্পাত্মবোধের নবজাগরণ এক অভূতপূর্ব ইতিহাস। এর তুল্য অন্য কোনো আন্দোলন বা কোনো জাগৃতির স্মৃতি কই আমার তো মনে পড়ে না।

আমাদের অনতি অতীতের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথ ও হ্যাভেলসাহেব, এবং নন্দবাবু ও অন্যান্যরা যে মহান আদর্শ তুলে ধরার প্রয়াস পান তা অবিস্মরণীয়।

কয়েক শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পক্ষাঘাত নিরাময় করে তাঁরা জাতিকে সাংস্কৃতিক নবজন্ম দান করেন। তাঁদের সেই সঙ্কল্প-প্রতিজ্ঞা-প্রতিকূল পরিবেশে তাঁদের প্রয়াস—স্পষ্টত সেটি একটা ঐতিহাসিক মহালগ্ন। তাঁদের সেই দুঃসাহসের নাম "বেঙ্গল স্কুল" বা "বাঙ্গলা কলম"। প্রতিভা ও দুর্বার মেহনত করে একা নন্দবাবু যাকেই তুলে ধরেছেন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় স্কুলের ভিত্তিতে তাকেই বলি ভারতীয় আরট। ভারতীয় ললিতকলা বলতে ঠিক কি বোঝায় তার সংজ্ঞা দেবার জন্য এখন Strzygowski-র লেখাথেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "Indian art is not to be viewed in connection with Asia Minor and with Hellenism but that in the ocean of art it forms an island"—"এন আই ল্যাণ্ড" সেই "মণিদীপ" আমাদের ঐতিহ্য। এর উপর নন্দবাবু বার বার জোর দিয়ে বলতেন এর মূল কথা হল "প্রতীক"। এই ঐতিহ্য, প্রতীকী—ঐতিহ্য পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংঘর্ষ এখানেই। আমাদের পাশ্চাত্যের মূলসূত্র বা মূল কেন্দ্র হল গ্রীস। সেখানে তারা নিছক নরত্বারোপ করে। এক অর্থে বলা যায় ওঁদের শিল্পকলা "অ্যানথ্রপমরফিক"। পরিবর্তে আমরা ভারতীয়রা পরিপূর্ণভাবে প্রতীকী (সিম্বলিক)। অবশ্য আমার খেয়ালে এই আলোচনা থেকে মধ্যযুগ ও আধুনিক বাদদিতে হবে। পশ্চিমের আরট গ্রীক সূত্রে পুতুল ও প্রতিমার ভেদজ্ঞান রহিত। কোন পণ্ডিত বলেন, rien viest moins symbolique que l'art grec, et rien ne l'est plus que les arts orientaux ;

অর্থাৎ এমন কোনো আরট নেই যা গ্রীকের মত প্রতীকহীন ও নিঃস্ব। আর প্রাচ্যের শিল্পকলার তুলনায় প্রতীকান্বিত শিল্পকলা আর নেই। এইসব কথা হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলেন নন্দলাল বসু। জলরঙ থেকে লোকশিল্প, অজান্তা, বাঘ, রাজপুত, পাহাড়ী সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। নানান প্রদেশের স্থানীয় শিল্পের সঙ্গে কাজ করে দেশীয় উপাদান পদ্ধতি রীতিনীতি করায়ত্ত করেছেন অতি যত্নে। চীন জাপানে শিক্ষনবিশী করেছেন। ভারতের সর্বত্র ঘুরে অনুধাবন করেছেন ভারতীয় শিল্প আত্মার কথা। এমন কি ১৯৭৪ সালের "বিশ্বভারতী নিউজ" পত্রে শ্রীমতী উমা দাশগুপ্তর লেখায় পড়েছি যে, শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর ১৯২৪ সালে ফ্রান্স দেশ থেকে ফেরার সময় হাতে করে এনেছিলেন art of fresco। এই বইটি নন্দলাল বসু মহাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে।

নন্দবাবু ১৩শ—১৬শ শতাব্দীর ফ্রেসকোর কথা পড়ে শান্তিনিকেতন ফ্রেস্কো নিয়ে মেতে উঠেছেন। তাঁর করা এমন কিছু কিছু ছবি শান্তিনিকেতনের দেয়ালে আছে, যা ভারতীয় শিল্প চেতনা জাগানর পক্ষে

যথেষ্ট। দেশ বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব কাজ দেখতে দেখতে অনেক সময় মনে হয়, আবার যেন রক্তের সঙ্গে মোকাবিলা করছি। সেই বাঘ সেই অজন্তা, সেই জয়পুর, রাজপুর—সেই ভারতবর্ষ।

১৯০৭ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯০৮ সালে প্রদর্শিত হয় নন্দবাবুর "সতী" পরে "সতীর দেহত্যাগ" ১৯০৯ সালে "দময়ন্তীর স্বয়ম্বরসভা" এবং "শিবের তাণ্ডব" নৃত্য, এই সময় নন্দবাবু হিন্দু দেবদেবীর চিত্র এঁকে সকলকে মুগ্ধ করেন। তাছাড়া গোকুলব্রত,১৯২৭শে আঁকা নটীর পূজা ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর কাজ যথার্থই সৃজনশীল বাঁক নেয় ১৯২২ সালে টেম্পারা রঙে মনোমুগ্ধকর "বীণাবাদিনী" আঁকার সঙ্গে সঙ্গে।

আমরা কয়েকটা ছবির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ—করবো "উমার শোক","স্বর্ণকুম্ভ","অভিসারিকা" এবং "রাধার বিরহ"। তাছাড়া কিছু নিসর্গ চিত্র তার মধ্যে "মধ্যাহ্নস্বপ্ন" এই কটি ছবিই প্রধান। এই সমস্ত ছবি পাশাপাশি বিছলে বোঝা যায় যে নন্দবাবু চিত্রশিল্প ইতিহাসের এক অধ্যায় হতে আর এক অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সর্বদাই এগিয়েছেন ধ্রুবতারার স্থির লক্ষ্যে। ভারতীয় নান্দনিক মার্গে সূত্র-আত্মিক সম্পর্ক বিচ্যুত না হয়ে সর্বত্রই বিষয়বস্তু রঙ রেখা সম্মিলিতভাবে প্রতীকধর্মী আজকের ছবি।

নন্দবাবুর এইসব ছবি পাশাপাশি দেখলে সেকাল থেকে একাল অবধি দুইদিক থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে তাঁর ছবি ক্রমশ বদলেছে। প্রথমত মিশ্র জলধোয়া, স্বচ্ছ রঙের পরিবর্তে তাঁর মধ্য পর্বের ছবিতে অনচ্ছ, গাঢ় রঙের সুবিবেচিত রেখা ঘিরে আকৃতি ও অবয়ব অনুযায়ী রঙের ধর্ম-বিন্যাসে পরিবর্তিত হয়েছে। আগের ও পরের ছবির বহু হেরফের দেখা যায় এটা স্বীকার করতেই হয়। এইদিক থেকে অবন ঠাকুর অনুযায়ী চিত্র গঠন ছিল অন্য আরেক রকম। একে বলা যেতে পারে অপ্রত্যক্ষভাবে "ঈজেল" পেন্টিং-এর ধাত। অধুনা ক্রিয়া কৌশলে ফ্রেমের সমতল ও খাড়া রেখার মধ্যবর্তিতার দ্বিমাত্রিক দেশের ছেদ বিন্যাসে হতোঅবশ্যই খুব ভাসাভাসা রঙ রেখা ও তলের ছন্দময় বন্ধনে। একে বলা হয় Cadre Frame work। অনুলব্ধ বা simultaneous। বাংলা করে বলতে গেলে যুগপৎ গঠন। এ অতি আধুনিক কথা। অন্যদিকে নন্দবাবু ধীরে দেয়ালচিত্রের ভিত্তিতে ওঁর ছবির গঠন প্রণালী গড়ে তোলেন। পর পর ধাপে ধাপে বা succession-এ বা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে—দেয়ালচিত্র হিসাবে এই দুইয়ের পার্থক্য অনেক। অনেকটা যেন বাইরে থেকে কুমারাস্বামী রাজপুত ও মুঘল চিত্রে যে পার্থক্য লক্ষ করেছেন তেমনি। কিন্তু ভিতরকার কথা হলো এই যে ছবির অনুষঙ্গের মহিমাকে বাদ দিয়ে ছবি দেখা। ছবিতে এটাই বিজ্ঞান ঠিক এই দিকটা ভালভাবে অনুধারণ করতে পারলে নন্দবাবুর চিত্র সমগ্রভাবে বোঝা শক্ত নয়। ঐতিহ্যগতভাবে পার্থক্য হল ইজেল পেন্টিং হলএক"রকমের"বা প্রকারের আর মুরালধর্মী পেন্টিং হল সার্বিকভাবে ভারতীয় "প্রজাতি"র অভিব্যক্তি যার জন্য ছোট হলেও রাজপুত পাহাড়ী চিত্র সকল মূলত মুরালধর্মী। অনেকেই একথা স্বীকার করেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদি নন্দবাবুর "স্বর্ণ-কুম্ভ" ছবি দেখি তো দেখব ঋজু, সৌন্দর্যের আধার। কমনীয় মিশরীয় মহিমার সুন্দরী অনুগ্রহ সুন্দর দেহে, এগিয়ে এসেছেন। ধীর সঞ্চালনে ওর বামপদ, পারস্য কায়দায় ফ্রেমের পাড়ে এগিয়ে আছে যেন। একটি স্বর্ণকুম্ভ হাতে নিয়েই। কিন্তু আরো বড় কথা হল, যে গাঢ় অবকাশ পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছেন, তার ভাগ ছবির তুলনায় হয়তো বেশি। অতখানি ভাগ এবং অবকাশ কোনোইজেল চিত্রকরের পক্ষে আজ অতি দুঃসাহসিক বলে মনে হতো। মনে হতো অসম্ভব। অবিশ্বাস্য। এ শুধু হয়েছে, যেহেতু, নন্দবাবু মূলত মুরালধর্মী চিত্রকর। ছবিটা দেখলে সেই কারণেই বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তারপর অমন মাখন সাদা শাড়ীর রঙ, সোনালী পাড় ও বুটি, কোমরবন্ধ ও অলঙ্কার ছাই নীল রঙে কাঁচুলী, তার উপর স্বর্ণকুম্ভ, চুলের অলঙ্করণ প্রতিধ্বনিত। সবটাই এক গাঢ় চকোলেট রঙের গভীরতার দেশ হতে বার হয়েছে। মনোমুগ্ধকর ফ্রেমে বাঁধা। এখানে ছবির একত্ব ও প্রলম্বিত ছকটাই যুগপৎ—এক অনবদ্য রহস্য। নন্দলাল বসুর যাদু! কি কাব্য! কি কবিতা!

তারপর ধরা যাক নন্দবাবুর অভিসারের চিত্রের কথা। এখানে রাত্রির চিহ্ন হিসাবে দুই কালো গাছ; বীজগণিত অনুযায়ী চিত্রিত, কি কালরঙ! গভীর রাত্রির প্রতীক। "রাধার বিরহ," সুন্দর সাজান বাগান পরস্পর কয়েক দিগন্তে মূর্ত, এদিক থেকে ওদিক থেকে, পাখির চোখে দেখা দৃষ্টি, উপর থেকে, 'বক্র' সোজা, জ্যামিতিক, ও বীজগাণিতিক নিয়মে বর্ণিত। যে রাধা বিরহে চিরন্তন আমাদের হৃদয় শীর্ণ, কাতর, সেই রাধারই চির-বিরহের সৌন্দর্য। নীল আকাশ, সবুজ তাল তমাল ঘেরা, কলাগাছ সখীদ্বয়, পদ্মে ও শালুক, ইণ্ডিয়ান রেড হতে ইয়োলো অকার; ও সাদার ফ্রেমের ভিতরে ফ্রেমে বাঁধা ঋজু রাধিকা সুন্দরী। তীরবিদ্ধ হরিণীর মত। ছকের স্তবকে উজ্জ্বল সম-আলোকের রঙে বিধৃত। মহিমময় ছবি।

নন্দবাবুর বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা আসতে বাধ্য, তা হল, নন্দবাবু বহু নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন। অবশ্য নিছক নিসর্গচিত্র অঙ্কনরীতি এদেশে এসেছে পশ্চিমের মারফৎ, কিন্তু নন্দবাবুর চিত্রে তা এসেছে চীন/জাপান হতে। ভেবে দেখলে দেখা যাবে দুই দেশের দৃষ্টি কোণ দুই ধরনের। কোন এক মহাশয় একটি নিসর্গচিত্র লক্ষ্যকরে দেগাকে বলেন, নিসর্গচিত্র সত্যই এক মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। দেগা তৎক্ষণাৎ একথার প্রতিবাদ করে বলেন, না তা নয়। নিছক চাক্ষুষ অবস্থার প্রতিফলন। একথা পাশ্চাত্যের নিসর্গচিত্রের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। কিন্তু চীন এবং জাপানের নিসর্গচিত্রে কিন্তু সত্যই মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। এই ভেদাভেদ আমরা নন্দবাবুর "উমার শোক" চিত্রে প্রতিফলিত দেখি। মূলত আধ্যাত্মিক হলেও, চীন, জাপান ও ভারতীয় শিল্পকলার পার্থক্য হল আমরা অবয়ব, আকৃতি অনুযায়ী রঙ রেখার বাঁধনে রূপ আদর্শায়িত করি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সজ্ঞায় ধারণা মূর্তকরি, প্রতীকরূপে। পূর্ব প্রাচ্যে, ওঁরা রঙ রেখা অনুযায়ী অবয়ব আকৃতি রূপ আদর্শায়িত করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সজ্ঞারসূত্রে অন্য একভাবে। ঠিক এই দুই ধারণা পরস্পর তুল্য হবার কথা নন্দবাবু "উমার শোকের" ছবিতে কল্পনা করেছিলেন।এ দুই-এর সমন্বয় হয়তো সুখকর হয়েছে কিংবা হয়নি বিবেচনা করে নন্দবাবু ঐ ধরনের কাজ থেকে বিরত হয়েছেন।এতে বেশ বোঝা যায় যে নন্দবাবু অন্বেষণ বিশ্লেষণে সদাই ব্যাপৃত ছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা জীবনের শেষ অবধি করেছেন, কখন কোনোবাঁধা বুলি উদ্গিরণ করে খ্যাতনামা হতে চাননি।

মনে পড়ছে ওঁর সঙ্গে যেকথা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেকথাই শিল্পকথায় আক্ষেপের সুরে আলোচনাও করেছেন, তার সারমর্ম হলো এই—শিল্পচর্চার দৈন্যে আমরা ক্লিষ্ট। যতদিন না আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে আমাদের দাসখৎ করা নান্দনিক মুচলেকাটা ফেরত পাচ্ছি, ততদিন আমরা মৃত। কথাটা খুব সত্য। অবস্থা সত্যই তাই।

আরব্য পণ্ডিত আল জামিরের একটা কথা আছে, রাজাকে দিয়ে কোন সুকার্য সম্পাদন করতে হলে ভগবান প্রধান তাঁকে যথার্থ এক উজির সরবরাহ করে থাকে এমন উজির পেলেও, যথার্থ প্রজা বা গ্রহণযোগ্য ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ সরবরাহ করেননি। কয়েক শতাব্দীর মূঢ়তায় আমরা চোখ মেলতে পারিনা, মূলে সেই worringer জাতীয় অ্যাংলো-স্যাকসন বাচালতায় লতায় ভরাডুবি। এসব থেকে কোথায় নন্দলাল দূরে। কত দূরে? অথচ আবেগশূন্য হয়ে দেখলে দেখা যাবে, সারাজীবন নন্দবাবু অভিযান চালিয়েছেন ফিরে পেতে সেই "মনিদীপ" যার নাম ভারতীয় ললিতকলা। সম্ভ্রান্ত ধ্রুপদী ললিতকলা। ফরাসী ভাষায় একটা কথা আছে, "প্রতিভা কি?" এই প্রশ্নের উত্তর হল, "এক প্রলম্বিত ধৈর্যই প্রতিভা।" কিন্তু না ঠিক তা নয়, পল ভালেরী তা সামান্য কিন্তু তাৎপর্যময় সংশোধন করে বলেন, "এক প্রলম্বিত অধৈর্যই হল প্রতিভা।" মনে হয়, একথা নন্দলাল বসু—মাষ্টার মহাশয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনবদ্য তাঁর অধৈর্য।

উত্তরসূরীর চোখে নন্দলাল

বিজন চৌধুরী

আচার্য নন্দলাল বসুর জন্মশত বর্ষ নিয়ে ভাবতে গিয়ে কতগুলো নতুন চিন্তা মনে উঁকি দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু আগে থেকেই ভারতের শিল্পজগতে—বাংলার তো বটেই—তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রাধিকার প্রশ্নাতীত হলেও, ইদানীং বহুদিন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সৃজনকর্ম সাধারণ্যে অনুপস্থিত। যাঁদের জন্ম ১৯৫০ এর পর তাঁরা বহুজনই সামগ্রিকভাবে তাঁর কাজ দেখার সুযোগ পাননি। সম্প্রতি তাঁর শিষ্য এবং অনুসারীদের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিচরণও বিরল, তাই বর্তমানে সৃজনকর্মের মধ্যে অনুরণিত তাঁর ব্যক্তিত্বকে আগের মতো আমরা আর অনুভবের মধ্যে পাই না। তরুণতর শিল্পীরা অনেকক্ষেত্রেই তাঁকে পান খণ্ডিত এবং সুতরাং আংশিকভাবে। পত্রপত্রিকায় তাঁর বিষয়ে আলোচনা, তাঁর ছবি ছাপা প্রায় বিরল হয়ে গেছে বেশ কিছুকাল।

তবু আমাদের অনেকের মধ্যেই নন্দলালের পরিবিকাশ চলিষ্ণু। বর্তমানে অ-প্রত্যক্ষ হলেও তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলি অলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। একজন চিত্রশিল্পী হিসাবে সংকোচে এবং দ্বিধা নিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব সংক্ষেপে। হয়তো প্রচেষ্টাটুকু অবান্তর হবে না।

একথা সত্য আজকে যাঁদের বয়স পঞ্চাশ, বা এমন কি যাঁদের বয়স চল্লিশের ঘরে তাঁরাও নন্দলালের বিপুল শিল্পকর্মের যতটুকু দেখার সুযোগ পেয়েছেন সেই তুলনায় তাঁদের পরবর্তী তরুণতর প্রজন্মের শিল্পীরা নন্দলালের সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভারের সামান্যই দেখতে পেয়েছেন। সমগ্র সৃষ্টি দেখে ওঠার প্রশ্নই নেই। পঞ্চম দশকে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলকাতায় তাঁর একটি বড় প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই তাঁর শেষ প্রদর্শনী। এত বড় একটা মহানগর, অথচ অগ্রজ অন্যান্য শিল্পীদের মতো তাঁর শিল্পসৃষ্টিও রাখার কোনো ব্যবস্থা হল না, তাই তাঁদের শিল্পকর্ম দেখার, মূল্যায়ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। সুতরাং এমন অনেকেই আছেন যাঁরা তাঁর বিচিত্র শিল্পসম্ভার এবং কর্মজীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও, বা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। যাঁরা আমাদের বয়সী বা আমাদের চেয়ে যাঁরা বড়, তাঁরা স্মৃতির ওপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। সম্প্রতি ইউরোপ ঘুরে আসার ফলে একথা আরও বেশি করে মনে হয়েছে। সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা না করলে দর্শক শুধু নয় শিল্পীরাও তৈরী হবেন না। দর্শক এবং শিল্পীদের মধ্যে ব্যবধান বাড়বে। শিল্পীদের সঙ্গে পূর্বসূরীদের সেতুবন্ধ রচিত হবে না। ভারতবর্ষের শিল্পকলার নবজাগরণের ইতিহাস ক্রমশ আমাদের চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। শিল্পকৃতি তো দেখার জিনিস, সুতরাং এক্ষেত্রেও চোখের আড়াল মানে মনের আড়াল। অবস্থাটা ক্রমশ কেমন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তার একটা পরিচয় দিচ্ছি।

আমার যাঁরা সমসাময়িক—অগ্রজ হোন বা অনুজই হোন, তাঁদের
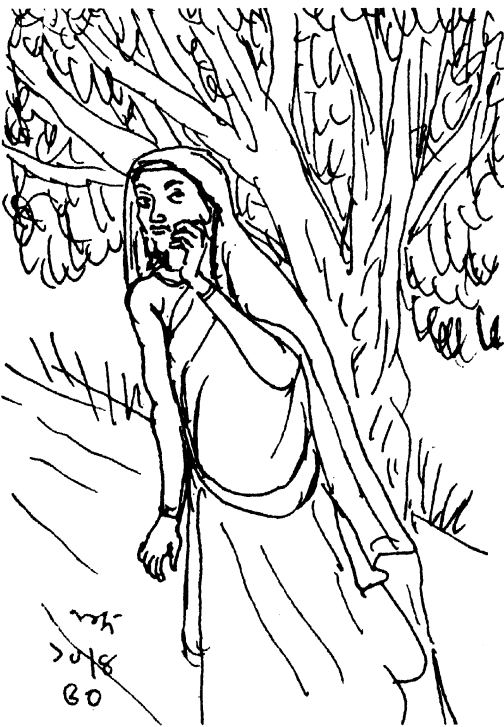
অনুশীলন, চর্চা ও বিভিন্ন পরীক্ষা—নিরীক্ষা দেখলে নিশ্চয় একথা বলা যায় যে তাঁরা সৃজনের প্রেরণা পান, রসদ সংগ্রহ করেন দেশ বিদেশের আধুনিক শিল্পকলা থেকে। এ যে দোষের সেকথা না বলেও বলব পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁদের সর্ম্পক ছিন্ন হয়েছে। সুতরাং পূর্বের তুলনায় এঁরা মননে ও মানসে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। এঁরা সকলেই নগর-রুচির প্রতিনিধি। এমন কথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে, বোম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ, বারোদা এবং কলকাতার শিল্পীরা গত দুই দশকের মতো সময় থেকেই ইওরোপের সভ্যতার দান হিসাবে আধুনিক শিল্পচর্চা ও মতবাদসমূহের আওতার মধ্যেই নিজেদের অনেকাংশে বন্ধ করে রেখেছেন। শিল্পকলায় জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও যামিনী রায়, দৃশ্যত প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যে গণ্য হচ্ছেন না। প্রশ্নটা এইখানেই আসে, কারণ সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির মধ্যে একটি নিজস্ব বোধ, একটি জাতীয় পরিচয় ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে এখন প্রায় অদৃশ্য। আমার ক্ষেত্রে অন্তত নন্দলালের জীবন ও সৃষ্টির অন্বেষণ এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমার বিশ্বাস অন্য কারো কারোর ক্ষেত্রেও। তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্ব, স্বকীয় সত্তা যেন বলে দেয় যে শিল্পকর্মে জাতীয় পরিচিতির প্রশ্নটি নিশ্চয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু উপরে আলোচিত কারণে বা আনুষঙ্গিক অন্য কারণে বিভ্রান্তি যে কিরকম তার উদাহরণ দিচ্ছি।

সেদিন একজন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে নন্দলাল বসুকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। নন্দলাল বসুর ছবি ও অবদান নিয়ে আলোচনা। খুব নির্লিপ্ত ভাবেই সে বলল, নন্দলাল বসু শিল্পাচার্য হিসাবেই বরণীয় এক দৃষ্টান্ত, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে তাঁর এই ভূমিকা নিশ্চয় সার্থক, বড় মাপের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু...বলেই সে একটু ইতস্তত করল। এই "কিন্তু"তে বাদানুবাদ বহু দূর গড়িয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল নন্দলাল বসুকে কিংবদন্তীর পুরুষ বানানো হয়েছে। কিন্তু একটি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ কিছুকাল ছিলাম বলেই এমন একটা পরিস্থিতির মহড়া নেওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি সেই যুগের পরিস্থিতির বিশেষত্বের বর্ণনা করে তাঁদের শিল্প আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম তাঁকে, তাঁদের নেতৃত্বে বহু আয়াসে ও পরিশ্রমে যে একটি স্বত চিত্রভাষা নতুন ভাবে গড়ে উঠেছিল, সে কি তা স্বীকর করে ? এঁদের আন্দোলন ও সৃষ্টি যে কি পরিমানে জাতীয় ঐতিহ্যের সুপ্ত অঙ্কুরকে উজ্জীবিত করেছিল সে কি তা মানে না ? দেশের শিল্প-সংস্কৃতির নতুনভাবে দেখার প্রেরণাস্থল হিসাবে তাঁদের সৃষ্টিসম্ভার যে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল, সে কি সেকথা জানে না ? দেখলাম এক্ষেত্রেও আমার বক্তব্যকে সে গ্রহণ করতে পারছে না। যেন ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট সুরে বলছে যে এই আন্দোলনটি পুরাতনপন্থী, ভারতীয়করণের নামে আলেয়ার পেছনে ছোটাছুটি। মুশকিল হল এই ছেলেটি একা নয়, বাদানুবাদ চালাতে চালাতে দেখলাম, ভঙ্গীটা খুবই পরিচিত, যুক্তিগুলোও। এ ধরনের যুক্তিবিহীন সরলীকরণ, উপেক্ষার ঝোঁক শুধু শিল্পী নয়, সমালোচক মহলে অনেক সময়ই চোখে পড়ে। একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি অবনীন্দ্র-নন্দলালের মৌলিক ছবির চেয়ে তাঁরা ইদানীংকালের অক্ষম দুর্বল অনুসরণকারীদের কাজ দেখেছেন। গিলটি করা গয়না দেখে নকল বলাই স্বাভাবিক। ঘুরে ফিরে সংগ্রহশালার প্রসঙ্গ এসে পড়ছে।

শুধু কলকাতায়ই নয়, ভারতবর্ষের শিল্পকলা কেন্দ্রগুলির সর্বত্র অবনীন্দ্র-নন্দলাল এবং তাঁদের প্রবর্তিত "বেঙ্গল স্কুলের" সম্বন্ধে এক তীব্র বিরূপতা দেখেছি। ওঁদের বিভ্রান্তিকর উক্তি ইতিহাসকে উপেক্ষা এবং নস্যাৎ করার ঝোঁকের সঙ্গে বহুজনই পরিচিত।

এখন আমার পক্ষে, বা অন্য কারো পক্ষে, "বেঙ্গল স্কুলের" স্বাদ, বর্ণ এবং প্রেরণার অনুবর্তন অবশ্যই কাম্য নয়। অনুকরণ করে উত্তরণ যে সম্ভব নয়, তার উদাহরণ চোখের সামনে বহু আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলব, এই ধরনের একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকা[illegible]কে কি করে অস্বীকার করব ? এবং কেনই বা করব ? কারণ এঁদের সম্বন্ধে ভুল মূল্যায়ন, অনীহা, আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভের ঘরে কিছুই জমা দেবে না।

অধুনা আমরা যাঁরা ছবি আঁকি আমাদের কাছে সমস্যা দুটোই। প্রথমত নানা সময় মনে এই প্রশ্ন জেগেছে, যে ধরনের পরীক্ষা এবং চর্চা বহু বছর ধরে করে যাচ্ছি, নানা ধরনের মতবাদের প্রভাবে যেভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, তা থেকে সার্থক শিল্পসৃষ্টি কি সম্ভব ? উত্তরণ কি সম্ভব ? কারণ সফল অভিব্যক্তি শুধু দেশ বিদেশের শিল্পকৃতির অনুকরণ, অনুবৃত্তির পথ ধরে আসে না। দ্বিতীয়ত একথাও মনে হয়েছে যে দেশ, কাল, সমাজ এবং আধুনিক পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতাও যেমন শিল্পীর ভেতরে কাজ করবে, তাঁর অনুভূতির অভিব্যক্তির রূপবন্ধ অনুসন্ধান করার প্রেরণা দেবে, তেমনি জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে বহু শতাব্দীর গড়া দেশীয় ঐতিহ্যের রূপগঙ্গায় অবগাহনও সঞ্জীবিত করবে, এও কাম্য যেন। একারণেই সার্থক সৃষ্টির জন্য সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পকলা থেকে কতটা গ্রহণীয় তা যেমন শিল্পীদের ভাবনায় থাকা উচিত, তেমনি নিজের দেশের পরম্পরার সম্পদ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতনতা দরকার। সমস্যা দুটি যত সহজে বলছি ততটা সরল নয়। প্রথমত শিল্পশ্রীময় স্পর্শ ছিল আমাদের কর্মে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, দ্বিতীয়ত তা ছিল ধর্মাশ্রিত। এখন আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে শিল্পকলাকে নির্বাসন দিয়েছি, ধর্মের সঙ্গে শিল্পকলার বিচ্ছেদ ঘটেছে। সুতরাং শিল্পকলার মধ্যে ধর্মনিরেপক্ষতার স্বরূপ এবং সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ধ্রুপদাঙ্গ থেকে খেয়ালে যাবার রাস্তা বানানোর সমস্যার মতোই ব্যাপার।

আজকের অশ্রদ্ধা এবং অনীহার সঙ্গে আমরা যখন আর্ট স্কুলের ছাত্র—স্কুলের কলেজের নয়, চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের গোড়ায়, সেই দ্বিতীয় যুদ্ধ পরবর্তী সময়, ল্যাম্পপোস্টগুলি যখন তাদের ঠুলি খুলেছে, এ আর পি শেল্টারের ব্যাফাল ওয়ালগুলো যখন ভাঙ্গা হচ্ছে, বোজানো হচ্ছে পার্কে কাটা ট্রেঞ্চ, তখন কলকাতা শহরের শিল্পচর্চার পরিবেশ ছিল এখনকার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তদানীন্তন ভারতীয় ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থানরত শিল্পীদের অনেকেই আর্ট ইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অতুল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রহলাদ কর্মকার, জয়নাল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমেদ—এঁরা প্রথাগতভাবে ইওরোপীয় চিত্রশৈলীমতে কাজ করতেন। এঁরা সর্বভারতীয় খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁরা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং যামিনী রায়কে উল্লেখ করতেন।

"ক্যালকাটা গ্রুপের" শিল্পীরা যাঁরা যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে শিল্পকলায় নতুন ধ্যান ধারণার উদ্বোধন করলেন, তাঁরাও কিন্তু আন্দোলনের প্রচারকার্যে "বেঙ্গল স্কুল" সম্বন্ধে যতই বিরূপতা ঘোষণা করুন, ব্যক্তিগত আলোচনায় ততোটা সোচ্চার হতেন না। "কল্লোল" বা "কালিকলমের" লেখকদের রবীন্দ্র-বিরূপতার মতোই "ক্যালকাটা গ্রুপের" অবনীন্দ্র নন্দলালের বিরুদ্ধতার মধ্যে কোথায় যেন একটা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছিল। এটা ছিল বৈরীভাবে পূজার এক রীতি। তাঁরা কিন্তু পূর্বসূরীদের বাতিল করেননি। "ক্যালকাটা গ্রুপের" খ্যাতনামা শিল্পীরা— গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল, শুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র এবং এমন কী পরিতোষ সেন ও নীরদ মজুমদার—যে দুজন অন্যদের থেমে যাবার পরও সক্রিয়—তাঁদের মুখেও স্বীকৃতির কার্পণ্য দেখিনি।

অবস্থাটা পালটাতে থাকে দ্রুত পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে। ততদিনে শিল্পকলার আধুনিক পীঠস্থান দখল করে নেবার আয়োজন শেষ। দিল্লিতে ললিতকলা আকাদমি প্রতিষ্ঠি হয়েছে। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি ললিতকলা আকাদমির তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে কি ভাবে নতুন ধরনের শিল্পচর্চার প্রসার ঘটেছে। রাজধানীর পরিবেশনে এবং পরিতোষণে বর্ধিত সাম্প্রতিক শিল্প আন্দোলন এক অর্থে পূর্বাপর সকল শিল্প আন্দোলন থেকে ভিন্ন চরিত্রের। পার্লামেনটারী রাজনীতির ক্ষুদ্র সংস্করণ। নির্বাচন থেকে অনুদানের প্রাদেশিক ভাগবাঁটোয়ারা, সুযোগ সুবিধা আদায়, পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য ছলছাতুরী সব চলে। নতুন আন্দোলন ইওরোপের—আমেরিকারও—সর্বাধুনিক শিল্পভাবনার কাছে আত্মাকে বিক্রয় করার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য লালায়িত এখানকার সঙ্গে জড়িত প্রায় সবাই—সবাই অবশ্য নয় সেটাই ভরসা—একেবারে তৈরী। এই অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং "বেঙ্গল স্কুলের" অবদানকে অস্বীকার ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ইদানীং এরই মধ্যে ধীরে ধীরে শিল্পকলা রাজ্যে এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এক নতুন স্বকীয়তাবোধ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হবার আকুলতাও যেন প্রকাশ পাচ্ছে। আমার সমসাময়িক এবং অনুজ শিল্পীদের বহুজনই নতুন করে এসব নিয়ে ভাবিত, তাঁদের কাজের মধ্যেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অনেক শিল্পীর চেতনায় নন্দলাল বসুর পরিবিকাশ চলিষ্ণু। এই বোধ হয়তো প্রতিভাধর কোনো কোনো শিল্পীকে মহৎ সৃষ্টির

পথে প্ররোচিত করবে বলে আমার দৃঢ় ধারণা। তখন নন্দলাল বসু আলোকবর্তিকা হিসাবেই কাজ করবেন। কারণ এখনকার অবস্থার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের সময়কার কিছু মিল আছে। আমরা কি ও কে, কেমনতর আমাদের ঐতিহ্য একথা তাঁদের মতো এখনও আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। প্রতীচ্যকরণ, আধুনিকীকরণ এবং নগরায়ণের ধাক্কায় তখনকার মতো আমরা এখনও বিচলিত। অমিল অবশ্য আছে, পরে সেই প্রসঙ্গে আসছি।

তাঁদের আন্দোলন যেমন ঐতিহ্যের গর্বে তাঁদের স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, শিল্পসংস্কৃতি প্রীতির সূত্রে জাতীয়তাবোধ তাঁদের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল, তেমনি বর্তমানে—প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে—গত তিন দশকের আধুনিক শিল্পের অনুকরণচর্চার অন্তে, নিজের দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পিত রূপমণ্ডলের সঙ্গে সাযুজ্য এবং সংযুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শতবর্ষে তাই নন্দলালের ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টির মূল্যায়ন করার প্রয়োজন বেড়েছে নতুন করে।

নন্দলালের সৃষ্টি যদি আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখি তাহলে লক্ষ্য করব যে অনেকক্ষেত্রেই সমকালীন শিল্পচর্চার সঙ্গে তাঁর মানসিকতার মিলের চেয়ে অমিল কম। তা যদি না হতো, তাহলে বিনোদবিহারী এবং রামকিংকরের উত্তরণে তিনি সহায় হতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের ছবির বিশেষত্ব তিনি বুঝতে পারতেন না। অন্ধ অনুকরণের বিরোধী ছিলেন বলেই তিনি বাঁধ দিতে চেয়েছিলেন। বন্যার জলে সব ভেসে যাক, এ তিনি চাননি। তাঁর স্বাদেশিক অভিমানকে ভুল বুঝলে হবে কেন?

ইমপ্রেসেনিস্টদের পরের সময়, খোদ ইউরোপেও যেমন, ছবিকে দ্বিমাত্রিক অনুভবে প্রকাশ করেছে, তাঁর ছবিও তো তাই ছিল। ইমপ্রেসেনিস্টদের আগে গ্রেকো-রোমান থেকে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস পরবর্তী বারোক রোকোকো পর্যন্ত ত্রিমাত্রিক রূপায়ণের সাধনাই করেছে নিও ক্লাসিকাল আমল পর্যন্ত। কিন্তু ইমপ্রেসেনিস্টদের পর থেকেই দ্বিমাত্রিক অভিযানে নানাভাবে রং, নির্মিতি, গঠন ও বিন্যাসে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এদেশে নন্দলালের কাজে দ্বিমাত্রিক চেতনা বিস্ময়কর রচনা বিষয়ে তাঁর স্বাধীনতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর শৈলী কে অসীম সাহসী এবং ভীষণ পরীক্ষামূলক করেছে।

নন্দলালের প্রথম জীবনের "ওয়াশ"-এর কাজে ঐতিহ্যের পুনঃপ্রবর্তন এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলের ছাপ পড়েছে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে—পরিণত অবস্থায়—সেই শৈলী বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিকের প্রশ্নে অনেক বেশি স্বাধীন। তখন তিনি দুঃসাহস ভরে লোকশিল্প এবং গ্রামীণ কারুকলার রাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করেছেন। আদিম এবং উপজাতীয় শিল্পে ডুব দিয়েছেন রত্নের অন্বেষণে। এই কারণে; সরল, আড়ম্বরহীন, অলঙ্কারশূন্য নিরাভরণ আকৃতি ও গঠন এই পর্যায়ের ছবিতে হাজির হয়েছে। আগের আলঙ্কারিক বিন্যাস তিনি ক্রমে তাঁর রচনা থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। এই আশ্চর্য উত্তরণ—অঙ্কনের ঈষৎ দুর্বলতা সত্ত্বেও, স্বাদেশিকতার পিছু টান সত্ত্বেও, আমাকে বিস্মিত করে।

ভিত্তিচিত্র বাদ দিলে নন্দলালের ছবি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তাঁর কাজে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে মোগল এবং দরবারী মেজাজের প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির ঔপনিবেশিক নব্য ধনী শিক্ষাদীক্ষা, নাগরিকতা এবং আভিজাত্যের সঙ্গে নন্দলালের পরিবেশ ও মানসিকতার ফারাক ছিল। তাঁর দেবদেবী, পুরাণ-নির্ভর জগৎটা যেন অজন্তায় গিয়ে নতুনতর বাঁক নিল। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দূরে সরে আসার কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। ১৯০৯ সালে অসিত হালদার নন্দলাল প্রমুখ ছাত্ররা লেডি হেরিংহামকে সাহায্য করার জন্য অজন্তায় যান। সেখানে অজন্তার ভিত্তিচিত্র নকল ও অনুশীলন করার মধ্যে দিয়ে তাঁর চেতনা নতুন এক পর্যায় উন্নীত হয়। অজন্তা থেকে ফিরে আসর পর তিনি দেবদেবী আঁকলেন বটে কিন্তু কোথায় একটা তফাৎ ঘটে গেছে। মিনিয়েচার নয়, তখন থেকে ভিত্তিচিত্রই তাঁর অনুপ্রেরণাস্থল। পরবর্তীকালে তাঁর ফ্রেস্কো ম্যুরালে এই চিন্তার পরিণত রূপ প্রকাশিত। ছবিতে এবং ভিত্তিচিত্রে রং লাগাবার ক্ষেত্রে তিনি এইজন্যে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। একদিকে তাঁর "টাচ" পদ্ধতি বা ছোপ ছোপ করে রং লাগানো, অন্যদিকে চাপিয়ে সমতলভাবে বর্ণলেপন। সীমারেখার সাবলীল বন্ধনীর মধ্যে সমতল রং ব্যবহারের ব্যাপারে নানারকম পরীক্ষা চালালেন। কারণ ইতিমধ্যে জাপান থেকে ওকাকুরার প্রেরিত শিল্পী আরাই কাম্পোর কাছে কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের দক্ষিণের বারান্দায় বসে নন্দলাল জাপানী ক্যালিগ্রাফির প্রথম পাঠ নিয়ে ফেলেছেন। এঁরজন্যেও নন্দলালের পক্ষে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে চলে আসা সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন জাপান ভ্রমণের ফলে নন্দলালের ছবি কালিগ্রাফি রেখার গুণগত অবস্থান আরও স্পষ্ট হল। ধরে ধরে তুলি চালাবার বদলে স্ট্রোক দিয়ে তুলি চালাতে থাকলেন। পরিবর্তন শুরু হয়েছিল অবশ্য তারও আগে। ১৯২০ সালে আচার্য হিসাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবি বদলে গেল। বীরভূমের প্রকৃতি, ঋতুর বৈচিত্র্য, গ্রাম, জীবজন্তু, সাধারণ মানুষ এসে তাঁর পট থেকে পুরাণের পরিমণ্ডলকে সরিয়ে দিল। ভারতের যেখানেই গেলেন সেখানেই ছবিতে প্রকৃতিই হলো তাঁর প্রধান উৎস। শান্তিনিকেতনে এসে "ওয়াশ" বাদ দিয়ে তিনি "টেম্পোরার" কাজ শুরু করলেন। সুতরাং উল্লিখিত দুই পর্ব যে তাঁর ছবির দুই মেরু একথা হয়তো বলা যায়। প্রথম পর্বে তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং ধ্রুপদী, দ্বিতীয় পর্বে তিনি লৌকিক জগতের অধিবাসী।

এই প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের উত্তরণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যামিনী রায় প্রথম দিকে তৈলচিত্রের প্রথাগত ধারার শিল্পী ছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে তিনি লোকশিল্পের সহজিয়া ধারায় অবগাহন করেন। যামিনী রায় যেমন বাংলার পোড়ামাটির মন্দির এবং গ্রাম্য পটচিত্রের ধারাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন, নিজের মতো করে রূপ দিয়েছিলেন, তেমনি নন্দলাল জৈন পুঁথিচিত্র, পটচিত্র এবং গ্রামের খেলনার অনুভবে ছবির দিক পরিবর্তন করেন। হরিপুরার কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপ সজ্জায় তিনি যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন তার মধ্যে তাঁর সবের চরম পরিণত রূপ দেখা যায়। যদিও ওঁদের অমিলও কম নয়। যামিনী রায়ের রেখা অনেক নির্দিষ্ট, রূপারোপিত এবং পটভূমির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আবদ্ধ, নন্দলালের রেখা সেক্ষেত্রে গতিপ্রধান ও ছন্দিত। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে নন্দলাল সীমা-বন্ধনীর রেখাকে অস্বীকার করেছেন। রং রেখা ছাপিয়ে ছলকে উঠেছে। এখানে ওখানে রং লাগাবার সময় ভারসাম্যের জন্য যথেচ্ছ স্বাধীনতা নিয়েছেন।

পাশাপাশি ইওরোপের শিল্প আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি যদি লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে ওঁরা সমকালীন চেতনার সমান্তরাল ছিলেন। পশ্চিমেও রেনেসাঁসের শিল্পচেতনাকে একমাত্র দিকদর্শন হিসাবে দেখতে নারাজ হয়ে, সব দেশের সব কালের শিল্প সম্পাদকে নিজের ঐতিহ্য বলে স্বীকার সাগ্রহে করল, তখন এঁরাও ধ্রুপদী ও দরবারী চিত্ররীতিকে একমাত্র অবলম্বন বলে না মেনে লৌকিক ঐতিহ্যকে তাঁদের উৎস ও প্রেরণাস্থল বলে নির্দেশ করেন। তদুপরি নন্দলাল চীন, জাপান ও দূর প্রাচ্যের শিল্পকলার ধারাকে নিজের খাতে প্রবাহিত করেন। সুতরাং যে স্বদেশী অভিমানের জন্য তাঁদের অভিযুক্ত করা হয় তা ধোপে টেঁকে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সফলতা এবং বিফলতার মধ্যে দিয়েই তাঁর ক্রম বিবর্তন তাঁকে উৎসমুখ থেকে সাগরে পৌঁছে দিয়েছিল। সুতরাং নন্দলাল আমাদের কাছে এক মহান দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তাঁর অন্বেষণ ও চর্চা তাঁর যুগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এক যুগের শিল্পী বা সৃষ্টি আরেক যুগের শিল্পী বা সৃষ্টির মতো হতে পারে না। সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক বিন্যাস, উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক জীবন সবই পাল্টাতে থাকে। সে যুগের প্রত্যয় ও বোধের সঙ্গে এ যুগের পার্থক্যই স্বাভাবিক। এ যুগে কেউ আর মাইকেল বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লিখবেন না। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতোও নয়। কিন্তু তাঁদের রচনা উপভোগ সব কালেই সম্ভব। তাঁদের সৃষ্টির অভিঘাত ও প্রভাব আমাদের জীবনে থেকেই যায়। এবং এই কারণেই আজও আমরা অজন্তা, মোগল চিত্র বা আদিম মানুষের শিল্পকৃতি উপভোগ করি। এগুলোকে আমদের উত্তরাধিকার ও সম্পদ জ্ঞান করি।

নন্দলালের মতন করে ছবি আজকালকার শিল্পীরা আঁকবেন না। এমন কি তাঁর শিষ্য বিনোদবিহারী ও রামকিংকর নন্দলালের ধরনের বাইরে নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছেন। একজন সমকালীন শিল্পী হিসাবে আমি তাই নন্দলাল বসুকে আমার যথার্থ পূর্বসূরী বলে জ্ঞান করি, পথিকৃৎ হিসাবে স্মরণ করি।

মাস্টারমশাই : শিক্ষক নন্দলাল

জয়া আপ্পাস্বামী

শিক্ষক হিসাবে নন্দলাল বসুর অবদান বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার বিষয়ে আলোচনা করে নিয়ে, নন্দলালের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য এবং যে সকল প্রভাবে তাঁর শিল্পিসত্তা ক্রমশ গড়ে উঠেছিল তা বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা দুটি নীতির ওপর নির্ভরশীল। এই দুই নদীসম কল্লোলিনী নীতি মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের সাগরসঙ্গমের দিকে সতত প্রবহমান। এর একটি সৃজনশীলতার ধারা এবং অন্যটি হলো সৃজনশীলতার পরিপার্শ্ব—মুক্তি। এমন একটা আকাশ এবং অবকাশ রচনা করতে তিনি চেয়েছেন যেখানে মানুষের মন মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে। নিজের বাল্য কৈশোরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, ১৯শ শতকীয় শিক্ষানীতি তোতাপাখির মতো জ্ঞানাহরণের ওপর অত্যধিক জোর দিয়ে বিকাশমুখী হতে পারেনি। এ-সম্বন্ধে কবিগুরুর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটা দিক খুবই স্পষ্ট। এটুকু অন্তত স্পষ্ট যে তিনি শিক্ষা বলতে যা বুঝতেন তা খুবই ব্যপ্ত বিস্তৃত। শুধু পড়াশুনো নয়, খেলাধূলা এবং কাজও তিনি শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ধরেছেন। শিক্ষার অর্থ আনন্দঘন আবিষ্কার, উদ্ভাবনময় একটা প্রক্রিয়া এবং অবশ্যই পূর্ণতার স্বাদ। এই পাঠ্যক্রমে কলা, অর্থাৎ চারু কারু সকল কলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। জীবনের অঙ্গাঙ্গী হলো সেসব। শুধু ঘর সাজাবার সামগ্রী বা নিছক বৃত্তি না হয়ে কলাকে তিনি এমনভাবে সমাজদেহে অনুপ্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন যাতে তা হয়ে ওঠে জীবনধর্মী, অভিব্যক্তিসক্ষম এবং মানবিক। শান্তিনিকেতন শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না, বরং তা যেন এমন এক জনপদের নাম যেখানে সকল কলাকে তার পরম্পরাগত স্থান এবং কাজ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলাভবন তৈরী হবার কয়েক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুকে বেছে নিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে। তিনি কবিগুরুর অনুরোধে শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনে যোগদান করেন। নন্দলালের পক্ষে কলকাতা ছেড়ে আসা সহজ হয়নি, কারণ শিল্পকলার সেই পীঠস্থানে শিল্পী হিসাবে তখনই তিনি কিছুটা লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কলাভবনের ভবিষ্যৎ তখনও অজ্ঞাত এবং নতুন পদের দায়িত্ব কম ছিল না। যদিও শিল্পী হিসাবে সেই সময়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকার কোনো কথা নয়, কিন্তু সংগঠক হিসাবে পরবর্তীকালের তাঁর বিরাট ভূমিকা তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে হয়তো পাননি। তিনি নিশ্চয় ঘুণাক্ষরে কল্পনা করেননি শিক্ষক হিসাবে তাঁর ছাত্ররা হবেন জাতির কাছে তাঁর অন্যতর উপহার। যখন নন্দলাল শান্তিনিকেতনে এলেন তখন তাঁর বয়স খুব কম। পরিচিত শিল্পী হলেও তখনও তিনি পরবর্তীকালে তাঁর যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা তা লাভ করেননি। শান্তিনিকেতনের অনুকূল পরিবেশে মনীষীদের সান্নিধ্যে ক্রমে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হলো। সেই সৃজনশীল পরিপার্শ্বের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেলো তার রুচি, মানসিকতা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার সূক্ষ্ম দিকগুলো তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শিল্পিত জীবনচর্চার ক্ষেত্রে কিভাবে তা রূপায়িত হতে পারে তা তিনি বুঝতে পরেছিলেন। শিল্পকলায় তাঁর এই তন্ময়তা অবশ্যই খ্যাতিবৃদ্ধির সহজ মজদুরি ছিল না কখনোই। তাঁর দৃষ্টিতে শিল্পকলা ছিল সৃজনলীলার ব্যাপ্ত বিশাল প্রান্তর। তাঁর ধ্যানে শিল্পকলা প্রাণস্পর্শী, সুরুচিকর এবং গভীর এক প্রভাবের অন্য নাম। তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন তা হোক ব্যবহারিক জীবনে শোভনতার দ্যোতক। মানুষের সকল অভিব্যক্তির নিহিত ব্যঞ্জনা। স্বপ্ন দেখতেন

শিল্পকলার মঙ্গল ও সুন্দর করস্পর্শে প্রাণসঞ্চারিত হচ্ছে মুমূর্ষু সমাজদেহে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল শিল্পকলা হয়ে উঠুক মানুষের সকল অভিব্যক্তির নিহিত ব্যঞ্জনা।

নন্দলাল শিক্ষক হিসাবে ছিলেন অসাধারণ। স্বল্পবাক। কথা বলার চাইতে শুনতেন অনেক বেশি। তিনি যেন আত্মমগ্ন। চিন্তায় ডুবে আছেন। লক্ষ্য করতেন সব। দেখতেন। সকল কাজের মধ্যে সৃজনশীল হয়ে উঠতেন। শেখাবার সময় নিজে করে দেখিয়ে দিতেন। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের গুরুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যেতো তাঁর আচরণ। তাঁর আদর্শ ও জীবনে কোনো অমিল ছিল না। তাঁর জীবনই ছিল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

নন্দলাল ছিলেন অবনীন্দ্র-শিষ্য। গুরুর কাছে নিজের ঋণের কথা

তিনি অকপটে বলতেন। সেইসময় ইউরোপীয় প্রথাসর্বস্ব শিল্পকলার চর্চা চলছিল। অবনীন্দ্রনাথ শিষ্য সমভিব্যহারে ভারতীয় শিল্পকলা ও সাহিত্যের পঠন ও অনুধ্যানে ব্যাপৃত হলেন। এইসব পুঁথিপত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার কোনো সহজ পন্থা ছিল না বলেই অবনীন্দ্রনাথ শিষ্যদের আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। গভীরতর বোধ থেকে কাজ করে যেতে উৎসাহিত করলেন।

নন্দলালের জীবনে অতলস্পর্শী প্রভাব ফেলেন আরও তিন জন—শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধর্মজীবন প্রভাবিত করেন। ঠাকুরের সারল্য, সরাসরিভাব, স্বতঃস্ফূর্ততা অবশ্যই নন্দলালকে আকৃষ্ট করতো, কারণ নন্দলাল নিজেই ছিলেন বিনয়ী এবং সাদাসিধে। নন্দলালের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার বন্ধুতা ছিল। তিনি ভগিনীর অনুপ্রেরণা ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সমর্থক ছিলেন নন্দলাল। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল। গান্ধীজীর প্রতি ভক্তি ছিল অন্যধরনের। তুলনা করলে বলতে হয় তিনি তাঁর দ্বারা জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হয়ে উৎসাহভরে কাজ করতেন। কৃষক শ্রমিকের জন্য গান্ধীজীর মমত্ববোধের মধ্যে নন্দলাল মাটি ঘেঁষা মানুষের প্রতি তাঁর নিজের ভালবাসার সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। ওঁদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনই যে মঙ্গলকর গান্ধীজীর মতো একথা তিনিও বিশ্বাস করতেন। তাঁদের কৃষ্টির প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল আরও ব্যাপক এবং তা নন্দলালের জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত করেছিল। কবিগুরু ছিলেন মূলত আশাবাদী এবং মানবিক। তাঁর জীবনদর্শন ছিল অধ্যাত্ম মূল্যবোধের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। এক হিসাবে ধরতে গেলে তাঁর শিক্ষানীতি এবং শিল্পবোধ ছিল কালাপাহাড়ী। তিনি দাবী করতেন প্রত্যেক শিশুর অধিকার আছে নিজেকে গড়ে তোলার। তখনও এদেশে এমন অদ্ভুত কথা কেউ শোনেনি। তিনি এ ব্যাপারে এমন সর্বংসহা ছিলেন যে সে-যুগে বসে তাঁর মতো অন্য কেউ একথা ভাবতে পারেননি। প্রকৃতি এবং জীবনের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল গভীর। তার বৈভব এবং সৌন্দর্য যেমন তিনি গ্রহণ করতেন অনায়াসে তেমনি অক্লেশে তার দুঃখদায়ক রূপ এবং খামখেয়াল মেনে নিতেন। প্রকৃতির সম্মুখে বিচলিত হতেন না তিনি। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, ঋতুরঙ্গ—এসবই উৎসবের মতো করে উদ্‌যাপিত হতো শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতিই যেন ছিল সকল কর্মের আধার এবং পরিবেশ। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে এখনও কখনো কখনো শান্তিনিকেতনকে "আশ্রম" বলা হয়ে থাকে—অর্থাৎ মুনি ঋষির তপোবন। কলাভবনে এসে নন্দলাল যে কাজের স্বাধীনতা এবং সুযোগ পেলেন তা মূল্যবান বলে মনে করতেন। সেখানকার আড়ম্বরহীন জীবন, শ্রদ্ধা ভালবাসা এওতো পরমপ্রাপ্তি। শান্তিনিকেতনকে তিনি তাই মনে করতেন তাঁর ভিটেমাটি। আশ্রমের শান্ত জীবনে অফুরন্ত ছাত্রধারা, বন্ধু এবং অতিথি অভ্যাগতের আগমন নির্গমন—তাঁর মনের দুকূল ছাপিয়ে উঠতো। নব নব গানে বাতাস হয়ে উঠতো ভারী। নতুন নতুন কবিতা আর নাটক নিত্য যোগাত চিন্তার খোরাক। পরিবেশটাই ক্রমাগত পালটে যেতো। ক্রমবিবর্তিত হতো যেন। তাই এতে সামিল হওয়ার অর্থই হতো দ্বৈরথ সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দেওয়া। অনুগতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা শান্তিনিকেতন স্থপতির মতো গড়ে তুলেছিলেন নন্দলাল তাঁদেরই একজন।

নন্দলাল নীরবে ধৈর্য ধরে নিজের কাজ করে যেতেন। তাঁর জীবনে অস্থিরতা, নাটক বা চটক ছিল না। প্রকৃতির মতোই ধীরে ধীরে কলাভবনকে গড়ে তুললেন। দৃঢ় ভিতের ওপর গড়ে উঠল যেন একটা বহুতল ইমারত।

হাতে গড়ে নেওয়ার বিষয় নন্দলাল ছাত্রদের শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতেন। তাঁর শিক্ষণপদ্ধতির মধ্যে চারুকলার অঙ্গীভূত ছিল কারুকলা। কারুকৃতির উত্তরণই তো চারুকৃতি। শিল্পী হওয়ার অর্থ অভিজাত কোনো বৃত্তির সুযোগভোগ করার অধিকার অর্জন নয়, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নকশা করা। নকশা করার ব্যাপারে তাঁর মুনশীয়ানা ছিল অসাধারণ। মঞ্চসজ্জা থেকে পুস্তক সচিত্রকরণ—সব কিছুই দক্ষতার সঙ্গে করতে পারতেন সহজে। নকশার বিষয় তাঁর আগ্রহ বস্তুত নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্যের অন্য নাম। সব কিছু হবে সুচারু এবং মাপমাফিক। ভারসাম্যের ত্রুটি না ঘটে। থাকে যেন সুরসঙ্গতি। এই বোধ, এই সংবেদ তিনি রূপবন্ধ গড়ে তোলার সময় প্রয়োগ করতেন। ছোটই হোক বা বড়ই হোক নন্দলাল সব কাজেই ছাত্রদের সঙ্গে হাত লাগাতেন। শান্তিনিকেতনের উৎসব সজ্জার দায়িত্ব থাকতো কলাভবনের ছাত্রদের হাতে। রবীন্দ্র-নৃত্য বা গীতিনাট্যের মঞ্চ সজ্জা করার জন্যে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তেমনি আবার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের প্যাণ্ডেল সাজানোর ডাক পড়লে, সমস্ত কলাভবনই হতো তাঁর সঙ্গী। নতুন এবং অদ্ভুত মাধ্যমে কাজ কেমন করে করতে হয় সেটা তাঁদের শেখাতেন নিজে কাজ করতে করতে। ছাত্ররা এইভাবে বহুমুখী হবার বিদ্যা আয়ত্ত করতে।

শান্তিনিকেতনের পরিবেশের জন্যই নন্দলাল তাঁর নিসর্গপ্রীতি পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করতে পারতেন। নিসর্গই ছিল তাঁর শিল্পকলার উৎস। তিনি নানা জায়গায় ঘুরতেন। পর্বত এবং তেপান্তর, নদী এবং সমুদ্র ভালবাসার চোখ নিয়ে দেখতেন বলে ছবি এমন সজীব হতো। 'দর্শন' এখানে 'সন্দর্শন'—নিসর্গের সঙ্গে তৈরী হয়েছে এক অচিন্ত্য ভেদাভেদ। ছোট ছোট রেখাচিত্রে নিসর্গের মুহূর্তের মেজাজটা ধরেছেন। কলাভবনের ছাত্ররা ডেস্কে বসে মডেল দেখে আঁকবে শুধু, এটা কস্মিনকালেও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। বরং তিনি আশা করতেন তাদের পরিক্রমা হবে পর্যবেক্ষণ। সেখান থেকে উঠে আসবে রেখাচিত্র। গাছের অন্ধকার গড়ন চোখ খুলে দেখতে হবে। ঘাস এবং পোকামাকড়ের রূপ রেখার লেখায় ধরতে হবে। তিনি তাদের বর্ষণ এবং রামধনু দেখে উপভোগ করতে শিখিয়েছেন। তেমনি পদ্ম এবং পদ্মপুকুর। শিমূল আর পলাশ। স্টুডিওর ভেতর থেকে ছাত্রদের ডেকে নৈসর্গিক দৃশ্যের দিকে নিয়ে যেতেন। তিনি চাইতেন তারা দেখবে। দেখে আনন্দ পাবে। পর্যবেক্ষণ করতে শেখাতেন তিনি। নিরীক্ষণ করতে। এই ঈক্ষণই পরবরর্তীকালে তাঁদের উত্তরণ ঘটাতো।

কলাভবনে প্রত্যেককে আলাদা করে শেখানো হতো। ব্যক্তিগত ভাবে। এই কারণে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হতো না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই শিক্ষা দেওয়া হতো। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠতো। ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের খবরদারী ছিল না। টুকটাক দেখিয়ে দেওয়া, কিন্তু পুরোপুরি হাত লাগানো কখনোই নয়। ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির ওপর জোর দেওয়া হতো। সাধারণভাবে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা বহুমুখী হতো। করণকৌশল আয়ত্ব করতে অনুপ্রাণিত করা হয়ে থাকে অভিব্যক্তির অভিনবত্বের জন্যেই শুধু। প্রথম থেকে নিজের মতো করে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় যাতে সে কাজে আনন্দ পেতে পারে। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ছন্দ এবং ঈক্ষণই হলো মূল কথা, তথ্যের অনুকরণ নয়। কলাভবনে অনুকূল পরিবেশ রচনার দিকে নন্দলাল প্রথম থেকেই যত্নবান ছিলেন। পরিপার্শ্ব যে শিল্পীর আত্মবিকাশের পক্ষে খুবই জরুরী এটা তিনি মনে করতেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর কাজ ছিল পথনির্দেশ দেওয়া। অনুপ্রাণিত করা। ছাত্রদের সঙ্গে হাতে কলমে কাজ করা। কথায় নয় কাজে তার সঙ্গে সমানে তাল ফেলে চলা। সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বেশ কয়েকজন তাঁর ছাত্র হয়ে এসেছিলেন। নিজের ব্যক্তিত্ব ছাত্রদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেননি নন্দলাল। উত্তরকালে ছাত্রদের উত্তরণ তাঁরই শৈলীর বিস্তারিত এবং পরিপূরক রূপ হিসাবে প্রতিভাত হল।

"বাংলা কলমের" এবং শান্তিনিকেতনী শৈলীর সমালোচকরা প্রায়শই অভিযোগ তুলেছেন যে এইধারা পুনঃপ্রবর্তনবাদী। প্রাচীন ধারার অনুকরণ করার জন্য নন্দলালকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে পরিজ্ঞাত ইতিহাসে তাঁর শৈলীর কোনো নজির নেই। নন্দলালের কাছে পরম্পরা ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিপুল অর্থের মতো। এই বিত্ত ঝুঁকি নিয়ে লগ্নী করলে সুদে আসলে সেটা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় তিনি বুঝেছিলেন। ওকাকুরার উক্তি : শিল্পকলা হল নিসর্গ, পরম্পরা এবং অভিনবত্ব। নন্দলাল এই মতামতকে পুরোপুরি সমর্থন করতেন। নিসর্গের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হলে শিল্পকলা দুর্বল এবং কৃত্রিম হয়। পরম্পরার সঙ্গে বিযুক্ত হলে তা হয় অপেশাদারী। অভিনবত্ব ব্যতীত তা নির্জীব এবং উদ্দেশ্যহীন। সর্বোপরি নন্দলালের শিল্পকলা হলো সাধনা। এরজন্য চাই ধৈর্য এবং তিতিক্ষা, ধ্যান এবং প্রেম।

ংক্ষেপে তা হলো পূজা। ভক্তিমার্গেই তাঁর সিদ্ধি।

কলাভবনের পরিবেশ ছাত্রদের মনে ভিন্ন মতাবলম্বী সহ্য করতে শখায়নি শুধু, কিন্তু আপন করে নেবার মতো উদারতা দিয়েছে। ছাটখাটো জিনিস থেকে শিল্পশিক্ষা করার মতো মুক্ত দৃষ্টি তৈরী করেছে। লোকশিল্পের সহজিয়া পন্থা যেমন তেমনি ধ্রুপদী রূপবন্ধ থেকে গ্রহণ চরার মতো মানসিকতা দিয়েছে। অন্যান্য সভ্যতার শিল্পকৃত্তিতে গ্রহণীয় কছু আছে কি-না সেটা আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করেছে। চিরায়ত অবদানকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দিয়েছে। বিচার এবং সমালোচনা করার শক্তি অর্জনের ফলে শিল্পের মান বুঝতে সাহায্য হয়েছে। কলাভবনের যাদুঘরে সংগৃহীত শিল্পবস্তু ছাত্ররাই তো অনেক সময় নিজেদের হাতে সাজিয়ে থাকে।

শিল্পকলা সমালোচনা এবং ইতিহাসকে নন্দলাল যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও, শিল্পসৃষ্টির স্থান তাঁর কাছে এসবের ওপরে। করণকৌশলে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ এবং নিপুণ। বহুরকম মাধ্যমে কাজ করেছেন—চীনা কালিতে রেখাচিত্র থেকে নানাধরনের ভিত্তিচিত্র, রেশমের ওপর রঙীন ছবি আঁকা, কাঠের পাটায় কাজ—ব্যাপক ছিল তাঁর রীতিপ্রকরণ। শিল্পীকে তিনি মনে করতেন মিস্ত্রী। কারুকার। যন্ত্রপাতি আর মাধ্যমের ওপর তাঁর দখলই সাফল্যের চাবিকাঠি। তা নাহলে অভিব্যক্তি সাবলীল স্বচ্ছন্দ হবে কি করে? শেষ হলে কি হবে মনশ্চক্ষে সেটা তো দেখে নেওয়া চাই! দ্বিতীয়ত তিনি মনে করতেন শিল্পী হলো সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। সমাজদেহ সুস্থ রাখার দায়িত্ব বিশেষভাবে তাঁর আছে। শিল্পীর কাজ হলো তার চারপাশের মানুষের মধ্যে পরিশীলিত রুচি তৈরী করা। তাদের সৃজনশীলতার উদ্বোধন ঘটানো। শিল্পীর উপলব্ধি করা উচিত যে তিনি নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্য কাজ করেন।

নন্দলাল সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যাতে তাঁর প্রতিটি ছাত্র শিল্পীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হন। তখনকার দিনে শিল্পী হওয়ার অর্থই ছিল আদর্শের পেছনে ছোটা কারণ ছবি এঁকে রোজগারপাতিতো আর হতো না। একটি ছেলে শিল্পী হবে বলে ঠিক করলে পরিবারের অন্যরা তাকে অবজ্ঞাই করতো—"না! ছোকরা গোল্লায় গেল দেখছি"। অনেক ত্যাগ এবং অনেক শিক্ষার পর তবেই সে নিজের পায়ে দাঁড়াতো! প্রত্যেক ছাত্রের যোগ্যতা এবং বিশেষ গুণগুলি নন্দলাল খুঁজে বার করতেন। সে-বিষয়
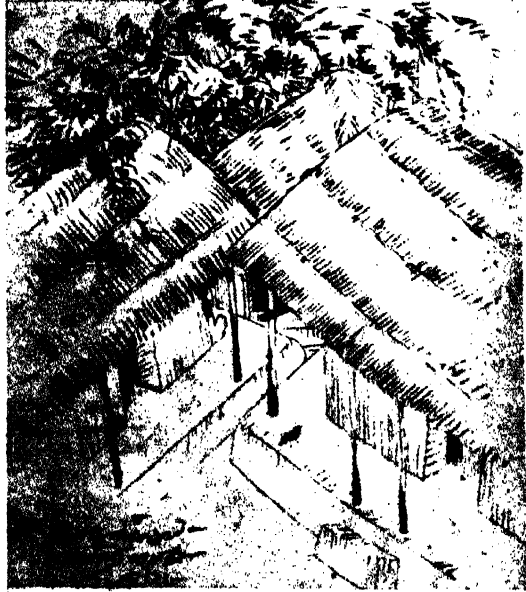
তাকে সচেতন করতেন। ছাত্রকে ছেলের মতো ভালবাসতেন, তাই নিয়মিত পোস্টকারডে ছবি এঁকে পাঠাতেন। ঠিকানার জায়গায় ছাত্রের নামের তলায় লিখতেন "শিল্পী"। এখন নন্দলালের ছাত্রেরা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছেন। অনেকেরই নাম ডাক হয়েছে খুব। অনেকেই শিল্প শিক্ষকতা করেন এবং গুরুর আদর্শ এবং শিক্ষণ পদ্ধতির স্মৃতি তাঁর বুকে বয়ে বেড়ান। অধুনা ভারতবর্ষে অসাধারণ শিল্পশিক্ষক হয়েছেন অনেকে, কিন্তু "মাস্টারমশাই" এই আদরের ডাক পাবার যোগ্যতা বোধহয় ওঁরই বেশি, কারণ গুরুর গুরুদায়িত্ব ওঁর মতো কেউ পালন করেননি।

আচার্য নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা

প্রভাস সেন

নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর—গুরু আর দুই শিষ্য। তিরিশের দশক থেকে শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদীক্ষা, প্রেরণা ও গর্বের আধার তিন দিকপাল। পিতৃপ্রতিম নন্দলাল শিক্ষাদানের বাঁধা রাস্তা পরিত্যাগ করে কলাভবনকে সংগঠিত করেছিলেন একটি বৃহৎ পরিবারের মতো। বিনোদবিহারী আর রামকিঙ্করকে আমরা সেযুগে দেখেছি বিদ্যালয়ের কল্যাণে উৎসর্গিত প্রাণ তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গী ও সহকারী। আর ছিলেন কন্যা গৌরী ভঞ্জ আর পুত্র বিশ্বরূপ। গৌরী দেবী নানা কারুকলা শিক্ষণের ক্ষেত্রে এবং বিশ্বরূপ দক্ষ গ্রাফিক শিল্পী হিসাবে কলাভবনে যোগ দেন ১৯৩৪ ও ১৯৩৬ সালে নন্দলালের সাহায্যকারীরূপে। বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর সহকর্মী হিসাবে যোগ দেন যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে। তিরিশের দশকের ছাত্র এ পেরুমলও ঐ দশকের শেষের দিকে কলাভবন গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ধীরেন দেববর্মন, বিনায়ক মাশোজী আর সুকুমারী দেবী কলা ভবনের কর্মী ছিলেন সম্ভবত ২৮/ ২৯ সালে। কিন্তু তিরিশের দশকে তাঁরা ছিলেন না। মাসোজী আবার কলাভবনে যোগ দেন চল্লিশের দশকের প্রথমে। ধীরেনদা আরও পরে।

নন্দলাল কলাভবনকে আর্ট স্কুল জাতের শিল্প শিক্ষাগার করতে চান নি কখনও। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় আদর্শকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তিনি মেলে ধরেছিলেন শিল্পবোধের একটি বিচিত্র আনন্দময় পথ। ছবি আঁকা বা মূর্তিগড়া শিক্ষার কাজ হতো পুরোন যুগের গুরুগৃহের মতো। পাশাপাশি ছাত্র শিক্ষকদের কাজ চলতো। একসঙ্গে স্টাডি, স্কেচ। ছাত্রদের কাজের দুর্বলতা দেখিয়ে বুঝিয়ে হয়তো আরও স্টাডি বা স্কেচ করবার উপদেশ দিতেন বড়রা। চলতো নানা দিকে অনুসন্ধান শিল্পের, সৌন্দর্যের।—শিল্প ও সৌন্দর্যের নতুন উপলব্ধির।

একসঙ্গে নানা ধারায় নতুন নতুন সৃষ্টি ছাত্রদের যুগিয়েছে প্রেরণা। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আর শিল্পক্ষেত্রে সবাই মিলে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলাপ আলোচনা তাদের দিয়েছে আত্মবিশ্বাস আর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাদের শিল্পরুচিবোধ। গুরুশিষ্য সবারই শিল্পচর্চার কাজ চলেছে নির্বাধ আনন্দে। এগিয়ে চলবার প্রয়োজনীয় সাহায্যটুকু সব সময় ছাত্ররা পেয়েছেন বড়দের কাছ থেকে—নন্দলালের সতর্ক দৃষ্টির সামনে। তিনিই ছিলেন গুরু—"মাষ্টারমশাই"। আর সবাই বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর, গৌরী, বিশ্বরূপ কখনও নিজেদের মাষ্টার মনে করেননি। কলাভবনের প্রথম যুগে নন্দলাল নতুন ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অগ্রসর ছাত্রদের সাহায্য নেবার প্রয়োজনবোধ করেছিলেন। সহকর্মী পর্যায়ে উন্নীত হবার পরও সেই সুযোগ্য ছাত্ররা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও রদবদলের দরকার মনে করেন নি। ফলে কলাভবনে গড়ে ওঠে ছাত্রশিক্ষকদের মধ্যে এমন এক অপূর্ব সম্পর্ক—যা আজও সেখানে অংশত বিদ্যমান আছে।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নন্দলাল শুধু ছবি আঁকবার বা মূর্তি গড়বার চর্চার

শিশুশিল্পীদের ছবি আঁকা শেখাচ্ছেন মাস্টারমশাই নন্দলাল

মধ্যে সীমিত রাখেননি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানবতাবোধ এবং রুচিবোধ জাগ্রত করা ও শিল্পদৃষ্টি খুলে দেওয়া তাঁর শিক্ষাসূচির অঙ্গ ছিল।

মাষ্টারমশাইয়ের নির্দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে যেমন ছেলেমেয়েরা বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখতো, তেমনি শিখতো গ্রামীণ সরল ও অনাড়ম্বর স্থাপত্য আর কারুশিল্পের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে।

ছাত্রছাত্রীদের রুচিবোধ একটু জাগ্রত হলেই তাঁদের উৎসাহিত করতেন নিজ নিজ অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও গ্রামীণ শিল্পগুলির মূল্যায়ন করতে। তিনি আমাদের দেশের দো আঁশলা শহুরে সংস্কৃতি সম্বন্ধে খুব আস্থাবান ছিলেন না। নন্দলাল মনে করতেন যে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শিল্পের গভীরে প্রবেশ করতে পারলেই তবে শিল্পী পায়ের নীচে মাটি পাবেন, যার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর পক্ষে সৃষ্টিধর্মী শিল্পচর্চা সম্ভব। নন্দলাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিল্পী সমাজ ও পারিপার্শিককে এড়িয়ে গিয়ে শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন না। মহাত্মা গান্ধী যখনই নন্দলালকে শিল্পীহিসাবে ডাক দিয়েছেন তিনি কখনও পিছিয়ে থাকেননি। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কংগ্রেসের নানা অধিবেশনে অতি সাধারণ গ্রাম্য উপাদান ব্যবহার করে তিনি বিশাল কংগ্রেস মণ্ডপগুলির যে অপূর্ব অথচ সহজ সরল নকশা ও সাজসজ্জার প্রবর্তন করেছিলেন তা মণ্ডন শিল্প সম্বন্ধে দেশের রুচিবোধ বদলে দিয়েছিল। হরিপুরা কংগ্রেসের সময় গ্রামীণ জীবনের উপর যে পোষ্টারগুলি তিনি কয়েকদিনের ভিতর অঙ্কন করেছিলেন, সেগুলো তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলির অন্যতম।

শান্তিনিকেতনের প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানে, নাটকে, মাষ্টারমশাই তাঁর ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন নানা নতুন নতুন পরিকল্পনায়। উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি, অলঙ্করণ, রঙ্গমঞ্চের পট, আলোক সংস্থাপন, অভিনেতা অভিনেত্রীদের পোশাকআশাক সাজসজ্জা সব নিয়ে পড়াশুনা, আলোচনা, পরীক্ষা, নিরীক্ষা প্রতিবার অনুষ্ঠানগুলিতে এনে দিতো নতুন বৈশিষ্ট্য, নতুন চমক। এসব চমকে প্রগলভতা ছিল না। ছিল সংযত শিল্পবোধের সৃষ্টিশীল প্রকাশ। ধীরে ধীরে সারা দেশে এ ধরনের অলঙ্করণ ও মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়েছিল।

কলাভবনের ছাত্রাবাস, ভোজনাগারের সামনের চৈত্য এবং রবীন্দ্র-গৃহ শ্যামলী জুড়ে ছড়ান আছে নন্দলালের গ্রামীণ স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহের প্রকাশ। কলাভবন ছাত্রাবাসে বর্তমানে কাল বাড়ি বলে পরিচিত মাটির বাড়িটি ছাড়া অন্য বাড়িগুলো নেই—যেগুলি থেকে অন্তত একটি বাড়ি গ্রামীণ স্থাপত্যের দিক থেকে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। শ্যামলী বাড়ীর নকশা প্রয়াত শিল্পী সুরেন কর মশাই করেছিলেন। কিন্তু গ্রামীণ স্থাপত্য ও গ্রামীণ নির্মাণ উপকরণ নিয়ে নন্দলালের আগ্রহ ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবেও সুরেন্দ্রনাথকে শ্যামলীর নক্‌শা করতে সাহায্য করেছিল।

এই বাড়িগুলির অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্য এখনও সারা দেশে নজীরবিহীন। বাঙলা দেশে মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ফলক এঁটে অলঙ্করণের রেওয়াজ ছিল ইংরাজ জমানার প্রথম যুগ অবধি। নন্দলাল তাঁর সহকর্মী ভাস্কর রামকিঙ্কর ও ছাত্রদের নিয়ে সেই ঐতিহ্যের আধুনিক প্রয়োগের পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন মাটির বাড়িগুলির দেওয়ালে। পোড়ামাটির ফলক নয়—মাটির দেওয়ালের সঙ্গে মিশ খাওয়া মাটিরই অলঙ্করণ। নানা উপাদান মিশিয়ে ও আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে তাকে শক্ত ও জলপ্রতিরোধ করা হয়েছে।

পাকা বাড়িগুলিতে হয়েছে দেয়ালচিত্র নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা। দেশ বিদেশের দেওয়াল চিত্র অঙ্কনের কলাকৌশল সংগ্রহ করেছেন প্রিয় শিষ্য বিনোদবিহারীকে দিয়ে। প্রথমে পোড়ামাটির ফলকের উপর তারপর দেওয়ালে দেওয়ালে চলেছে মহা উৎসাহে সবাই মিলে নানা ধরনের দেওয়াল চিত্রের কাজ। জয়পুর থেকে সেখানকার ঐতিহ্যগত দেওয়াল চিত্রের শিল্পীকে আনিয়ে নন্দলাল ছাত্রদের নিয়ে তাঁর কাছে করণকৌশল শিখেছেন যার অনবদ্য ফলশ্রুতি হলো পুরোন গ্রন্থাগারের (বর্তমান পাঠভবন দপ্তর) বারান্দার দেওয়াল চিত্রগুলি। মাষ্টারমশাই ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্র হয়েই বৃদ্ধ কারিগরের কাছে কাজ শিখেছিলেন। নন্দলালকে আমরা কখনও পরিপাটি পোশাকে দেখিনি। অতি সাধারণ গ্রামের মানুষের মতো পোশাক পরতেন খাদিতে তৈরী। জয়পুরের বৃদ্ধ কারিগর ছাত্রদের ধমকাতেন নন্দলালকে দেখিয়ে—"তোমরা শিল্পী হয়ে কাজ শিখতে এতো দেরী করছো আর দেখো তো এই মিস্ত্রী কেমন তাড়াতাড়ি সব শিখে নিয়েছে।"

সেকালের শান্তিনিকেতনে বেশ কিছু খাটা পায়খানা ছিল। মেথর রসিক ছিলো তার দলবল নিয়ে সেগুলি পরিষ্কার রাখবার জন্য। গান্ধীজী যেদিন তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার ফনিকস আশ্রমের অধিবাসীদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রথম এসে উঠেছিলেন—সেই দিনটির স্মরণে আজও সেখানে গান্ধী পূণ্যাহ পালন করা হয়। ঐ দিনটিতে সেকালে আশ্রমের সেবা কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে ছুটি দেওয়া হতো। এবং ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী আর আশ্রম পরিবারভুক্ত সবাই সবরকম সেবার কাজ নিজেরা করতেন। অতো লোকের হাতের স্পর্শে আশ্রম তকতকে ঝকঝকে হয়ে উঠতো। প্রতি বছর নন্দলাল বেছে নিতেন মেথরের কাজটি সঙ্গে চেলাও জুটে যেতো—তাঁর ছাত্রদেরই একটি দল। রান্নাঘরের বাগানের জন্য কমপোষ্ট সারের খাদ তৈরী হতো—আর পায়খানার এবং সাধারণ রান্নাঘরের ড্রেইন পরিষ্কার করা, ময়লা, পচাপাতা আর কাটাজঙ্গল দিয়ে সেটা ভরাট হতো আর উপরে পড়তো মাটির আস্তর।

আশেপাশের নানাগ্রামে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা যে বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্র চালাতেন—সেগুলিতেও কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহই বেশী ছিল। হাসপাতালে সেবার কাজে বা পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে অসুখবিসুখ লাগলে মাষ্টারমশাই তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এগিয়ে যেতে কখনও ইতস্তত করতেন না। আবার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর কড়া নজর ছিল। আমার স্বাস্থ্য কোনও দিনই খুব ভাল ছিল না। এবং মাষ্টারমশাই আমার স্বাস্থ্য ভাল করবার জন্য কত যে চেষ্টা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। একবার অনেক ভেবেচিন্তে তিনি আমাকে চিরোতার জল খাওয়ান স্থির করলেন। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। সকালবেলা স্টুডিওতে ঢুকতেই একহাতে বোতলে চিরোতার জল আর অন্য হাতে গ্লাস নিয়ে মাষ্টারমশাইয়ের প্রবেশ। নিরুপায় আমার চিরোতার জল পান, তারপর একটি লজেন্স লাভ। দু' তিন দিন পর অসহ্য হওয়াতে মাষ্টারমশাইকে বোতল হাতে আসতে দেখলেই জানলা দিয়ে বেরিয়ে দেয়াল ঘেঁসে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে শিখলাম। মাষ্টারমশাই দু' তিনবার খোঁজ করে না পেয়ে শেষে কলাভবনের পিওন কালোকে খাওয়াবার ভারটা দিতেন—ফলে না খাওয়ার মাশুল হিসাবে আমার রোজ কিছু বিড়ি খরচ হোত। মাসখানেক খাবার পর চিরোতাতে কোনও উন্নতি না দেখে মাষ্টারমশাই আমাকে রোজ বিকেলে দশ মিনিট মাটি কোপাবার কাজে লাগিয়েছিলেন। নিজে বসে থাকতেন।

এইভাবে মাষ্টারমশাইয়ের কলাভবনের সংসার চলেছিল সেকালে। যে ছেলেমেয়েরা আসতেন তাঁদের সবার মধ্যে বড় চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর হবার মালমশলা থাকতো না। যাদের ভিতর থাকতো তাদের স্ফুরণের যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা যেমন তখন ছিল, তেমনি ছিল নকশা বা অন্যদিকে প্রতিভাধারী অথবা দুর্বল ছাত্রদের শিল্পের নানা সমান্তরাল ক্ষেত্রে বিকাশ লাভের সুযোগ সুবিধা। সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভিতর এমন একটি রুচিবোধ তৈরী হয়ে যেতো যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার পর তাঁদের কাজকর্মের ভিতর এই বৈশিষ্টটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্বন্ধেও নন্দলালের নানা চিন্তাভাবনা ছিল। নানা কারুশিল্প শিক্ষা জীবিকা অর্জনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। মেয়েদের জন্য কিছু হাতের কাজ শিক্ষা আবশ্যিক ছিল। শান্তিনিকেতনে সেযুগে যে একটি সৃজনশীল পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তাতেও নন্দলালের অবদান ছিল অমূল্য।

রবীন্দ্রনাথ এই ছোট্ট জায়গাটিতে তাঁর এবং তাঁর বিদ্যালয়ের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বেশ কিছু মানুষকে একত্রিত করেছিলেন। তাঁদের কিছু ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং কিছু ছিলেন সাধারণ মানুষ। 'এই মানুষকটি, তাঁদের পরিবার আর দেশবিদেশ থেকে আসা কিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর গ্রামীণ পরিবেশে তৈরী হয়েছিল শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং বিশ্বভারতী। অর্থ এবং নানা ধরনের জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার অভাব ছিল আশ্রম জীবনের অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন যাদুবলে একটি উচ্চস্তরের সৃজনশীল জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরী করে নিতে পেরেছিলেন সেখানে। অতি সামান্য উপচার আর উপকরণ নিয়ে যে আশ্রম জীবন গড়ে উঠেছিল সেখানেও সৃজনশীল ঐশ্বর্যের ছোঁয়া লেগেছিল। সে ঐশ্বর্য ছিল সারল্যের ঐশ্বর্য—রুচির ঐশ্বর্য।

কালোবাড়ির দেওয়ালে নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের করা কয়েকটি রিলিফ ভিত্তিচিত্র

দৈনন্দিন আশ্রম জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এই যে ঐশ্বর্যের সমাবেশ সেটি ছিল প্রধানত নন্দলাল ও তাঁর কলাভবনের অবদান। সেযুগের আশ্রমের সামর্থ্য অনুযায়ী কবি প্রবর্তিত নানা উৎসব অনুষ্ঠান নন্দলাল সাজিয়েছেন প্রাকৃতিক পরিবেশ, সরল গ্রামীন শিল্প ও গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠান থেকে অভিযোজিত উপচার দিয়ে। এই সব উৎসব অনুষ্ঠানের অনাড়ম্বর সৌন্দর্য আশ্রমবাসীদের রুচির প্রসার ঘটিয়েছে। শান্তিনিকেতনে ও পরে শ্রীনিকেতনে শিল্পভবনে নন্দলাল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নানা কারুশিল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁতে নানা ধরনের নক্‌শার শাড়ী তৈরী হয়েছে। চাদর, ধুতি, বিছানার আচ্ছাদন, টেবিল ঢাকা, গামছা, নানা রকমের জামাকাপড় সবই নতুন ধরনের নক্‌শায় করা—সুরুচিপূর্ণ কিন্তু সহজ সরল অনাড়ম্বর। রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী নতুন শিল্প এনেছেন বিদেশ থেকে—বাটিক, চামড়ার কাজ। এদেশের প্রয়োজনমতো তার রূপরসের বদল করেছেন নন্দলাল আর তাঁর ছাত্ররা কলাভবনে। নানা লৌকিক অনুষ্ঠানের আল্পনা নিয়ে তার সঙ্গে প্রকৃতির বিচিত্র নকশার অলঙ্করণ যোগ করে গড়ে উঠেছে নয়নাভিরাম নতুন আলপনার নানা অভিব্যক্তি। কুমোরের হাঁড়ি-কুড়ির আদলে মাটির বাসনকোসন তৈরী হলো গ্লেজযুক্ত করে নানা নকশায়।

কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা নতুন দৃষ্টিতে দেখে অবহেলিত গ্রামের কোণা থেকে অতি সামান্য মূল্যে কারুশিল্পের মহার্ঘ সম্পদ সংগ্রহ করে আনলেন। আশ্রমবাসীরা সে সব দেখেছেন অবাক হয়ে। ধীরে আশ্রমের সাধারণ মানুষের রুচির বদল এসেছে। একসময় কলাভবনের দরজা খুলে দিলেন নন্দলাল আশ্রমের সমস্ত গৃহিণী ও কন্যাদের জন্য। তাঁরা দু'তিন বছর করে কাটাতে শুরু করলেন কলাভবনের সৃজনশীল পরিবেশে। শিখলেন নানা ধরনের কারুশিল্প, কেউ বা ছবি আঁকতে। ধীরে ধীরে প্রতিটি গৃহে সুরুচির ছোঁয়া লাগলো। জীবন এবং জীবনযাপনের উপকরণে লাগলো সহজ সৌন্দর্য সৃষ্টির স্পর্শ।

নন্দলাল বিশের দশকে স্বপ্ন দেখেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিবেশে তাঁর শিল্পী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি উপনিবেশ গড়ে তোলবার—যেখানে শিল্পীরা সহজ সরল পরিবেশে সৃজনশীল শিল্প ও কারুশিল্পের চর্চা করবার সুযোগ পাবেন। শিল্পভবনে নানা কারুশিল্প ও নকশায় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য এবং তাদের তৈরী জিনিসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখে তাঁর এদিকে আগ্রহ জন্মেছিল। নন্দলালের প্রথমদিকের ছাত্র কবিশিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহী সহকারী। গড়ে উঠলো কারু সংঘ নামে প্রতিষ্ঠান কলাভবনের ছাত্র ও প্রাক্তনদের নিয়ে। কাজ-কর্মের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ, কলকাতা, বম্বাই, আহমেদাবাদ থেকে অর্ডার সংগ্রহ, শিল্পীদের মধ্যে কাজ বণ্টন ক্ষণে ক্ষণে মাস্টারমশাই-এর কাছে গিয়ে ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনা আর তার সঙ্গে চললো প্রভাতমোহনের কবিতা লেখা, ছবি আঁকা আর রাত্রে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্রে পড়াবার কাজ। মাস্টারমশাই তাঁর এই দুরন্ত যৌবন ভরা ছাত্রটিকে বেশ ভালবাসতেন এবং নানা ক্ষেত্রে ছড়ান তাঁর কাজগুলিকে উৎসাহ দিতেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন আরও অনেক আদর্শবাদী যুবকের মতো প্রভাতমোহনকেও ডেকে নিল। এরপরও কারু সংঘ চলেছিল কিছুদিন—এখনও বোধ হয় নবকলেবরে তার অস্তিত্ব আছে—কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের বিশ দশকের স্বপ্ন সফল হয়নি।

নন্দলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা আমরা প্রথম জানতে পারি ১৯১৪ সালে। ঐ সালে যুবা শিল্পী নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা জানান হলো। ১৯১৭ সালে কবি নন্দলালকে শিলাইদহে এসে, কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শিল্পী মুকুল দেও ঐ সময় শিলাইদহে ছিলেন। কবি শিল্পীদের নানা বই থেকে পড়ে শোনাতেন। শিলাইদহের অপূর্ব পারিপার্শিক নন্দলালকে মুগ্ধ করেছিল—যার পরিচয় বহন করে ঐ সময় আঁকা তার বহু স্কেচ ও স্ট্যাডিগুলি। পদ্মার উপর দিয়ে হাঁস উড়ে যাবার প্রসিদ্ধ চিত্রটিও তিনি শিলাইদহে অঙ্কন করেন। এটিই সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র।

কবির সঙ্গে শিলাইদহ বাসের পর থেকেই নন্দলাল তাঁর অনুরোধে শান্তিনিকেতনে যাওয়া আসা করতেন। ১৮ সাল নাগাদ আশ্রম বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষকরূপে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী সুরেন করকে পাঠান। শিল্পী অসিত হালদার বোধহয় তার পূর্ব থেকেই সেখানে ছিলেন।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন, কিন্তু কয়েক মাস পরই, গুরু অবনীন্দ্রনাথের ডাকে ফিরে গিয়ে তাঁকে অবনীন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ইনডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস্-এর স্কুলটির ভার নিতে হল। এরপর মনে হয় নন্দলালকে নিয়ে 'রবিকা' আর 'অবনের' ভেতর কিছু টানাটানি হয়েছিল এবং 'অবন' তাঁর গুরুপ্রতিম প্রিয় কাকার কাছে হারস্বীকার করেছিলেন। কারণ আমরা দেখতে পাই

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের পত্তন করলেন আর নন্দলালকে নিয়ে এলেন তার অধ্যক্ষ করে। কলাভবনের প্রথম পত্তন হয়েছিল অধুনা বিলুপ্ত দ্বারিক বাড়িটিতে। বর্তমান শান্তিনিকেতনের মৃণালিনী ছাত্রাবাসটির সামনের দিকে ছিল দ্বারিকের দোতলা বাড়িটি।

২১ সালে শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার পর গোয়ালীয়র সরকারের আমন্ত্রণে বাগগুহাচিত্রের অনুলিপি করে আনেন নন্দলাল—অসিত হালদার ও সুরেন করকে সঙ্গে নিয়ে। কলাভবনের প্রথম যছাত্ররা সেই দ্বারিক বাড়িতেই থাকতেন। এরপর ছাত্রাবাসটি যায় পুরোণ হাসপাতালের বাড়িটিতে। এটি ছিল দেহলী এবং বর্তমান আনন্দপাঠশালার উত্তর দিকে। দ্বারিক থেকে কলাভবন উঠে যায় বর্তমান পাঠভবন গৃহের দোতলায়।

সিংহসদনের পাশের তোরণ দুটির একটিতে প্রথম মূর্তি গড়বার স্টুডিও তৈরী হয়। ১৯৩৭/৩৮ সাল পর্যন্ত রামকিঙ্কর ঐ স্টুডিওতে কাজ করতেন। কলাভবনের পুরোন নন্দন বাড়ি এবং তিনটি কাজ করবার স্টুডিও গড়ে ওঠে ১৯২৬ থেকে ২৮ সালের মধ্যে। কাঠিয়াওয়ার আর গুজরাত থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কলাভবনের একটি আলাদা অর্থকোষ তৈরী হয়, এবং এই কোষ থেকেই উপরোক্ত বাড়িগুলি করা সম্ভব হয়। সে সময় অবশ্য নন্দনের সামনের অঙ্গনে মেয়েদের ছাত্রাবাস বানাবার দুর্বুদ্ধি কারুর হতে পারে সেটা কল্পনাই করা যায় নি। নন্দনের সঙ্গে সংলগ্ন করে উত্তর দিকে 'হ্যাভেল হল' তৈরী হয় ১৯৩৭ সাল নাগাদ পাটনার ব্যারিস্টার পি. আর. দাশ মশাইএর অর্থানুকুল্যে। ২৬/২৭ সাল থেকেই কলাভবনের ছাত্রাবাসগুলি গড়ে ওঠে কলাভবন স্টুডিওগুলির পশ্চিম দিকে। প্রথমে কয়েকটি মাটির বাংলো. তারপর দুটি পাকাবাড়ি আর কালো বাড়ি। বর্তমান ছাত্রাবাসে গেলে এক কালো বাড়িটি ছাড়া অন্য বাড়িগুলি কোনটা কোথায় ছিল খুঁজে পেতে মুশকিল হবে।

আচার্য নন্দলালের জন্ম হয়েছিল ১৮৮২ সালের ৩রা ডিসেমবর। কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২১ সালে অর্থাৎ ৩৯ বছর বয়সে। ৩০ বছর পর ১৯৫১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২১ সালে যখন নন্দলাল কলাভবনের ভার নিয়ে পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে এসে চারজন ছাত্র কলাভবনে যোগ দেন। এঁদের নাম হ'ল—হীরাচাঁদ দুগার, অর্ধেন্দু ব্যানার্জী, কৃষ্ণপদ আর ওয়ারিয়ার। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রদের ভেতর থেকে যোগ দেন ৭ জন—ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হরিপদ রায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনু দেশাই।

এঁদের ভেতর হীরাচাঁদ দুগার কখনও কোন চাকুরী করেছেন বলে শোনা যায়নি। মিনিয়েচার ঢংএ খুব সংবেদনশীল ছবি এঁকে সুনাম করেছিলেন। এবং অঙ্কনদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। অর্ধেন্দু ব্যানার্জি ভাল ইলাষ্ট্রেটর হয়েছিলেন। ভাগলপুরের ছেলে কৃষ্ণপদ পরে পাগল হয়ে যান। ওয়ারিয়র অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন—কিন্তু তিনি কলাভবনের পাঠ সমাপ্ত করেন নি। হরিপদ রাও ইলাষ্ট্রেশন করতেন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, রমেন্দ্র, বিনোদ বিহারী, মণি গুপ্ত ও সত্যেনবাবু—কলাভবন ও বিভিন্ন আর্ট স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই শিল্পী হিসাবে সারা দেশে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কনু দেশাই একযুগে বোম্বাইয়ে ছায়াচিত্র জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প নির্দেশক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কলাভবন দপ্তরে সবচেয়ে পুরোন ছাত্রদের যে নামগুলি পাওয়া যাচ্ছে তাঁরা এসেছিলেন ১৯৩০ সালে। এঁদের পূর্বের ছাত্র ছাত্রীদের যে নামগুলি পাচ্ছি তা হ'ল নিজের, নন্দলাল পুত্র বিশ্বরূপ বসুর এবং আরও দু এক জনের স্মৃতি নির্ভর। আমাদের ছাত্রাবস্থায় দেখেছি যে মাষ্টারমশাই তাঁর ছাত্রছাত্রীরা কে কোথায় কি করছেন তার একটি তথ্য তালিকা রাখতেন কলাভবনে। সে তালিকা খুঁজে পাই নি। তবে ৩০ সাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত যেসব তথ্য রাখা হচ্ছে সেটাও আজকের যুগে অন্যত্র আশা করা যায় না। সুতরাং ২১ সাল থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত কলাভবনের ছাত্রদের যে নামগুলি কয়েক জন মিলে স্মরণ করতে পেরেছি তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করছি।

নন্দলাল ১৯৫১ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং দীর্ঘ ৩০ বছরে বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সবার নাম স্মরণ করা সম্ভব নয়। যাঁরা পরবর্তী জীবনে শিল্পচর্চা বা সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের ফলে নানাভাবে মানুষের নজরে পড়েছেন তাদের সম্বন্ধে দুচার কথা বলবার চেষ্টা করবো। অনিচ্ছাকৃত ভাবে সেখানেও হয়তো অনেক নাম বাদ পড়বে কারণ নন্দলালের ছাত্ররা সারা দেশে এবং বিদেশেও ছড়ান যাঁদের সব খবর আমাদের কাছে পৌঁছোয় না।

সেযুগে কলাভবনে বহু ছাত্র ছাত্রী আসতেন দু'তিন বছর মাষ্টারমশাইযের সান্নিধ্যে থেকে কিছু কাজ করবার জন্য। পুরা পাঠক্রম যাঁরা সমাপ্ত করতেন তাঁদের সঙ্গে এঁদের কখনও ইতরবিশেষ করতে দেখিনি। সবাই ছিলেন নন্দলালের শিল্প পরিবারের ছেলে মেয়ে এবং সবার সম্বন্ধে তিনি সস্নেহ খোঁজ খবর রাখতেন।

১৯২১ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠার তিন চার বছরের ভিতরে ছাত্রী হিসাবে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুকুমারী দেবী, শ্রীমতী হাতিসিং (ঠাকুর), গৌরী বসু (ভঞ্জ), সবিতা ঠাকুর, বাসন্তী মজুমদার আর ইন্দুসুধা ঘোষ। সুকুমারী দেবী কিছু দিন কলাভবনে অধ্যাপনা করেছিলেন প্রথমদিকে। নন্দলাল তনয়া গৌরী কলাভবনে কারুশিল্প বিভাগে অধ্যাপিকা ছিলেন আর ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাময়ী নাচিয়ে আর অভিনেত্রী। অবসর যাপন করছেন অপূর্ব কারুশিল্পের কাজ করে। শ্রীমতী ঠাকুরও ছিলেন খুব প্রতিভাময়ী নাচিয়ে। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সম্পাদিকা হিসাবে তিনি কলকাতার শিল্পী মহলে সুপরিচিতা ছিলেন। ইন্দুসুধা কারুশিল্পের নকশাবিদ হিসাবে যশস্বিনী। ১৯২৫/২৬ এর ভেতর আর যাঁরা আসেন তাদের মধ্যে ছিলেন নাগপুরের বিনায়ক মাসোজী, অন্ধ্র দেশের ভি. আর. চিত্রা, জাপানের হাসেগাওয়া দেনজিরো, মহীশূরের পি. হরিহরণ, কালিম্পংএর মণি প্রধান, কেরলের বাসুদেবন, বাঙলার রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আর সত্যেন বিশী। হায়দ্রাবাদ থেকে এসেছিলেন সুকুমার দেউস্কর, মহারাষ্ট্র থেকে বামন শিরোদকর, জয়পুর থেকে সোহাগমল আর রঘুবীর সিং। বিষ্টুপদ রায় আর গোষ্টবিহারী ঘোষও সম্ভবত এই সময়েই ছাত্র ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে আরও ছিলেন অনুকণা দাশগুপ্ত আর মন্দাকিনী দেবী।

মাসোজীর কর্মজীবনের অনেকটা কেটেছে শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সহকারীরূপে। শ্রীনিকেতনের গোড়াপত্তনের সময় মাসোজীকে নন্দলাল পাঠিয়েছিলেন শিক্ষাসত্রের শিক্ষক আর শিল্পভবনের নকশাশিল্পী হিসাবে। ৩০ দশকের প্রথমদিকে কিছু কাজ নিয়ে তিনি বোধহয় আহমেদাবাদ যান। আটত্রিশ উনচল্লিশ সালে আবার ফিরে এসে ক'য়েক বছর থাকেন। ভি. আর. চিত্রা মাষ্টারমশাই অবসর নেবার পর এক সময় কিছুদিন কলাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। তারপূর্বে বেশ কিছুদিন ইউনেস্কোর চারুশিল্পের উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরে উচ্চ পদে কাজ করতেন।

পি, হরিহরণ জাপান থেকে ভাল পটারী শিখে এসেছিলেন এবং ব্যাঙ্গালোরে সরকারী পটারীর পরিচালক ছিলেন বেশ কিছু দিন। পরে হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস বোর্ড তাঁকে নিয়ে আসেন কারুশিল্পের উন্নতমানের হাতিয়ারপত্র তৈরীর জন্য গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ করে, সুধীর খাস্তগীর ছিলেন রামকিঙ্করের সমসাময়িক এবং রামকিঙ্করেরই মতো একাধারে চিত্রী ও ভাস্কর। দেরাদূনে দুন স্কুলে তাঁকে দেখেছি কাজ নিয়ে দিবারাত্রি মেতে থাকতে। বাঙলাদেশে ও উত্তরপ্রদেশে তিনি একসময় শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট মান সম্মান পেয়েছেন। দুন স্কুলের পর তিনি লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে ছিলেন।

সত্যেন বিশী কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে কারুশিল্প বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। আর বামনশিরোদকর সঙ্গীতের দিকে সরে গিয়েছিলেন—কর্মজীবন কাটিয়েছিলেন দুন স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে। সুকুমার দেউস্কর শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এবং হায়দ্রাবাদ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। বিষ্ণুপদ রায় ছিলেন শিবপুর বটানিক্যাল উদ্যানের শিল্পী।

১৯৩০ সালের পূর্বে আর যে ছাত্রছাত্রীরা কলাভবনে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন বনবিহারী ঘোষ—বিনোদবিহারীদের দু'তিন বছর পরে এসেছিলেন বোধহয়। কর্মজীবনে বিখ্যাত টেকস্‌টাইল ডিজাইনার। কর্মজীবন থেকেই দিল্লী প্রবাসী। আর এক কাপড়ের নকশাবিদ ছিলেন হীরেন ঘোষ। মণিকা সেনও ছিলেন ভাল নকশাবিদ—হীরেনবাবুর সহধর্মিণী ছিলেন উত্তরজীবনে। নন্দলালপুত্র বিশ্বরূপ পিতার কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করে জাপান পাড়ি দেন গ্রাফিক আর্ট শিখতে। বিখ্যাত শিল্পী তোমিমোতো সানের অভিভাবকত্বে কিয়োতোতে তিনি

বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। কর্মজীবন কলাভবনে। কিছুদিন অধ্যক্ষের কাজ করেন। যদুপতি বসু, গুজরাতের শান্তিলাল, কবি নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, গীতা রায়, মন্দিরা দেবী, সিংহলের রোজালীন দক্ষিণের সাবিত্রী কৃষ্ণান, শিশির ঘোষ, নন্দলালকন্যা যমুনা বসু (সেন), রানী দে (চন্দ) শ্রীমতি হসি হাসিমোতো (জাপান), পার্শি মহিলা রডিপেট্টি, গুজরাতের জয়ন্ত জাভেরী ও শান্তা দেশাই, নিভাননী চৌধুরী, ফিরোজা বেগম, মণি রায়চৌধুরী ও রুদ্র হাঞ্জী এঁরা সবাই কলাভবনে এসেছিলেন ৩০ সালের পূর্বে। খুব সম্ভব কবি কানাই সামন্তও এই সময় প্রথম কলাভবনে আসেন। শিশির ঘোষ ও কানাই সামন্তকে আমরা আটত্রিশ, উনচল্লিশ সালেও দেখেছি কলাভবন ছাত্রাবাসের দুই স্তম্ভবিশেষ। গানে বাজনায়, মজলিসী আড্ডায়, রসিকতায় শিশিরদা কলাভবন জমিয়ে রাখতেন। কানাইদার ছিল অফুরন্ত রসবোধ যার প্রকাশ ছিল তাঁর প্রচণ্ড হাসিতে। কলাভবনের চৌহদ্দিতে কানাইদা হাসলে তা এদিকে মন্দির আর ওদিকে পিয়ার্সনপল্লীর সাঁওতাল গ্রাম থেকে শোনা যায় বলে কথিত ছিল। কানাইদা বোধহয় এখনও রবীন্দ্রভবনের সঙ্গে সংযুক্ত। শিশিরদা শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে কর্মজীবন কাটিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন। সমজদার পরিবেশে এখনও ঝলমল করে ওঠেন।

মণি রায়চৌধুরী করাচীতে কর্মরত ছিলেন দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত, আর রুদ্র হাঞ্জী ছিলেন রামকিঙ্করের প্রথম ভাস্কর্যের ছাত্র। গোয়ালীয়রে কর্মজীবন কাটিয়েছেন। শ্যামলীর গায়ে তাঁর হাতের কাজ আছে। যমুনা সেন আর রাণী চন্দ অত্যন্ত প্রতিভাময়ী আশ্রমকন্যা। নানা কারুশিল্পে পারদর্শিনী যমুনাদি ছিলেন শক্তিশালী নৃত্যশিল্পী, প্রতিভাময়ী চিত্রশিল্পী রানী চন্দ আজ তাঁর লেখার জন্য সর্বজন পরিচিতা। জাপানের শ্রীমতী হাসিমোতো ছবি আঁকা শিখতেন আর আশ্রমের মেয়েদের 'টি সেরেমনি' আর জাপানী ফুল সাজান শেখাতেন। দুই জার্মান ছাত্র এই সময় ছিলেন—তাঁদের ডাকা হতো জিজি আর বোকা বলে।

৩০ দশকের প্রথম দিকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নীহাররঞ্জন চৌধুরী শান্তিনিকেতন থেকে চীনে আঁকা শিখতে গিয়েছিলেন। পরে দিল্লী পলিটেক্‌নিকের চারুকলা বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। কিরণ সিংহও কলাভবনের পাঠ সাঙ্গ করে চীনদেশে গিয়েছিলেন চীনা কলম আয়ত্ব করবার জন্য। সিংহল থেকে এসেছিলেন এসমি পেরেরা, পেরিস সাহেব আর ভিক্ষু মঞ্জুশ্রী। কিরণশশী দে কলাভবন থেকে পাঠ সমাপ্ত করে সিংহলে শিল্পশিক্ষক হয়েছিলেন। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তও কলকাতা আর্ট স্কুলে আসবার পূর্বে কিছুদিন সিংহলে ছিলেন। রামেশ্বর শুক্লা, এ পেরুমল, গোবর্ধন পাঞ্চাল প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। লম্বা চওড়া শুক্লাজীর ভোজন নিয়ে প্রথম ক'দিন কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল শুনেছিলাম। প্রতিবেলা আহারের জন্য তাঁর ৭৫টি করে রুটি লাগতো। ভোজনাগারে এ নিয়ে গোলমাল। মেয়েরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের রুটির ভাগ দিয়ে থামিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে প্রথম চাকুরী গান্ধীজীর সেবাগ্রাম আশ্রমে তিনি রাখতে পারেন নি কারণ তাঁর রোজকার ভোজনের আটা পেষাই থেকে রুটি গড়া পর্যন্ত করে অন্য কাজের সময় পেতেন না। পরে লক্ষ্নৌ-এ কাজ করতেন তিনি। পেরুমল থেকে গিয়েছিলেন কলাভবনেই প্রথমে গ্রন্থাগারের সহকারী ও পরে অধ্যাপকরূপে। গুজরাতের গোবর্ধনভাই আহমেদাবাদের স্কুলে কাজ করতেন পরে ফ্যাসান ডিজাইনার আর স্টেজ ডিজাইনার হিসাবে বেশ নাম করেছিলেন।

কিছু বিদেশী ছাত্র এসময় প্রায়ই থাকতেন প্রধানত সিংহল আর জাভা বালি থেকে। হল্যাণ্ডের মেয়ে পউলিনা বোলকেন ছিলেন বছর তিনেক। জাভার রুসলী ছিলেন পুরো পাঁচ বছরের বেশী। চীনের হু-মিং-চুন ছিলেন বছরখানেকের কিছু বেশী। আশ্রম বধূ ও কন্যাদের মধ্যে এই সময়ে ছিলেন কমলা রায়, জ্যোতি সেন শ্রীমতী সোগরা আমীর আলী। সীমান্ত নেতা খান আব্দুল গফফর খানের পুত্র আব্দুল গনি খানও এই সময় কলা ভবনে ছিলেন কয়েক বছর। অক্সফোর্ড থেকে পাঠ সাঙ্গ করে এখানে এসেছিলেন—মূর্তিগড়া শিখতে।

শ্রীমতী রেণুকা কর, সিংহলের সেলিনা বিক্রমরত্ন, শিবকুমার দত্ত, শান্তিময় গুহ ও কানাই সামন্তমশাই—সম্ভবত দ্বিতীয় দফায়—আসেন ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি। শান্তিময় আহমেদাবাদে ভাল টেক্সটাইল ডিজাইনার হয়েছিলেন। শিবকুমার বম্বাই-এ জাহাঙ্গীর ভকিল সাহেবের পিপলস্ ওউন স্কুলে ছবি আঁকা আর গানবাজনা শেখাতেন। রেনুকা কর আছেন কলকাতায়, বোধহয় সরোজনলিনীর সঙ্গে যুক্ত।

আজকের স্বনামধন্যা শিল্প সমালোচক ও প্রাবন্ধিক জয়া আপ্পাস্বামী প্রথম আসেন ১৯৩৫ সালে। মাঝে ক'বছর মাদ্রাজে কলেজে পড়ে

আবার কলাভবনে ফিরে আসেন। কলাভবনের পাঠ সাঙ্গ করে ইনিও চীন দেশে যান চৈনিক শিল্প অনুশীলন করতে। সুগায়িকা ইন্দুলেখা ঘোষ ৩৫ সালে কলাভবনে যোগ দেন শিল্প শিখবার জন্য কিন্তু তিনি বিকশিত হয়ে ওঠেন সঙ্গীতে। রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের প্রিয় পাত্রী ছিলেন।

শান্তি বসু ও সুখময় মিত্র আসেন ১৯৩৬ সালে। প্রতিভাবান ছাত্র সুখময়কে মাষ্টারমশাই কলাভবনে সহকারী করে নিয়েছিলেন—তিনি এখনও সেখানে কর্মরত। এঁদের পর দু'তিন বছরে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাবান মধুকর শেঠ (গুজরাত) পঞ্চাশের দশকে অকালে পরলোক গমন করেন। আর একটি সম্ভাবনাময় ছাত্র দুর্গা রায় মারা যান পাঠ সমাপ্ত হবার পূর্বেই। অনিল সাহা কলকাতায় প্রথম শ্রেণীর ছাপাখানা কেমিও প্রেস গড়ে তুলেছিলেন। শচীন দাসগুপ্ত অঙ্কন থেকে সবে গিয়ে ভাল সেতারী হয়েছেন—বর্তমানে লণ্ডনপ্রবাসী। এই প্রবন্ধলেখকও কলাভবনে ছাত্র হিসাবে যোগ দেন ১৯৩৭ সালে। দক্ষিণ ভারতের মুত্থুস্বামী ছিলেন খুবই প্রতিভাবান কিন্তু অত্যন্ত খেয়ালী মানুষ। সম্ভবত খেয়ালীপনা তাঁকে শিল্পের পথ থেকে সরিয়ে নিয়েছে না হ'লে দেশের শিল্প জগতে তাঁর নাম শুনতে পাওয়া উচিত ছিল। উত্তর প্রদেশের দেবীপ্রসাদ গুপ্ত শান্তি আন্দোলনের নেতা—বহুদিন লণ্ডন প্রবাসী। বিশিষ্ট স্টুডিও পটার হিসাবে ওদেশে স্বীকৃত। ভবঘুরে প্রসন্ন রাও এখন থাকেন ফ্রান্সে। পুতুল নাচ আর ছায়াছবি (শ্যাডোপ্লে) হাতের কজায় এবং মুখে নানা বাজনার অনুকরণ, গান আর বুলি নিয়ে—একক এনটারটেইনার হিসাবে প্রসন্ন ইউরোপের শো বিজনেস মহলে সুপরিচিত। এখনও ফ্রান্সকে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চমৎকার কাঠের পুতুল তৈরী করেন। ধীরেন আর নবীন গান্ধী নামে মহাত্মা গান্ধীর দুই আত্মীয় এসময় কলাভবনে ছিলেন, আর ছিলেন আবুলকালাম—পরে দিল্লীতে ডঃ জাকীর হোসানের জামিয়া মিলিয়ায় শিল্প বিভাগের প্রধান হন। উনচল্লিশ চল্লিশ সালে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে আছেন আজকের বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়, শঙ্খ চৌধুরী আর পৃথ্বীশ নিয়োগী। পৃথ্বীশ বর্তমানে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। এই সময়ের সুনীতি মিত্র আর রবি চ্যাটার্জি ফিল্ম জগতে শিল্প নির্দেশক হন। দীনকর কৌশিক লক্ষ্নৌ আর্ট কলেজ ও পরে শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী পুষ্পা তারভেও ছিলেন সমসাময়িক ছাত্রী। আজকের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পদ্রব্য সংগ্রাহক জগদীশ মিট্টলও প্রায় এই সময়ের ছাত্র ছিলেন।

চল্লিশ একচল্লিশের ভেতর অন্য যে ছাত্রছাত্রীরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন মনোরমা সেন, বিশ্বনাথ খান্না, নিবেদিতা পরমানন্দ, মৃদুলা থ্যাকার, মেনা কাপাডিয়া, নীলিমা বড়ুয়া, অনিল মজুমদার, নগেন্দ্র হেম্বরম ও অজিতকেশরী রায়।

ওড়িষার অজিত কেশরী ঐ রাজ্যের আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। নগেন্দ্র হেম্বরম এসেছিলেন রাঁচী থেকে। নাচ গান অভিনয়, ক্যারিকেচার, ম্যাজিক আর নানা দুষ্টুমী করে তিনি কলাভবন মাতিয়ে রাখতেন। নীলিমা বড়ুয়া গভীরভাবে কারু শিল্পের অনুরাগী ছিলেন—এবং সরকারী কারুশিল্প নকশা কেন্দ্রের পরিচালিকা হয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালের ভেতর আসেন বিখ্যাত গ্রাফিকশিল্পী, বর্তমানে ফ্রান্স প্রবাসী কৃষ্ণ রেড্ডি, আমাদের দেশের এযুগের উজ্জ্বল শিল্পী কে, জি, সুব্রহ্মণ্যম, অজয় চক্রবর্তী, অমলা বসু, ঊষারঞ্জন দত্তগুপ্ত, জিতেন্দ্র কুমার, আর কৃপাল সিং সাখোয়াত। নির্মলা দয়ালদাস (পটুবর্ধন) এবং ক্ষমা গুপ্তও আসেন এই সময়ে। একচল্লিশ সালে থাইল্যাণ্ড থেকে আসেন ফুয়া তঙ্গিয়ু কিন্তু এক বছরের ভেতর থাইল্যাণ্ড ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় তাঁকে নিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়। চীন ভবনের বারান্দার দেয়ালচিত্রগুলির মধ্যে তাঁর একটি কাজ আছে। উত্তরকালে ঊষারঞ্জন আর অজয় চক্রবর্তী বিজ্ঞাপন শিল্পে নাম করেছেন। অমলা বসু (সরকার) আর জিতেন্দ্রকুমার নিয়োজিত হয়েছিলেন শিল্পবিদ্যালয়ে যথাক্রমে কারুশিল্প এবং ভাস্কর্যের অধ্যাপনায়। অমলাদি কলকাতায় আর জিতেন্দ্র কুমার গোরক্ষপুরে। ক্ষমাও বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায় রত আছেন। কৃপাল সিং জয়পুরে সর্বজন পরিচিত শিল্পী। রাজস্থানের ঐতিহ্যগত 'জয়পুর পটারী' নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় খুব সাফল্যলাভ করেছেন। কৃপাল আজকের দিনে মিনিয়েচার ছবির ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ বোদ্ধা। নির্মলা পটুবর্ধন এদেশে স্টুডিও পটারীর প্রবর্তকদের একজন।

কলাভবন থেকে অবসর নেবার পূর্বে নন্দলালের শেষ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সুখেন গাঙ্গুলি, সুমিত্রা বেনেগাল, অবতার সিং পারবার, অমিত পাল —এঁরা সবাই মোটামুটি শিল্প জগতে পরিচিত। এবং প্রায় সবাই দেশের নানা শিল্প বিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। খ্যাতনামা শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব সম্ভবত এই সময়েই কলাভবনের ছাত্র ছিলেন।

নন্দলাল কলাভবনের ভার নেবার সময় থেকেই দেখা যায় তাঁর ছাত্রছাত্রীরা এসেছেন দেশের নানা অঞ্চল থেকে এবং বিদেশ থেকেও। তাঁর অবসর গ্রহণের পরও কলাভবন সারা দেশ ও বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করছে আজ পর্যন্ত। শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের নিরিখে নন্দলাল যে বৈশিষ্ট্য এনেছিলেন কলাভবনের কর্মকাণ্ডে ; এবং যে বৈশিষ্ট্য দেশবিদেশ থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে সেটি এখনও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। আশা করি বিশ্বভারতীর অন্য নানা প্রতিষ্ঠানের মতো—এই বৈশিষ্ট্যটি নির্মূল হতে না দিয়ে কলাভবনের বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী এটিকে লালনপালন ও বর্ধনে যত্নবান হবেন। যাতে অন্তত নন্দলালের কলাভবনে বিশ্বভারতী নামের সার্থকতা বজায় থাকে।

শিল্পক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর ছাত্রীদের ভূমিকা

চিত্রা দেব

শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরেই সবার মনে যিনি একটি আসন লাভ করেছিলেন তিনি শিল্পী নন্দলাল বসু। সেখানে তাঁর নাম, একটাই পরিচয় মাস্টারমশাই। অন্যত্র তাঁর পরিচয় শিল্পীরূপে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য, আধ্যাত্মিক-ভারতের শ্রেষ্ঠ কার, নন্দলালের সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে শান্তিনিকেতনে বড় হয়ে ছিল তাঁর শিক্ষকসত্তা। তারপর সেই শিক্ষকসত্তা ও শিল্পীসত্তা সমিশে এক হয়ে গেল ছাত্রছাত্রীদের কাছে। নন্দলালের শিল্পাদর্শ ও আদর্শের মধ্যে গভীর ও নিবিড় যোগ ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। অন্যান্য শিল্পীদের মতো আত্মমগ্ন হয়ে তিনি শুধু নিজের সৃষ্টির মধ্যে ডুবে থাকেননি, সৃষ্টিরহস্যের গহনে ডুব দিতে শিখিয়েছিলেন নিজের ছাত্রদেরও। শিখিয়েছিলেন বিশ্বপ্রকৃতিকে খুঁটিয়ে দেখতে, রূপ-রেখার বাঁধনে ধরে রাখতে। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্রদের অনেকেই শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে নন্দলালের ছাত্রীদের দানও কম নয়। তাঁদের নাম বিশেষ ছড়িয়ে না পড়লেও কারুশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছেন।

চিত্রশিল্পীরূপে ভারতীয় নারীরা প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। মুঘল আমলে সহিফাবাণু প্রমুখ দু একজনকে বিহসাদের চিত্ররীতি অনুসরণ করে দু একটি ছবি আঁকতে দেখা গেলেও তাঁরা কেউই উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পী ছিলেন না। একথা বলা চলে ঊনবিংশ শতকের আলোকপ্রাপ্তা বিদুষী মহিলাদের সম্পর্কেও। প্রগতিশীল ধনী সমাজের মহিলারা ইংরেজী পড়া, ঘোড়ায় চড়া, পিয়ানো শিক্ষা কি লেস বোনার মতোই ছবি আঁকা শিখতেন। মহর্ষি পরিবারে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী নীপময়ী দেবী ও তাঁর কন্যারা দেশী ও বিলাতি উভয় ধারাতেই ছবি আঁকা শিখেছিলেন। বিশেষ করে প্রতিভা দেবী ও প্রজ্ঞা দেবী অনেক ছবি এঁকেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যারাও ছবি আঁকতেন। কিন্তু অঙ্কনশৈলীতে এঁদের কারোরই নিজস্ব কোন ছাপ পড়েনি। বরং আধুনিক অর্থে প্রকৃত চিত্রশিল্পী বলা যায় ঠাকুরবাড়িরই অপর একটি কন্যা সুনয়নী দেবীকে। দুই শিল্পীভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব তাঁর ছবিতে নেই। সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় বাংলার লোকশিল্পের ওপর ভিত্তি করে তিনি বহু ছবি এঁকেছিলেন। আজও তাঁর নিজস্ব ধারায় তিনি অনন্যা। তাই ভারতীয় মহিলাশিল্পীদের পথিকৃৎ হিসেবে সুনয়নী দেবীকেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিল্পক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর ছাত্রীরা এলেন আরো কিছুদিন পরে। প্রতিমা ঠাকুরকেই আমরা নন্দলালের প্রথম ছাত্রী বলতে পারি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা সম্মিলনী আরম্ভ হয়।

সেখানে সাহিত্যচর্চা, শিল্পশিক্ষা ও নানাবিধ আলোচনারও ব্যবস্থা হয়। সেইসঙ্গে সূঁচের কাজ, পিতলের কাজ ও নানাপ্রকার কারুশিল্প শিক্ষার আয়োজনও ছিল। সেখানেই নন্দলাল এলেন শিল্পশিক্ষক হয়ে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে প্রতিমা ও সুধীন্দ্রনাথের কন্যা এণা ছবি আঁকার ক্লাসে ভর্তি হলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন অবনীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ পারুল, নীলরতন সরকারের কন্যা অরুন্ধতী ও আরো কয়েকজন। এঁদের মধ্যে শুধু প্রতিমা শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে নন্দলাল বসুর পরিচয় অবশ্য 'বিচিত্রা'র ক্লাস শুরু হবার অনেক আগে থেকে। তখন তাঁর বয়স দশ এগারো বছর। একদিন তাঁর ছোট মামা অবন ঠাকুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন, 'তোরা তো ছবি আঁকিস, চল মায়ের কাছে। তোদের একটা ছবির মতো ছবি দেখাই।' সৌদামিনী দেবীর কাছে সকলকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন নন্দলালের আঁকা দুখানি ছবি। দেখিয়ে মাকে বললেন, 'মা এবার মনের মতো ছাত্র পেয়েছি—দেখো এ ছেলেটা বড় আর্টিস্ট হবে।' মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর ছবির সঙ্গে প্রতিমার সেই প্রথম পরিচয়।

'বিচিত্রা'র ছবি আঁকার ক্লাসে অনেকেই আসতেন। প্রথম থেকেই নন্দলালের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা ছাত্রছাত্রীদের খুব বেশি আকৃষ্ট করত। প্রতিমা লিখেছেন, 'তাঁর চিত্রশালায় গেলে তিনি কত রকম ছবি দেখাতেন—এবং বিষয়বস্তুগুলি সহজ ও সরলভাবে আমাদের বোঝাতেন, যা দেখে আমরা মনের খোরাক সঞ্চয় করতুম। তিনি এক একটা ছবির লাইন বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল খুবই আশ্চর্যজনক, অপূর্ব ছিল তাঁর হাতের লাইনের টান। এক একটা লাইনের টানে তিনি রূপ ও ভঙ্গী এনে দিতেন।'

'বিচিত্রা'র স্কুল বেশিদিন স্থায়ী হল না। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। আহ্বান জানালেন নন্দলালকে। সামান্য বাধা ছিল। সে বাধা অপসৃত হলে নন্দলাল স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন ১৯২০—২১ সালে। তিনি যে শুধু কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন তা নয়, এলেন শিল্পসাধনার কেন্দ্র গড়ে তুলতে।

কলাভবনের প্রথম পর্বে অবশ্য বর্তমান রূপ ছিল না। শান্তিনিকেতন তখন সবে গড়ে উঠছে। গুরুদেবের নির্দেশে স্থানীয় কর্মীদের গৃহি[ণীরা] নন্দলালের কাছে ছবি আঁকা ও মাটির কাজ শিখতে আসেন। না[রী] জীবনে সে প্রয়োজন আরো বেশি। তাই সকালে ছাত্রদের ক্লাস হত[,] দুপুরে হত গৃহিণীদের ক্লাস—ছাত্রী ছিলেন কিরণবালা সেন, মনো[রমা] ঘোষ, শৈলবালা দেবী, নিভাননী দেবী, সুরঙ্গিণী দেবী, কমলা [...] কাত্যায়নী দেবী, সবিতা দেবী ও আরো অনেকে। প্রতিমা তো ছিলেন[।] সম্ভবত এই সময়েই কিংবা কিছু পরে এসেছিলেন সুকুমারী দে[বী।] মনোরমা ঘোষের এই বালবিধবা মাসীমা শান্তিনিকেতনে আসার [আগে] থেকেই কাঁথার ফোঁড়ে নানারকম নকশা সেলাই ও খুব ভাল আল[পনা] দিতে জানতেন। ছাত্রীরূপে তাঁকে পেয়ে নন্দলাল অবনীন্দ্রনা[থের] পরিকল্পিত গৃহজাত শিল্পের জাগরণে অনেকটা সাহায্য পেলেন।

প্রায় একই সময়ে প্রতিমা হাতের কাজ শেখার জন্যে একটি বি[ভাগ] খোলেন ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কারপেলের সহযোগিতা[য়।] কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা একই সঙ্গে অয়েল পেন্টিং, ফ্রেস্কো, আল[পনা,] গালার কাজ, লিথোগ্রাফ, কাঠখোদাই, বই বাঁধাই সবই শিখতেন। ত[খন] কলাভবনে নির্দিষ্ট নিয়মে শিল্পশিক্ষার ক্লাস শুরু হয়নি। ছাত্রছা[ত্রীরা] নিজের নিজের প্রবণতা অনুযায়ী এক একটি বিষয় নিয়ে অনুশী[লন] করতেন। ১৯৩০—৩৫ সালের মধ্যে চামড়া ও বাতিকের [কাজ] কলাভবনের শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়। চামড়ার কাজে রথীন্দ্রনাথের দ[ক্ষতা] ছিল অসাধারণ। বাতিকের জিনিসপত্র প্রতিমা নিয়ে আসেন য[বদ্বীপ] থেকে। যদিও বাতিক শিল্প সম্বন্ধে তাঁর হাতে-কলমে কোন অভি[জ্ঞতা] ছিল না। তবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ডাচ ভাষায় লেখা বাতিক সংক্রান্ত একটি বই তিনি নিয়ে আসেন। পুস্তকের অনুবাদ[,] পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাতিক শিল্প কলাভবনের শিল্পীদের আ[য়ত্তে] আসে। বর্তমানে ভারতের যে বাতিকশিল্পের চল দেখা যায় তার [সঙ্গে] জাভানিজ বাতিকের সাদৃশ্য নেই। এ হল কলাভবনের ছাত্রছাত্রী[দের] পরীক্ষালব্ধ নতুন শিল্প।

কলাভবনের প্রথম ছাত্রী হিসেবে নাম করা যায় শ্রীমতী হাতিসিং[এর।] আমেদাবাদ থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ছবি আঁকা শে[খার] জন্যেই। এসময় সঙ্গীতভবন ও কলাভবন যুক্ত ছিল বলে যাঁরা আস[তেন] তাঁরা গান এবং ছবি আঁকা দুই-ই শিখতেন। সঙ্গীতশিক্ষার আগ্র[হে] অনেকে কলাভবনে এসে সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রচর্চা করেছে[ন।] শ্রীমতী বিশেষভাবে নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রশিক্ষা নেবার জ[ন্যে] শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শ্রীমতীর পরে এসেছিলেন রানী[,] চিত্রনিভা চৌধুরী, অনুকণা দাশগুপ্ত (খাস্তগীর), মন্দাকিনী সেন, গৌ[রী] প্রমুখ ছাত্রীরা। এ সময়েই নন্দলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরীও কলাভ[বনের] ছাত্রী হিসেবে যোগ দেন।

নন্দলাল বসু কলাভবনে ছিলেন দীর্ঘ দিন, প্রায় তিরিশ বছর। ছাত্রছাত্রী এসেছিলেন এই সময়ের মধ্যে। বাঙালী ছাড়াও অন[্য] প্রদেশের বিশেষ করে গুজরাট ও পাঞ্জাবের ছাত্রী ছিলেন অনে[কে।] বাইরে থেকে অর্থাৎ চীন, জাপান, সিংহল, নেপাল, হল্যাণ্ড, হা[ঙ্গেরি,] রাশিয়া থেকেও এসেছিলেন কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে অনে[কে] শিল্পক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পজগতের দুটি শাখা অ[র্থাৎ] চারুশিল্প ও কারুশিল্প দুটি শাখাকেই কলাভবনের ছাত্রীরা নানাভাবে [সমৃদ্ধ] করেছেন। নন্দলালের বহু ছাত্রীই পরবর্তী জীবনে ছবি আঁকেননি[,] অলংকরণশিল্পে ও নকশা বা ডিজাইন রচনায় অসামান্য দক্ষতার প[রিচয়] দিয়েছেন।

চারুশিল্প ও কারুশিল্প নামে শিল্পকলাকে দুটি ভাগে ভাগ কর[া] সার্থক কারুশিল্পে ও চারুশিল্পে আসলে কোন ভেদ নেই। ব্যবহা[রিক] জীবনে কারুশিল্পের প্রয়োজন বেশি কিন্তু চারুশিল্পকে বাদ দিলে তার [...] অস্তিত্ব থাকে না। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা কারুশিল্পকে যথার্থ শি[ল্পের] মর্যাদা দিইনি তার ফলে শিল্প শাখায় অপূর্ণতা ছিল। নন্দলাল [...] চিত্রশিল্পী হলেও কারুশিল্পের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেননি। কারুশিল্পকে শিল্পকলার প্রধান অবলম্বনরূপে দেখেছিলেন। কলাভ[বনের] শিক্ষাপদ্ধতিতে কারুশিল্পকে যথেষ্ট স্থান দিয়েছিলেন। তার সুফল [...] গেল তাঁর ছাত্রীদের কাজের মধ্যে। শিল্পক্ষেত্রে তাঁদের স্বতন্ত্র ভূ[মিকা] আলোচনা করার আগে আমরা দেখব কলাভবনে নন্দলাল কী

শিল্পশিক্ষা দিতেন এবং তারই আলোকে তাঁদের পরবর্তীজীবনের
স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কি না।

াভবনের শিক্ষাপদ্ধতির দিকে তাকালে প্রথমেই মনে হয়,
-নিরীক্ষার স্বাধীনতাই ছিল এখানকার শিক্ষাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
ক রচনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরা—এই তিনটি ধারাতেই
দেওয়া হত। শিক্ষণীয় বিষয় ছিল চিত্রকলা, ভিত্তিচিত্র, মূর্তিকলা,
, নকশার কাজ, অলংকরণ প্রভৃতি। চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ
ও কলাভবনের শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়েছিল। কোন ছাত্র বা ছাত্রী
কোন রীতির অনুশীলন করতে চাইলে বাধা দেওয়া হত না।
ল শিক্ষক হলেও ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন
লতেন, 'শিল্পসৃষ্টি কারো ফরমাস মতো হয় না।' ক্লাসেও প্রথমে
লতেন, 'আঁকো'। তারপর তাদের আঁকা হয়ে গেলে তিনি একটি
কাগজে এঁকে বুঝিয়ে দিতেন কোথায় ত্রুটি হয়েছে। এছাড়া তিনি
শ দিতেন ভাল ভাল ছবি দেখার, 'আঁকবে যত দেখবে তার বেশি।'
শিল্পশিক্ষার একটা বড় অংশ ছিল নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি
ক্ষণ।

াভবনে প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট আসন বা 'সিট' ছিল কিন্তু দিনের পর
সেখানে বসে ছবি আঁকাকে নন্দলাল প্রশ্রয় দেননি। আশ্রমের
কে ঘুরে ঘুরে স্কেচ করাতে উৎসাহ দিতেন। তাঁর ভাষায়, 'আগে
মেলে দেখ, স্কেচ করে আন, তারপর তুলি ধরতে পারবে।' প্রকৃতি
ক্ষণের জন্যে নন্দলাল কয়েকটি ভ্রমণ ও পিকনিকের ব্যবস্থা
ন। প্রতিবছর দু তিনটি তাঁবু নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা চলে
ন প্রকৃতির কোলে কয়েকদিন বাস করতে। সব কাজকর্ম নিজেদেরই
হত। তারই সঙ্গে সঙ্গে সকলেই অজস্র স্কেচ করতেন। নন্দলাল
উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'এই যে হেঁটে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে, সেটাকে
রাখো।' মনোরমা একবার বুঝতে পারছিলেন না দূরত্ব কিভাবে
নো যায়। মাস্টারমশাই নিমেষে বুঝিয়ে দিলেন দূরের জিনিস গাঢ় ও
টা হালকা হবে। শেখাতেন কিভাবে শুধু সাদা কালোর মধ্যেই
আভাস আনা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা কার্ডে স্কেচ এঁকে পাঠালে
লও অনুরূপ উত্তর পাঠাতেন। একবার রানী এঁকে পাঠালেন একটি
তকলিতে সুতো কাটছে। উত্তরে তিনিও একখানি ছবি পেলেন
ছবি দেখে রানী বুঝলেন তাঁর মেয়েটি যে সুতো কাটছে সেটা মোটা
আর তাঁর মাস্টারমশাইয়ের আঁকা মেয়েটির সুতো যেন হাওয়ায়
য যাওয়া, চোখে ধরা যায় না এত মিহি।

নেক সময় নন্দলাল ছাত্রছাত্রীদের টেবিলে তাদের অজ্ঞাতে রেখে
তন কচি বা শুকনো পাতা, উজ্জ্বল রঙের ফুল বা ঘাসের শিস।
লে লক্ষ্য করতেন এর ফলে তার ছবিতে কোন পরিবর্তন আসছে কি
প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে কিনা। একবার একটি কাঁঠাল পাতা
য এনে ছাত্রীদের দেখালেন সেখানে কত অপূর্ব রঙের সমাবেশ
। তিনি তাঁদের দেখতে শেখাতেন বিভিন্ন গাছে কত রকম
—শুধু সবুজ রঙই কত রকমের—গাঢ়, হালকা, কালচে, নীলাভ,
, লালচে, 'এটা খুব কম লোকই চোখ চেয়ে দেখে।'
ন্ত্রের মতো কাজ করা বা বিনা কর্মে সময় কাটানো দুটোই বর্জন করার

পক্ষপাতী ছিলেন নন্দলাল। জনৈকা গুজরাটী ছাত্রী অসাধারণ পরিশ্রম করতেন। তা দেখে তিনি তাঁকে এক সপ্তাহের জন্যে সব কাজ বন্ধ রাখতে বললেন। প্রথমে ছাত্রীটি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন কিন্তু তৃতীয় দিনে তাঁর উদ্বেগ কমে আসে এবং সপ্তম দিনে দেখা গেল ছাত্রী বেশ প্রসন্ন। নন্দলাল তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কী শিখলে?' ছাত্রী বললেন, 'অনেক নতুন জিনিস দেখলাম। বুঝতে পারছি কেন আপনি আমার কাজ বন্ধ করেছিলেন।' তাঁর শিল্পকর্মে যে নীরসতা ছিল এই ঘটনার পর সেটি অনেক পরিমাণে দূর হয়। রেণুকা যখন রেঙ্গুন থেকে প্রথম এলেন তখন তাঁকেও নন্দলাল বলেছিলেন, 'পনেরো দিন কিছু না করে শুধু ঘুরে বেড়াও।' একটু অস্বস্তি নিয়েই ঘুরে ফিরে শান্তিনিকেতন দেখে বেড়ালেন রেণুকা। পনেরো দিন পরে নন্দলাল তাঁকে বললেন, 'একটা কাঞ্চন ফুল আঁকো।' আরেকবার ফ্রেস্কো আঁকতে গিয়ে বললেন, 'শিশুগাছ আঁকো।' ছাত্ররা অপ্রস্তুত। কারুরই ঠিক মনে নেই শিশুগাছ কেমন দেখতে। শুধু পুষ্পা তরতর করে একটি শিশুগাছ এঁকে দিলে তার প্রশংসা করে মাস্টারমশাই বললেন, 'দেখেছ ও কেমন দেখে মনে রেখেছে। খুঁটিয়ে দেখাটাই হল আসল জিনিস।'

নন্দলালের শিক্ষাপদ্ধতির দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁর ছাত্রীরা খুব বেশি মনে রেখেছেন। প্রথমত, কিভাবে তিনি শেখাচ্ছেন তা ধরা যেত না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেককে শেখাবার পদ্ধতি ছিল আলাদা। সাধারণত, তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ছবিতে হাত দিতেন না ঠিকই তবে মাঝে মাঝে অদলবদল করতেন। ছাত্রদের ছবিতেই বেশি হাত পড়ত। একবার যমুনা একটি সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন মা ও ছেলে। আঁকতে আঁকতে নিজেরই ভাল লাগছিল। হঠাৎ একদিন দেখেন ছবিটি গাঢ় রঙে ঢাকা। ক্রোধে, অভিমানে দুদিন আর ক্লাসেই গেলেন না, পরে নন্দলাল শেখালেন কি

ভাবে ছবি পুনরুদ্ধার করতে হয়। অনুশীলা এঁকেছিলেন মেঠোপথে মোটর গাড়ি। নন্দলাল কয়েকটি আঁচড়ে তাকে বদলে করে দিলেন গরুর গাড়ি।

এমনি অজস্র ঘটনার মধ্য দিয়ে কলাভবনের ছাত্রীরা শিক্ষালাভ করতেন। কলাভবনের সেন্টার স্টুডিওতে প্রতিদিন এক একজনকে আলপনা দিতে হত। প্রত্যেকেই চেষ্টা করতেন সবচেয়ে সুন্দর আলপনা দিতে। ইন্দুসুধা প্রথম এসে একটি সুন্দর আলপনা দিলে নন্দলাল অন্য ছাত্রছাত্রীদের ডেকে তা দেখিয়ে বললেন, 'দেখেছো এ শেখেনি। কিন্তু নেচারের নিয়ম লঙ্ঘন করেনি।' অনুকণা একটি আলপনা দিলে তিনি তা দেখে বললেন, 'প্রাণ কই?' এখানে ওখানে কয়েকটি ফোঁটা দিয়ে বললেন, 'ফোঁটা হল আলপনার প্রাণ—প্রত্যেকটি ফোঁটা যত্ন করে দেবে, যেমন তেমন করে নয়।'

পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান ছাত্রীসংখ্যা দেখে নন্দলাল কলাভবনের পাঠ্যসূচীতে ভারতীয় অলংকরণশিল্পকে অনেকখানি প্রাধান্য দান করেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল, 'একজন মেয়ের মনে শিল্পবোধ জাগাতে পারলে সেটি ভবিষ্যতে একটি পরিবারের মধ্যে সংক্রমিত হবে। এইভাবে শিল্পবোধ দেশের মধ্যে জাগতে পারে।' কেবল ছবি আঁকা নয় ছাত্রছাত্রীদের তিনি নানারকম জনহিতকর কাজে উৎসাহ দিতেন। স্টুডিওর কাজ, পিকনিক, একজিবিশন, ৭ই পৌষের ছবি আঁকা, ভিত্তিচিত্র অঙ্কন, মূর্তিগড়া, ভ্রমণ, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা, গ্রামের অসুস্থ রোগীর পরিচর্যা, উৎসবের আয়োজন, মঞ্চসজ্জা সর্বত্রই তিনি ছাত্রছাত্রীদের পাঠাতেন এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অম্লান বদনে সেইসব কাজ করতেন। বলতেন, 'যে কাজই করো না কেন, তুমি যে আর্টিস্ট। সে কথা ভুলে যেও না।'

নন্দলালের এই শিক্ষা এবং শিক্ষাদর্শ তাঁর ছাত্রীদের কতখানি প্রভাবিত করেছিল সেকথা জানা যাবে তাঁদের কর্মবহুল জীবনের দিকে তাকালে। স্বল্প পরিসরে বিস্তৃতভাবে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে আমরা এখানে শুধু তাঁদের কাজের প্রকৃতি ও কর্মক্ষেত্রের কথা বলব। প্রথমে প্রতিমা ঠাকুরের কথাই ধরা যাক। তিনিই নন্দলালের প্রথম ছাত্রী। প্রতিমা নিজে খুব বেশি ছবি আঁকতেন না, প্রদর্শনীতে পাঠাতেনও কম। সেজন্যে তাঁর যাবতীয় ছবি এখনও প্রকাশিত হয়নি। তিনি ছিলেন [illegible] চিত্রদ্রষ্টা। তাঁর লেখা 'গুরুদেবের ছবি' রবীন্দ্রচিত্র বিচারে আজও সব[illegible] বড় সহায়ক।

শান্তিনিকেতনে মঞ্চসজ্জা, অভিনেতৃবৃন্দের পোশাক-প[illegible] পরিকল্পনায় প্রতিমা ছিলেন নন্দলালের প্রধান সহায়িকা। নাট[illegible] চরিত্রগুলির কি পোশাক হবে বা মঞ্চসজ্জা কেমন হবে সেগুলি তিনি এঁকে বা স্কেচ করে রাখতেন। অনেক সময় এঁকে রাখতেন নৃত্যের বি[illegible] বিশেষ ভঙ্গী যা পরবর্তীকালের নৃত্য পরিকল্পনায় কাজে লেগেছে[illegible] বেশি। কারুশিল্পের প্রতি প্রতিমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যদিও তিনি আঁকা ছেড়ে নকশা বা আলপনা আঁকার দিকে যাননি তবে জাভার বা[illegible] শিল্পটির সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন তিনিই। এ সম্বন্ধে[illegible] হাতে-কলমে কোন শিক্ষা ছিল না কিন্তু বস্তুটির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য[illegible] সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে জেগেছিল বলেই তিনি বাতিক সং[illegible] জিনিসপত্র ও একটি ডাচ ভাষায় লেখা বই শান্তিনিকেতনে নিয়ে আ[illegible] কলাভবনের ছাত্রীরাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাতিক শিল্পের ন[illegible] দান করেন।

নন্দলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্রী ছিলেন সুকুমারী দেবী। পূর্ব[illegible] চাঁদপুর থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। আলপনা দেওয়া, ন[illegible] কাঁথা সেলাই, পিঁড়ি-চিত্র অঙ্কন, ছাঁচ তৈরি প্রভৃতি ঘরোয়া কাজে[illegible] জুড়ি ছিল না। তাঁর আলপনা দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এই শিল্পী[illegible] কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।' 'গুরুদেবের নির্দেশে সুকুমারী নন্দলালের কাছে ড্রইং শিক্ষা করলেন। মাস্টার মশাইয়ের শি[illegible] সুকুমারীর আলপনায় সরল গ্রাম্যভাবের পরিবর্তে দেখা দিল নান্দ[illegible] সূক্ষ্মতা। কলাভবনের শিক্ষাধারাতেও এ সময় থেকে আলপনার [illegible] জোর দেওয়া হল। মৌলিক চিত্র আঁকার মতোই প্রকৃতি পর্যবেক্ষ[illegible] অভিজ্ঞতাকে নকশায় রূপান্তরিত করা শুরু হল আলপনার সাহা[illegible] ছাত্রীদের অন্যান্য রচনাতেও আলংকারিক বিন্যাসের আভাস এই [illegible] থেকে লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য এ কাজে নন্দলালের প্রধান সহা[illegible] ছিলেন সুকুমারী দেবী। তিনি ছাত্রীদের শেখাতেনও। পরে [illegible] অনেকেই আলপনার কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুকুমারী দেবী ছবিও আঁকতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটি ছবি জল রঙে এঁকেছিলেন। একটি ছবি দেখে অবনীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেন। আলপনার মতো ছবিতেও তাঁর একটি নিজস্ব টান ছি[illegible] বিশেষ করে পদ্মফুল আঁকার সময় তিনি একটি সুন্দর রেখা টানতেন তুলনা খুঁজে পাওয়া যেত না।

গৃহিণীদের মধ্যে কিরণবালা সেনের উৎসাহ ছিল ছবি আঁকা ও ম[illegible] কাজ শেখার। অবসর সময়ে তিনি আসতেন নন্দলালের কাছে ম[illegible] কাজ শিখতে। আগে থেকেই অবশ্য জানতেন নানারকম পুতুল মাটির শিব গড়তে। তাঁর তৈরি করা মাতৃক্রোড়ে শিশু দেখে অবনীন্দ্র[illegible] সেটি ব্রোঞ্জে ঢালাই করে কলাভবনে রাখার ব্যবস্থা করেন। উত্তরায়ণের 'শ্যামলী' মাটির বাড়ি তৈরির সময়েও নন্দলালের আ[illegible] পরম আনন্দে কিরণবালা ছুটে এসেছিলেন কাজ করতে। শ্যাম[illegible] পশ্চিমের দেওয়ালের ক্লান্ত কৃষক দম্পতিটি তাঁর শিল্পদক্ষতার প[illegible] দিচ্ছে।

নন্দলালের গৃহিণী-ছাত্রীদের মধ্যে সবিতা ঠাকুর বিশেষ কৃতি[illegible] পরিচয় দিয়েছিলেন ডিজাইনার হিসেবে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার [illegible] শেষ করে তিনি পাটনায় চলে যান এবং সেখানকার ডিজাইন সেন্ট[illegible] সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু কাজ করেন। পরে জাপানে যান কাঠ ও বাঁশের [illegible] শেখবার জন্যে। ফিরে এসেও ঐ সেন্টারের সঙ্গেই যুক্ত ছিলে[illegible]

কলাভবনে শ্রীমতী এসেছিলেন বিশেষভাবে নন্দলাল বসুর কাছে আঁকা শেখার জন্যেই। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সরকারী কলেজ [illegible] তিনি চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। কলা ও সঙ্গীত উভয় বিভাগে শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তীকালে তাঁকে আমরা নৃত্যশিল্পীরূপেই দেখে[illegible] রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তির সঙ্গে অভিনব আঙ্গিকে নৃত্য প্রদর্শন করে [illegible] স্মরণীয়া হয়ে আছেন। হয়ত সেজন্যেই ছবি আঁকার হাত ভাল [illegible] সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁকে চিত্রশিল্পী রূপে দেখা যায় না। ওরিয়ে[illegible] আর্ট সোসাইটি পরিচালনার কাজে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার প[illegible]

ওয়া যায়। এসময় তিনি বহু শিল্পীর একক চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা রছিলেন। এছাড়াও তিনি যুক্ত ছিলেন বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। রুশিল্পের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল তাই কিছু কিছু নকশা, ব্লকপ্রিন্টের জও করেছিলেন। তাঁর এলগিন রোডের বাড়িটির সর্বত্রই ছিল ল্পী-হাতের স্পর্শ। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'নিজের রিপার্শ্বিককে সুন্দর করে তোলাই শিল্পীর কাজ।'

নন্দলালের ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রনিভা চৌধুরীর নাম সকলেই জানেন। ং, নকশা, আলপনা, সেলাইয়ের নানারকম কাজ করলেও তাঁর প্রকৃত রচয় 'পোর্ট্রেট-পেন্টার' হিসেবে। নোয়াখালি থেকে তিনিও ন্তিনিকেতনে এসেছিলেন শুধু ছবি আঁকা শেখার জন্যে। আলপনা তে পারতেন আগে থেকেই কিন্তু ছবি আঁকার ইচ্ছেটাই ক্রমশ বড় হয়ে য়তে একদিন চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। ভিত্তিচিত্র, দেওয়াল চিত্র, টির বাড়িতে অর্ঘ্যদানের চিত্র, উৎসবের আলপনা সব কিছুর সঙ্গেই ত্রনিভা জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে ভাল লেগেছিল প্রতিকৃতি আঁকতে। য় ৭০০ ছবি এঁকেছেন তিনি। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির মুখের ছবি ধরা ড়েছে চিত্রনিভার হাতে। অথচ মুখ আঁকার ইচ্ছেটা তাঁর মনে এসেছিল কস্মিকভাবে। একবার পৌষমেলাতে একটি ছোট্ট ছেলের প্রতিকৃতি কতে বসে দেখলেন হুবহু আঁকা হয়ে গেল। সেই শুরু। তারপর শুধু খ আর মুখ, মুখের মিছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, নয়নী দেবী, ইন্দিরা দেবী, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী ইডু, শ্যামাপ্রসাদ, বিনোবা ভাবে, ইন্দিরা গান্ধী, সুনীতিকুমার ট্টোপাধ্যায়, এণ্ডরুজ, দিনেন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি কেছেন চিত্রনিভা। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের অনেককেই চিত্রনিভার বির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। ছবি আঁকতে, আলপনা দিতে কিংবা নারকম ডিজাইন করতে ভাল লাগে চিত্রনিভার। গোটা তিনেক একক দর্শনী হয়েছে। শিক্ষকতা করেছেন কলাভবনে, কলকাতার বিদ্যাসাগর ণীভবনেও। সেখানে তিনি কারুশিল্প বা ক্রাফটসের কাজ শেখালেও তিকৃতি-শিল্পী হিসেবেই চিত্রনিভাকে সকলে চেনেন।

রানী চন্দের লেখার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। অবন ঠাকুরের বনাকে ঠিক ছবির মতো ধরে রেখেছেন 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর রে'তে। চোখের সামনে ছবির পরে ছবি এঁকে যায় 'পূর্ণ কুম্ভ', 'আমার য়ের বাপের বাড়ি', 'জেনানা ফাটক'। শুধু কথার পর কথা সাজিয়ে ছবি কা নয় সত্যিকারের রঙ-তুলি দিয়ে ভাল ছবি আকেন রানী নিজেও। খুব ছোট থেকেই ছবির জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কলাভবনের প্রথম দিকের ছাত্রী রানী খুব ভাল ছবি আঁকলেও নিজেকে যেন আড়ালে রাখতেই ভালবাসেন। নানা কারণে পরবর্তীকালের কলাভবনের সঙ্গেও তাঁর যোগ নেই। শ্রীভবনের ফ্রেস্কো ও লাইব্রেরীতে রানীর হাতের কাজের নিদর্শন আছে। পাটনা মিউজিয়ামে রাখা বুদ্ধ সিরিজের ছবিগুলিও তাঁরই আঁকা।

নন্দলালের দুই কন্যা গৌরী ও যমুনা। দুজনেই কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন। 'নটীর পূজা' ও 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করে তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন। গৌরী ছবিও আঁকতেন খুব ভাল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'নটীর পূজা' নৃত্যাভিনয় দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন তেমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর আঁকা 'পূজারিণী' দেখে। উপহার দিয়েছিলেন নিজের আঁকা একটি ছবি। যদিও তিনি বলতেন, 'মেয়েরা ভাল ছবি আঁকতে পারে না কারণ তারা জিনিয়াস হতে পারে না।' গৌরীর আলপনা আঁকার হাতটিও ভাল ছিল। সুকুমারী দেবীর পরে ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারতেন। নন্দলাল প্রবর্তিত অলংকরণকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম অংশীদার ছিলেন গৌরী। শুধু তাই নয়, কলাভবনে বাতিক শিল্প শেখানোর সূত্রপাতও হয় একরকম তাঁরই হাতে। অবশ্য কলাভবনের আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাতিক সংক্রান্ত ডাচ ভাষায় লেখা বইটি অনুবাদে সাহায্য করেন অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী দেবী।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কলাভবনে শিক্ষকতা করেছেন গৌরী। প্রকৃত শিল্পশিক্ষা হয়েছে সেসময়েই। তাঁর নিজের ভাষায় 'শেখাতে শেখাতেই বেশি শেখা হয়।' কলাভবনে তিনি শেখাতেন কারুশিল্প—নানারকম হাতের কাজ। এখন তাঁর কৃতী ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন ডিজাইন সেন্টারে কাজ করছেন। তিনি নিজেও যুক্ত আছেন নতুন করে গড়ে ওঠা গৃহিণীদের 'কারুসংঘে'র সঙ্গে।

গৌরীর ছোট বোন যমুনা ছ'বছর শিখেছেন ছবি, ফ্রেস্কো, মডেলিং, লিনোকাট প্রভৃতি সব কাজ। সে সময় হাতের কাজ বা আলপনা, সেলাই-ফোঁড়াই মোটেই ভাল লাগত না যমুনার। কলাভবনে ক্রাফটস বিশেষ শেখেননি, শিখেছেন ক্রাফটস শেখাতে গিয়ে। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায়, গৌরী-যমুনার মা সুধীরা দেবীর হাতের কাজও ছিল অসাধারণ। তিনি শান্তিনিকেতনের মেয়েদের জন্যে সুন্দর সুন্দর ফুলের গয়না তৈরি করে দিতেন। তাঁর হাতের গুণে তাঁদের মাটির বাড়িটিকে

মনে হত একটি শিল্পীর যথার্থ বাসস্থান। কলাভবনের শিক্ষিকা হয়ে যমুনা শিখেছেন বহু রকম হাতের কাজ। আগে ছবি আঁকতেন, প্রদর্শনী হয়েছে, কিছু কিছু ছাপা হয়েছে 'প্রবাসী' ও 'জয়শ্রী'তে। শান্তিনিকেতনে নতুন করে 'কারুসংঘ' গড়ে উঠলে যমুনা যোগ দিলেন সানন্দে। গৃহিণীরা তাঁদের হাতের কাজ এনে এখানে বিক্রী করেন। পৌষ মেলার সময় বাইরে থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা কিছু না কিছু 'কারুসংঘ' থেকে কিনে নিয়ে যান।

এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার কথাও বলে নেওয়া যেতে পারে। নিবেদিতা 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে অর্জুন সাজতেন বলে গৌরী-যমুনার সঙ্গে তাঁর নামটিও উচ্চারিত হয়। কলাভবনে শিল্পশিক্ষা নেবার পর তিনি শিল্পী-পরিবারের একজন হয়েছিলেন নন্দলাল বসুর পুত্রবধূরূপে। তাঁর উৎসাহে বিয়ের পরে গ্রামের কুমোরের কাছে শিখেছিলেন মাটির কাজ। এখনো নানারকম মাটির কাজ করেন। ঘর জুড়ে আছে নানারকম নয়ননন্দন মৃৎপাত্রে। দু একবার প্রদর্শনীও হয়েছে। তবে ঘরে বসে মাটির কাজ করতেই বেশি ভালবাসেন নিবেদিতা।

অনুকণা দাশগুপ্ত ভাল ছবি আঁকতেন, আলপনার কাজেও ছিলেন দক্ষ। সবচেয়ে ভাল করতেন লিনোকাটের কাজ। নন্দলাল সহজ পাঠের প্রথম ভাগের ছবিগুলি লিনোর ওপরে শুরু করলেন। সেগুলি নরুণ দিয়ে সুন্দরভাবে কাটার ভার পড়ল অনুকণার ওপর। বৃক্ষরোপণ উৎসব ও মহাত্মাজীর ডাণ্ডী অভিযানের ছবিদুটিও কেটে দিয়েছিলেন অনুকণা। এছাড়া শ্রীভবনে ফ্রেসকোর কাজ, উডকাট সবই করেছেন। ছবির জন্যে ওরিয়েণ্টাল আর্ট একজিবিশনে পেলেন প্রথম পুরস্কার। তবু ঠিক ছবির জগৎ নিয়েই থাকতে পারেননি অনুকণা। কলাভবনের শিক্ষা শেষ করেই চলে যান শিলং-এর লেডিকিন স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা হয়ে। পরে আসেন কলকাতার লরেটোতে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছোটদের জন্যে বই লিখেছেন গোটা পনেরো।

ইন্দুসুধা ঘোষ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৯২৬-এ। তার আ[...] বছর রবীন্দ্রনাথ মৈমনসিংহে গেলে তাঁর সংবর্ধনাসভায় সুন্দর আল[...] দিয়ে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন ইন্দুসুধা। প্রতিমা দেবী ও পুলিনবি[...] সেনের আগ্রহেই ইন্দুসুধা এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ছবি আঁকায় হা[...] খড়ি হয়েছিল মৈমনসিংহের এক ফোটোগ্রাফারের কাছে। পরে [...] আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপনে যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের স[...] আশ্রয় দিয়েছিলেন বহু সন্ত্রাসবাদীকে। হিজলী জেলে বন্দী ছিলেন [...] বছর। কারাবাসের সেই রুক্ষ নীরস দিনগুলোকেও ইন্দুসুধা রঙে-রসে [...] করে দিয়ে নন্দলালের শিক্ষাকে সার্থক করে তুলেছিলে[...] শান্তিনিকেতনের প্রথম শিল্পীপ্রতিষ্ঠান কারুসংঘের সঙ্গে ইন্দুসুধার নি[...] যোগ ছিল। পরে কিছুদিন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে ভার[...] পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা দেবার জন্যে যোগ দেন। বহু কাজ করেছেন 'ম[...] শিল্প শিক্ষালয়' ও 'নারী সেবা সংঘে'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে। অনাথ ও দ[...] মেয়েদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যেই 'নারী [...] সংঘ' গড়ে উঠেছে। ইন্দুসুধা এই কাজে মনপ্রাণ সর্বস্ব সম[...] করেছিলেন। এখনও আছেন তাদের নিয়ে। তাদের শুধু কাজের জ[...] হাজার হাজার নকশা তৈরি করেছিলেন। ছবিও আঁকেননি তা [...] বেশিরভাগই এঁকেছিলেন জেলে বসে কিন্তু সেসব জমিয়ে রাখেনি[...]

ইন্দুলেখা ঘোষ শান্তিনিকেতনে এলেন ১৯৩৪ নাগাদ। অসাধা[...] কণ্ঠের অধিকারিণী ইন্দুলেখাকে হয়ত সঙ্গীতের ছাত্রী বলাই সঙ্গত। [...] আঁকা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্কোচ ছিল। নন্দলালের আগ্রহেই তিনি ছবি আঁ[...] শেখেন, সেইসঙ্গে বাতিক ও চামড়ার কাজ। সেণ্টার স্টুডি[...] মাস্টারমশাইয়ের কাছেই একপাশে বসতেন ইন্দুলেখা, অনেক সময় [...] লেখালেখির কাজেও সাহায্য করতেন। সেজন্যে শান্তিনিকেতন [...] চলে যাবার পরেও ইন্দুলেখার সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের পত্রে যোগা[...] ছিল। নন্দলাল তাঁকে কার্ডে বহু স্কেচ এঁকে পাঠিয়েছিলেন।

ইন্দুলেখার পরবর্তী অনেক কাজের মধ্যে বড় কাজ হল নীলখে[...] পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের নানারকম হাতের কাজ শিখিয়ে পুনর্বাসনের ব্য[...] করা। তাদের সমস্যা জর্জরিত জীবনে তিনি এনে দিয়েছিলেন ন[...] জীবনের আশ্বাস। নীলখেরির কাজে সফল হবার পর ইন্দুলেখা ফুলি[...] বাঙালী উদ্বাস্তু শিবিরে কাজ করতে আসেন।

আগেই বলেছি নন্দলালের বহু ছাত্রীই উত্তরকালে নিজস্ব ক্ষে[...] সাফল্য অর্জন করেন। জয়া আপ্পাস্বামীর নাম আজ সকলেই জা[...] প্রখ্যাত শিল্পবোদ্ধা হিসেবে। তিনিও শান্তিনিকেতনে এসে কলাভ[...] নন্দলালের কাছে প্রথমে ছবি আঁকা শিখতেন। তারপর ছাত্রী হিসে[...] ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে যান পিকিংয়ের 'কলেজ অব আর্টস্'এ। [...] শিল্পীচক্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী শিল্পী জয়া পৃথিবীর নানা দেশ [...] করেছেন। ওহিওর ওবারলিন কলেজ থেকে শিল্পকলায় এম এ পাশ ক[...] ললিতকলার পত্রিকা 'ললিতকলা কনটেমপোরারী' সম্পাদনা করে[...] কিছুদিন, যুক্ত ছিলেন আর্ট কলেজের সঙ্গেও। কলকাতায় এবং বাইরে বহুবার তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছে। ১৯৭৪-এ পেয়েছেন আইফে[...] পুরস্কার। জয়ার কর্মময় জীবনের তালিকায় যুক্ত হতে পারে আরো অ[...] কিছু। বিশেষ করে তরুণ শিল্পীদের শিল্পক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য [...] বহু চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজে অনেকগুলি গ্রন্থের লেখিকা [...] সম্পাদিকা।

জয়ার মতো বিখ্যাত না হলেও সেরামিকসের কাজে নির্মলা পটবর্ধ[...] নামও ভারতজোড়া। তিনিও নন্দলালের ছাত্রী, শুধু তাই নয় প[...] সেরামিকসের কাজ শিখিয়েছিলেন নিবেদিতাকেও।

সেলিনা বিক্রমরত্ন এসেছিলেন সিংহল থেকে। খুব ভাল [...] আঁকতেন তখনই। মূর্তিও গড়তেন। কালোবাড়ির একটি মূর্তি তাঁর হা[...] গড়া। দেশে ফিরে গিয়ে ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা দেবার কা[...] তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। নন্দলালের শিল্পরীতিকে সিংহলে নি[...] গিয়েছিলেন আরো কয়েকজন শিল্পী। ভারতীয় আলপনা তাঁদের ম[...] আগ্রহ ও কৌতূহল জাগিয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

রেণুকাবালা কর এসেছিলেন রেঙ্গুন থেকে। শান্তিনিকেতনে আ[...] আগে প্রতিকৃতি অঙ্কন শিখেছিলেন ঢাকায়, এখানে কাঞ্চন ফুল এঁকে [...] হল নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। রেণুকা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা[...]

যুক্ত ছিলেন কারুশিল্পের শিক্ষয়িত্রীরূপে। বিশ্বনারী সংঘের সদস্যা রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯৬০ সালে।

...নোরমা সেন পাটনা থেকে এসে কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলেন ...রণ শিল্প শিক্ষার জন্যেই। তারপর আর শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে ...। কলাভবনের শিক্ষা শেষ করে দু'বছরের জন্যে ইংলণ্ডে ...ছলেন 'আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফট' স্কুলে নানারকম হাতের কাজ শিখতে। ...প্রিন্টিং, কাশ্মীরী ও কাথিয়াবাড়ী কাজের নকশা, বাতিকের কাজ ...নিয়ে কয়েকটা প্রদর্শনী হয়েছিল। মনোরমার নকশা সর্বত্রই আগ্রহ ...য়েছে।

...ন্দলালের আরো কয়েকজন ছাত্রী কারুশিল্প শিক্ষার জন্যে বিদেশে ...নীলিমা বড়ুয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন স্টেজ ক্রাফটস্ শিখতে ...নিবেদিতা পরমানন্দ সুইজারল্যাণ্ডে টেকসটাইল ডিজাইনের জন্যে। ...শিল্পের জগতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন প্রভা ...য়ার। তিনি লখেনী-এর ডিজাইন সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। বাতিকের ...অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। মেনা ...ডিয়া খাটাউ মিলের ডিজাইনার হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে চলে ...। লীলা মুখোপাধ্যায় কাঠের কাজে ক্রমাগত দক্ষতার পরিচয় ...ন। কমলা পোড়ুয়াল ও রুবি মণ্ডিওয়ালা কলকাতা ও লাহোরে আর্ট ...ও করেন। মৃদুলা ঠক্কর ভাল ছবি আঁকতেন। গীতা রায়ের আঁকার ...ও ভাল ছিল কিন্তু তিনি বেশি আঁকতেন না। পুষ্পা যখন ছবি আঁকা ...তেন তখন নকশার কাজ পছন্দ করতেন না কিন্তু পরে তিনি নকশা, ...সেলাই নিয়েই কাজ করেছেন, ছবি বিশেষ আঁকেননি।

...ন্দলালের ছাত্রীদের মধ্যে অনেককেই বিভিন্ন স্কুলে কারুশিল্প শিক্ষা ...দেখা যায়। সাক্ষাৎ প্রয়োজনের তাগিদেই কারুশিল্পের জন্ম হয়েছিল ...এই তাগিদ আমাদের দেশের চিত্রশিল্পীদের সামনে আগে ছিল না। ...লাল এর গুরুত্ব বুঝেছিলেন। শুধু তাই নয়, কারিগরের সাহায্যকারী ...কাজ শিখতে ছাত্রদের উৎসাহও দিয়েছেন। বলতেন, 'আশেপাশের ...গরদের সঙ্গ করবে, কেউই নগণ্য নয়।' ধীরে ধীরে ...প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কারুশিল্প শিক্ষার প্রয়োজন ও আগ্রহ সৃষ্টি হবার ...থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের ...পড়ে। আমাদের অনুমান, কারুশিল্পের শিক্ষয়িত্রীরূপে কলাভবনের ...রাই সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য ছাত্রদের সংখ্যাও যে কম ছিল তা নয়। কয়েকজন ছাত্রীর কথা আগেই বলেছি। এছাড়া দেখা যাবে, বিমলা নিয়োগী এলাহাবাদে গিয়ে শিল্প শিক্ষয়িত্রী হয়েছিলেন, সীত গিধোয়ানী ফিরোজপুরে। মোহিনী পাণ্ডে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছিলেন নৈনিতালের স্কুলে, মণিকা সেনগুপ্ত আলমোড়ার মিউনিসিপাল বালিকা বিদ্যালয়ে, কমলা মুখোপাধ্যায় দেরাদুনের মানব ভারতী স্কুলে, অবশ্য তিনি ছবিও আঁকতেন। অমলা সরকার কলকাতার আর্ট কলেজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সেই ১৯৫১ সাল থেকে, তার আগে ন'বছর শিক্ষকতা করেছিলেন কলাভবনে। ক্রাফটসের অধ্যাপিকারূপে বেশিরভাগ সময় কাটালেও ছবি আঁকা ও আলপনা নিয়ে কিছু ভাবনা-চিন্তা করেছেন। ভেবেছেন মূক-বধির মেয়েদের অর্থকরী শিল্পশিক্ষা দেবার কথাও। পাঠভবনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত রয়েছেন ক্ষমা ঘোষ। নন্দলালের কাছে শিল্পশিক্ষা নেবার পরে তিনি বিনোদবিহারীর কাছে ওয়াসের কাজ শিখেছিলেন। নন্দলাল শেখাতেন টেম্পারা, এগ টেম্পারা প্রভৃতির সাহায্যে। কিন্তু ছবি আঁকা ক্ষমার বিশেষ হয়নি। পাঠভবনে শিশুদের ছবি আঁকা শিখিয়েছেন অনেকদিন, এখন শেখান হাতের কাজ।

ইলা ঘোষ নন্দলালের কাছে যখন কাজ শিখেছিলেন তখন কলাভবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ছাত্রছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই ঘরোয়া পরিবেশ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পিকনিকে যাবার মাত্রাও কমে গিয়েছিল। ইলা অবশ্য সবই শিখেছিলেন। ফ্রেস্কো আঁকার কাজও করেছেন কলাভবনে। তিনি তাঁর শিল্পশিক্ষাকে একটি অভিনব কাজে লাগালেন বছর কুড়ি বাইশ আগে। গ্রামের মেয়েদের অর্থকরী হস্তশিল্প শেখাবার একটি পরিকল্পনায় হাত দিয়ে তিনি দেখলেন গ্রামের মেয়েদের প্রচলিত হাতের কাজ না শিখিয়ে তাদের নিজস্ব শিল্পকে যদি পুনরুজ্জীবিত করা যায় তাহলে আরোই সুফল পাবার সম্ভাবনা। তিনি দেখলেন, কাঁথা শিল্প যা একসময় গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল সেটি অনুশীলনের অভাবে হিন্দু সমাজে লুপ্ত হয়ে এলেও মুসলমান সমাজে এর চল রয়েছে। সুতরাং গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হলে কাঁথা শিল্পের পুনরুজ্জীবন করাই সঙ্গত। তিনি এই কাঁথার সেলাই দিয়েই তৈরি করলেন শাড়ির পাড়, চাদরের নকশা, বটুয়া, বেডকভার প্রভৃতি। এখন এই শিল্পটি বোলপুরের গ্রামাঞ্চলে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। শহরাঞ্চলেও এই ধরনের শিল্পকর্মের চাহিদা বাড়ছে।

নন্দলালের ছাত্রীদের বা তাঁদের কাজের তালিকা এখানেই যে শেষ তা নয়, কলাভবনে আরো বহু ছাত্রী ছিলেন তাঁরা পরে কোথায় আছেন এবং কি করছেন নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। নন্দলাল অবসর নেবার পরেও তাঁর কাছে অনেকেই আসতেন শিল্পশিক্ষা নেবার জন্যে। যেমন এসেছিলেন জাপানের কিয়াতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের অধ্যাপিকা ফুকু তাকিনো। ১৯৬২ সালে তিনি কলাভবনে ভিজিটিং প্রফেসার হিসেবে এসে নন্দলালের কাছে কিছুদিন শিল্পচর্চা করেন। স্থানাভাবে যাঁদের কথা খুব সংক্ষেপে বলা হল তাঁদের দানও কম নয়। তবু একথা সত্যি, নন্দলালের ছাত্রীদের কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশই বিশেষ পরিচিতা নন। সেজন্য মনে হয়, একজন চিত্রশিল্পী যত সহজে স্বীকৃতি পান বা পরিচিত হয়ে ওঠেন একজন কারুশিল্পীর পক্ষে তা হয় না। অথচ একটা ভাল নকশা তৈরি করা একটা ভাল ছবি আঁকার মতোই কঠিন, দুটিই সমান অভিনিবেশ দাবি করে। তুলনায় দেখা গেছে, নন্দলালের ছাত্রদের মধ্যে চিত্রশিল্পীর সংখ্যা বেশি। ছাত্রীদের অনেকেই খুব ভাল ছবি আঁকতেন কিন্তু পরে তাঁরাই কারুশিল্পী হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিলেও বিশেষ ছবি আঁকেননি। কেন এমন হয়, একজনের ক্ষেত্রে নয় বহুজনের ক্ষেত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে কেন? নন্দলালের কন্যা গৌরী এ প্রশ্ন করেছিলেন অবনঠাকুরকে। তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েরা জিনিয়াস হতে পারে না। তারা অনেক জিনিস নিয়ে থাকে এবং বড় বেশি জড়িয়ে পড়ে।' তাই তারা চিত্রশিল্পী হতে পারে না। ঠিক এই প্রশ্ন জেগেছিল শিক্ষক নন্দলালের মনেও। তিনি একবার রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মেয়েরা কেন বড় শিল্পী হতে পারে না,' গুরুদেব উত্তর দিয়েছিলেন, 'মেয়েরা সংসারকেন্দ্রিক। তারা সংসার পেলে সব ভুলে যায়।' প্রায় একই কথা বলেছেন মহিলা শিল্পীরাও। তাঁদের মতে, সংসারের কাজ ফেলে ছবি আঁকা হয় না আবার কাজ করতে করতে এক ফাঁকে বসে ছবি আঁকাও যায় না। কিন্তু ডিজাইন করা যায়, হাতের কাজও করা যায়। তাই শেষ পর্যন্ত মেয়েরা কারুশিল্পের দিকেই ঝোঁকেন। সময়ের অভাবটাই মেয়েদের ছবি আঁকার কাজে একটা বড় অন্তরায়। আরো ছোট বড় অনেক কারণ আছে হয়ত। কেউ মনে করেন শুধু ছবি এঁকে প্রতিষ্ঠা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কেউ কারুশিল্পের প্রয়োজন ও অর্থকরী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুচিন্তিত ধারণা মেলে প্রতিমা ঠাকুরের উক্তিতে। তিনি লিখেছেন, 'আমার মনে হয়, মেয়েরা প্রকৃতিগত ইনডিভিজুয়েলিস্ট, বাস্তবভাবে না পেলে আদর্শ বা আইডিয়ালকে তারা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না, তাদের সাধনার জিনিস রূপের মধ্যে দিয়েই চিত্তের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, পুরুষদের এ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়ার দিকেই বিশেষ আগ্রহ ও উন্মুখতা দেখা যায়। তাদের মনের ভাব আগেই রূপ নেয় তারপর তার প্রকাশ দেখা যায় বাইরে। এই বিপরীত চরিত্র ও রুচি নিয়ে স্ত্রী পুরুষ পৃথিবীতে জন্মেছে। কাজেই উভয়ের প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষাপ্রণালীরও বিভেদ হওয়া দরকার। সেদিক থেকে আর্টের জগতে কারুকর্মের শিক্ষাই হল মেয়েদের পথ।'

এ প্রসঙ্গে নন্দলালের নিজস্ব ধারণা ঠিক কি ছিল জানা যায়নি। তিনি মেয়েদের শিল্পশিক্ষার ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাঁর শিক্ষারীতি দেখে মনে হয় তিনি তাদের শিল্পবোধকে জাগ্রত করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'মেয়েরা উত্তর জীবনে শিল্পের অখণ্ড সাধনা নাও যদি করে উঠতে পারেন, শিল্পের প্রভাব শিল্পের পরিবেশ তার আগ্রহ ও অনুরাগ জাগিয়ে তুলবেন ঘরে ঘরে'—তার মূল্যই বা কম কিসে! সেজন্যেই তিনি কারুশিল্প শিক্ষায় উৎসাহ দিয়েছেন এমনকি কলাভবনের শিক্ষণীয় বিষয়সূচীরও পরিবর্তন করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল বিচিত্র। তিনি কলাভবনকে একটা স্টুডিওয় পরিণত করতে চাননি। ছবি, অলংকরণ, কারুশিল্প, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, নকশা, সাজসজ্জা, ভিত্তিচিত্র, কাঠের কাজ, হাতের কাজ, মাটির কাজ—শিল্পের সঙ্গে জড়িত সব কিছুকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিলেন। শিল্পকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে জীবনকে সুন্দর করে তোলার এই শিক্ষাকে নন্দলালের ছাত্রীরা অন্তর দিয়ে শুধু গ্রহণই করেননি, ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের জীবনে।

নন্দলাল বসুর গ্রন্থচিত্রণ

পূর্ণেন্দু পত্রী

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমাকে যে ছাগলের ছবি পাঠিয়েছ এ উর্বশীর সহোদর ভাই নয় কিন্তু এর বাসা অমরাবতীতে। এর থেকে প্রমাণ হয় আর্টে সুন্দর হবার জন্যে সুন্দর হবার কোনো দরকার হয় না। আর্টের কাজ মন টানা, মন ভোলানো নয়।....

১৯৩৭-এর ১৭ মে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি নন্দলাল বসুকে। রবীন্দ্রনাথ তখন লিখছেন 'ছড়ার ছবি' নন্দলালের ছবির উপর ভর করে।

এর ঠিক ১৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২১-এর ১৮ মার্চ টমাসমান প্রায় একই বক্তব্যকে, ভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যদিও, প্রকাশ করেছিলেন নিজের এক চিঠিতে, যা তাঁর 'ডেথ ইন ভেনিস'-এর ইলাসট্রেটর উলফগাং বর্ণ-কে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প্রিয় হের বর্ণ :

আমার কাহিনী 'ডেথ ইন ভেনিস' অবলম্বনে তোমার 'গ্রাফিক ফ্যানটাসিজ' গুলো পর্যবেক্ষন করে অসম্ভব আনন্দ পেয়েছি। একজন লেখকের কাছে এটা সব সময়েই আলোড়িত ও উল্লসিত হওয়ার মতো অভিজ্ঞতা যখন দেখা যায় তাঁর মনন-জাত সৃষ্টিকে অবলম্বন করে প্রস্তুত হচ্ছে অথবা মহিমান্বিত রূপায়ণের উদ্যোগ চলেছে অন্য শিল্পে যা সরাসরি আবিষ্ট করে আমাদের অনুভূতিকে—গ্রাফিক আর্ট অথবা থিয়েটার। এক্ষেত্রে তোমার ইলাশট্রেশন সত্যিই যা ঘটিয়েছে তাকে বলতে পারি 'স্পিরিচুয়ালাইজেশন অফ দা সাবজেকট', অথবা আরো সঠিক ভাবে 'স্পিরিচ্যুয়াল এলিমেন্টেস'-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া এবং তাকেই মূর্ত করে তোলা—একটা নাট্যানুষ্ঠান অথবা একটা চিত্রায়ণের কাজ সম্পর্কে যা বলে উঠতে পারাটাই সবচেয়ে খুশী হওয়ার ব্যাপার।

আমার সবচেয়ে যা ভালো লেগেছে তা হল তোমার লিথোগ্রাফস পুরোপুরিভাবে এই নভেলের 'ন্যাচুরালিস্টিক স্ফিয়ার' থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, এর 'প্যাথোলজিক্যাল' এবং 'সেন্টিমেন্টাল' উপকরণকে বিশোধিত করে বেছে নিয়েছে 'ওনলি দা পোয়েটিক কোয়ালিটি'!

এরও বহু বছর আগে ঐ জার্মান-এরই মহাকবি গোটে গ্রন্থ-চিত্রণ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা মনে রাখলে বুঝে-নেওয়া সহজ হয়ে যায় টমাস মান তাঁর এই জাতীয় চিন্তায় বহন করছেন কার উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। মধ্যযুগের ধারায় গ্রন্থ-চিত্রণ যখন **কেবলই** মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে, বইকে শোভিত করে চলেছিল সুদৃশ্য নকশাদার অলঙ্করণে, তখন গোটের মুখেই প্রথম শোনা গেল এর আধুনিকতম সংজ্ঞা—

'দি আর্টিস্ট মাস্ট থিংক আউট টু দা এণ্ড দা পোয়েটস আইডিয়া।'

গোটের এই উচ্চারণকেই অস্পষ্টতার রাস্তা থেকে পৌঁছে দিলেন স্থির ঠিকানায়, স্বনামধন্য গ্রন্থ-চিত্রকর লিটন ল্যাম্ব।

"ইলাসট্রেশন ক্যান ওনলি বি জাস্টিফায়েড ইফ দে আড টু এ বুক সামথিং দ্যাট লিটারেচর ক্যাননট এনকমপাস।"

গ্রন্থ-চিত্রণ সম্পর্কে এই উক্তি যেন রাজঅট্টালিকার সিং-দরোজার মতো। এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত সার কথা এটাই।

অবশ্য বই বা বইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে ছবির ওতপ্রোত সম্পর্কের যে-ধারণায় লালিত আমরা আজ, তার আদি বীজ বপন করেছিল যে মহাপ্রতিভার হাত, তিনি দা ভিঞ্চি।

"এবং তুমি যে চাইছ অক্ষর দিয়ে গড়ে তুলবে মানুষের আকৃতি, তার দেহকোষের যাবতীয় কিছু, পরিত্যাগ করো তেমন ধারণা। কারণ যত সক্ষ্মাতিসক্ষ্মভাবে তা বর্ণনা করবে তুমি, ততই রুদ্ধ করে দেবে পাঠকের
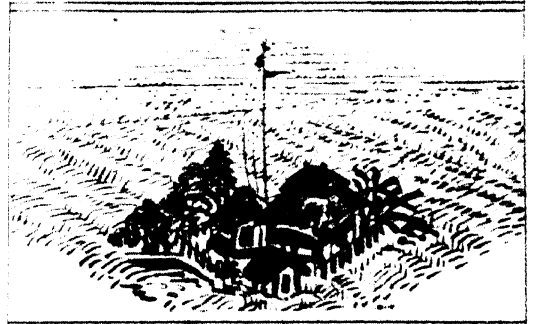
দীপালি

গান

হিমের রাতে ওই গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।

জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে"।
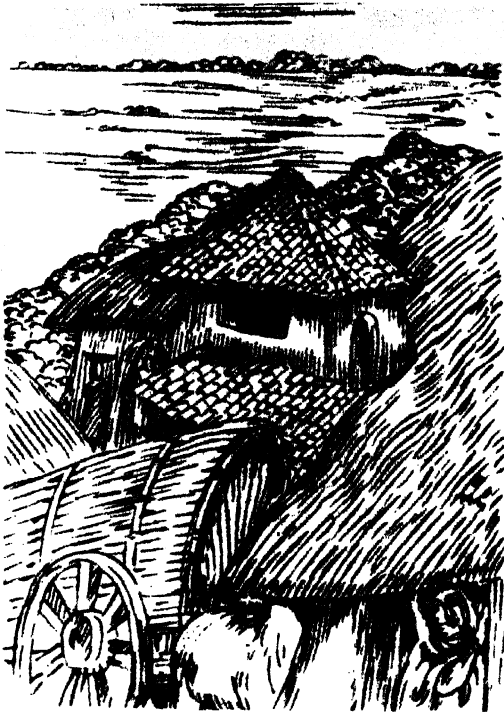
মন, ততই বর্ণিত বিষয়ের স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেবে তাকে।"

অতঃপর, প্রতিকার হিসেবে, তাঁর নির্দেশ—

"অ্যাণ্ড শো ইট ইজ নিসেস্যারি টু ড্র অ্যাণ্ড টু ডেসক্রাইব।"

পৃথিবীর শিল্পইতিহাসের দিকে তাকালে এক আলোকিত অঞ্চল চোখে পড়ে যায়, যেখানে সব খ্যাতনামা শিল্পীকেই দেখি জীবনের কোনো না কোনো সময়ে গ্রন্থ-চিত্রণে মগ্ন। বেত্তিনি, বতিচেল্লি, ব্রাক, ড্যামের, ডুরার, ব্লেক, লিয়র, রুয়ঁ, মাতিস, লেজ্জার, পিকাসো, ককতো, রেমব্রাঁ প্রমুখদের সকলেই চিরায়ত সাহিত্যের, সেই সঙ্গে কেউ কেউ নিজেরও রচনাকে চিত্রিত করেছেন বইয়ের অঙ্গ হিসেবে। ভাস্কর রঁদা-র প্রিয় লেখকের সংখ্যা দুই, দান্তে আর বোদলেয়ার, এঁকেছেনও বার বার এঁদের কবিতার ছবি। বাইবেল, কিংবা অ্যারাবিয়ান নাইটস, কিংবা ঈশপস্ ফেবল্, বোকাচ্চিও, ডন কুইকসোট, চসার শেকসপীয়র, প্যারাডাইস লস্ট, ডিভাইন কমেডী,ভারতবর্ষের বৈষ্ণব গীতিকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, গ্রীক ট্রাজেডীর উপাখ্যান আবহমান প্রলুব্ধ করে আসছে মহত্তম শিল্পীদের, আপন আত্মপ্রকাশের এক লোভনীয় উপকরণ হিসেবে। গ্রন্থ-চিত্রণের ক্রমাগত প্রসার, শিল্পীদের জোগান দিয়ে চলেছে বিরতিহীন প্রেরণা।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনেক আগেই এবং এদেশে ছাপাখানা ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা বইয়ের ন্যাড়া কপালে সচিত্র সিঁদুর টিপ্। আদি পর্বে বাংলা বইকে সালঙ্কারা করার ভার ছিল বটতলার শিল্পী-কারিগরদের হাতে। আর অলঙ্কার বলতে, কাঠখোদাই ছবি। পরে কেয়ূরের পাশে কঙ্কণের মতো লিথোগ্রাফ। ক্রিয়েটিভ ইলাসট্রেশন বলতে যা বুঝি, তা তখনও, অন্নদাচরণ বাগচী অথবা হরিশচন্দ্র হালদার সত্ত্বেও, ঘোমটা-ঢাকা রমণীর মতো সূর্যালোক থেকে বেশ খানিকটা দূরে। গ্রন্থ-চিত্রণের বেশ-ভূষাকে আধুনিকীকরণের উগ্র উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ একদিন হ্যাঁচকা টান মারলেন সে ঘোমটায়।

অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি কিংবা একুশ। গিলার্ডির হেফাজতে চলেছে বিলেতী-ধাঁচের ছবিতে হাতেখড়ি। অবনীন্দ্রনাথের সেই কোমল ঘাড়েই রবীন্দ্রনাথ চাপিয়ে দিলেন দারুণ গুরুভার : ছবি এঁকে দাও আমার চিত্রাঙ্গদা কাব্য নাট্যের। আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ, অজস্র রেখাঙ্কন। কৃতজ্ঞ কাকা ভাইপোকে স্নেহ-আশীর্বাদ হিসেবে উৎসর্গ করলেন সে-বই, যত্ন-রচিত চিত্রোপহারের বিনিময়ে।

কাকার বইয়ে ভাইপোর ছবির যুগলমিলন ঘটেছে আরো একবার, 'নদী' নামের দীর্ঘ কবিতার চিত্রণে। কিন্তু সে চিত্রণ কবির ইচ্ছা-অনুরোধে নয়, শিল্পীর নিজস্ব ভালোলাগার টানে, ব্যক্তিগত গোপন সদিচ্ছায়। পুস্তকাকৃতিতে 'নদী'-র যখন প্রথম প্রকাশ, সে ছিল হরফ-সর্বস্ব, অর্থাৎ চিত্রহীনতায় নগ্ন। দৌহিত্র মোহনলাল অবনীন্দ্রনাথ-অলঙ্কৃত ছাপা বইয়ের একটি কপি বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আবিষ্কার করেন অনেক বছরের পর। 'নদী'-র সে সচিত্র সংস্করণ বিশ্বভারতী প্রকাশ করল ১৯৬৪ তে। এরপর বিচ্ছিন্নভাবে অবনীন্দ্রনাথের কিছু ছবি রবীন্দ্রনাথের বইয়ে ঠাঁই পেলেও, সচেতন পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়ণ ঘটেনি কখনো। আর গগনেন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় কাকার রচনা-চিত্রণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন পরে। এই দুটি ভাইপো কবির প্রাণাধিক প্রিয়।

কিন্তু দুই ভাইপো সম্বন্ধেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভিতরে শীতের কুয়াশার মতো স্তরে স্তরে জমে উঠেছিল এক ধরনের গোপন অভিমান, হয়তো বা অসন্তোষও। আর সেটা অকারণের নয় আদৌ। দুই প্রিয়জনকে বারে বারে ডাক দিয়েছেন বিদেশের শিল্পসম্ভারের প্রত্যক্ষদর্শী হতে। কিন্তু সাড়া মেলেনি কখনো। জাপানী চিত্রকলার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের বিহ্বল-মুহূর্তে জাপান থেকে দুই ভাইপোকে স্বতন্ত্র যে দুটি চিঠি, সেখানে মনের চাপা ক্ষোভের পালে লেগেছে ঈষৎ ঝাঁঝালো হাওয়া।

গগনেন্দ্রনাথকে—

"গগন, তোমরা কবে ঘর থেকে একবার বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়বে ? তোমাকে তোমার নামের সার্থকতা করা উচিত। কিন্তু তোমাদের তাড়া দেওয়া মিথ্যে।...."

অবনীন্দ্রনাথকে—

"আমাদের দেশের আর্টের পুনর্জীবন-সঞ্চারের জন্যে এখানকার সজীব আর্টের সংশ্রব যে কত দরকার সে তোমরা তোমাদের দক্ষিণের বারান্দায় বসে কখনোই বুঝতে পারবে না। আমাদের দেশে আর্টের হাওয়া বয়নি,

সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোনো নাড়ির যোগ নেই-ওটা একটা উপরি জিনিস—হলেও হয়, না হলেও হয় ; সেইজন্যে ওখানকার মাটি থেকে কখনোই তোমরা পুরো খোরাক পেতে পারবে না। একবার এখানে এলে বুঝতে পারবে এরা সমস্ত জাত এই আর্টের কোলে মানুষ—এদের সমস্ত জীবনটা এই আর্টের মধ্যে দিয়ে কথা কচ্ছে। এখানে এলে তোমাদের চোখের উপর থেকে একটা মস্ত পর্দা খুলে যেত ; তোমাদের অন্তর্যামিনী কলাসরস্বতী তাঁর যথার্থ নৈবেদ্য পেতে পারতেন। এখানে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে, তোমাদের আর্ট ষোলো আনা সত্য হতে পারেনি। কী করবো বলো, তোমরা তো কিছুতেই বেরোবে না, তাই মুকুলকে এখানে রেখে গেলুম।..."

অবনীন্দ্রনাথকে এই চিঠি লেখার দুদিন আগে আরো একটা চিঠি লিখেছিলেন তিনি, পুত্র রথীন্দ্রনাথকে। সে চিঠিতেও একদিকে যেমন জাপানী ছবির প্রসঙ্গে প্রশস্তি, নব্যবঙ্গের চিত্রকলা প্রসঙ্গে ঈষৎ কড়া-ভাষার নালিশ, ঠিক তেমনি গগন-অবন সম্বন্ধে কটাক্ষ। আর ঐ চিঠিতেই তাঁর মনে পড়ে গেল গগন-অবনকে বাদ দিয়ে অন্য এক শিল্পীর নাম, নন্দলাল।

"নন্দলাল যদি আসত তা হলে এখানকার এই দিকটা বুঝে নিতে পারত। ওদের কারো এখানে আসার খুবই দরকার আছে, নইলে আর্ট একটু কুনো রকমের হবার আশঙ্কা আছে। গগন অবনরা তো কোথাও নড়বে না। কিন্তু নন্দলালের কি আসার সম্ভাবনা নেই?..."

নন্দলালের প্রতিভার সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি পরিচিত। শুধু পরিচিত বললে গুরুত্বে খামতি থেকে যায় খানিক। নন্দলালের ছবির বিশিষ্টতায় তিনি প্রভাবিত। শিল্পীর 'রুদ্র বৈশাখ' ছবিকে ভর করে ইতিমধ্যেই তিনি লিখেছেন একটা কবিতা, 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ'। 'রুদ্র বৈশাখে' যার শুরু, কবির পরবর্তী জীবনে আমরা দেখতে পাবো তার আরো ব্যাপক ব্যবহার। অর্থাৎ নন্দলালের ছবি তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে আরো অনেক কবিতা, স্বতঃপ্রণোদিত আবেগে।

নন্দলাল এবং রবীন্দ্রনাথের মণি-কাঞ্চন যোগের শুভারম্ভ ১৩১৬-য়। ১৩০টা কবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসঙ্কলন প্রকাশনা উপলক্ষে। প্রিয় ছাত্রটির সঙ্গে সবে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে প্রীতি জ্ঞাপনের পরিবর্তে, কবি শক্ত রুদ্রাক্ষের তাগা বেঁধে দিলেন নন্দলালের হাতে তৎক্ষণাৎ। এখন নন্দলালকে আঁকতে হবে 'চয়নিকা'-র জন্যে আরো ৬ খানা ছবি, 'রুদ্রবৈশাখ' ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনান কবিতা শিল্পীকে, শিল্পী বসে যান চিত্রায়ণের ধ্যানে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন এমন মন্তব্য, 'অপরগুলি রবীন্দ্রনাথের কথামত আঁকা', যা স্বভাবতই খুঁচিয়ে তোলে কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ কি নন্দলালকে বলে দিতেন কি আঁকতে হবে-র সঙ্গে কি ভাবে আঁকতে হবে? নন্দলাল কি, যেহেতু তখনও শিক্ষকের সম্মানিত স্তরে অনুত্তীর্ণ, মাথা নুইয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন কবির ফতোয়া? নাকি এটা প্রভাতকুমারেরই ভাষা-ব্যবহারের অক্ষমতা? আসলে হয়তো প্রভাতকুমার বলতে চেয়েছিলেন, কোন কোন কবিতা চিত্রায়ণের পক্ষে উপযুক্ত, শুধুমাত্র তারই নির্দেশ দিয়ে থাকবেন নন্দলালকে। কেননা শিল্পীর উপর খবরদারির প্রবণতা তাঁর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

চিত্রকর-নন্দলালের আদি শিক্ষা অবনীন্দ্রনাথের স্নেহ-সান্নিধ্যে। গ্রন্থ-চিত্রকর নন্দলালের আদি দীক্ষা রবীন্দ্রনাথের উষ্ণ স্নেহে।

পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলনের দিকে তাকালে আমরা এমন অজস্র দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবো অবশ্যই, যেখানে একজন কবির প্রভাব পড়েছে একজন শিল্পীর সত্তাবিকাশে, অথবা একজন শিল্পীর প্রভাব পড়েছে একজন কবির সৃষ্টি উন্মেষে। অবশ্য এটা কিছু নতুন তথ্য নয় যে, চিত্রকলার উপর কবিতার একটা স্থায়ী প্রভাব সভ্যতার প্রথম প্রহর থেকেই, এবং যুগে যুগে তা শীর্ণ হয়নি কখনো।

কবিতা যে 'a speaking picture', আর ছবি যে 'a silent poetry', একথা আধুনিক শিল্পালোচনার বইয়ে যদি পড়েও থাকি, তবুও জানি এর প্রথম উচ্চারণ ঘটেছিল প্লুটার্কের রচনায়, আলেকজান্দ্রিয়ান গীতি-কবি সিমোনিদেসের-এর উক্তি হিসেবে। আর বোদলেয়ার তো স্পষ্টই বলেছিলেন যে, কোনো একটা সম্ভ্রান্ত ছবির শ্রেষ্ঠ সমালোচনা হতে

পারে শুধুমাত্র সনেটে অথবা এলিজিতেই। ফরাসী দেশে ছবিতে কিউবিজমের আঁতুড় ঘর হিসেবে যদি সত্যি কোনো কিছুর দিকে তাকাতে হয় তো সেটা অ্যাপোলিনেয়ারের কবিতা। আবার এও ভুলে যাইনি যে কীটসের গ্রীসিয়ান আর্ণ-এর বন্দনায় ইয়েটস টেনেছিলেন চাইনীজ পেনটিং-এর উপমা। অ্যাপোলিনেয়ারের 'ক্যালিগ্রাম' অথবা কামিংসের 'টেকনোপেগানিয়া', যে একই সঙ্গে কবিতা এবং ছবি, 'ut pictura poesis' উচ্চারণে সেটাই বোঝাতে চাইতেন গ্রীক নন্দনতাত্ত্বিকেরা।

এসব উপকারী এবং উজর তথ্য-সম্ভারকে মনে রাখার পরও যে আমাদের চোখে লেগে থাকে অবাক বিস্ময়ের ঘোর, তার কারণ ফরাসী দেশে কবি পল এলুয়ার এবং শিল্পী পিকাসোর পরস্পরনির্ভর সৃজনশীলতার কয়েকটা বছরকে বাদ দিলে পৃথিবীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের পরস্পর-বিনিময়ের সৃষ্টি-উদ্যমের দীর্ঘ পর্ব-পর্বান্তর সম্ভবত দৃষ্টান্তহীনই নয় শুধু, এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও।

॥ ৩ ॥

যদিও জানি রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়াও নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে আরও নানা বই, তবুও এখন শুধুমাত্র নন্দলাল এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-সম্পর্কটাকেই একটু নিবিড় পর্যালোলোচনা করে নিতে চাই, যেহেতু রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনেই নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণের পরিপূর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। এই পর্যালোচনার দিকে এগোনোর একেবারে শুরুতে যে-জাতীয় প্রশ্ন পিরামিডের কঠিন এবং ছুঁচোলো ভঙ্গী পথ আটকে দাঁড়ায়, তা ত্রিকোণ।

১। নিজের রচনাকে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র নন্দলালের উপর এতখানি নির্ভর করলেন কি কারণে?

২। য়ুরোপীয়-আবহে পরিশীলিত তাঁর শিল্প-অভিজ্ঞতা কি নন্দলালের শিল্প-চর্চার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিল অনেকখানি সমর্থন?

৩। নন্দলাল-নির্ভরতার তৃতীয় কারণ কি এই যে, একই সঙ্গে ধ্রুপদী এবং লোকায়ত এক শিল্পীর নিয়ত-সান্নিধ্যে তিনি পেয়ে যাচ্ছিলেন নিজেরও তীব্র অন্বেষণের কোনো সাযুজ্য, খুঁজে পাচ্ছিলেন এমন শক্ত এক মহিষ-শিং-এর চিরুনী যা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে পারেন নিজের দ্বন্দ্ব-সংকটেরও খানিক জট, বিশেষ করে যখন তাঁর মানস-যাত্রা কৈলাস শিখর থেকে নেমে আসতে চাইছে বা চাইবে সংঘাতময় প্রাত্যহিকের পাথুরে সমতলে? এর সঠিক উত্তর পেতে হলে আমাদের তাকাতে হবে দুটো ভিন্ন দিকে। প্রথমত দেখে নিতে হবে তাঁর অব্যবহিত শিল্পধারা থেকে নন্দলাল ঠিক কোনখানে হয়ে উঠছিলেন স্বতন্ত্র। অন্যদিকে বুঝে নেওয়া দরকার, ভারতীয় তথা বাংলার শিল্পধারার কাছে কী চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ, য়ুরোপীয় এবং প্রাচ্যেরও ভিন্ন দিগন্তের চিত্রকলার সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শনের প্রোজ্জ্বল

অভিজ্ঞতা থেকে।

নন্দলালের ছবির প্রসঙ্গে ইতস্তত, যদিও বিশেষজ্ঞ-সুলভ, কিছু মতামতের দিকে ঘুরে তাকাবো এখন, এই একজন শিল্পীর সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা এখনো কানাঘুষোর অথবা ফিসফাসের স্তর ছাড়িয়ে উন্নীত হয়নি কোনো বলিষ্ঠ, এবং উৎকর্ষময় বিশ্লেষণে, সে-খেদ-ক্ষোভকে মনে রেখেই।

১। "আজকাল আমাদের দেশে যাঁহারা ছবি আঁকিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সম্বন্ধেই বলা চলে না যে, তাঁহার আঁকিবার পদ্ধতি একটি জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। নন্দবাবুর মুদ্রাদোষ নাই ইহা তাঁহার চিত্রাঙ্কন রীতির একটা বড় কথা বটে, কিন্তু উহার চেয়েও বড় কথা, তাঁহার পটুয়া জীবন সচল—জীবন্ত নদীর মত প্রবহমান।...আজকাল যিনি ছবি আঁকিতে যাইবেন তাঁহারই প্রাচীন প্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক ইওরোপীয়, চীন ও জাপানের চিত্র হইতে শুরু করিয়া নিগ্রো আর্ট পর্যন্ত অগণিত রীতি ও পদ্ধতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালে পানি না পাইবার অবস্থা হইবে। এই ঘাত-প্রতিঘাত ও বিভ্রান্তির ফলে পাত্রের যোগ্যতা ভেদে তিন প্রকার হইতে পারে—প্রথম, ক্লৈব্য ও জড়তা; দ্বিতীয়, অনুকরণ এবং জোড়াতালি ও গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার চেষ্টা, (আর্ট সম্বন্ধীয় পরিভাষায় ইহাকে Pastiche বলা হয়); তৃতীয়, অনবরত পরীক্ষা ও ব্যক্তিগত রূপ দিবার চেষ্টা।...আমাদের দেশের বর্তমান যুগের বহু আর্টিস্ট সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারা যায় না, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সম্বন্ধে তাহা বলা চলে—অর্থাৎ তিনি এই তৃতীয় পর্য্যায়ের চিত্রকর। তাঁহার উপর অজন্তা হইতে বাংলাদেশের পট পর্যন্ত বহু চিত্রের প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান এবং ভারতবর্ষের বাহিরে চিত্রাঙ্কন রীতি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নহেন। 'মিডিয়াম' সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসাও সুবিদিত। অথচ তাঁহার কোন ছবিই বিশুদ্ধ অনুকরণ বলিয়া মনে হয় না। নন্দবাবু যে রীতিই অবলম্বন করুন না কেন, তাহাকে সায়ত্ত ও নিজস্ব করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।"
নীরদচন্দ্র চৌধুরী

২। "নন্দলাল জীবনে বিচিত্র আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নন্দলালের শিল্পধারা আলোচনা করলে লক্ষ করা যায় সংক্ষিপ্ত উপকরণ, মণ্ডনদক্ষতা এবং রেখার অনবদ্য গতি এই তিনের সংযোগ, নন্দলালের বহু রচনা ক্যালিগ্রাফিক আদর্শের দ্রুততা ও মণ্ডনের জমাট ভাব প্রকাশ করে। সম্ভবত এই কারণেই পরিণতকালের রচনায় বর্ণ প্রয়োগ যেমন সংক্ষিপ্ত, রূপনির্মাণ তেমনি সরল।...রেমব্রান্টের ড্রইং বাদ দিয়ে তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য চেনা যেমন অসম্ভব তেমনি নন্দলালের অসংখ্য ড্রইং তাঁর প্রতিভার আয়তন বোঝবার অন্যতম উপায়।...দিনলিপির মত নন্দলালের শিল্পী জীবনকে এই ড্রইংগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুজগতকে দেখবার ক্ষমতা যেমন এই ড্রইংগুলিতে পাওয়া যায় তেমনি বিশ্লেষণের পথে বস্তুর মৌল উপাদান অনুসন্ধানের শক্তি এই ড্রইংগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে।" বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

৩। "তখন তিনি বরোদার কীর্তিমন্দিরের জন্যে একটা বিরাট ম্যুরাল পেনটিং-এর খসড়া করছিলেন। তাঁর মাথায় ঘুরছিল কোনারকের মহাকালের মূর্তিটি। সেই মূর্তির ভাব, ইঙ্গিত, আকৃতি—সব তাঁকে এত অভিভূত করেছিল যে, নতুন কিছু না করে সেই আকৃতিটিই এঁকে দিয়েছেন। সে সময় আমাকে বলেছিলেন, "পরের জন্মে আবার যদি শিল্পী হয়েই জন্মাই তবে ভাস্কর্য করব।" কারণ, প্রাচ্য শিল্পের সব কিছু তাঁর কাছে অপূর্বরূপে ধরা পড়েছিল এবং তাঁর সাধনা ছিল সেই রূপকে সর্বাঙ্গভাবে ধরে রাখবার। সেইজন্যে অনেক মহলে তাঁর বদনাম ছিল, এখনো আছে। আধুনিকতার আওতায় তাঁকে কখনো অবসাদগ্রস্ত হতে দেখিনি। তখন সেজানের পরবর্তী যুগ চলছে।"
রামকিঙ্কর বেইজ

৪। "নন্দলালের রূপায়ণে অন্তহীন নব নব বিকাশ, তাঁর নানা রীতির অন্বেষা যে-কোনো শিল্পগোষ্ঠীর গর্বের বিষয়। দীর্ঘ কীর্তির পটে আজও তাঁর কল্পনার সাবেক ঐশ্বর্য কমে নি, অধিকন্তু এই কথাই বলা উচিত যে তাঁর মানস সম্পদের প্রাচুর্যই তাঁকে তাঁর রেখার ও রঙের অমিত ঐশ্বর্যের সাতমহলা মহলে বারবার নিয়ে যায় রূপের শুদ্ধ মাটি থেকে। নন্দলালের পোস্টার চিত্রে অবশ্য লোকশিল্পের ব্যবহার দ্রষ্টব্য, যেমন তাঁর বাংলার গ্রামজীবন ও নিসর্গের অজস্র চিত্রাবলীতেও তা দ্রষ্টব্য।"
বিষ্ণু দে

যশস্বী দুজন শিল্পী এবং দুজন শিল্প-সমালোচকের মতামত থেকে আমরা নন্দলাল রচিত ছবির কয়েকটি সাধারণ-লক্ষণ পেয়ে যাচ্ছি এখন।

১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুবিধ রীতি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্লান্তিহীনতা।
২। তাঁর ছবিতে ক্যালিগ্রাফির আদর্শ।
৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণ প্রয়োগ ও সরল নির্মাণ।
৪। রেমব্রাঁ-সুলভ অজস্র ড্রইং-এ দিনলিপি রচনা।
৫। ভাস্কর্যের প্রতি প্রবণতা।
৬। নিয়ত আধুনিকতার পথে অভিযান।
৭। বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক।
৮। বাংলার গ্রামজীবন ও নিসর্গের অজস্র দলিল।

এখানে ৮ নম্বর উপপাদ্যটিকে আমরা একটু ভিন্নভাবে সাজিয়ে নিতে পারি। কারণ হয়তো বা নন্দলালের অজস্র, যা আসলে সংখ্যাহীন, স্কেচের স্বল্প কিছুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের ফলেই বিষ্ণুবাবুকে লিখতে হয়েছে বাংলার গ্রামজীবন, অথচ নন্দলাল ভারতীয় জীবন ও প্রকৃতির সমগ্রতাকেই ধরতে চেয়েছেন তাঁর স্কেচে। যদি সম্ভব হতো তাঁর সমগ্র স্কেচকে কোনো প্রদর্শনীর মারফৎ একসঙ্গে দেখার, সন্দেহ নেই আমরা দেখতে পেতাম প্রায় গোটা ভারতবর্ষকেই।

তাঁর স্কেচের প্রসঙ্গে বিনোদবাবু রেমব্রাঁ-র উল্লেখ করেন যখন, সেখানেও এই স্কেচগুলোকে নতুন আলোয় চিনে নেবার আর এক দরজা খুলে যায় যেন। এই প্রসঙ্গে এটাও জেনে রাখা ভালো যে, রেমব্রাঁর ছবির সঙ্গে চোখের আত্মীয়তা ছিল নন্দলালের। কানাই সামন্তকে লেখা তাঁর এক চিঠির অংশ—

"Rembrandt বইটি...পেলাম। রেমব্রাণ্ডের ছবি দেখে হঠাৎ মনে হলো গুরু অবনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। কি সুন্দর তাঁর ছবি। পাশ্চাত্যের এই দান জগতের সম্পদ, ইহাতে দেশী বা বিলাতি বা মডার্ন বলে বিচার করবার অবকাশ নেই। ইহা অমর লোকের বস্তু। শিল্পীকে বারবার প্রণাম করি।"

এ চিঠি ১৯৫৪-র, ফলে নন্দলালের স্কেচে রেমব্রাঁর সরাসারি প্রভাব প্রশ্নাতীত। অথচ দুজনের মধ্যে কি আশ্চর্য মিল। ক্লাসিক ঔপন্যাসিকের ভঙ্গীতে নিজের আইডিয়াগুলোকে নিয়ে স্কেচ করে যেতেন অনর্গল, 'এ্যাজ এ পিওরলি প্রাইভেট রেকর্ড অফ অবজারভেশন এ্যাণ্ড ফিলিং'। সারল্যে যা গ্রামবধূ, শিল্পবোদ্ধারা তার মধ্যে খুঁজে পেতেন রাজরানীকে। হারিয়ে-খুইয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা রেমব্রাঁর স্কেচের সংখ্যা ১৪০০। আগুন, বন্যা আর অযত্ন ছাড়া, গবেষকদের ধারণা, অন্য বড় কারণটা হল, ঐ সব স্কেচের অসাধারণ সারল্য এবং ছবিতে শিল্পীর স্বাক্ষর-না-থাকা। আনাড়ী সংগ্রাহকেরা তাঁর আঁকা স্কেচ হাতে পেয়েও বুঝতে পারেনি এইসব ছবির পিছনে লুকিয়ে আছে কোন্ বিরাট প্রতিভার খেলা। ফলে নষ্ট করতে কাঁপেনি হাত বা বুক।

নন্দলালের সঙ্গে রেমব্রাঁর স্কেচের মিল খুঁজে পাই যেখানে—

"His outdoor scenes constitute little more than a tenth of his total productioon, yet they reveal the same wide-ranging quality that marks his work in other fields. Some of Rembrandt's landscapes are romantic and visionary; other wholly realistic......

He reseved his realism in landscape almost entirely for etching and drawing. Even here, however, he developed a free'short hand' style that went beyond mere faithful reproduction. Notonly did he reduce the complexities of visible scene, but, through a process of exquisite selection, he emphasized what was important in that scene, providing the viewer with exactly the meterial,

ıd none other, that enables him to follow Rembrandt,
to the artist's world." Robert Wallace.

এই বিবরণের সঙ্গে নন্দলালের ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার ইতিহাসকে মিলিয়ে খি যদি, বিস্ময় হয়ে উঠবে নীল এক দিগন্ত।

"সম্প্রতি উনি পুরী গিয়েছিলেন ; সেখানকার অনেক স্কেচ—সমুদ্রের রে জেলেরা মাছ ধরছে, সমুদ্রের ধারে মাছ বিক্রী করছে প্রভৃতি অনেক ব দেখে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি বাইরের (outdoor) স্কেচ কি রকম রে করেন ?

বললেন, সকালে বেড়াতে যাবার সময় যা দেখলুম, তা খুব ছোট ছোট র একটা কার্ডে হয়ত সাত আটটি বিষয়, কেবল মনে রাখার জন্যে এঁকে লুম বা লিখে নিলুম বিষয়টি কি ; যেমন শুয়োর চরছে, একটি মেয়ে ওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে প্রভৃতি। এইরূপে যতগুলি দেখলুম, সব টি করে নিলুম। পরে বাড়ি এসে এক একটি সেই স্কেচ দেখে বা লেখা খে তখনই এঁকে ফেললুম। এইভাবে সবগুলিই শেষ করলুম। আর টা কথা বলে রাখি—আমরা spot-এ বসে আঁকি না।

এইসব কথার পর বললেন, আমি তোমাকে এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। নি একখানি ছোট্ট পোষ্টকার্ডের মত কাগজ নিয়ে ছোট্ট একটা স্থানীয় য়াই-এর rough sketch করলেন। বললেন, প্রধান বিষয়বস্তুকে থমেই আঁকতে হয়, তারপর সেই অনুযায়ী অপর জিনিসগুলিকে কতে হয়।...এই বলে স্কেচে যা ছিল তার একরকম অনুসরণ না করেই, ছন্দ স্বাধীন সাবলীল গতিতে বীরভূমের খোয়াই-এর একটি স্থানচিত্রের শ বর্ধিত আকারে এঁকে চললেন। বললেন, যদি ব্যালান্সের জন্যে াথাও কিছু করতে চাও, তাও আটকাবে না। এই দেখ, এখানে কিছু ওয়া দরকার হচ্ছে, তা তিনজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে পথের উপর দিয়ে, ঃ দিয়ে দিলুম, তুমি, আমি আর শংকর মহারাজজী। আকাশে মেঘ দিয়ে লে, দুটি পাখি উড়ে যাচ্ছে, তাও দিয়ে দিলে। তাঁর কথাগুলি বলার ঙ্গ সঙ্গে আঁকাও হয়ে যাচ্ছে।' বললেন, আকাশে ঐ রেখা দুটি পাখি ড়া আর কিছু বলা যাবে না। ছবি যেন ক্রমশ অক্ষরে পরিণত হয়ে চ্ছে।"

নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

নন্দলাল অবশ্য তাঁর স্কেচগুলোকে পরিয়েছেন দু ধরনের জামা, যে ত পোশাক তাঁর সারা জীবনের ছবিরও অঙ্গে অঙ্গে। একটা জামায় স্তবের অনুকৃতি। আরেক জামায় বাস্তবকে নিংড়ে বস্তুর সত্তারূপ। ঠিক -ভাবে পিকাশো আঁকেন দু-ধরনের ষাঁড়, একটার গায়ে নগ্ন বাস্তবতা, পরটির গায়ে বিমূর্ত প্রতীকতা। অর্থাৎ শিল্পী একবার আঁকছেন চোখ য় বাইরে থেকে, আরেকবার বস্তুর ভিতরে ঢুকে মননের অবলোকনে। খানিক আগে উল্লিখিত নন্দলালের বিশেষ গুণপনার আটটি দিকে নানিবেশ করলে আমরা দেখতে পাবো গ্রন্থ-চিত্রণের উৎকর্ষের পক্ষে চখানি উপযোগিতা তাদের। একজন যথার্থ গ্রন্থ-চিত্রকর কখনোই রাবৃত্তি ঘটায় না একটা বিশেষ রীতি বা প্রকরণের। বইয়ের বিষয়, ব্য এবং ভঙ্গীর সঙ্গে গ্রন্থচিত্রণকেও এগোতে হয় সমান্তরাল বন্ধনে। চিত্রণে প্রকৃতি বা মানুষকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে আঁকার কাশ অনুপস্থিত। একজন শিল্পী প্রকৃতি অথবা মানুষের যত রকম ভঙ্গী অভিব্যক্তিকে যতখানি ভরে রাখতে পারবেন স্মৃতির সিন্দুকে, চিত্রণে তাঁর সাফল্য এবং সিদ্ধির ব্যাপকতার দিগন্ত ততটাই প্রসারিত। চিত্রণে 'রিক্রিয়েট' করতে হয় বাস্তবকে, যা নন্দলাল করতেন তাঁর চের ছবিতে। গ্রন্থচিত্রণে ক্যালিগ্রাফি-সম্পর্কিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার য়োজনীয়তা প্রবল। নন্দলাল সেখানেও সম্রান্ত। গ্রন্থচিত্রণের আরও চ বড় চাহিদা, কল্পনার ডানা যতই বিশাল হোক না কেন, প্রকাশ তীতে তাকে হতে হবে সারল্যের আজ্ঞানুবর্তী। নন্দলালের ল-কালিতে যে-কোনো জটিল বিষয়ই আত্মার মতো সারল্যে ভজাত।

কিন্তু নন্দলালের স্কেচে আত্মগোপন করে থাকে আরো অতিরিক্ত টা জিনিস, যা সাধারণত চোখ এড়িয়ে যায় আমাদের। তাকে বলতে রি বের্গসঁ-কথিত 'এলান ভাইটাল'। তাঁর স্কেচে এই 'ভাইটালিটি'র কাশ দুভাবে। এক, গতিময়তায়, দুই, বিষয়ের অবয়বে ভাস্কর্য-সদৃশ্য জন বা ভর (mass) জুড়ে দেওয়ার দক্ষতায়। মাত্র আট কিংবা দশটা খার আঁচড়েও যখন তিনি কোনো সাঁওতাল কিংবা গ্রাম্য পুরুষ-রমণীর ব আঁকেন, কিংবা কোনো গাছ অথবা মেঘ, মনে হয় ছবিটাকে অথবা

ছবি থেকে ঐ-সব মূর্তিকে কেটে নিয়ে ওজন করি দাঁড়িপাল্লায়, হয়তো পেয়ে যাবো তাদের আসল মাপ। এটা ঘটে বা শিল্পী ঘটান একটা আশ্চর্য কৌশলে। পেন্টিং-এ এটা ফুটিয়ে তোলা সহজ, কেননা শিল্পী সেখানে পেয়ে যাচ্ছেন আকৃতির ডৌলকে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ। নন্দলাল যে আশ্চর্যের সাহচর্যে সেটাকে সম্ভব করে তোলেন নিজের স্কেচে, তা লুকনো এ্যানাটমি। এই এ্যানাটমির ছিটেফোঁটায় তার বিমূর্ত গড়নও পেয়ে যায় বাস্তবতার আদল এবং আদর।

শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে এ্যানাটমি-চর্চার উপর একসময়ে ঝুঁকে পড়েছিলেন যতখানি, তার পরিচয় যেমন পেয়ে যাই তাঁর নিজের রচনায়, তেমনি বিনোদবাবুর সাক্ষ্যে। স্বরচিত 'শিল্পচর্চা' নামের বইয়ে 'গাছপালার ভাবভঙ্গী গঠন' এবং 'জীবনের ভাবভঙ্গী' এবং 'সমুদ্র-পর্বতের ভাবভঙ্গী' এই তিনটে অধ্যায়ে মানুষ এবং প্রকৃতির এ্যানাটমি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি, অজস্র অসাধারণ ছবি-আঁকা দৃষ্টান্তসহ। 'সমুদ্র পর্বতের ভাবভঙ্গী' অধ্যায়ে আঁকা জলের বিভিন্ন কোঁকড়ানো গতির স্কেচের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই মনে পড়ে যায় দা ভিঞ্চির মুখ, নন্দলালের স্কেচে যাঁর উত্তরাধিকার, জলের গতিভঙ্গীর বিচিত্র রহস্য দা ভিঞ্চির নিখুঁত এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরীক্ষণের মাধ্যমেই প্রথম গোচরে আসে পৃথিবীর। নন্দলালের রচনা পড়তে গিয়ে আরও একবার দা ভিঞ্চির মুখ ভেসে ওঠে আমাদের চোখে, যখন তিনি লেখেন—

"ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি ভাবের আবেশে দেহ সংকুচিত হয়, আর হর্ষ-উৎফুল্লভাবে দেহ বিকশিত ও লীলায়িত হয়।"

দা ভিঞ্চির অন্তহীন অম্বিষ্টের অন্তর্গত ছিল এই সবও, আর সেই কারণেই কোনো অপরাধীর ফাঁসী হচ্ছে শুনলে তৎক্ষণাৎ ফাঁসীর মঞ্চের কাছে হাজির হতেন তিনি খাতা-পেনসিল সহ, দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীর মুখাবয়বের সংকোচন এবং পরিবর্তনের স্তরগুলোকে লিপিবদ্ধ করার জরুরী তাগিদে।

নন্দলালের এ্যানাটমি-চর্চা প্রসঙ্গে বিনোদবাবুর সাক্ষ্য—

"দেশী রং, কাগজ, পরম্পরার ক্ষেত্রে জাতীয় আভিজাত্য থাকলেও

নন্দলালের শিক্ষা বৃহত্তর শিল্পপরম্পরা সম্বন্ধে তখনও যথেষ্ট সচেতন। অ্যানাটমি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং রীতিমত অ্যানাটমির চর্চা ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রবর্তিত করেন এবং নিজেও এ বিষয়ে নূতন করে চর্চা শুরু করেন। ডাক্তারের সহায়তায় বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ও যন্ত্রের সঙ্গে শরীর-সংস্থান বিদ্যা (Anatomy) শিক্ষণের ব্যবস্থা কলাভবনে থাকলেও শিক্ষণ-আদর্শ যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তার দুটি দিক আছে।

একটি হল আশ্রমের নাটক অভিনয়ের পটভূমিতে বিদগ্ধ পুরুষ-রমণীর বস্ত্রাচ্ছাদিত, নৃত্যরত গতিশীল দেহভঙ্গিমার প্রভাব, অপরটি হল নিরন্তর কর্মরত অর্ধনগ্ন সাঁওতাল ও গ্রামবাসীদের দৈহিক গতিময়তার প্রভাব। শারীর-সংস্থান বিদ্যার অনুশীলন জীবন থেকে বিচ্যুত না হওয়ার কারণে এবং জীবনের সঙ্গে তার নিরন্তর প্রয়োগের ফলে কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা ড্রইংয়ে গতিভাবাবেগে সংযোজনায় যে দক্ষতা ও সফলতা অর্জন করেছিলেন এমন তৎকালীন কোনো আর্ট স্কুলেই দেখা যায়নি।

এই অভিজ্ঞতারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ অর্জুনের ছবি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, ডুরার ইত্যাদি শিল্পীদের তিনি অনুশীলন করেন এবং প্রয়োজনমত ছাত্রদের এই ড্রয়িঙের অনুলেখন করতে উৎসাহিত করেন।

পাশ্চাত্য-শিল্পের বিভিন্ন ইজম এবং সাদৃশ্য-বর্জিত শিল্পরূপ সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন সন্দেহ সংশয় এবং কিছুটা প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও নন্দলাল এইভাবে ঢুকে পড়েছিলেন তার বেশ খানিকটা ভিতর-মহলে। সেখানকার আঙ্গিক তাঁর পোস্টকার্ডের ছবিতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার টানেই, অনুপ্রবেশ করে থাকবেই। আর এ তো আমাদের চোখে দেখা যে, পোস্ট কার্ডের ছবিতে আঙ্গিক নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের কী উদার খেলাধুলো তাঁর।

॥ ৪ ॥

এ অধ্যায়ে আমাদের তল্লাসীর বিষয়, নন্দলাল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র টানের কার্যকারণ। আগের অধ্যায়েই আমরা জেনেছি, যখন গগন-অবনকে তাঁদের নিজস্ব পরিবেশ থেকে উপড়ে বিদেশের পরিমণ্ডলে অর্থাৎ ব্যাপ্ত ভূমণ্ডলে টেনে আনা একেবারেই অসম্ভব বুঝে গেলেন তিনি, তখন তৃতীয় যে নামটি মনে এসেছিল তাঁর, তা নন্দলালেরই। আর ঐ সময়ে ভারতীয় চিত্রকলার ভাবীরূপ সম্বন্ধে তিনি যে চিন্তিত এবং বর্তমান রূপ সম্বন্ধে কিছুটা প্রশ্নাতুর, তার প্রমাণ যেমন 'জাপান যাত্রী'র পাতায়, তেমনি জাপান থেকে লেখা গগন-অবনের চিঠিতেও। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে যে চিঠিতে নন্দলালের প্রসঙ্গ, তার আরম্ভেই—

"আমাদের নব্যবঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার আছে এই কথা বারবার আমার মনে হয়েছে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটোখাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েছি। . . ."

এই চিঠির এক মাস পরে আমেরিকা থেকে মীরা দেবীকে—

"দুঃখের বিষয় এই যে—বাঙালীর প্রতিভা যথেষ্ট আছে কিন্তু উদ্যম ও চরিত্রবল কিছুই নেই। . . . সেইজন্যে আমাদের যার যেটুকু শক্তি আছে সেইটুকু নিয়ে ছোটো ভাবে কারবার করি—তারপরে একটু ফুঁ লাগলেই সেই শিখা নিভে যায়, তারপর আবার যেমন অন্ধকার, তেমনি অন্ধকার। . . . আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে, কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলে না। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি তো করতে প্রস্তুত হলুম, কিন্তু কোথাও তো প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা তো আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তা হলে একবার দেখাতুম আমি কী করতুম। . . . "

১৯১৯-এ 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ এখানে শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছেন যে দুটো জিনিস, তার একটা ছবি,আর একটা গান। "আমার বিশ্বভারতীর দুটি প্রধান অঙ্গ হবে শিল্প ও সঙ্গীত।" ছাত্রদের ছবি আঁকা শেখানোর জন্যে তাঁর তখন দরকার একজন যোগ্য শিল্পীর। এবং তাঁর মনে পড়ল একটিই নাম, নন্দলাল। কেন? এর উত্তরে বিনোদবাবু—

"অবনীন্দ্র-পরম্পরা অঙ্কুরিত হবার মুহূর্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ এই নবজাগ্রত শিল্পধারা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কারণ একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অবনীন্দ্রনাথকে তিনি শৈশব থেকেই দেখেছেন এবং তাঁর মতি-মেজাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথ পরিচালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ভারত-শিল্প জীবনের বৃহত্ পটভূমি থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। শহরের আওতায় এ শিল্পধারার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সোসাইটি নবপর্যায় শুরু হবার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ আর একবার অবনীন্দ্রনাথকে ত প্রবর্তিত শিল্পধারার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করলেন। তি জানালেন যে ভারত-শিল্প নূতন পরিবেশে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত ক দরকার।

আকাশ-মাটি-মানুষ-ছোঁয়া বিশ্বভারতীর উন্মুক্ত অঙ্গন যে বাংল ছবিকে নতুন রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেই, এই বিশ্বাস থেবে বিশ্বভারতীর শিক্ষায় শিল্পের উপর এতখানি ঝোঁক। সম্ভবত নন্দলাে ছবিতে তুলির জোর অথবা নন্দলাল এখনো কোনো নির্দিষ্ট স্টাইলে ধরা-বাঁধা ছকে আটকে পড়েনি, নিজেকে নতুন করে নির্মাণের প এখনো সে প্রস্তুতহতে পারে যথেষ্ট উদ্দীপনা নিয়েই, এই ধারণা থেবে নন্দলালকে টেনে আনলেন তিনি শান্তিনিকেতনে। কিন্তু অবনীন্দ্রনা তাঁকে মনে করেছিলেন সোসাইটি'র পক্ষে অপরিহার্য। তাই গুরুর ডা পড়ল কলকাতায়। এরপর অবনীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি—

"নন্দলালকে যে চিঠি দিয়েচ সেইটি পড়ে বড় উদ্বিগ্ন হয়েচি। ত জন্যে আমাকে অনেক ব্যবস্থা ও খরচ করতে হয়েছে এবং আশাও অনে করেছিলুম। আমার আশা নিজের জন্যে নয়—দেশের জন্যে, তোমাদে জন্যে। এই আশাতেই আমি আর্থিক অসামর্থ সত্ত্বেও বিচিত্র অকৃপণভাবে টাকা খরচ করেছিলুম। . . কলকাতায় ভাল করে শিক লাগল না বলেই এখানে কাজ ফেঁদেচি। সফলতার সমস্ত লক্ষণই দে দিয়েচে। ছাত্রেরা উৎসাহিত হয়েচে, শিক্ষকেরাও—এক atmosphere তৈরী হয়ে উঠচে। নন্দলালের নিজের রচনাও এখা যেমন অব্যাহত অবকাশ ও আনন্দের মধ্যে অগ্রসর হচ্চে এমন কলকাত হওয়া সম্ভব নয়—সেইটেই আমার কাছে সবচেয়ে লাভ বলে মনে হয় নন্দলাল এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন—বাহির থেকে তার উপর কোনো দায়ি চাপানো হয়নি—তাছাড়া এখানে তার নিজের কাজের ব্যাঘাত করব কোনো প্রকার উপসর্গ নেই। আরও একটা সুবিধা এই, এখানে সংস্কৃত ইংরেজি সাহিত্য চর্চায় নন্দলাল যোগ দেওয়ায় মনের মধ্যে সে যে এক নিয়ত আনন্দলাভ করচে সেটা কি তার প্রতিভার বিকাশে কাজ কর না? তোমাদের সোসাইটি প্রধানত চিত্র প্রদর্শনীর জন্যে —এখান থে তার ব্যাঘাত না হয়ে বরঞ্চ আনুকূল্যই হবে। তারপরে নন্দলালের ল লম্বা ছুটি আছে। প্রয়োজনমত কখনো কখনো সে ছুটি বাড়াতেও পারে অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে নন্দলাল এখানে থাকাতে তোমাদে কাজের সুবিধা হচ্ছে—অথচ এতে আমার আনন্দ। যদি তোমরা ব্যাঘাত কর তাহলে আমার যা দুঃখ এবং ক্ষতি তাকে গণ্য না করলে এটা নিশ্চয় জেনো নন্দলালের এতে ক্ষতি হবে এবং তোমাদের এতে ল হবে না। . . নন্দলালের পরে আমার কোনো জোর নেই—কিন্তু ওর প আমার অনেক আশা—নিশ্চয় জেনো, সে আমার কাজের দিক থেকে দেশের দিক থেকে। . . ."

গুরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাঁর চরিত্রে সম্ভব নয় জেনেই নন্দল চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়, অবশ্য শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি না ছিঁড়েই। আসতেন সপ্তাহে একবার। ছাত্রদের ক দেখতেন। এর দু বছর পরেই কলকাতাকে চির-বিদায় জানিয়ে চিরকালে মতো চলে এলেন শান্তিনিকেতনে, কলাভবনের অধ্যক্ষরূপে। ১৯২ কবি যাবেন চীনে। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি বেছে নিলেন নন্দলালকে। সিদ্ধান্তের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণটা নিশ্চয়ই এই যে, নন্দলালের ম প্রত্যক্ষ করেছেন এমন কৃতিত্বময় উৎপাদনের ক্ষমতা, চীন ভ্রমণের প্রত অভিজ্ঞতা সে-উৎপাদনের মর্মমূলে উর্বরতা জোগাতে পারবে আরে আর নন্দলালকে কেন্দ্র করেই তাঁর ভবিষ্যতের বৃহত্তর স্বপ্ন।

প্রথম আলাপ ১৯০৯। শিল্পীর 'সাবিত্রী আর যম' ছবি দেখে ব মুগ্ধ। নন্দলাল শিল্পচর্চার দিকে নজর পেতেই কবি নিশ্চয়ই পৌঁছ পেরেছিলেন এই জাতীয় ধারণায় যে, এ স্বতন্ত্র, এবং বৃহতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যয়ী। সেই থেকে বিচ্ছেদহীন বাঁধনের শুরু। তিনি বলেছিলেন ব 'সে আমার কাজের দিক থেকে নয়', কিন্তু পরবর্তী পটপরিবর্তনের ধা ধাপে দেখতে পাই, কবির পক্ষে শিল্পী হয়ে উঠছেন কতখানি গভীর

জনের। শুধু তাঁর নাটক অথবা গীতিনাট্যের মঞ্চসজ্জায় বা
জোর ক্ষেত্রে নয়, যেখানে নন্দলালের কল্পনাবিকাশের আর এক
দ্রা, নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নন্দলালের প্রভাব অনেকখানিই কাজে
ছিল তাঁর। যেমন নন্দলালেরও কাজে লেগেছিল রবীন্দ্রনাথের গান
বিতা, নিজের ছবিতে। কি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গের
লার কাছ থেকে? সে-সব জটিল হিসেবনিকেশকে এড়িয়ে সহজেই
ঝ নিতে পারি আমরা তা হল, জীবন এবং জীবনীশক্তি। এর মধ্যেই
যায় বাস্তবতা, মানুষের দৈনন্দিন, দেখার ভিন্ন জগৎ, রেখার ভিন্নতর
প্রকৃতি। আসলে তিনি চাইছিলেন চোখ জুড়োনো জৌলুষ নয়,
লেন মন-মাতানো জোর। আর নন্দলালের অবিরল ভ্রমণ, অবিরল
পরীক্ষায় লিপ্ত হওয়ার সাহস, নির্মাণের ঋজুতা, কবির নিজের
বর প্রেক্ষিতেই, তাঁকে করে তুলেছিল অভিন্ন সম্পর্কের আত্মীয়।
ন্দলালের যে ঋজুতা সম্পর্কে কবি আকৃষ্ট, নন্দলাল নিজেও যে
চতন ছিলেন সে সম্পর্কে এমন নয়। গুরু অবনীন্দ্রনাথের
গানো নিষেধকে মনে রেখেও স্বীকার করেছেন সে কথা। কানাই
কে লেখা চিঠিতে।

গা, আমার ছবিতে একটা লড়াই করার ও challenge-এর ভাব
ও প্রকাশ পেয়েছে যা গুরু অবনবাবুর ছবিতে নাই। তা অতি ধীর
য় তাতে আমার ছবির উগ্রতা নাই। ... গুরু অবনবাবুও মাঝে মাঝে
র আঙ্গিকের এ উগ্রতা দেখে চিন্তিত হয়েছেন। এর কারণ আমার
onalism-এর প্রভাব। ভারত শিল্পের গৌরব সাব্যস্ত করতে হবে,
আমরাও করণকৌশলে দক্ষ—জাপান চীনের চেয়ে হীন নই তা
করতে হবে। ...”

চিঠির শেষ ছত্রে যদিও তিনি আর পা বাড়াতে রাজি নন
নপ্ত'-এর ঝুঁকিতে, কিন্তু এটা মানতে দ্বিধাকাতর নন যে, ছবি জ্যান্ত
ব্যক্তিত্বের জোরে অথবা তেজে। সে-কথা উচ্চারণ করেছেন
নাথের ছবি প্রসঙ্গে।

তাঁর সমস্ত ছবিতে বিশাল ব্যক্তিত্বের জোরটাই বিশেষভাবে প্রকাশ
ছে। ... আমায় বলেছেন—নন্দলাল, হাত-পা-গুলোর ড্রয়িং হয়
শখিয়ে দাও। আমি দেশী বিলাতী যত বড়ো বড়ো মাস্টারদের ছবি
নকল করে চার্ট করে দিয়েছি, কিন্তু তিনি ষাটের উপর, সত্তরের
কাছি—আদর্শে দাগা বুলিয়ে পরিশ্রম করে শেখা সে আর সম্ভব
। শেষে ল্যাণ্ডস্কেপের দিকে ঝুঁকেছেন। ... শাস্ত্রে আছে
য়ানের সব ভালো। গুরুদেব যাই করুন, যেমন ভাবেই করুন,
ই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিসত্তার ছাপ রয়েছে—সুতরাং তা চিরস্মরণীয়
গেছে। তাঁর ছবি দেখে শিল্পীরা অনেক কিছু শিখতে পারবে, অন্তত
র সাহস বাড়বে।”

রে আরেকবার—“tradition-”এর সঙ্গে গুরুদেবের ছবির তো
নেই। অত্যন্ত complex personality-র, বিরাট ব্যক্তিত্বের
স্ফুরণ।”

নিজের আঁকার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি নির্ভর করতেন
লালকে, তা এখন আর অজানা নয় আমাদের, কখনো কখনো তো
ও বলেছেন, নন্দলালই আমার শিক্ষক। নন্দলালের প্রশংসা পেলে
করতে পারতেন বিশ্ববিরূপতাকেও। আর নন্দলালকে এইভাবে কাছে
য়া, প্রেরণা দিতে এবং প্রাণিত হতে, ক্রমশই সম্ভব হয়ে উঠেছে তাঁর
ত্রণের সুবাদেই, গ্রন্থচিত্রণে নন্দলাল-নির্ভরতার প্রত্যক্ষ পরিণামে,
সর্বোপরি সঙ্গত সিদ্ধান্তে।

॥ ৫ ॥

পিকাশোর সারা জীবনের গ্রন্থচিত্রণ পাঁচ ভাগে ভাগ করা।
মূল রচনা পড়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ছবি এঁকেছেন ২৪টা বইয়ের,
যার সবই কবিতা।
তাঁর আগে আঁকা ছবিকে মানানসই ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে
২৭টা বইয়ে।
ইলাসট্রেশন করেননি, এক বা একাধিক 'পোর্টরেট' এঁকে দিয়েছেন
লেখকের, এমন বইয়ের সংখ্যা ৩৬।
শুধু মাত্র নামপত্র এঁকে দিয়েছেন ৩৩ খানা বইয়ের।
কেবল র‍্যাপার ডিজাইন করে দেওয়া বইয়ের সংখ্যা ২০।

পিকাশো নন্দলালে এখানে এক আশ্চর্য মিতালি। পিকাশোর মত
নন্দলালের গ্রন্থচিত্রকেও পাঁচ ভাগে ভেঙে নিতে পারি আমরা।

১। মূল রচনা পড়ে নিজে প্রাণিত হয়ে এঁকেছেন। যেমন, 'চয়নিকা'য়, 'গীতাঞ্জলিতে', বিচিত্রার প্রথম সংখ্যায় নটরাজ ঋতুরঙ্গ শালায় জগদানন্দ রায়ের পশুপাখির বইয়ে সহজ পাঠের খণ্ডগুলোয়
২। তাঁর আগে আঁকা ছবি মানানসই ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন The cresent Moon, Fruit gathering-এ, আলোর ফুলকিতে, বীথিকার প্রচ্ছদে, ছড়ার ছবিতে।
৩। ভিতরের ছবি নয় শুধু প্রচ্ছদ এঁকেছেন। যেমন Parrot's Training-টার পূজা, কানাই সামন্তর কয়েকটি কবিতার বই, শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র সঙ্গীত, আলোর ফুলকি, তাসের দেশ।
৪। অন্তঃচ্ছদ সম্ভবত মাত্র একটি বইয়ের। আলোর ফুলকি।
৫। ১৯৩০-এ ৫৩টা বাটিকের ডিজাইন, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদের জন্যে।

এ তালিকা অসম্পূর্ণ। এর বাইরেও হয়তো আছে আরও অনেক। যথার্থ
গবেষণার অভাবে জানা যায়নি এখনো, কোন কোন ছবি সরাসরি
গ্রন্থচিত্রণের জন্যে, আর কোন কোনটি আগে আঁকা হয়ে পরে গ্রন্থভুক্ত।
পিকাশোর সঙ্গে নন্দলালের মিল কি শুধু গ্রন্থচিত্রণের
ভাগ-বাটোয়ারাতেই? ভাস্কর্য গুণান্বিত নন্দলালের কিছু কিছু
জন্তু-জানোয়ারের স্কেচের সঙ্গেও পিকাশোর সমধর্মী ছবির আত্মীয়তা
নজরে এসে যায় আমাদের। মিল আরো এক জায়গায় যদি তাকাতে চাই
মঞ্চসজ্জার দিকে। তফাৎ শুধু এই মঞ্চের সঙ্গে পিকাশোর ঘনিষ্ঠতা
দপদপিয়ে উঠেছিল জীবনের একটি বিশেষ পর্বে, কক্‌তোর সান্নিধ্যে ও
প্রেরণায়, আর নন্দলালের জীবনের সঙ্গে মঞ্চসজ্জাই নয় শুধু,
শান্তিনিকেতনের বারো মাসের যা-কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান, জীবিতকালে তিনি
ছিলেন তার প্রধান রূপকার এবং রূপসজ্জাকর।

ফিরে আসি গ্রন্থচিত্রণে। নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণ দক্ষতার দুটি ভিন্ন
দিগন্তকে দেখতে চাই যদি আমাদের তাকাতে হবে একবার 'নটরাজ
ঋতুরঙ্গশালা'-র দিকে, আরেকবার ছড়ার ছবির দিকে। প্রথমটিকে যদি
বলি তাঁর চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গীর দৃষ্টান্ত, তাহলে দ্বিতীয়টা হবে লোকায়তর
নিখাদ নমুনা।

'ছড়ার ছবি'-র ভূমিকায় রচয়িতা জানাচ্ছেন, এ-বইয়ের শব্দের চেহারা
প্রাকৃত বাংলা, ভদ্রজীবনের সাধু ভাষাকে দূরে সরিয়ে, এ ভাষায়
হাটে-মাঠে যাবার পায়ে-চলা পথের দাগ। শব্দে যা পড়তে চাইছেন কবি,
শিল্পীর মনোভঙ্গী পুরোপুরি তাকে ছুঁয়েই, পোস্ট কার্ডের স্কেচে যাঁর সঙ্গে

প্রাকৃত জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাঁর পক্ষে কবির এই সদিচ্ছাকে সমর্থন জানানো এমন কিছু চ্যালেঞ্জের ব্যাপারও নয় আদৌ। অথচ এমন নয় যে কবিতায় যা লেখা, হুবহু তারই অনুকরণ ছবিতে। অথবা ছবিতে যা আঁকা, কবিতা তারই আক্ষরিক অনুবাদ। বরং দু-পক্ষের যুগ্মতা থেকে পাঠক তৈরি করে নেবার সুযোগ পাচ্ছেন অনুভূতির একটা তৃতীয় স্তর। 'ছড়ার ছবিতে''পিসনি' নামের লেখাটিতে আছে—

"অনেক গেছে ক্ষয় হয়ে তার, সবাই দিল ফাঁকি—
অল্প কিছু রয়েছে তার বাকি।
তাই দিয়ে সে তুললো বেঁধে ছোট্ট বোঝাটাকে,
জড়িয়ে কাঁথা আঁকড়ে নিল কাঁখে।
বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে,....."

অথচ আমরা ছবিতে দেখতে পাই কাঁখের পুঁটলি ঠিক জায়গায় থাকলেও, বাঁ হাতে ঝুলছে ঝুলির বদলে ঘটি, আর ডানহাতে সুতো-বাঁধা দুখানা কুলো, যার উল্লেখ নেই ছড়ায়। এইখানে ছবি দেখে আর ছড়া পড়ে, পাঠকের অনুভূতিতে তৈরী হয় যে তৃতীয় স্তর, তা দিয়েই তারা গড়ে নিতে পারেন জীয়ন্ত এক পিসনিকে, ছড়া এবং ছবির সীমারেখার বাইরেও বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে যার প্রতিদিনের জীবনযাপন। অর্থাৎ পিসনির জীবনের একটা দিনের পরিবর্তে পাঠক এখানে পেয়ে যাচ্ছেন নানা দিনের পিসনিকে।

'সহজ পাঠ'-এর চিত্রাঙ্কনেও এই একই রহস্য। ছড়ায় যা, ছবিতে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি বিরল। 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগের দ্বিতীয় ছড়ায় হাঁসের উল্লেখ নেই কোথাও। আছে ক্ষীরের। কিন্তু হাঁসের গড়নের মধ্যে ই আর ঈ-এর আকৃতি খুঁজে পেয়েছেন বলেই শিল্পী এতটুকুও দ্বিধান্বিত হলেন না হাঁস এঁকে দিতে। ঐ বইয়েরই ৯ নং ছড়ায়—

চ ছ জ ঝ দলে দলে
বোঝা নিয়ে হাটে চলে।

"ছবিতে না আছে বোঝা মাথায় কোনো মানুষ, না কোথাও হাট-বাট। তার বদলে দিগন্তের গায়ে তাল গাছের সারি। আর যত বোঝা তাদের মাথাতেই। 'সহজ পাঠ'-এর দ্বিতীয়ভাগে রান্নাঘরের চালে ঝগড়া করছে তিনটে শালিক। নন্দলাল আঁকলেন দুটো। যেন ঝগড়া করতে করতে একটা লুকিয়ে পড়েছে আড়ালে-আবডালে।

রবীন্দ্রনাথ এসব ছবি নিজে দেখেই অনুমতি দিয়েছেন গ্রন্থভুক্তির। তাঁর চোখে বিসদৃশ লাগেনি কিছুই। অর্থাৎ চিত্রকরের সঙ্গে মনে মনে তিনি যেন একমত যে, অক্ষরে যা বর্ণিত, ছবিতে তার আক্ষরিক অনুবাদ ঘটলে শিশুদের স্বাভাবিক অথবা সহজাত কল্পনপ্রবণতা সোনার পায়ে পরানো হবে লোহার বেড়ি। এইভাবে শিল্পের রহস্যও জানা হয়ে যাচ্ছে তাঁর। বুঝে নিতে পারছেন সাহিত্যের বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পের বাস্তবতার পার্থক্য। "নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণ তাঁকে জুগিয়ে যাচ্ছে, হয়তো গোপনে গোপনে, নিজের চিত্র-রচনার প্রস্তুতিপর্বের রণ-সাজও।

'ছড়ার ছবি'-তে ছবি আঁকিয়ে নামের কবিতায় ছবি আঁকিয়ে নন্দলালের মাথায় ছড়া লিখিয়ে রবীন্দ্রনাথ পারিয়েছিলেন শ্রদ্ধা-সম্মানের এক রাজমুকুট, অতি সংক্ষিপ্ত একটি শব্দবন্ধে —

"এরা যে-সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।"

কোনো কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের হৃদ্য সৃজনশীল সম্পর্কের প্রসঙ্গে যখন বলেন—

"আমাদের কাব্যে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে কাজটি করেছেন চিত্রশিল্পে সেই কাজ করেছেন নন্দলাল . . . তাঁর শিল্পকর্ম অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাকৃতির পরিপূরক। . . . এদিক থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম interpreter বা ভাষ্যকার"—(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) তখন এই মন্তব্যকে ষোলো আনা সত্যি জেনেও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে এর উল্টোটাও কি সত্যি নয় ষোলো আনা? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথও কি এক অর্থে নন নন্দলালের ইন্টারপ্রেটার অথবা ভাষ্যকার? আমরা যদি শুধু মাত্র তথ্যগত দিক থেকেই এদিকে তাকাতে চাই তাহলে দেখতে পাবো, নন্দলালের ছবি নির্ভর করে অর্থাৎ ছবির প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন অসংখ্য।

১। 'চয়নিকার' 'রুদ্র বৈশাখ'।
২। 'গীতাঞ্জলির' 'নিভৃত প্রাণের দেবতা, যেখানে জাগেন একা'।
৩। 'মহুয়া'-র 'প্রত্যাখাত' কবিতা,সাঁওতাল দম্পতির ছবি দেখে।
৪। কার্সিয়াং থেকে পাঠানো দেবদারুর ছবি দেখে 'বনবাণী'-র 'দেবদারু'।
৫। 'বিচিত্রতা'-র স্যাকরা।
৬। 'বীথিকা'-র গোধূলি।
৭। 'পরিশেষ'-এর শুকসারী কবিতা।

তারপর 'ছড়ার ছবি'-র ছবি।

নন্দলালের ছবিতে, বিশেষকরে পোষ্টকার্ডের স্কেচে, রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরেই দেখে আসছেন সত্যি-মানুষের চলাচলের জগৎ। 'ছড়ার ছবি'-তে এসে তারা ঘটিয়ে বসল এক সাংঘাতিক কাণ্ড। নন্দলালের ছবি তাঁকে দিয়ে ৩২টা ছড়াই লিখিয়ে নিল না শুধু, সৃষ্টি করিয়ে নিল এক রাশ সত্যি-মানুষ। যারা লুকিয়ে ছিল কবির অভিজ্ঞতার তলদেশে, অবচেতনে, তারাই এখন ঝাঁকে ঝাঁকে জেগে উঠল ছড়ার প্রাকৃত ভাষার ডাঙায়, প্রায় বিস্ফোরণের বেগে। আর কবি-সত্তার অভ্যন্তরের এই ভাঙচুরের সুফলা-পরিণামেই আমরা পেয়ে গেলাম যে-সব সত্যি-মানুষ, সত্যি-ঘটনা, সত্যিকারের কালি-ঝুলি মাখা বাস্তব, তার মধ্যে রয়েছে—

মুখলুচরের ঘাট, খড়কেডাঙার হাট, তিন পহরের শেয়াল, ভজনঘাটায় গিয়ে কিনবার মতো বেগুন-পটল-মুলো-সজনে ডাঁটা, স্বামী হারানো পিসনি যাকে দেখলে চমকে উঠতে হয় নিশ্চিন্দিপুরের ইন্দির ঠাকুরন ভেবে, ইঁটখোলার মেলা, ফড়িঙ ধরা ভজহরি, মেয়ের বিয়ের দায়ে গোরু বেচতে যাওয়া মানুষ, কুমোরটুলি হাটে বেচার জন্যে ঝাঁটা বাঁধা, গাড়ি-চাপা পড়ে বেঁচে ওঠা অচলা বুড়ির খোঁড়া কুকুর, বালেশ্বরের আধ-পাগলি ঝি, গয়লা শিউনন্দন, স্যাকরা জগন্নাথ, ধর্মঘটে কোমর বাঁধা হাজার হাজার মানুষ, গুঁতো-গাঁতার পুলিশ, বালি ঝুর ঝুর তিরপুর্ণির চর, চিকন-চিকন চুল ঝাড়া মেয়ের পরণে ঘুরে পড়া ডুরে শাড়ি, শুকনো বাঁশের পাতায় ছাওয়া সরু পথ, ঘাসের আঁটিমাথায় দিয়ে হাট করতে চলা মেয়ে, রান্নঘরের গন্ধ, বাসন মাজার শব্দ, পথে পথে ছেলেদের লড়াই-লড়াই খেলা, অজগরের ভূতের মতন গলির পর গলি, আঁধার-মুখোশপরা বাড়ি, বাকি থাকা মাসকাবারের ঝুড়ি ঝুড়ি হিসেব, শনির দশা-গ্রস্থ আধবুড়ো, গৌরবর্ণ নধরদেহ মাকাল চন্দ্র রায়, খাটের খুরোয় বাঁধা মাধো, রায়বাহাদুর কিষেণলালের ছেলে দুলালের গুমোর, ডিক্রিজারিতে পাকা শেঠজি, স্বরূপগঞ্জের শ্বশুরঘরে এক জ্বরি জ্বরে ভুগতে থাকা অচলা বুড়ির পাতানো নাতনি, কোতলপুরের বাজার খপ্পরে পড়ে রাই ডোমনির ছেলের মিথ্যে ডাক-লুঠের মকদ্দমায় সাত বছরের জেল, মহেশ খুড়োর মেজো জামাই নিতাই দাসের নাতির চৌকিদারি, হাতে থেলো হুঁকো নিয়ে চাদর কাঁধে কঙ্কালী চাটুজ্যে, বেগনি ফলে রঙিন তুঁতের শাখা, সাদা ধুলো, ডোবার পাতা-পচা পাঁক জমানো জলে মহিষদের গম্ভীর ঔদাস্য, চড়া মেজাজের শালিক, মিলিটারির জরিপে পশ্চিমের শহরে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ানো ডেরাইসমাইলখাঁয়ের যোগীনদাদা ইত্যাদি।

নন্দলালের ছবি, গ্রন্থচিত্রণের সুবাদে, এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে জাগিয়ে দেয় এক প্রাকৃত রবীন্দ্রনাথকে। আর গ্রন্থচিত্রকর নন্দলাল-এর সার্থকতা এইখানে এসে পেয়ে যায় অন্য এক রবি-রশ্মির আলিঙ্গন।

নন্দলালের ছাপাই ছবি

কাঞ্চন চক্রবর্তী

পরিণত নন্দলালের সৃষ্টিধারা তখনো অব্যাহত। চিত্র হয়েছে ভাষায় সরল, ব্যঞ্জনায় অমেয়। প্রক্রিয়া-প্রকরণ-উপকরণের ব্যবহারে এসেছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা, সাবলীলতা। নন্দলাল নিঃসংশয়ে তখন সৃষ্টিধরদের মধ্যে পুরোধা। বছর পঁচিশ আগে তেমনি এক যুগে এক প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধকার জাতীয় একটি শিল্প-পত্রিকায় নন্দলাল সম্বন্ধে লিখে বসলেন, 'His art may not have the rich aesthetic flavour of Abanindranath Tagore, the versatility of Gaganendranath, the technical excellence of Venkatappa or the robust character of D.P. Roychoudhury...' ইত্যাদি। লেখক এবং স্বনামধন্য শিল্পী চারজনের প্রতি ন্যূনতম অসম্মান না দেখিয়েও এটুকু ক্ষোভ করে বলা চলে যে এই সব শিল্পীদের সামগ্রিক কাজের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না বললেই চলে, থাকলেও, শিল্পকৃতি বিচারের মানদণ্ডটি সুনির্দিষ্ট ছিল না।

লেখকের উদ্ধৃতি-প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ঋণের কথা স্বীকার করতে নন্দলাল কোনদিন কুণ্ঠিত হননি। একই কথা ভাষান্তরে বারবার বলেছেন : 'অবনীন্দ্রনাথ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আমায় শিল্পের ভুবনে।' আবার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে গগনেন্দ্র নন্দলালের বিচিত্রমুখিনতার তুলনাত্মক বিচার করা চলে না এমনও নয়। অথচ আঙ্গিক উপকরণ নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচিত্র প্রয়োগ, সার্বিক আত্মিকরণে যাঁর সমস্ত জীবনের শিল্পচর্যা চিহ্নিত সেই নন্দলাল আঙ্গিকগত মুন্সিয়ানায় ('technical excellence') কারো দ্বিতীয় একথা বড় বিচিত্র শোনায়!

রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি পাই : 'আর্ট তাঁর [নন্দলালের] পক্ষে সজীব পদার্থ, তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে, দরদ দিয়ে জানেন।' কাজেই এই সজীব পদার্থের চিন্তন-মনন-পরীক্ষণ নিয়ে তাঁর কখনো অবসাদ আসেনি। 'সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির [এই] অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ।' অর্থাৎ এতদর্থে নন্দলালকে আমরা সিদ্ধকাম বলে ধরে নিতে পারি। তিনি কখনো কয়েকটি মাধ্যম উপকরণের মধ্যে বাঁধা পড়েননি। বারবার নিজেকে ভেঙেছেন, নতুন সড়ক তৈরি করেছেন আবার বাঁক নিয়েছেন। নিজস্ব ভাষাপথের সন্ধানে দেশী-বিদেশী কোনো পরম্পরার দ্বারস্থ হতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। সর্বত্রই উপকরণ—মাধ্যমের প্রতিশ্রুতি, সম্ভাবনাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন, যখনই যে উপাদান—আঙ্গিককে 'ভর' করেছেন সেখানেই রেখেছেন সব্যসাচীর স্বাক্ষর। শিষ্যরাও স্মৃতিচারণ করেছেন : 'আমাদের আচার্যদেব ছিলেন বিশ্বকর্মার বরপুত্র।...তাঁর বিচিত্র অবদানের ভিতর দেখেছি শিল্পস্রোত নানাভাবে নানারূপে তীব্রভাবে এসেছে। কিন্তু কখনো স্বাদবিহীন নয়।' নীরদচন্দ্র চৌধুরী নিতান্ত সহজ করে শুনিয়েছেন : 'আজকাল আমাদের দেশে যাঁহারা ছবি আঁকিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সম্বন্ধেই বলা চলে না যে তাঁহার আঁকিবার পদ্ধতি একটি জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে।...নন্দবাবুর মুদ্রাদোষ নাই।' এ-তো গেল শিল্পী নন্দলালের বাতাবরণ। আচার্য নন্দলাল একটি ঐতিহাসিক চাহিদারও

পূরণ করেছেন। '...এ-পর্যন্ত আমাদের চিত্রকরদের প্রকাশ করবার এক পথ ছিল চিত্র। নন্দলালের আদর্শ বিচিত্র উপকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশের পথ করবার আগ্রহ জাগিয়েছিল।' আজকের দিনে একথা খুব একটা অজানা নেই যে : 'The efforts of Nandababu to locate the visual concomitants of each art style and work out their syntatic norms were highly educative and no single artist in India made as many revealing explorations into as many art forms as he did. শিল্পী ও শিক্ষক নন্দলালের এই যৌথ সাধনাই নিঃসংশয়ে কলাভবনকে 'রূপকলার প্রাণনিকেতনে' পরিণত করেছিল যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এ খাঁচা নয়—এ-যে নীড়।'

এই উদ্ধৃতি ক'টিকে বিশ্লেষণ করলে গুটিকয়েক তথ্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই : ১। বিচিত্র ভাষাপথের সন্ধানে নন্দলালের ছিল নিরন্তর ব্যাকুলতা ; ২। নীতি-পদ্ধতি-ব্যাকরণের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেও তাঁর চিত্র হয়েছে ভাব-রসে উত্তীর্ণ এবং আত্যন্তিক অনুভূতি উপলব্ধি আনন্দের মধ্যেই সেই ভাব-রসের উদ্গতি ; ৩। ব্যক্তিগত সৃজনবৈচিত্র্যের মধ্যেই শিল্পীর উদ্দেশ্য আদর্শের পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি ; ৪। আচার্যের ভূমিকা সম্বন্ধেও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব অতি সচেতন, আত্মানুসন্ধানী এবং আত্মসমালোচক ; আর সর্বোপরি ৫। শিষ্য সহানুধ্যায়ীদের আগ্রহ-অনুরাগ নিয়ত উজ্জীবিত রাখতে স্বয়ংসিদ্ধ।

নন্দলাল সম্বন্ধে আলোচনায় উল্লিখিত প্রথম দুটি তথ্যের বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ প্রায় সংস্কারে দাঁড়িয়েছে। অথচ স্বল্প আলোচিত পরবর্তী তিনটি ক্ষেত্রেই প্রধানত নন্দলাল ইতিহাসের একটি নিরতিশয় প্রয়োজনের নিশানা দিতে পেরেছেন এবং সমাধানের ইঙ্গিত রেখেছেন। নন্দলাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিচার বিশ্লেষণে আঙ্গিক উপাদান পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিল্পীটিকে চিনে নিলেই তাই চলবে না, একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক শিল্পরুচি ও সৃজন-প্রতিভা স্ফুরণের একটি স্বতোৎসারিত পরিমণ্ডল রচনার যে আদর্শ আচার্য নন্দলালের মধ্যে আমরা পাই, সেই বাতাবরণকেও উপেক্ষা করার পথ নেই। নন্দলালের নিরন্তর সাহচর্যধন্য শ্রী শান্তিদেব ঘোষ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : 'আজ যে শিল্পচর্চা শান্তিনিকেতনে অনেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে সে কাজ একদিন এত সহজ ছিল না। তাকে সহজ করে তুলতে নন্দলালকে বহুবৎসর সাধনা করতে হয়েছে।'

এই সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র হল অগণিত মাধ্যম উপকরণের স্বরূপ, সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিকে আঁতিপাতি করে অনুসন্ধান করা এবং তদনুযায়ী সৃজনকর্মের আদর্শ নির্ণয় করা। অন্য সমস্ত মাধ্যমের মত নন্দলালের ছাপাই ছবির ক্ষেত্রটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

কাঠের ফলক বা পাটা, লিনোলিয়ম, লিথো পাথর, ধাতুফলক (তামা দস্তা ইত্যাদি) হল প্রধান উপকরণ আর এনগ্রেভিং, এচিং, একোয়াটিন্ট, ড্রাইপয়েন্ট বা লিথোস্টোনের ওপর আঁকাকে অবলম্বন করে ছাপাই ছবির আঙ্গিক। লিথোস্টোনের স্পর্শকাতর (sensetive) পৃষ্ঠভূমিতে অনুভূতিনিষ্ঠ চিত্রণ ও বর্ণবিভঙ্গ ছাপাই ছবিতে একধরনের সাবলীলতা আনে। আবার কাঠ, লিনোলিয়ম, ধাতুফলক-এর মত কমবেশী কঠিন ভূমিকে সুতীক্ষ্ণ, ধারাল নরুন জাতীয় অস্ত্র দিয়ে উৎকীর্ণ করে সোজাসুজি ছাপ-ছবি নেওয়া অথবা নানান কাচগুড়ো অণুকণা প্রয়োগের আস্তরে জমিকে অ্যাসিডে স্নান করিয়ে গভীর ও বৈচিত্র্যধর্মী ছাপাই ছবি সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক স্বাদ ও আত্মতৃপ্তি আছে।

ক্ষেত্র ও তদুপরি বিধৃত শিল্পীর ভাবরূপ বা বিষয়বস্তু ছাপাই হয়ে যখন ছবির স্থান নেয় তখন উভয়ে মিলে একটি ধনাত্মক (positive) আর ঋণাত্মক (negative) সম্পর্কে বাঁধা পড়ে, শুদ্ধ সাদা ও শুদ্ধ কালোর বৈপরীত্যে তারা একই সঙ্গে যুগ্ম ও দ্বিধাবিভক্ত। এই সাদা ও কালো ক্রমান্বয়ে একবার বিষয়বস্তু (object) ও আরেকবার শূন্যস্থানের (space) দৌত্য করে একটি প্যাটার্ন বা ডিজাইনের সৃষ্টি করে যে প্যাটার্ন দৃশ্য ও বিবরণধর্মী ততটা নয় যতটা চিত্রানুগ (graphical) ভাষায় সন্নিবদ্ধ।

নন্দলাল ছাপাই ছবির শব্দ-বর্ণ ভাষার প্রতি যখনই আকৃষ্ট হলেন তাঁর বুঝে নিতে বিলম্ব হয়নি যে করণ-প্রক্রিয়া-আঙ্গিকে দক্ষতা ও মুন্সিয়ানা নিতান্তই অপরিহার্য। তবে আঙ্গিকগত কালোয়াতির পরিবর্তে আঙ্গিককে অতিক্রম করার মধ্যেই ছাপাই ছবির সার্থকতা। একথা সর্বৈব সত্য যে ছাপাই ছবির অধিকাংশ মাধ্যম-প্রকরণ পশ্চিমী। কিন্তু এই আধুনিক শিল্পভাষার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী চিত্রণরীতির সাযুজ্য কোথায় সেটুকুও খুঁজে বার করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি।

নন্দলাল নানান প্রভাব প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছাপাই ছবির প্রতি অনুরক্ত হন। ১৯১৫-১৯৩০ পর্যন্ত বিলাত-পূর্ব ও বিলাতোত্তর পর্বে মুকুল দে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি ও বিচিত্রাসভায় যে সমস্ত ছাপাই কাজ করেন সে প্রভাব তো ছিলই, ১৯২০ তে প্যারিস থেকে ফেরা সোসাইটির চঞ্চল ব্যানার্জী ও তাঁর পশ্চিমী-আদর্শের উডকাট ও উড এনগ্রেভিং, শান্তিনিকেতন পর্যায়ে পিয়ার্সনসাহেবের সংগ্রহে মুইরহেড বোন-এর করা এচিং ও উড এনগ্রেভিং, এবং মাদাম আঁদ্রে কার্পেলে কলাভবনে ছাপাই ছবি করার যে প্রথা-পদ্ধতি প্রদর্শন করেন সবগুলির মধ্যেই নন্দলাল আলোছায়া নির্ভর, দৃশ্যানুগত একাডেমিক আদর্শের পরিচয় পান। ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে ড্যুরার, রেমব্রা আদি কৃতবিদ্য শিল্পীদের ধারার সঙ্গেও তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ছিল যথেষ্ট।

ছাপাই ছবির অপর এক আদর্শের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ভারতীয় মন্দির মসজিদ স্থাপত্যের থেকে নেওয়া অসংখ্য rubbingsএ, দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে সংগ্রহ করা দেবদেবীর ছাপাই নমুনায় (votive prints), চীন-জাপান ভ্রমণে (১৯২৪-২৫) দেখা ও সংগ্রহ করা কাঠ খোদাইয়ের ও ছাপ-চিত্রের (rubbings) বিচিত্র সব নিদর্শনে। এছাড়া ওকাকুরার যাওয়া-আসার সূত্রে তাঁর সংগ্রহভুক্ত জাপানী ছাপাই ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ক্যালকাটা ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন আর উডরফ্ সাহেবের ছাপাই ছবির সংগ্রহ প্রদর্শিত হয় ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে। কিন্তু আলোছায়া-নিরপেক্ষ, সংবেদনধর্মী আধুনিক যে ইউরোপীয় পরম্পরা তাঁকে অবাক করেছিল তা হল ১৯২২ এ কলকাতায় প্রদর্শিত জার্মান এক্সপ্রেসনিস্টদের বৃহদাকার কাঠখোদাইয়ের পঁয়তাল্লিশটি নমুনা। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা হল বিচিত্রা প্রেসে ছাপা গগনেন্দ্রনাথের নিজস্ব লিথো স্টাইল (১৯১৭, 'অদ্ভুতলোক') আর ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে কর্মরত গিরিধারী মহাপাত্রের রঙিন কাঠখোদাই।

নন্দলাল দ্বিতীয় এই আদর্শটির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হলেন। এসমস্ত কাজে পরিদৃশ্যমান আলো-ছায়ার নিরন্তর লুকোচুরি নেই। বাস্তব এক ধরনের সাদৃশ্যে বা ব্যক্তিগত বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুস্থাপনা, চিত্রপট ও আঙ্গিক অনুসরণে জটিলতার আভাষ অনুপস্থিত। কার্যত সাদা-কালোর নিরঙ্কুশ বৈপরীত্যে কালোকে করেছে অত্যুজ্জ্বল, সাদা হয়েছে দীপ্তিমান, সব মিলিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন প্যাটার্ন বা ছন্দোবদ্ধ রূপাকার, নির্মাণধর্মিতায় যা ভাস্বর।

সে যাই হোক একথা অস্বীকার করার কারণ নেই যে নন্দলাল চিত্রের বিভিন্ন শাখায় যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে তা তাবৎ প্রোজ্জ্বল নয়। তাহলেও ছাপাই ছবির অভিনবত্বকে নন্দলাল কখনো ফ্যাসান হিসাবে গ্রহণ করেননি। নতুন আঙ্গিকের খোলসটুকু নিয়েও সন্তুষ্ট থাকার মানুষ তিনি ন'ন। ছবির ফাঁকে ফাঁকে ছাপাই ছবিকে অম্লমধুর অবকাশ হিসাবেও দেখতে তিনি নারাজ। বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠপোষকের কথা ভেবেও তিনি ছাপাই ছবির পরীক্ষণে মনোনিবেশ করেননি। সে কারণেই আধুনিক পশ্চিমী এবং পূবদেশের পরম্পরাসিদ্ধ ভিন্নতর এই দুই আদর্শের মধ্যে তিনি দিশে হারাননি। বাস্তবাশ্রিত এবং উপলব্ধিধন্য দুই রূপাকারকে কৃত্রিম সমন্বয়ের (hybrid) মধ্যেও বাঁধা যে নিরর্থক সে কথা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তাঁর স্থির দৃষ্টি ছিল এই দুই আদর্শের আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে একটি বিমূর্ত চিত্রাভাষ কেমন করে গড়ে তোলা যায় যা নিরঙ্কুশ বাস্তবও নয়, আবার বাস্তব-নিরপেক্ষ দুর্বোধ্যতাও নয়—অথচ রূপময়তায় অভিনব (graphical)।

এখন প্রশ্ন হল কেমন করে তা সম্ভব হবে! স্বদেশী-বিদেশী নানান ধারার বিশ্লেষণ করে নন্দলাল এই সত্যে পৌঁছেছিলেন যে ছাপাই ছবির নির্মাণধর্মিতা হবে সংক্ষিপ্ত, সরল ও অনাড়ম্বর। স্বতঃস্ফূর্ততা, সাবলীলতা হবে তার আত্যন্তিক গুণ। কাজেই বাস্তবের আমেজ আনার জন্য চিত্রপটে তিনমাত্রিক স্পেসের প্রবর্তনা করলেই করণগত জটিলতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য—যে করছে এবং যে দেখছে উভয়ের ক্ষেত্রেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য। নন্দলাল তাই দ্বিমাত্রিক তল (surface) উদ্ভাবনের দিকেই মন

দিয়েছেন বেশি। তাতে করে নন্দলালের কাজ সহজেই দর্শককে নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব থেকে কিঞ্চিৎ দূরে নিয়ে গেছে—নিয়ে গেছে বাস্তব আর বাস্তবাতীতের এক দ্বারদেশে, একটি বাস্ময় বিমূর্ততায়। একথাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আলোছায়া নির্ভর দৃশ্যজাত উদ্দীপনা বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে অপারগ। তাই তিনি শিল্পের এমন একটি শব্দভাণ্ডার (vocabulary) রচনা করতে চেয়েছেন, যা একদিকে প্রকাশ করবে রেখার অমিত গতিময়তা এবং তার অন্তর্লীন কর্ষশক্তি (tension) আর অন্যদিকে সাদা ও কালোর সংঘাতে রূপ দেবে একটি শুদ্ধ, বিমূর্ত চিত্রানুভূতির।

এচিং, এনগ্রেভিং ও ড্রাই পয়েন্টকে ঘিরেই নন্দলালের রেখানিষ্ঠ রচনা। আপাতদৃষ্টিতে এসমস্ত কাজে এক ধরনের 'একাডেমিক' আমেজ প্রধান, বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি পক্ষপাত বেশি। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলেই দেখা যাবে যে রেখার গতি, রেখাজালের বুনট, স্তিমিত বা উজ্জীবিত রেখার বিন্যাস বস্তুর রূপ-গঠন-বর্তনাকে অনুকরণ করে নির্মিত হয়নি। বস্তু বা বিষয়ের অন্তর্লীন কাঠামোকে (structure) অবলম্বন করেই তারা রূপ পেয়েছে। রেখা প্রয়োগ পশ্চিমী আদর্শের অনুষঙ্গী নয়। কিন্তু তাহলেও রূপাকার বা মোটিফকে নিয়ে আধুনিক ইউরোপীয় যে ডিজাইন ভাবনা তার সঙ্গে যেন কোথায় একটা নাড়ির যোগ! অবাধ রেখা-সর্বস্ব তাঁর অধিকাংশ দৃশ্যপট বা নিসর্গচিত্র স্পষ্টতই ক্যালিগ্রাফধর্মী। চীন-জাপান সূত্রেই তাঁর ক্যালিগ্রাফ-মর্মিতার জন্ম। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ক্যালিগ্রাফির মাত্রা, ছন্দ, শব্দ-বর্ণ-ব্যাকরণ চীনী-জাপানী ধারার সাক্ষাৎ দোসরও নয়। আশে-পাশের প্রকৃতি মানুষের প্রাণচ্ছন্দ থেকেই তাঁর ক্যালিগ্রাফি ভাষার উৎসারণ এবং নিজস্ব অনুভূতি উপলব্ধির মধ্যেই তার মৌলিকত্ব নিহিত।

নন্দলালের লিথো, লিনো, সিমেন্টব্লক খোদাই কাজে কিন্তু ছোট বড় আয়তন (block) আকারের প্রাধান্য। বস্তু ও তল (surface) পালাক্রমে আলো ও কালোর ভিন্ন ভিন্ন আয়তন নিয়ে টানাপোড়েনে বাঁধা। সাদা কালো বিন্যাসের ক্ষেত্রেও নন্দলাল অগৌণে এদেশী পরম্পরার দ্বারস্থ হননি। তীর্থক্ষেত্রের ছাপাই ছবি, মন্দির স্থাপত্যের ছাপ-ছবি (rubbings), চীন-জাপানের ঐতিহ্যাশ্রয়ী নিদর্শনে আলো-কালোর সম্মিলন ও সংঘাতে কোথায় যেন একটা প্রথাপরায়ণতা (convention) আছে, কেমন যেন কারিগরি ছাঁচে ঢালা। নন্দলালের পদবিন্যাসে (syntax) সাদার বৈপরীত্যে কালো স্থির, স্থাণু বা নিশ্চল নয়, ক্ষেত্রের মধ্যে তারা যেন নড়াচড়া করে, ঝিলিমিলি তৈরী করে, দৃশ্যজাত হিল্লোলের নিশানা দেয়; বস্তুর বাহ্যিক রূপাকার নয়, বস্তুর গুণ-সত্তার সম্বন্ধে দর্শকের প্রতীতি জন্মায়। নন্দলাল এখানটাতেই একেবারে অনন্য।

নন্দলালের সমগ্র ছাপাই ছবি সম্বন্ধে অগৌণে একথা বলা যায় না যে উপাদানবিশেষের সীমা অতিক্রম করে তিনি অবলীলাক্রমে চেতন, সংবেদনশীল এক রূপময়তা রচনা করেছেন। বস্তুত জগতের তাবৎ কোন শিল্পী সম্বন্ধেই সে কথা খাটে না। প্রাথমিক স্তরে নতুন উপকরণ ব্যবহারের উন্মাদনাই প্রধান থেকেছে। ক্রমেই তাকে জানবার, বোঝবার চেষ্টা করেছেন। বিচিত্রাসভায় করা সাঁওতাল নাচ (লিথো, ১৯১৮), কোনারক মন্দির (লিথো, ১৯১৮), অথবা মন্দিরানৃত্য (কলাভবন সংগ্রহ, ১৯২৩), 'নবীন' নৃত্য-নাট্যের বিভিন্ন অভিনয় দৃশ্য (এচিং, ১৯৩১ রবীন্দ্রভারতী, মুকুল দে সংগ্রহ) কিংবা খোদাই করা সিমেন্ট ব্লক থেকে ছাপ নেওয়া 'গর্দভারোহী বালক' (কলাভবন সংগ্রহ ১৯২৪), বৃক্ষের অন্তরালে রমণী (রঙিন কাঠখোদাই, ১৯২৯) মা ও ছেলে (ড্রাইপয়েন্ট, ১৯২৫) এসবগুলির মধ্যেই উপাদানের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের ছাপ স্পষ্ট।

১৯২৭-২৮ থেকেই কিন্তু ছাপাই ছবির তাবৎ সমস্ত উপাদানের রহস্য তিনি প্রায় উদ্ঘাটিত করে ফেলেছেন এবং নিজস্ব এক শৈলীর প্রবর্তনা ঘটিয়েছেন। বৃক্ষরোপণ উৎসবের শোভাযাত্রা (কাঠখোদাই, ১৯২৮), মহাত্মাজীর ডাণ্ডিমার্চ (লিনো, ১৯৩০), সহজ পাঠের (১ম ভাগ) লিনোয় কাটা গ্রন্থচিত্রণ (১৯৩০), আবদুল গফ্ফর খান (উড এনগ্রেভিং, ১৯৩৫), ছাগল (ড্রাইপয়েন্ট, ১৯৩৬-৩৭) অর্জুন, পাইনবন, চিত্রাঙ্গদা (সবগুলিই ১৯৩৮-এ করা ড্রাইপয়েন্ট), বাউল (এচিং, ১৯৩৯) অথবা কোপাই নদী (এচিং, ১৯৪৯) —এদের যদি পাশাপাশি সাজিয়ে একসঙ্গে দেখা যায় তাহলেই বোঝা যাবে নন্দলাল বিষয়, পদ্ধতি ও প্রকাশে শুধু বৈচিত্র্যধর্মী নন, আঙ্গিকের ওপর তাঁর কী অপরিসীম দক্ষতা অথচ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মার-প্যাঁচ নিয়ে সামান্যতম শিরঃপীড়া নেই। 'পাকা আর্টিস্টের টেকনিক যা ঠিক টেকনিক হল, তন্ত্রের একটি শ্লোকে যেমন বলেছে, পাখির ওড়ার মত, এক গাছ থেকে আর এক গাছে গিয়ে বসলে—বাতাসে পথের কোন চিহ্ন রইল না।' নন্দলালের এই উক্তির সঙ্গে তাঁর করণ-প্রক্রিয়ার কোনরকম তফাৎ ছিল না। বিশেষ করে ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে টেকনিকের ওপর যে অস্বাস্থ্যকর পক্ষপাত ইদানীংকালে বৃদ্ধি পাচ্ছে নন্দলালের কাছে তা-ও রোগের লক্ষণ বলেই মনে হয়েছে। রসিকতা করে বলেছেন: 'রোগের চেয়ে রোগীর প্রতি যখন ডাক্তারের নজর থাকে বেশি, আরোগ্য হয় দুর্লভ।'

নন্দলালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুধু ব্যক্তিগত আকৃতি-অনুভূতির পরিপোষণা করেনি। কখনো বা তিনি অন্তরের তাগিদেই নতুন আঙ্গিকের দ্বারস্থ হয়েছেন। কখনো বা শিষ্য-সহানুধ্যায়ীদের মানসিক প্রবণতার কথা সামনে রেখে এক একটি উপাদানের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, কোথাও বা

উৎসাহ উন্মাদনা অনুপ্রেরণাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উপাদানের অভিনবত্বের শরণাপন্ন হয়েছেন, কখনো বা ছাত্রদের বা ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ পরিকল্পনা ও পারস্পরিক সমঝোতা সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ উপকরণ-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন, কখনো বা কারা তাঁর দর্শক (consumer) তাদের রুচি চাহিদার কথা ভেবেই টেকনিকের হেরফের করেছেন। নন্দলাল সম্বন্ধে একটা অনুযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে দেওয়ালচিত্রণ, ছাপাই ছবি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁকে দিকপাল বলে মেনে নিতে কুণ্ঠা লাগে তাঁর প্রতিভার দৈন্যের জন্য নয়, তিনি এদিকে আশানুরূপ মনোযোগ দেননি বলেই। এই প্রসঙ্গে আমার পূর্ববর্তী বক্তব্যে ফিরে আসতে চাই যেখানে আমি একাধিক উদ্ধৃতির শেষে কয়েকটি তথ্যের অবতারণা করেছি এবং স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি একটি জাতীয় শিল্পনিকেতনের আদর্শ পরিবেশ-পরিমণ্ডল গড়ে তোলার সাধনায় নন্দলালকে অনেক ক্ষেত্রেই নিজেকে বঞ্চিত করতে হয়েছে অর্থাৎ স্বকীয় স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি বা ব্যষ্টির কথা ভেবে ব্যক্তিকে সচেতনভাবে যবনিকার অন্তরালেই রাখতে চেয়েছেন। বৃহত্তর স্বার্থে চিত্রী নন্দলালের এটি একটি বড়ো মাপের আত্মত্যাগ এ-কথা নিঃসংশয়ে জানবার আজ সময় এসেছে। শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যের মত দেদীপ্যমান থাকবেন এবং একই সঙ্গে একটি রস-সচেতন, সৃজনশীল শিল্প-পরিমণ্ডল গড়ে তোলার বনেদ তৈরী করে যাবেন এটা আমাদের একটা অসম্ভব আশা-দুরাশাই বলতে হবে।

আজকের দিনে যখন শিল্পীর ওপর সমাজের বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে, শিল্পী যেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও স্বাধীন সেখানে সে সহজেই বলে ফেলতে পারে যে আমার ছবি যদি এক মিনিটের জন্য একজন লোকও দেখে তাহলেই ছবি করার উদ্দেশ্য সার্থক। নন্দলাল ও মাঝে অনেকেই ততখানি সাম্প্রতিক ছিলেন না। তিনি দেখছেন যে, সহজপাঠের যে লিনোকাট তার দর্শক তার পড়ুয়া শিশুরা। সারাদিন ধরেই বইটির সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক। শব্দ বর্ণ বাক্য যেমন তার মধ্যে ধ্বনির জগতের একটা পরিচয় দেয়, চিত্রগুলির মধ্যেও তেমনি তারা তাদের অভিজ্ঞতা, অনুষঙ্গকে যাচাই করে নেয়। বই-এর সঙ্গে তার ছবিগুলিও তাদের সর্বক্ষণের সাথী। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হুবহু বাস্তবতাকে পরিহার করলেন। শিশুদের বিশ্বাসের স্বপ্নের দুনিয়াকে (make believe world) মনে রেখে সাদা-কালোকে এমনভাবে চিত্রপটে বণ্টন করলেন যা অভিনব। দুটো দিক তাঁকে একই সঙ্গে রাখতে হয়েছে—এক রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে নির্ভর করে তাঁর চিত্রকল্পনা আর অন্যদিকে যেখানে সাদা-কালো ছাড়া নানান রঙের বাহার নেই চিত্রে তা কেমন করে শিশুদের মনোহারী হবে। আদতে ডিজাইনের সারল্য, বিষয়ের স্পষ্টতা এবং বস্তুর রূপের চেয়ে বস্তুর গুণের ওপর নির্ভরশীল আলংকারিক ভাবনা শুধু শিশুগ্রন্থ চিত্রণে নয়, লিনোর মত সুলভ অনায়াস উপাদানে ছাপাই ছবির ভঙ্গীকে কেমন করে ধরে রাখা যায় তার একটি অতি উজ্জ্বল ও আধুনিক দৃষ্টান্ত।

আবার কাঠের ওপর রেখাধর্মী সীমান্তগান্ধীর যে কাজ সেখানে অন্যতর অভিনবত্বের দিকে নজর দিয়েছেন। শোনা যায় যে রেখা-রীতি দিয়ে আবদুল গফফর খান সাহেবকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে তা উর্দু কালিগ্রাফির স্বাধীন রূপান্তর। উর্দু এই বিশেষ ক্যালিগ্রাফির অর্থ খোদাই খিদমদগার—সীমান্তগান্ধী তো দেশ ও জনগণের কাছে উৎসর্গীকৃত খিদমদগার বিশেষ।

'ডাণ্ডী অভিযানের' (কাঠ খোদাই) গান্ধীজিকে মনোবল, স্থৈর্য, তেজ ও দার্ঢ্যের এমনই এক অনমনীয় টাইপ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন যা ভারতের শুধু নয় সারা দুনিয়ার স্বরাজকামী মানুষের অহিংস যোদ্ধার ভাব-মূর্তিটিকে রূপ দিয়েছেন। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতবর্ষে এই কাজটির বহুল প্রচার হয়েছিল এবং বোধহয় আর কোন একটি ছাপাই কাজের জন্য নন্দলাল ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে এতখানি পরিচিত হননি। এটি যদি গান্ধীজির মামুলি একটি প্রতিকৃতিহত অথবা পটের মধ্যে বিচিত্র বুনটের (texture) কারিগরির মধ্যে হারিয়ে যেত তাহলে কি ছাপাই ছবির তীব্র ও নিবিড় আবেদনের কথা আমরা জানতে পেতাম। অথচ উপাদানের ব্যবহার কি নির্মমভাবে সংক্ষিপ্ত, সরল ও নিতান্তই সরাসরি!

ড্রাইপয়েন্টের 'অর্জুন' (১৯৩৮) ভাবনা এবং ভঙ্গীর দিক থেকে অনবদ্য। ভস্মে ঢাকা অগ্নির মত আত্মগোপনকারী মধ্যম পাণ্ডবের তেজোদ্দীপ্ত, বলীয়ান ও অভিজাতধন্য পৌরুষময়তা রসিককে স্মরণ করিয়ে দেবে যে উৎকীর্ণ রেখাও কেমন গতিময় ও কর্ষণগুণসম্পন্ন হতে পারে। ড্রাইপয়েন্টের 'ছাগল' (১৯৩৬) কে তো রবীন্দ্রনাথ ছাগাবতারের মর্যাদা দিয়েছেন। ছাগল তো এখানে পশুবিশেষ নয়—মূক পাশবিক শক্তিরও প্রতিনিধি নয়! ছাগল এখানে আধ্যাত্মিক এক চেতনশক্তির (force) ধারক। 'ছবি আঁকিয়ে'—কবিতায় একাধারে শিল্পী ও ছাগাবতার উভয়কেই 'ছড়ার ছবি' পুস্তকে অমরত্ব দিয়ে গেছেন, পাইনবন (ড্রাইপয়েন্ট ১৯৩৮) সাঁওতালদের বাড়িফেরা (লিনো, ১৯৩৬) তেঁতুলগাছ (এচিং, ১৯৩৫) বাউল (এচিং, ১৯৩৯) চিত্রাঙ্গদা (ড্রাইপয়েন্ট ১৯৩৮) ইত্যাদি কাজগুলির মধ্যে উপাদান সম্বন্ধে নন্দলালের সম্যক জ্ঞান ও স্বকীয় একটি ভঙ্গী বা শৈলীর পরিচয় বিশেষ স্পষ্ট। নন্দলাল আধুনিক ও প্রধানত পশ্চিমী এই মাধ্যমে উপযুক্ত একটি ভারতীয় ও একটি আধুনিক ভাষা তৈরী করেছেন যা শুধু দৃশ্যজাত উদ্দীপনা-গ্রাহ্য নয় যা গুণাত্মক আবেদনগ্রাহ্য। ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে নান্দনিকগুণ নন্দলালের একমাত্র প্রেয়বস্তু ছিল না। প্রেরণা ও প্রাণধর্মী করাই তাঁর লক্ষ্যে স্থির ছিল। ছাপাই ছবির এই নতুন দিগন্ত নন্দলালের আবির্ভাব ছাড়া সম্ভব ছিল না।

নন্দলালের ঐতিহাসিক অবদান অন্যতর আর একটি ক্ষেত্রে আছে। তিনি যদি চিত্র ছাড়া অন্য একাধিক পথে বিচরণ করায় উৎসাহ না দিতেন, এবং 'আপনি আচার ধর্ম' এর আদর্শ না রাখতেন এবং সৃষ্টিকার্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাতাবরণ তৈরী করতে বিফল হতেন তাহলে এই মুহূর্তে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতাম তা বিচারসাপেক্ষ বটে। আচার্য হিসাবে তিনি যে বিচিত্র উপকরণ নিয়ে পরীক্ষণের দিকে ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছিলেন এবং উপকরণের ব্যবহারে সংক্ষিপ্ত, সরল, অনাড়ম্বর পদ্ধতি প্রক্রিয়ার প্রবর্তনা করেছিলেন তাতে করে কলাভবনের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল এবং সকলেই নানান উপকরণের সঙ্গে কমবেশী পরিচিত ছিল। শিক্ষান্তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই ধারাটি তাঁরা বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। নন্দলালের শিষ্য ও ছাত্ররা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক) চিত্র, ভাস্কর্যের সঙ্গে ছাপাই ছবির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। যার ফলে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ছাপাই ছবির একটি বাতাবরণ তৈরী হতে বিলম্ব হয়নি। ষাটের দশকের পর আমাদের দেশে ছাপাই ছবির যে রমরমা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে ব্যক্তি হিসাবে নন্দলালের এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলাভবনের পরোক্ষ অথচ অতি অতিশক্তিশালী প্রভাবকে ইতিহাস অস্বীকার করতে পারবে না।

তবে ছাপাই ছবির গুণাত্মক বিমূর্ত দ্বিতীয় একটি ভাষার জন্ম নন্দলাল না দিলে একটি আধুনিক ভারতীয় পরম্পরা বিলম্বিত হত এবং বিনোদবিহারী, সুব্রহ্মণ্যমের মত মৌলিক ও আধুনিক মেজাজের উপযোগী সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যেত। নন্দলাল যদি শিল্পী ব্যক্তিত্ব হিসাবেই আত্মোন্নতি, ও আত্মপ্রচারে ব্যগ্র হতেন তা হলে তাঁর ব্যক্তিগত ত্যাগের আত্মপ্রকাশের ভিত্তিভূমিতে ছাপাই ছবির সৌধটি তৈরী হতে পারতো না এবং একটি সংবেদনশীল, রূপনিষ্ঠ শব্দ-ভাণ্ডার সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞানই থেকে যেতাম। নন্দলালের এই ভূমিকাটি নিয়ে আজও প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশ্লেষণ হয়নি এটাই সবচেয়ে ক্ষোভের।

পোস্টার শিল্প ও নন্দলাল

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

নন্দলালের হরিপুরা পোস্টার সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে পোস্টার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এর কারণ আরও নানান রকম বিজ্ঞাপন ও প্রচারের হাতিয়ারের মতন পোস্টারও পশ্চিম থেকে আমাদের দেশে এসেছে।

অনেক পণ্ডিতের মতে পোস্টারের শুরু হয় প্রাচীন গ্রীস ও রোমে। গ্রীক ও রোমান ব্যবসায়ীরা দোকানের সাইনবোর্ড ছাড়া কাঠের ফলকে বা দেওয়ালের গায়ে ছবি এঁকে জিনিসপত্তর বিক্রির বিজ্ঞাপন দিতেন। আমাদের দেশে বৌদ্ধ প্রচারকরা বুদ্ধের জীবনের নানান ঘটনা চিত্রিত করে সেগুলি মুখের কথার ফাঁকে ফাঁকে দেখিয়ে ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করতেন।

১৪৫৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আধুনিক পদ্ধতিতে ছাপার কায়দা আবিষ্কারের পর ছাপাকে নানানভাবে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের কাজে লাগানো শুরু হয়। বিলেতে ছাপাখানার প্রবর্তক উইলিয়াম ক্যাকসটন ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে শুধুমাত্র অক্ষর দিয়ে ছাপা পোস্টার দোকানে লটকে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন করতেন। আমি এখানে পোস্টার কথাটা ব্যবহার করছি এই কারণে যে, পোস্টার কথাটার একটা মানে হল যে কোন পোস্ট বা খুঁটিতে কিম্বা সহজে চোখে পড়ে এমন কোন জায়গায় কাগজ বা প্ল্যাকার্ড লটকে বা সেঁটে সেগুলি দিয়ে কোন জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন, খবর বা নোটিশ প্রচার করা। এই মানে নিয়ে পোস্টার কথাটা ইংরিজিতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বহুলভাবে চালু হয়ে যায়।

এর আগে থেকেই অর্থাৎ ১৬ থেকে ১৮ শতকের মধ্যে আরও নানান রকম প্রচারের মাধ্যমের সঙ্গে সঙ্গে ছাপা পোস্টারের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। চীন ও জাপানে ১৮ ও ১৯ শতকে বিরাট বিরাট শিল্পীরা রঙিন কাঠ খোদাই দিয়ে অপূর্ব সুন্দর থিয়েটারের পোস্টার সৃষ্টি করেন যেগুলির নিদর্শন পৃথিবীর বহু মিউজিয়াম ও বা[illegible] রয়েছে।

ইউরোপে আধুনিক পোস্টারের পেছনে ছিল ছাপার জগতে একটা নতুন আবিষ্কার। সেটা হ'ল লিথোগ্রাফি। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অ্যালোয়াস সেনফেলডার বলে একজন অস্ট্রিয়ান মুদ্রাকর পাথরের ওপর ছবি এঁকে বা কাগজে ছবি এঁকে সেটাকে জলছবির মতন পাথরের গায়ে ট্রান্সফার

হরিপুরা কংগ্রেসের পোস্টার প্রদর্শনীতে গান্ধীজির সঙ্গে নন্দলাল

করে তা দিয়ে ছাপার কায়দা বার করেন।

লিথোগ্রাফি বিশেষ করে ছবি ছাপার ব্যাপারে শিল্পীদের কাছে নতুন দিক খুলে দিল। প্রথমত লিথোগ্রাফি দিয়ে যত বিরাট বিরাট ছবি ছাপা সম্ভব হ'ল তা কাঠখোদাই বা ধাতুর ব্লক দিয়ে পারা যেত না। দ্বিতীয়ত এই কায়দায় মূল রঙিন ছবির প্রতিলিপি এমন হুবহুভাবে ছাপা সম্ভব হল যা ধাতু বা কাঠ খোদাইয়ের ব্লক দিয়ে সম্ভব হত না। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে রঙিন লিথোগ্রাফির চল বেড়ে যায়। এর দশ বিশ বছরের মধ্যে এই কায়দায় জীবজন্তু, ফুল-গাছ-পালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্য ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে যেসব বিশাল বিশাল বই ছাপা হয় সেগুলি মুদ্রণের ইতিহাসে রঙিন ছবিওয়ালা বইগুলির মধ্যে অনাতম বললে ভুল হবে না।

লিথোগ্রাফি ব্যবহার করে আধুনিক জগতে যিনি সর্বপ্রথম রঙিন আর্ট-পোস্টারের সৃষ্টি করেন যা অয়েল পেন্টিং-এর কপি নয় তিনি হলেন ফরাসী চিত্রশিল্পী জুল সেরে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে তাঁর নিজের লিথোগ্রাফিক প্রেস থেকে প্রথম রঙিন পোস্টার ছেপে বার করেন। এর পরের তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে তিনি থিয়েটার, মিউজিক হল, রেস্তোরাঁ এবং আরও অজস্র রকমের জিনিসের বিজ্ঞাপনের জন্যে যে প্রায় হাজারটা পোস্টার আঁকেন যার মধ্যে অনেকগুলিই সর্বযুগের সেরা পোস্টারের মধ্যে পড়ে। সেরে আধুনিক পোস্টারের মূল ছকটা বেঁধে দিয়ে যান। সেটা হ'ল রঙিন ছবির সঙ্গে খুব কম লেখা মিলিয়ে মিশিয়ে এমন একটা 'ভিজুয়াল' জিনিস খাড়া করা যা বেশ খানিকটা দূর থেকেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং পথচলা লোকেরাও এক ঝলকে দেখে বিজ্ঞাপিত ব্যাপারটা কী চট করে বুঝতে পারে। অর্থাৎ জ্বলজ্বলে রঙ, সরল ফর্ম, জোরদার লাইন এবং স্পষ্ট অক্ষর মিলিয়ে মিশিয়ে সেরে তৈরি করলেন যন্ত্রযুগের 'রাস্তার ম্যুরাল'।

সেরের পর পোস্টারের জগতে আবির্ভূত হলেন জগৎ বিখ্যাত শিল্পী তুলুস-লোত্রেক। তুলুস-লোত্রেক কাফে, মিউজিক হল ইত্যাদির বিজ্ঞাপনের জন্য ১৮ ও ১৯ শতাব্দীর জাপানী কাঠ-খোদাই ও আর্ট ন্যুভোর সমন্বয় করে যে সব অপরূপ পোস্টার আঁকেন সেগুলি এখন সেরে ও আরও দুচারজন সুবিখ্যাত পোস্টার-শিল্পীদের কাজের মতন শিল্পবস্তু হিসেবে সারা দুনিয়ায় আদৃত। এই সব সাময়িক পোস্টার শিল্পীদের নাম করার আগে বলা দরকার যে এঁদের পরে পিকাসো, মাতিস, বোনার্ডের মতন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীরা তাঁদের জীবনের কোন না কোন সময়ে পোস্টার বা পোস্টার জাতীয় জিনিস এঁকেছিলেন। এই সব পোস্টারগুলোর অবশ্যই প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞাপিত জিনিসের কাটতি, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আরও যশ ও সুনাম অর্জন করতে সাহায্য করা। আমি বিদেশের সাধারণ ব্যবসায়িক পোস্টারের কথা এই লেখায় না তুললেও এখানে একটা কথা বলতে চাই। সেটা হ'ল যে, এই সব মহান শিল্পীরা পোস্টারের যে নিদর্শন ও ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তার ফলে আধুনিক ফরাসী ব্যবসায়িক পোস্টারগুলিও যে কত সুন্দর হ'তে পারে তা প্যারিসের মেট্রো-স্টেশানগুলির দেওয়ালে আঁটা বহুখণ্ডে ছেপে জোড়া লাগানো বিশালাকৃতি রঙিন পোস্টারগুলো দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

১৯ শতকের শেষ দিকে যে সব শিল্পী আর্ট পোস্টার সৃষ্টি করে অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন বিলেতের অব্রে বিয়ার্ডসলে, বেগারস্টাফস (উইলিয়াম নিকলসন ও জেমস প্রাইড) ও ম্যাকিনটস, অ্যামেরিকার উইল ব্র্যাডলে ও উইলিয়াম ক্রাকভিল, সুইজারল্যাণ্ডের স্টেনলাইন, বোহেমিয়ার মুকা, বেলজিয়ামের ক্রিসপিন, অস্ট্রিয়ার মোশের, হল্যাণ্ডের টুরোপ, ইটালীর মাট্যালনি ইত্যাদি। বিদেশী আর্ট-পোস্টার সম্বন্ধে এঁদের ও আরও অনেকের কাজ দেখতে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা হেওয়ার্ড ও ব্লানস্ ক্রিকারের 'দি গোল্ডেন এজ অফ দি পোস্টার' (ডোভার পাবলিকেশানস ১৯৭১) বইটি উলটে পালটে দেখতে পারেন।

॥ ২ ॥

আমাদের দেশের পোস্টারের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা হয়নি। আজকের জগতে কলকাতা ও অন্যান্য বড় বড় শহরের রাস্তাঘাট যেসব পোস্টার আর হোর্ডিং (যার মধ্যে অনেকগুলিই ২৪-খণ্ডে ছাপা ছোট ছোট ছবি ও লেখার সমষ্টি) দিয়ে আস্টে-পিষ্টে মোড়া সেগুলি হল মূলত সিনেমা আর হাজার রকমের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসের বিজ্ঞাপন। বলা বাহুল্য ষাট বছর আগে এই ধরনের পোস্টার বা হোর্ডিং ছিল না বললেই চলে, কারণ তখন এখানে ফিল্ম হত না আর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ জিনিসই বিদেশ থেকে আসত। তাই কলকাতায় যে ধরনের পোস্টার প্রথম রাস্তাঘাটে দেখা যায় সেগুলি ছিল গিরিশ ঘোষের যুগের থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। গত শতাব্দীর শেষ যুগের ও এই শতাব্দীর প্রথম দিকের এই পোস্টারগুলির দুচারটে নিদর্শন ছাড়া অন্যগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলি থেকে দেখা যায় যে বটতলার কাটা বড় বড় বাংলা কাঠের টাইপ ব্যবহার করে নাটক, নাট্যমঞ্চ ও প্রধান অভিনেত্র-অভিনেত্রীদের নাম ইত্যাদি ছাপা থাকত, ছবি থাকত না বললেই চলে। তখনকার দিনে ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা ও এখনকার ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া এগুলির কোন শিল্প মূল্য ছিল না। কলকাতায় গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে কয়েকটা ভাল পোস্টার হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় তিরিশের দশকে শিল্পী ভোলা চ্যাটার্জীর বলিষ্ঠ লাইনে সাদা কালোর সঙ্গে একটু একটু লালের এখানে সেখানে ছোঁয়াচ লাগানো উদয়শঙ্করের মুখ আঁকা পোস্টার। এর পরে নাম করতে হয় পঞ্চাশের দশকে সত্যজিৎ রায়, মাখন দত্তগুপ্ত, ও সি গাঙ্গুলী, রঘুনাথ গোস্বামী, রণেন আয়ান দত্ত, খালেদ চৌধুরী ও পূর্ণেন্দু পত্রীর করা কয়েকটি নাচ-গান, ফিলম ইত্যাদির পোস্টার। কমার্শিয়াল বা ব্যবহারিক পোস্টারের মধ্যে এয়ার ইণ্ডিয়ার অনেকগুলি পোস্টার সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিমান কোম্পানীর পোস্টারগুলির মধ্যে কয়েক বছর শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই পটভূমিতে দেখলে নন্দলালের হরিপুরা পোস্টারগুলি পোস্টারের উদ্দেশ্য সফল করা ছাড়াও আর্ট-পোস্টারের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। এই পোস্টারগুলির সার্থকতার কারণ খুঁজতে গেলে নন্দলালের শিল্পক্ষমতার কথা অবশ্যই প্রথমে বলতে হয়। কিন্তু তা ছাড়াও জানা দরকার তাঁর শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁর শিল্পমানস।

নন্দলালের শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলতে গেলে তাঁর শিল্পজীবনের শুরু থেকে তাঁর ওপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা, কুমারস্বামী, ওকাকুরা, অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা আলোচনা করা দরকার। ১৩৮৯ সনের যুগান্তরের পূজা সংখ্যায় নন্দলালের শিল্প-ভাবনার এবং বিশেষ করে নিবেদিতার প্রভাবের কথা রঘুনাথ গোস্বামী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'দেশ'-এর এই নন্দলাল বসু শতবার্ষিকী সংখ্যায় অবশ্যই কেউ কেউ নন্দলালের শিল্পের এই দিকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে থাকবেন। তাই আমি এই লেখায় নন্দলালের শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গীর কথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব যা তাঁর হরিপুরা পোস্টারগুলির প্রসঙ্গে বলা দরকার বলে মনে করি।

নন্দলালের শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা পরে শিল্পী ও সমালোচক হিসেবে বিখ্যাত হন তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেটা হল শিল্প বিষয়ে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিখ্যাত শিল্পী ও সমালোচক কে জি সুব্রহ্মণ্যম লিখেছেন যে, নন্দলাল কলাভবনে কয়েকজন পেশাদার শিল্পী তৈরি করার চেষ্টা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন একটা নতুন শিল্প ধারার প্রবর্তন করতে যাতে চারুশিল্প ও বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পের সুষম সমন্বয় ঘটবে। নন্দলাল বিশ্বাস করতেন না চারুশিল্প উঁচুস্তরের জিনিস আর কারু বা হস্ত শিল্পর জাত নিচু। তাঁর চোখে একটা সুন্দর হাতে-গড়া জিনিস আর একটা সুন্দর ছবির কোন তফাৎ ছিল না। বরঞ্চ তিনি বিশ্বাস করতেন যে একজন শিল্পী যদি কারুশিল্প নিয়ে মাথা ঘামায় এমন কি তৈরি করতে চেষ্টা করেন তা হলে তাঁর শিল্প সৃজনের ক্ষমতা ও কল্পনা আরও শক্তিশালী ও গভীর হবে। এই জন্যেই তিনি শান্তিনিকেতনে 'কারুসঙ্ঘ' বলে একটি সংস্থা গড়েছিলেন যেখানে চারুশিল্পী ও কারুশিল্পীরা মিলে মিশে কাজ ও তাঁদের চিন্তা-ভাবনার লেনদেন করতে পারেন।

আজকাল এদেশে ও বিদেশে সুখের কথা যে, মিউজিয়াম কিউরেটার ও বিদগ্ধ শিল্প রসিকেরা কারু বা হস্তশিল্পের জিনিসপত্রের ব্যবহারিক দিক ছাড়া সেগুলির সৌন্দর্য সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। নন্দলাল অনেক দিন আগেই যামিনী রায় ও গুরুসদয় দত্তর মতন হস্ত শিল্পের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এখানে বলা দরকার যে বিবেকানন্দ 'স্বামি শিষ্য সংবাদে'-এ বলেছেন 'মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই আর্ট... ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলিও ঐ ভাব প্রকাশ করে তৈরি করা উচিত'। এই ঔচিত্যের কথা ছাড়া তিনি আরও বলেছিলেন যে, বিদেশের নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে 'ইউলিটি আছে কিন্তু বিউটি' নেই, আর

আলফনস মুকা (চেক) স্যালোঁ দে স্যাঁ-র ছবির প্রদর্শনীর পোস্টার (১৮৯৭)

আমাদের দেশের এই সব জিনিসের দুইই আছে।

যেমন উদাহরণ দিয়ে তিনি চুমকি ঘটির রূপের কথা বলেন। নন্দলাল ধামা, হাঁড়ি, জালা, ঘড়া, মাদুর, মালা, বই ইত্যাদি গৃহস্থালীর জিনিস ব্রত ও পুজোয় ব্যবহৃত জিনিসপত্র, আলপনা, ইত্যাদির 'রূপ' তারিফ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলির আকৃতি-প্রকৃতি, তৈরি করার কায়দা, সেগুলির তৈরির জন্যে কাঁচা মাল-মশলা ইত্যাদি তন্ন তন্ন করে দেখে, শিল্পীর চোখ ও মন দিয়ে বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই জন্যেই তিনি কলাভবনে কিছু গোঁড়া লোকদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারায় শিল্প ভাস্কর্য ছাড়াও আলপনা, উডকাট, লিনোকাট ইত্যাদি 'গ্রাফিক' শিল্পেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলা-বাহুল্য নন্দলাল তাঁর এই প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের পুরো সহানুভূতি পেয়েছিলেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল শিল্প তাঁর জীবনের ব্রত ও ধর্ম হলেও তিনি শিল্পকে কখনও জীবন থেকে বিচ্যুত করে দেখেন নি। বরঞ্চ তিনি শিল্পকে সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের কাজে এবং সাধারণ নরনারীকে শিল্প সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যে সবসময়ে তৈরি ছিলেন। তাই নন্দলাল রাজনীতিতে কখনও সক্রিয়ভাবে যোগদান না করলেও যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁকে প্রথম লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেস অধিবেশনে মণ্ডপ সজ্জার কাজের জন্যে ডাকেন তখন তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেছিলেন।

নন্দলাল প্রথম জীবনে নিবেদিতার সংস্পর্শে এসে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। রঘুনাথ গোস্বামী তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে মহিষবাথানে লবন আইন ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে নন্দলাল কয়েকটি প্রাচীর চিত্র (পোস্টার ?) এঁকে দিয়েছিলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের আগে অবধি বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপ গড়া ও সাজানোর কাজ ঠিকেদাররা করত। নন্দলাল যখন লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের এই কাজের ভার নেন তখন তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা খুব কাজে আসে। ছবি আঁকা ও পড়ানো ছাড়া নন্দলাল 'নেক বছর ধরে শান্তিনিকেতনে উৎসব-অনুষ্ঠানে আলপনার ব্যবস্থা করতেন, উৎসবের জায়গা সাজাতেন, রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গীতি-নাট্যের জন্যে মঞ্চসজ্জা ও পোশাক-আশাক পরিকল্পনা করতেন এবং স্থাপত্য নিয়ে কাজ করতেন, মাথা ঘামাতেন। শান্তিনিকেতনের আগে তিনি বাগবাজারের নিবেদিতা গার্লস স্কুলের প্রবেশ দ্বারের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন। এই আগেকার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের যে মণ্ডপ তৈরি ও মণ্ডপ-সজ্জা করেন তা পরবর্তীকালে অন্যান্য কংগ্রেস অধিবেশন ও অন্যান্য জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মণ্ডপ তৈরি ছাড়া নন্দলাল ভারতীয় শিল্পের আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগ অবধি একটি শিল্প-প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। যাদুঘর থেকে পুরনো শিল্পবস্তু ছাড়া নন্দলাল এই প্রদর্শনীতে অজন্তা ও বাগের গুহাচিত্রর কিছু কিছু আলোকচিত্রও দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রদর্শনীর আর একটা বড় আকর্ষণ ছিল এর বাইরের দেওয়ালে প্রদর্শিত যামিনী রায়ের আঁকা গ্রাম্য জীবনের নানান ছবি। আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মনে শিল্পকে টেনে নিয়ে যাওয়ার এ ধরনের প্রচেষ্টা আগে হয়নি।

১৯৩৭ সনে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন প্রথম গ্রামে করা হয়, ফৈজপুরে। নন্দলাল এখানেও মণ্ডপ পরিকল্পনা ও অলংকরণের ভার নেন। এই প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"দেশের মাটির সঙ্গে নন্দলালের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। গ্রামের পরিবেশ ও গ্রাম্য কারিগরদের অবদান সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই কারণে ফৈজপুর কংগ্রেসের সজ্জার পরিকল্পনা স্থানীয় উৎপন্ন জিনিসের সাহায্যে অনায়াসে পরিণত করেন।"

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসে মণ্ডপ সজ্জার জন্যে গান্ধীজির কাছ থেকে নন্দলালের আবার ডাক আসে। মণ্ডপ-সজ্জা ছাড়াও হরিপুরার জন্যে নন্দলাল মণ্ডপের বাইরের দেওয়ালের জন্যে পোস্টার আঁকার ভার নেন। এই পোস্টারগুলো শেষ অবধি হরিপুরার শ্রেষ্ঠ শিল্প-আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। (প্রচ্ছদে হরিপুরা কংগ্রেসের কয়েকটি পোস্টার দ্রষ্টব্য)

পোস্টার বলতেই প্রথমে যে কথা এসে পড়ে সেটা হল কেন, এবং কাদের জন্যে সেটা আঁকা হচ্ছে। কারণ কারা দর্শক তার ওপর নির্ভর করবে পোস্টারের বিষয়বস্তু কি হবে এবং কিভাবে সেগুলি আঁকা হবে। নন্দলালের হরিপুরা পোস্টারগুলি দেখলে বোঝা যায় যে তিনি সেগুলি লেখা না ব্যবহার করে এঁকে ছিলেন প্রথমত নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জন্যে আর দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের নেতা, কর্মী ও দর্শকদের জন্যে। নন্দলাল ভালোভাবে জানতেন যে এই পোস্টারগুলিকে গ্রামের সাধারণ মানুষদের কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে গেলে এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যা তাঁদের জীবন ও অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষিত শহুরে লোকদের কথা আলাদা। শিল্পী যদি আকর্ষণীয়ভাবে এবং সোজাভাবে গ্রাম্যজীবন চিত্রিত করেন তা হলে তা তাঁরা বুঝতে পারবেন এবং দেখে শিক্ষাও পাবেন, আনন্দও পাবেন। কার্যকরী 'কমিউনিকেশানের' এই মোদ্দা কথাটা আমাদের বিজ্ঞাপন ও

জ্যুল সেরে (ফরাসী)—ফোলি বার্জেরের পোস্টার (১৮৯৭)

সঁরি তুলুস-লোত্রেক (ফরাসী)—মুলা রুজ-এ লা গুলুয়ের নাচের পোস্টার (১৮৯৮)

জনসংযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওস্তাদরা 'থিয়োরীতে' জানলেও তাঁরা কাজের বেলায় তা করে উঠতে পারেন না। এর কারণ তাঁরা অধিকাংশ শহুরে লোকেদের মতন রেলগাড়ির জানলা দিয়েও গ্রামকে দেখেননি। গ্রাম্য জীবন সম্বন্ধে এই অজ্ঞতার জন্যে আজকেও তাঁরা নানা নতুন নতুন শক্তিশালী অডিও-ভিজুয়াল প্রচার-যন্ত্র দিয়েও গ্রামবাসীদের কাছে তাঁদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারেন না। যদিও তাঁরা সব সময়েই রুরাল কমিউনিকেশনের কথা জোর দিয়ে বলে থাকেন।

নন্দলাল গ্রামবাসী ও গ্রাম্য জীবনকে নিবিড়ভাবে জানতেন। তিনি তাঁদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের 'ভাষা' বুঝতেন, তাঁদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এখানে 'ভাষা' শব্দটাকে আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি, অর্থাৎ কথা ও ছবি সমস্ত নিয়ে। তাই তিনি তাঁর হরিপুরা পোস্টারগুলিতে গ্রামের জীবনের বিভিন্ন দিক ও পরিবেশ সফল ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন।

এখানে কেউ কেউ হয়ত আপত্তি তুলতে পারেন যে শিল্পীকে আবার গ্রামের লোককে গ্রামকে চেনাবার কি দরকার আছে। এর জবাবে বলতে হয় যে শহরই হ'ক বা গ্রামই হ'ক মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একটা পরিবেশের মধ্যে থাকার ফলে সেই পরিবেশের ছোট-বড় সাধারণ-অসাধারণ জিনিস সাধারণত দেখেও দেখেন না, সে সবের মর্মও ভালভাবে বুঝতে পারেন না, সেগুলিকে চিরাচরিত বলে ধরে নিয়ে সে সম্বন্ধেও কোন প্রশ্নও করেন না। জন্মাবধি কলকাতায় আছেন এমন অনেক লোকের অভিজ্ঞতা আছে যে বাইরে থেকে আসা সাধারণ দিশী-বিদেশী লোকজন এই শহরের জীবনের ছোট বড় নানান জিনিস লক্ষ্য করে মুগ্ধ, বিস্মিত বা শিউরে ওঠেন যা আমরা গতানুগতিক বলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকি। আবার যখন সত্যিকারের লেখক ও শিল্পীরা সেই সব জিনিসকে তাঁদের অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে ছবি ও ভাষার মারফৎ রূপ দেন তখন আমাদের চোখ খুলে যায়। গ্রামবাসীদের পক্ষে এই ব্যাপারটা সমানভাবে খাটে। নন্দলাল তাঁর হরিপুরা পোস্টার দিয়ে ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন। তাঁর গ্রাম্যজীবনের জ্ঞান তাঁর শিল্পী-মন ও চোখ দিয়ে গ্রামের নরনারী, দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, খেলাধুলা, উৎসব-অনুষ্ঠান এমন সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গভীরতা দিয়ে মূর্ত করেছিলেন যা দেখে গ্রামবাসীরা নিজেদের জীবন ও পরিবেশের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। যেমন মা ছেলেকে কোলে করে বসে আছেন এ গ্রামের লোকরা রোজই দেখেন। এই সাধারণ দৃশ্যটি নন্দলাল তাঁর হরিপুরার একটি পোস্টারে এমন অপরূপ ভাবে চিত্রিত করেছিলেন যা দেখে নিশ্চয়ই গ্রামবাসী ও শহুরেরা মাতৃমূর্তির সুষমা ও সৌন্দর্যকে নতুনভাবে উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

নন্দলাল হরিপুরা কংগ্রেসের জন্যে ৮৩টি পোস্টার আঁকেন। সেগুলির মধ্যে ছিল ১৬টি নানান ধরনের সংগীত শিল্পীর, ১৬টি গেরস্থালী বিষয়ক, ২২টি চাষী, তাঁতি, কুমোর প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকার লোকজন এবং সাধু সন্ন্যাসী জাতীয় চরিত্র, ৮টি পালোয়ান, খেলোয়াড়, ১৫টি পাখি, জন্তু-জানোয়ার আর অলংকরণ এবং ৬টি পরীজাতীয় অলৌকিক বিষয়ের।

পোস্টারগুলির সাইজ ছিল ২৪"×২৪"। ছবিগুলি অস্বচ্ছ জল-রঙে আঁকা তবে টেম্পেরার মতন নন্দলাল এতে রঙের সঙ্গে ডিমের গোলা ব্যবহার করেননি। রঙ মুখ্যত প্রাইমারী এবং তা ভারতীয় কায়দায় ফ্ল্যাটভাবে চাপানো। লাইন সাবলীল, কিছুটা আলঙ্কারিক ধরনের। লোকজনের মুখের মধ্যে খানিকটা জৈনপুঁথিতে চিত্রিত নরনারীর মুখের ধাঁচ, চোখ মুখের পাশ দিয়ে সামান্য বের করা। সমগ্র ভাবে দেখলে রঙ, রেখা, ফর্ম সব দিক দিয়েই মনোমুগ্ধকর। এগুলিতে অবশ্য সাধারণ পোস্টারের মতন কোন লেখা ছিল না। কিন্তু পোস্টারের যে যে বিশেষ গুণ থাকে অর্থাৎ রঙ ও ছবি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা ও সরল বোধগম্যতা পূর্ণভাবে ছিল।

নন্দলাল খুব ভালভাবে বুঝতেন যে গ্রামবাসী ও সাধারণ লোকজনদের জন্যে আঁকা ছবির মধ্যে সরলতাই সবচেয়ে দরকার এবং এতে সকল 'অলঙ্কারের' সারই সরলতা। তাই তিনি ছবিগুলি খুব সরল সহজভাবে আঁকেন। এ ছাড়াও নন্দলালকে এই ৮৩টা পোস্টার আঁকতে হয় মাত্র উনিশ দিনে। এই অল্প সময়ের অসুবিধা এক দিক দিয়ে শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। সময়াভাবের জন্যে নন্দলাল এই পটগুলিকে তড়িৎ গতিতে আঁকেন যেমনভাবে কালীঘাটের পটুয়ারা তাঁদের পট আঁকতেন। এই তড়িৎগতিতে নিজের খেয়াল খুশী মত আঁকার জন্যে হরিপুরা পোস্টারগুলিতে একটা স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাব এসেছিল যা হয়ত ধরে ধরে আঁকলে আসত না। এই প্রসঙ্গে বিদেশের একটা উদাহরণ মনে আসছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া জিলো পিকাশোর সঙ্গে এগার বছর ঘর করে তাঁকে ছেড়ে চলে যান। তারপর নভেম্বর ১৯৫৩ থেকে ন হপ্তার মধ্যে নিঃসঙ্গ পিকাশো ১৮০টা ছবি এঁকে তার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ও জিলোকে নানান ভাবে নানান পরিবেশে নানান রূপকে এঁকে তাঁর জিলোর সঙ্গে জীবনের সুখ দুঃখময় স্মৃতিকে অনুরূপভাবে প্রকাশ করেন। এই ছবিগুলিকে শিল্পী ও সমালোচকরা এক অবিশ্বাস্য শিল্প বিস্ফোরণ বলে অভিহিত করেছেন। হরিপুরা কংগ্রেসের এই পোস্টারগুলিও তেমনি নন্দলালের জীবনের একটা শিল্প-বিস্ফোরণ বললে ভুল হবে না।

হরিপুরা পোস্টারগুলি প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী বলেছেন: "পরম্পরা ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার অনবদ্য সংযোগ এই চিত্ররাজির সর্বত্র বিদ্যমান। শিল্পী কোন একটি বিশেষ প্রাচীন বা নবীন শিল্পাদর্শকে স্বীকার না করে সাময়িক মেজাজ অনুযায়ী চিত্রগুলি রচনা করেন। রূপে বর্ণে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন হয়েও হরিপুরার চিত্রগুলির অন্তরে যে প্রবাহের ভাব সেটি উজ্জ্বল বর্ণের পরিমাণ বা অবস্থানের জন্যই সম্ভব হয়েছে।"

হরিপুরা কংগ্রেসের পোস্টারগুলি অন্যান্য পোস্টারের মতন ছাপা হয়নি। এই ছবিগুলি এখন শান্তিনিকেতনে তাঁর ছেলে বিশ্বরূপ বসুর কাছে আছে। নন্দলালের শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির মধ্যে এই পোস্টারগুলি পড়ে বলে শিল্পী ও শিল্পরসিকরা মনে করেন। সেরে ও তুলোস-লোত্রেকের পোস্টারগুলি যেমন তৎকালীন প্যারিসের জীবনের একদিকের সফল প্রতিছবি, তেমনিই নন্দলালের পোস্টারগুলি ভারতীয় গ্রাম্যজীবনের জীবন্ত চিত্রায়ণ। আর্ট পোস্টার হিসেবে ভারতীয় পোস্টারকে ঐগুলি যে শিল্পস্তরে নিয়ে গেছে, অন্য কোন ভারতীয় পোস্টার আজ অবধি বোধহয় সেখানে পৌঁছতে পারেনি।

দক্ষিণী শিল্পীদের ওপর নন্দলালের প্রভাব

সুশীল মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগেকার ঘটনা। বছর বা তারিখ ঠিক মনে নেই। তবে িরিশ বছরের ওপর হবে, কিন্তু ভাবলে এখনও মনে হয় যেন এই দিনকার কথা। তখন আমার বয়স অল্প। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের প্রথম ভাগের স্নাতক। অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদের বিশেষ প্রিয় ছাত্রদের একজন। সময়ের কথা বলছি তখন শিল্পী হিসেবে দেশে কিছু নাম হয়েছে, মডার্ন ভিয়ু, প্রবাসী, ভারতবর্ষ তখনকার নামজাদা পত্রিকায় নিয়মিত ছবি এবং মার শিল্প সম্বন্ধে রচনা বেরুচ্ছে। গোয়ালিয়রে খ্যাতনামা সিন্ধিয়া বলিক স্কুলে শিল্প শিক্ষকের কাজ করি। আমার নবপরিণীতা স্ত্রী কুর্গের য়ে গৌরী একই স্কুলে হাউস মিসট্রেস এবং ইংরিজীর শিক্ষয়িত্রী। তিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও নিজের চেষ্টায় শিল্প ও বৈষয়িক সাফল্যের র্ব গর্বিত। নিজের শিল্প সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করি বলেই বহারটা স্নিগ্ধ রেখেছি। চেষ্টা করেই পাশ্চাত্য শিল্পের অনুসরণে ভারতীয় ব রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষপাতী। পুরাতন ভারতীয় শিল্পাদর্শের ্যপ্রেরণায়যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাজ বেশীর ভাগই মেরুদণ্ডহীন বলে ন করি।

মে মাস। গরমের ছুটি হয়েছে। বহুদিন পর আত্মীয়স্বজন মা, ভাই, ানদের সঙ্গে দেখা করতে প্রথমবার সস্ত্রীক রাঁচির পথে আমার প্রিয় ্র কলকাতায় কয়েকটি দিন কাটাচ্ছি। দক্ষিণ কলকাতার মনোহর ্কুর রোডে বন্ধুর বাড়ির ড্রইং রুমে বসে সকাল বেলায় বাঁশীতে বৃন্দাবনী সারং-এর ধুন বাজাচ্ছি 'সাজিরে দুলহন সাজ।' পাশে গৌরী বসে কাগজ পড়ছেন। খোলা বড় জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় সবকিছু ঝলমল করছে।...তখন দক্ষিণ কলকাতায় এতবেশী লোকজন, গাড়িঘোড়া, গোলমাল ছিল না। বন্ধুর বাড়ির সামনে রাস্তাটা সেদিন সকালে নির্জন, চুপচাপ। হঠাৎ রাস্তার একপ্রান্তে দেখি ছাতা মাথায় পাঞ্জাবী পাজামা পরা একজন ভদ্রলোক আমাদের বাড়িটার দিকেই আসছেন। আরও একটু এগিয়ে আসতে তাঁকে চেনা চেনা মনে হলো। ভদ্রলোক কলাভবনের মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু নয় তো? বাঁশী রেখে আবার ভালো করে দেখলুম। কখনও ওঁর সঙ্গে সামনা সামনি দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ওঁর শিল্পের সঙ্গে পরিচিতি অনেকদিনের। কাগজপত্রে ওঁর ফোটো দেখেছি বহুবার। ছাতা মাথায় পাজামা পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকটি অন্য কেউ হতেই পারেন না—আমার কেন যেন নিশ্চিত মনে হলো।

"এই গৌরী দেখেছ কে যাচ্ছেন রাস্তায়?"

"না—প্রথম কলকাতায় এসেছি, আমি কজন লোককেই বা চিনি? কে যাচ্ছেন?"

"নন্দলাল বসু—শিল্পী নন্দলাল। বেঙ্গল স্কুলের রত্ন, পাঁকে পদ্ম ফুল। আমি যাচ্ছি ওঁকে প্রণাম করতে আর পারিতো হাত ধরে এখানে নিয়ে আসবো।"

টির পথে

বীণাবাদিনী

"তুমিতো ওঁকে কখনও দেখোনি। কি করে জানলে নন্দলাল ? যদি অন্য কেউ হয় ? ডোনট্ বি সিলি। এরকমভাবে না জেনে না শুনে হঠাৎ গিয়ে কারুর সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে আলাপ করা ভদ্র আচরণ বিরুদ্ধ। তোমার মাথা খারাপ।"

"হ্যাঁ আমার মাথা খারাপ। রাখো তোমার আদবকায়দা। এরকম সুযোগ খুব কম আসে। উনি নন্দলাল—বাজি ধরছি।"

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম ওঁর সামনে। মাথা নীচু করে যাচ্ছিলেন হয়তো কোন ছবি ফাঁদার চিন্তায় বিভোর। একটু থতমত খেয়ে দাঁড়ালেন।

"স্যার আপনি কি নন্দলাল বসু ?" জিজ্ঞাসা করলুম।

"হ্যাঁ—কিন্তু আপনি ?"

"আমার নাম সুশীল—সুশীল মুখার্জি। আমি দেবী প্রসাদের ছাত্র।"

"এ্যাঁ—দেবীর ছাত্র ? বেশ—বেশ। আপনার নাম সুশীল মুখার্জি ? হ্যাঁ আপনার কিছু কাজ দেখেছি পত্রিকায়। ভালো মাস্টার মশায়ের কাছে কাজ শিখেছেন। দেবী যেমন ভালো শিল্পী তেমনি ভাল শিক্ষক।"

"আমাকে আর আপনি বলে ডাকবেন না স্যার। আপনি গুরুস্থানীয়। আপনার পায়ের ধুলো নিই।"

"না—না সেটা কি ঠিক হয় ?"

আমি ততক্ষণে পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলেছি।

"আচ্ছা এবার আমাদের এখানে একটু আসবেন ? এই সামনের বাড়িটা কয়েক মিনিটের জন্য যদি আসেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হবে। ভিন প্রদেশী মেয়ে, খুব খুশী হবে স্যার।"

"আমার তো একটু কাজ ছিল। তা যখন বলছেন, চলুন।"

ঘরে ঢুকে গৌরীকে বললাম "আমার ভুল হয়নি। তুমি ওঁর পায়ের ধুলো নাও, তারপর চা নিয়ে এসো।"

১৯২৮ সালে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হলেন। ভারতীয় শিল্পে বেঙ্গল স্কুলের প্রভাব তখন প্রবল। প্রাদেশিক সরকারী আর্ট স্কুলগুলোতে বেশীর ভাগই বেঙ্গল স্কুলের প্রথম সারির শিল্পীরা অধ্যক্ষ হয়েছেন। দেবীপ্রসাদ বেঙ্গল স্কুলের নেতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহী শিল্পী বলে পরিচিত। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে তখনকার চলতি ভারতীয় শিল্প শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করলেন। প্লাস্টার কাস্ট থেকে ড্রইং-এর প্রথা বাতিল করে পাশ্চাত্য মতে ন্যুড লাইফ ড্রইং প্রবর্তন করলেন এবং ছাত্র শিল্পীদের বিভিন্ন অঙ্কন পদ্ধতিতে নানারকম মিডিয়মে কাজ করতে উৎসাহ দিলেন। আমি যখন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে ছাত্র হয়ে গেলাম ১৯৩৮ সালে—তখন বেঙ্গল স্কুলের শিল্প প্রাধান্য অনেকখানি ম্লান হয়ে এসেছে। অবনীন্দ্রনাথ আর বিশেষ কিছু নতুন কাজ করেন না। তবে তাঁর দুই শিষ্য শান্তিনিকেতনে নন্দলাল আর মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ স্বকীয় শিল্পসৃষ্টিতে মেতে আছেন এবং দেশের তরুণ শিল্পীদের নিজেদের বিশিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে চারুকলায় অনুপ্রাণিত করছেন। মানুষ হিসেবে এঁরা দুজন ছিলেন বিভিন্ন প্রকৃতির। নন্দলাল—শান্ত, নম্র, বিনয়ী, সাধুসুলভ। দেবীপ্রসাদ অশান্ত, গর্বিত, সুরাসক্ত, কর্তৃত্ববাদী কিন্তু সরল এবং মেজাজী। দুজনার কাজে বাহ্যিক সাদৃশ্য না থাকলেও শিল্প সম্পর্কে মনোভাবের মিল ছিল। নন্দলাল ও দেবীপ্রসাদ নতুনত্বের পূজারী ছিলেন, তবে নন্দলালের নতুনত্বের রং শান্ত স্মিত, দেবীপ্রসাদের চমকপ্রদ। দেবীপ্রসাদ নন্দলালকে শিল্পী হিসেবে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। প্রায়ই আমি পানিকর, পরিতোষ সেন ও মাঝে মাঝে অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ছুটির ঘণ্টা বাজলে দেবীদার স্টুডিও কিংবা বাড়িতে গিয়ে বসতাম। আমাদের তিনজনকে উনি বিশেষ স্নেহ করতেন আর আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন। নানারকম আলোচনা হোতো। দেশ বিদেশের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে। খাওয়া দাওয়া হোতো, কখনও আবার গান বাজনা জমতো—আমি আর দেবীদা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বাঁশীতে বাজাতাম গাইতাম।

তারপর একসময় যখন তখনকার সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীদের কথা উঠতো প্রায়ই বলতেন "দেশে অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে শুধু গগনেন্দ্রনাথ আর নন্দলালই উঁচু পর্যায়ের কাজ করেন। আমি তাঁদের প্রতিভার সম্মান করি আর আমি চাই যে আমার ছাত্রছাত্রীরাও ওঁদের কাজ দেখেন আর বোঝবার চেষ্টা করেন। বাদবাকী অন্য শিল্পীরা বেশীর ভাগই স্থবির, দুর্বল।"

একবার বিশ্বভারতী কোয়াটারলিতে নন্দলালের নতুন ধরনের ছবি বেরিয়েছে। আমাদের ডেকে পাঠালেন। ছবি দেখিয়ে বললেন "দেখেছ ছবিখানা ? সবাই বলে নন্দলাল দিশী ধরনের কাজ করেন। বোঝেনা। হ্যাঁ ওঁর প্রাণ দিশী কিন্তু ছবির টেকনিক-দিশীও নয় বিদেশীও নয়—চমৎকার নিজস্ব ভঙ্গী। টাচ দিয়ে অনচ্ছ রঙ-এ এঁকেছেন দল বেঁধে গ্রামের মেয়েরা কাজের পর বাড়ি ফিরছে। ছবিতে বন্ধনহীন গতি সূক্ষ্ম সহজ অনুভূতি দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। নন্দবাবু বাস্তবিকই রসিক—তবে ওঁকে যদি মদ খাইয়ে দেওয়া যেতো তাহোলে হয়তো রস আরও উপচে পড়তো।"

আমি বললুম "দাদা, নন্দলাল যে নেশায় মেতে ছবি আঁকেন, তার সঙ্গে মদ মেশালে হয়তো ওঁর শিল্পের অভিব্যক্তি ঘোল হয়ে যাবে।"

পরিতোষ আর পানিকর হেসে উঠলো।

চশমা নাকের ডগায় নাবিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন আর বললেন "হাসির কথা নয়। সুশীল ঠিক কথা বলেছ হে। আমি অ্যাগনসটিক নারী সঙ্গ ভালোবাসি, মদ খাই—সে রসের ছাপ আমার কাজে। নন্দবাবুর রস অন্য ধরনের সে রসে মদের স্থান নেই। হয়তো আমার রসের চেয়েও সে রস উঁচু পর্যায়ের।"

হিংসাদ্বেষহীন গুণ ও গুণীর কদর (শিল্পীদের ভেতর যে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বিশেষ অভাব) দেবীপ্রসাদের মহত্ত্বের এক বিশেষ অংশ ছিল এবং ওঁর নিজস্ব মতের সঙ্গে অমিল হোলেও বুদ্ধিমান, যুক্তিপূর্ণ তর্ক উক্তি পছন্দ করতেন।

...র্জুনের নিদ্রাভঙ্গ

নানা দেশ, নানা প্রদেশ থেকে দেবীপ্রসাদের শিল্প ও জাদুকরী ব্যক্তিত্বে ...াকর্ষিত হয়েই আমরা সবাই জড়ো হয়েছিলাম মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে সেটা ...ক, কিন্তু নন্দলালের শিল্পবৈচিত্র্যও সে সময় মাদ্রাজের অনেক শিল্পীকেই ...াকৃষ্ট ও অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, খদ্দরের পাঞ্জাবী পাজামা পরা রসিক শিল্পী পি ...ল নরসিংহমূর্ত্তি ছবি এঁকেছেন—আমের কুঞ্জের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ...টীরে বসে বিরহিণী তরুণী প্রেমপত্র লিখছেন। সুন্দর ছবিটিতে ...ন্দলালের প্রভাব রঙে, রচনায় আর বিশেষ করে রেখায়। উনি নিজে ...থকেই বললেন আমাদের প্রশংসা ও বিশ্লেষণের উত্তরে "নন্দলালের কাজ ...থকে পেয়েছি প্রেরণা। তবে ওঁর রেখা আর আমার রেখায় অনেক ...ফাৎ। আমার রেখা এখনও অনমনীয়—রেললাইনের মত, আর ওঁর ...বীণাবাদিনীর" লাইন দেখুন—কত সুন্দর সাবলীল। উনি সত্যিই ...ল্পাচার্য। দেবীপ্রসাদ আমাদের গুরু। সব কিছুই গুরুর কাছে শেখা। ...ালো শিল্পীর কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হওয়াও ওঁর কাছেই শেখা।"

আমার নিজের টেম্পারাতে আঁকা বহুদিন আগের ছবি ভারতবর্ষে ...কাশিত 'মগ্না', প্রবাসীতে প্রকাশিত 'রাধার বিরহ' বিশ্লেষণ করে দেখলে ...নতে হবে যে ফিগারগুলির ভঙ্গীতে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াসৃষ্টির চেষ্টায় নন্দলালের প্রভাব আমার চারুকলার অনুভূতিতে এক সময় ...ষ্টভাবে বর্তমান ছিল। বন্ধুবর পরিতোষ সেনের পুরোনো অনেক ...বিতে শিল্পাচার্যের প্রভাব আরও প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান। কে সি এস ...ানিকর তখন ইংরেজ জলচিত্রকর কটম্যানের ধরনে মালাবারের দৃশ্য ...াঁকেন চমৎকার জলরঙের টেকনিকে। তেলরঙের কাজে দেবীপ্রসাদ ও ...্যানক ব্র্যাঙ্গুইনের প্রভাব। অনেকগুলি প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে পুরস্কার ...পয়েছে। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কাছে ছবি বেশ বিক্রী হয়। কিন্তু ...খনই আমাদের মধ্যে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হয়, বুঝতে পারা যায় ...ানিকর নিজের করণকৌশল সম্বন্ধে হয়তো আত্মবিশ্বাসী কিন্তু প্রকাশভঙ্গী ...ম্বন্ধে নয়। নন্দলালকে 'টোটাল আরটিস্ট' বলে মনে করত। আমায় ...নেকবার বলেছে "আমরা করণকৌশল নিয়ে বিশেষ লাফালাফি করি। ...ত্যি বলতে গেলে আমার ছবিগুলো বেশীরভাগই পর্যবেক্ষণধর্মী। ...বিতে আড়ম্বর আছে কিন্তু স্বকীয়তার অভাব। নন্দলালের শিল্পে ...ত্রিমতা নেই নিজস্ব ধরণে আঁকেন। নিজের সীমানা সম্বন্ধে সচেতন। ...-জটিল রঙ, রচনা ও ভাব ওঁর শিল্প প্রকাশকে শক্তিশালী আর ...শিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে। ওঁর মত শিল্পীর কাজ দেখেও অনেক কিছু শেখা ...ায়।"

পরবর্তীকালে পানিকরের পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক প্রথা ছেড়ে স্বকীয় ...রণে ছবি আঁকার পেছনে ছিল নন্দলালের অনুপ্রেরণা।

আমি আর পানিকর মাদ্রাজে একসঙ্গে এক বাড়িতে অনেক বছর কাটিয়েছিলুম। নিজেদের ভেতর শিল্প সম্বন্ধে কথাবার্তায় একথা আমায় কয়েকবারই বলেছিল। আমাদের সময় মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে অন্যান্য যে শিল্পীরা নন্দলালের চারুকলায় আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীনিভাসালু, মোক্কাপাটি কৃষ্ণমূর্তি ও ধনপালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্ট স্কুলের বাইরেও তখন দক্ষিণে শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের মধ্যে নন্দলালের নামে জাদু ছিল। কৃষ্ণা রেড্ডী, জয়া আপ্পাস্বামী, মণি সুব্রহ্মণ্যম এবং আরও অনেকে শান্তিনিকেতনে যান নন্দলালের নামের আকর্ষণেই।

১৯৩৯ সালের কথা। আমি, পানিকর আর পরিতোষ সেন থাকি মামবালামে একটা ছোটো বাড়ির দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে। চারিদিকে ধূধূ মাঠ—সারি সারি তালগাছ, দূরে হলদে সবুজ ধানের ক্ষেতের চৌকোয় মেয়েরা লাল, নীল, সাদা শাড়ি পরে উবুড় হয়ে কাজ করে যেন নন্দলালের পটে আঁকা শান্ত, ভারতীয় দৈনন্দিন নৈসর্গিক দৃশ্য। শহর বা বসতি থেকে বহুদূর। একদিন শুনলাম এ্যাডেয়ারে রুক্মিণী আরুণডেলের কলাক্ষেত্রে নন্দলালের ছবির একটি বড় প্রদর্শনী হচ্ছে। সেদিন শেষ রবিবার প্রদর্শনী খোলা থাকবে।

বাইরে জুলাই মাসের শেষদিকের রুদ্রতাপ চোখ ঝলসানো রোদ।

পানিকর প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে খুবই উত্তেজিত, বলল "চল যাই দেখে আসি। একসঙ্গে নন্দলালের এতোগুলো অরিজিনাল দেখার ভাগ্য আবার কবে হবে কে জানে।"

. মাসের শেষ, কারুর পকেটে পয়সাকড়ি নেই। খুঁজেপেতে বেরুলো চারটে পয়সা। চার পয়সা দিয়ে তো তিনজনের ট্রেনের টিকিট কেনা যাবে না।

পানিকর নাছোড়বান্দা "কি আছে হেঁটেই যাবো।" ছ'মাইলের ওপর এ্যাডায়ার, মাথায় ছাতা নেই, তিন বন্ধু তিন তরুণ শিল্পী নন্দলালের ছবির জাদুর আকর্ষণে চলে গেলাম কলাক্ষেত্রে হেঁটেই। সেদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটার পর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি দেখে কত আনন্দ হোলো আর কত পরিতৃপ্তি পেলাম তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আবার ছ'মাইল হেঁটে মাঝ রাস্তায় চার পয়সার ডাবের জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে যখন মামবালামে বাড়ি ফিরলুম তখন পশ্চিমে সূর্যাস্তের আকাশ রঙে মাতোয়ারা হয়েছে। দিনের শেষে কাজ সেরে মেয়েরা মাথায় বোঝা চাপিয়ে সারি সারি তালগাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা ধরে গ্রামে ফিরছে। বাড়ির সামনে রোয়াকের ওপর বসে আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে দেখলুম। সেদিন বলার কিছু ছিল না আর প্রয়োজনও বোধ করিনি। গুণী শিল্পীর সৌন্দর্য সৃষ্টি আর প্রকৃতির শক্তিশালী প্রাথমিক আবেদন মিলে মিশে আমাদের মিলিত অনুভূতিকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিল।

নন্দলালের সময়

সন্দীপ সরকার

হঠাৎ গাড়ি যদি বাঁক নেয় তাহলে আরোহীরা অতর্কিত ঝাঁকুনিতে বেসামাল হয়ে পড়বেন। ঔপনিবেশিক আমলে, শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়া আফ্রিকার অবস্থা ঐরকম হয়েছিল। ক্রমশ বিদেশী বণিকরা এইসব দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলল। দেশের আভ্যন্তরীণ নগরগুলির গুরুত্ব আস্তে আস্তে হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন্দর-নগরগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। পণ্য সম্ভার রপ্তানীর ওপর নির্ভরশীল কৃষিপ্রধান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ফলে ভেঙ্গে পড়তে থাকল। যন্ত্রবিপ্লবের পর এসব দেশ পরিণত হল ইউরোপের বাজারে। বিদেশী বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত নতুন শ্রেণীর জমিদার এবং শহুরে মধ্যবিত্তের উদ্ভব হল। সামন্ত অভিজাতদের রাহুগ্রস্ত দশার মাপে এঁদের ক্ষমতা প্রথমদিকে খুবই বেড়ে গেল।

এঁদেরকে বলা যায় "ইনটেলেজেনসিয়া"। ইংরাজিতে দুটি শব্দ আছে। তার একটি হল "ইনটালেকচুয়াল"—বাংলা করা হয়েছে "বুদ্ধিজীবী"। "ইনটেলেজেনসিয়া"র বাংলা নেই। শব্দটি আসলে রুশী। ১৯শ শতকে যাঁরা পিছিয়ে পড়া রুশদেশের পশ্চিম ইউরোপের আদলে প্রতীচ্যকরণ এবং আধুনিকীকরণ চেয়েছিলেন, তাঁদের "ইনটেলেজেনসিয়া" বলা হতো। এখন সমাজবিজ্ঞানীরা শব্দটাকে সেইসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যেখানে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানসে পশ্চিমী এবং অপশ্চিমী সাংস্কৃতির মূল্যবোধের সংঘাত তাঁদের বোঝাতে হয়। ইনটেলেজেনসিয়ার ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে (স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি গ্রন্থে) টয়েনবী বলেছেন: "এক শ্রেণীর মধ্যস্থ যাঁরা অনুপ্রবেশকারী সভ্যতার কারবারের কায়দাকানুন রপ্ত করেছে" ("এ ক্লাস অব লিয়াঁস অফিসারস হু হ্যাড লারণ্ট-দ্য ট্রিকস্ অন ইনট্রিউড সিভিলাইসেনস ট্রেড")। ঔপনিবেশিক পর্বে শিল্পসংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি বুঝতে গেলে "ইনটেলেজেনসিয়ার" মানসবিবর্তন বুঝে নিতে হবে। এই পটভূমিতে না দেখলে নন্দলালের ব্যক্তিত্ব এবং সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে না।

পশ্চিমী ধাক্কায় ভারতীয় মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল । প্রথমে বাভূত শ্রেণী, বিদেশী বণিকদের আগমন বৈষয়িক স্বার্থেই বিধাতার শীর্বাদ বলে মেনে নিলেও, নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা চাপা সন্দেহ ঘৃণা ছিল । বিশেষত ধর্মীয় বোধের দিক দিয়ে ম্লেচ্ছ সংসর্গ বাইরে এবং দয়েও জটিলতা সৃষ্টি করত । মনের ভেতর পুরাতন সংস্কার এবং নতুন ল্যবোধের টানাপোড়েন শুরু হয়ে যেত । বিদেশী সংস্পর্শে আসার ফলে, াদের জীবনযাপন, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক সুবিচার সম্বন্ধে ধারণা, াইন-কানুন এবং ন্যায়বোধ সম্বন্ধে মতাদর্শ নানাভাবে নতুন শ্রেণীর মধ্যে ংক্রামিত হতে লাগল । অন্যদিকে ইংরাজের শোষণের চেহারাটা ক্রমে ততদিনে নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে । এদিকে যন্ত্রবিপ্লবের পর বাণিজ্যিক নানা বিধিনিষেধ এদেশের মানুষকে মেনে নিতে হচ্ছে । দৈনন্দিন জীবনেও অত্যাচার অবিচার মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে । বৈষয়িক ভাগ বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রেও ইংরাজ যেন আর আগের মতো দরাজ নয় । গোলামি এবং অনুকরণের ফলে নতুন শ্রেণীকে হীনমন্যতায় পেয়ে বসলো । পরিস্থিতির জটিলতা এবং নিজেদের আচরণ সম্বন্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্বই এঁদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নেতৃত্বের দিকে ঠেলে দিতে লাগল । "বিধাতার আশীর্বাদ" বলে যাদের প্রথমে মনে হয়েছিল পরে তাদের "বিধাতার অভিশাপ" বলে মনে হল ।

॥ ২ ॥

নন্দলাল বসুর চরিত ও মানস বোঝার জন্য একে একে ১৯শ শতকের তৈরী দুটি পুরাণকল্প (মিথ্) এবং ইংরাজ আসার ফলে ভারতীয় শিল্পকলার দুর্দশার আলোচনা করে নেওয়া হয়তো এইবার প্রয়োজন পড়বে ।

প্রথমে দুটি পুরাণকল্পের কথাই ধরা যাক । পশ্চিমের সর্বনাশা ধাক্কা সামলাবার জন্য এই দুটির প্রয়োজন পড়েছিল । অন্য অনেক কিছুর মতোই । এর একটির নাম দেওয়া যেতে পারে "প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ" এবং দ্বিতীয়টির "ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব" । ঔপনিবেশিক পর্বের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ প্রায় গোটা ১৯শ শতক থেকে স্বাধীনতালাভ করা পর্যন্ত, কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের সম্মিলিত উদ্যোগে এগুলি প্রচলিত হয় । ভারতীয় মনীষীদের রচনায়, নেতাদের বক্তৃতায় এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে পুরাণকল্প দুটি সহজভাবে মিশে গিয়েছিল ।

ক্ষুণ্ণ স্বাজাত্যাভিমানে এই পুরাণকল্পদ্বয়ের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল । পুরাণকল্প আখ্যাত করে অবশ্য রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এইগুলির সত্যাসত্য নির্দেশ করতে চাইছি না । আঙ্গিকগত দিক দিয়ে এগুলি পুরাণের পর্যায়ে পড়ে কি-না তাও যাচাই করার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই । এই সময়কার মানুষ পিতৃপুরুষের গৌরবময় কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যয় এইভাবে সাজিয়ে নিয়ে সমবেতভাবে অধ্যাত্ম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন । পুরাতনী স্বর্ণযুগ, শুধু তৎকালীন অধঃপতিত অবস্থার তুলনায় নয়, কিন্তু ইউরোপের অতীতের তুলনায়ও । এই মুদ্রার উলটো পিঠ হল—ভারতবাসী আধ্যাত্মিক এবং ইউরোপ বস্তুবাদী, অর্থাৎ নৈতিক বিচারে ওরা ঘোর তামসিক । এমন বিশ্বাসের একটা ঐতিহাসিক কারণ ছিল । যন্ত্রবিপ্লবের পর ওদের দ্রুত উন্নতি এদেশের শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল । পিছিয়ে পড়া অবস্থাটা যেন শাসাচ্ছিল !

পরাজিতের হীনমন্যতার অন্ধকার গুহায় এই প্রত্যয় আশার মশাল জ্বেলেছিল । বিশেষত বিদেশী শাসক এবং ধর্মপ্রচারকরা যুগ্মভাবে অনবরত ভারতীয় সভ্যতার তীব্র সমালোচনার বিষ তীর হানছিলেন । পাশাপাশি সাহেব ভারততত্ত্ববিদ ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতির গবেষণা করে সনাতন ভারতের চিত্র আঁকছিলেন নিপুণভাবে । এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের পর প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণা এবং প্রচারের ফলে আত্মগ্লানির ওপর প্রলেপের মতো কাজ হল । সর্দার পানিক্করের ভাষায় "১৮শ শতাব্দীর শেষে জাতীয় আত্মসম্মান যখন ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে তখন ভারতীয় সাহিত্য ইউরোপের মনীষীর পঞ্চমুখ প্রশংসা পেল । শুশ্রূষার সেই প্রথম করস্পর্শে যেন বেদনা অনেকখানি প্রশমিত হল ।" (এ সারভে অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী, বোম্বাই ১৯৫৪) । তরুণ গ্যায়টের শকুন্তলা প্রশস্তিতে এবং আমাদের মহোল্লাস এই আলোকেই দেখতে হবে ।

॥ ৩ ॥

মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিম দশার বিশৃঙ্খলার ছাপ স্বভাবত শিল্পকলার ওপরও পড়ল । ১৮শ শতক থেকে মুঘল, রাজপুত পাহাড়ী কলমের অবনতি ঘটতে লাগল । ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগ্রাসী নীতির ফলে রাজা এবং নবাবী দরবারের শিল্পীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন । দরবারের বদান্যতায় শিল্পীরা অনেক জায়গায় নিষ্কর ভূমি ভোগদখল করতেন । ইংরাজ আমলে সেসব সুখ সুবিধা থেকে তাঁরা ক্রমাগত বঞ্চিত হতে থাকলেন । দরবারী চিত্রশালা বন্ধ হতে থাকায় তাঁরা ক্রমে বৃত্তিচ্যুত হতে থাকলেন । বিপদের ওপর বিপদ । ভাগ্যান্বেষী বিদেশী শিল্পীরা দলে দলে ভারতে আসতে শুরু করলেন । এঁদের প্রথাগত বাস্তবরীতির কাজ অবক্ষয়িষ্ণু সামন্ত এবং অভিজাত শ্রেণীর মনোহরণ করতে লাগল । সেইজন্যে স্থানীয় চিত্রকরদের মনে নিজেদের অসামান্য দক্ষতার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে লাগল । তাঁদের আত্মবিশ্বাস টলে গেল । তাঁরা মিশ্ররীতিতে শারীরবিদ্যাসম্মত কাজ করতে লাগলেন । তার ফল খুব ভাল হল না ।

ছিন্নমূল দরবারী চিত্রকরদের দুরবস্থার এক করুণ বর্ণনা আছে এমিলি ইডেনের লেখায় । সন ১৮৩৬ । "বালিগঞ্জে বেড়াতে গেছি আমরা । হঠাৎ রাস্তায় একটা পর্ণ কুটির চোখে পড়ল নারকেল গাছের ভেতর । দরজায় ঝোলানো সাইনবোর্ডে লেখা—'পির বক্স্, অণুচিত্র আঁকিয়ে' । আমি আর জর্জ (ওঁর ভাই লর্ড অকল্যাণ্ড) একটু অবাক হলাম । আলো হাওয়া তো ঢোকে না এই পর্ণকুটিরে । এর মধ্যে কি যেন কেমন অণুচিত্র আঁকেন পির বক্স্ । দেহরক্ষীদের ছাউনির পাশে ছিল ওঁর কুঁড়ে । আমরা চলে আসার পর দেহরক্ষীদের জনৈক অধিনায়ক ঢুকলেন সেখানে । ওঁর সুন্দর একটা প্রতিকৃতি আঁকলেন পির বক্স্ । একটু আড়ষ্ট হয়তো । কিন্তু শেষ কাজটুকু বেশ ।"

কলকাতায় দুঃস্থ দরবারী শিল্পী ছিলেন আরও কেউ কেউ । তাঁরা জলের দরে ফিরকা চিত্র ফেরি করতেন । এগুলি পিকচার পোস্টকার্ডের মতো । অভ্রের ওপর আঁকা এদেশের নানা বৃত্তির মানুষ, দৃশ্য এবং উৎসবের ছবি । কড়েয়ায় থাকতেন এমনই এক চিত্রকর সৈয়দ মহম্মদ আমীর । ফেনি পার্কস তাঁর "ওয়ানডারইং অফ এ পিলগ্রিম ইন সারচ অব দা পিকচারেস্ক"-এ এঁর ছবি ব্যবহার করেছেন ।

পরিব্রাজক সাহেব শিল্পীরা ক্যামেরা আবিষ্কারের আগে ছবিকে চাক্ষুষী নথির কাজে লাগিয়েছিলেন এ সব ছবির নান্দনিক কোনো মূল্য নেই, ঐতিহাসিক মূল্য যদিওবা থেকে থাকে । শিল্পকলার ইতিহাসে এঁদের কারো নাম ওঠেনি । সাহেব শিল্পীদের প্রভাবে এখানকার পৃষ্ঠপোষকদের রুচি পালটে গেল । নিদারুণ ক্ষতি হল এদেশের শিল্পীদের । শিল্পকলারও ।

শিল্পকলার যখন এমন দুর্দিন তখন বোম্বাই এবং কলকাতায় আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল । সময়টা হল ১৯শ শতক ।

॥ ৪ ॥

১৯০৫ সালের ১৫ই অগাস্ট অবনীন্দ্রনাথ সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে যোগদান করলেন । ভারতশিল্পের দৈন্যদশা তখনও ঘোচেনি । বয়স তখন তাঁর বছর চৌত্রিশ । বঙ্গভঙ্গের সময় । ঔপনিবেশিক মোহ নির্মোক ছেড়ে তখন সব কিছুকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করা শুরু হয়েছে । প্রতীচ্যকরণ এবং আধুনিকীকরণ আলাদা করে আর দেখা হচ্ছে না স্বভাবতই । এসব বির্তকের ছায়া পড়ল শিল্পকলার অঙ্গিনায় ।

শিল্পকলা ভারতীয় নবজাগরণের শেষ শিবপুষ্প । এর জনকের মর্যাদা অবনীন্দ্রনাথের প্রাপ্য এ-বিষয় কারোই অমত নেই । হ্যাভেলের সঙ্গে আলাপের আগেই শিল্পী হিসাবে তিনি কিঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করেছেন । হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডেকে আনেন । অবনীন্দ্রনাথ যোগদানের আগেই হ্যাভেল "স্টুডিও" পত্রিকায় তাঁর বিষয় প্রবন্ধ লেখেন । দুজনই পরস্পরের গুণমুগ্ধ ছিলেন । "জোড়াসাঁকোর ধারে" গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলকে "গুরু" বলেছেন । পক্ষান্তরে হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে "সহযোগী" বলেছেন । দুজনের সাহচর্যে দুজনেই সম্ভবত উপকৃত হয়েছিলেন । অবনীন্দ্রনাথকে হ্যাভেল ভারতশিল্পের ইতিহাস এবং তাত্ত্বিক দিক কিছু শিখিয়ে থাকবেন ।

অন্যদিকে হ্যাভেলের পুথিপড়া বিদ্যা অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে বাস্তবের মাটি পেয়েছিল।

এর কিছু পরে নন্দলাল এসে বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

সরকারী চারুকলা বিদ্যালয় (যা পরে মহাবিদ্যালয় হয়) গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত হয়। প্রথমে কারিগরী নকশা আঁকা শেখানোর জন্য গড়ে উঠেছিল। ক্রমে এদেশে শিল্পকলা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এর পরিচিতিলাভের ইতিহাস দীর্ঘ। সরকারী অধিগ্রহণের পর অধ্যক্ষ এইচ. এইচ. লকের যত্ন এবং চেষ্টায় ইস্কুলটির সুনাম হয়। লক বিশ্বাস করতেন ভারতীয় জীবন এবং শিল্পকলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে ছাত্রদের শেখাতে হবে। দেশজ পরম্পরায় সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটুক এটা তিনি চেয়েছিলেন।

হ্যাভেল কিন্তু লকের তুলনায় ছিলেন গোঁড়া। তিনি মনে করতেন "ভারতীয় শিল্পকলার মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির শক্তি" এবং সমকালীন ভারতীয় কাজ থেকে "প্রতীচ্যের বাজারে বস্তুবাদ"..."প্রতীচ্যের বিষ" শুষে নিতে হবে (দ্রঃ বেসিস ফর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভাইবেল ইন ইণ্ডিয়া,

মাদ্রাজ ১৯১২)। স্বাদেশিকতার জোয়ারের সময় পূর্বে আলোচিত পুরাণকল্পের সঙ্গে হ্যাভেলের মত খাপে খাপে মিলে গেল। ইংরাজের সঙ্গে মোহভঙ্গের সেই যুগে এমন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রতিপক্ষের কিন্তু তা মনে হয়নি। হ্যাভেল যখন ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর জোর দিয়ে শিক্ষাক্রমে অদল বদল করলেন, তখন ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে গেল। নিয়মানুবর্তিতা এবং অশিষ্ট আচরণের জন্য কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবছেন। তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে একদল ছাত্র বহুবাজারে একটা ইস্কুল করলেন। ১৮৯৭ ভিকটোরিয়ার হীরক জয়ন্তীর বছর বলে ইস্কুলটার নাম হল "জুবিলি আর্ট আকাদমি। ইস্কুলটা কলকাতার কিছু বিদগ্ধ এবং অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন পেল। এমন কি কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের অনুদান পেতেও অসুবিধা হল না। কুড়ি বছর বেশ ভালভাবেই চলেছিল। তারপর উঠে যায়।

হ্যাভেলের শিক্ষাক্রম সরকারী অনুমোদন পেলেও, শুধু ছাত্রদের তরফ থেকে নয়, সমাজের নানা কোণ থেকেই এ বিষয় তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথকে উপাধ্যক্ষ করে আনার পেছনে হ্যাভেলের কিছু স্বার্থ ছিল এমন অনুমান করা হয়তো যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির ছেলে। ভারতীয় পদ্ধতিতে কিছু কাজ করে ইতিমধ্যে সামান্য খ্যাতি পেয়েছেন। দরখাস্তে তিনি "দ্বারকানাথের বংশধর" বলে নিজের উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাদপ্তর এবং সাধারণ-উভয়ই অবনীন্দ্রনাথের যোগদানে আশ্বস্থ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

অন্য দৃষ্টিতে অবশ্য মনে হয়, হ্যাভেলের একদেশদর্শিতার ফল সবটাই শুভ হয়নি। কাব্যে যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বা চতুর্দশপদাবলী বা বীরত্বব্যঞ্জক পত্রকাব্য বা গদ্যে যেমন উপন্যাসের আঙ্গিক গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি ওঠেনি, বা উঠলেও টেঁকেনি, বিদেশী প্রভাবিত ভাবধারা বলে কেউ কদা ছোঁড়েনি, শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার বিপরীত হয়েছে। হবার কারণ এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে একটা ভেদ ছিল। উপরন্তু ভারতীয় আধুনিক শিল্পকলা কি রূপ নেবে তার ফতোয়া যাঁরা জারি করছিলেন তাঁদের অধিকাংশ সাহেব বা মেম। সৌভাগ্যক্রমে, বাল্মীকি, ব্যাস বা কালিদাসের মতো করে ভারতীয় ঐতিহ্যে কাব্য এবং সাহিত্য রচনা করতে হবে, কোনো ক্যানিংহাম, গ্রিফিথস, ফারগুসান, হ্যাভেল বা নিবেদিতার এমন আদেশ হয়নি। হলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ কি সে-নির্দেশ মানতেন? এর পরও কিন্তু সবিনয়ে স্বীকার করব এইসব শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যতত্ত্ববিদের জন্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিস্মৃত এবং অজ্ঞাত দিকটা পুনরাবিষ্কৃত হয়। প্রতীচ্য সারস্বত সমাজের দৃষ্টিও তাঁরা এদিকে ফেরাতে পেরেছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলা গ্রীস এবং রোমের সমতুল বলে আমাদের চিরঋণী করেছেন, একথা বলার পরও বলব, তাঁরা পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতি শেখার বিপক্ষে রায় দিয়ে ভুল করেছিলেন। হ্যাভেল যেমন। পাশ্চাত্ত্যের শিল্পরীতি বলতে যদি বোঝায় —বিলাতের রাজকীয় মহাবিদ্যালয় রয়েল আকাদমি মার্কা প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি তাহলে কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু হ্যাভেল যখন অধ্যক্ষ হন, ইউরোপে তখন রেনেসাঁস পরবর্তী প্রথাসর্বস্ব রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। প্রতিচ্ছায়াবাদ (ইমপ্রেসেনিজাম)-এর পরবর্তী আন্দোলনগুলির সময়।
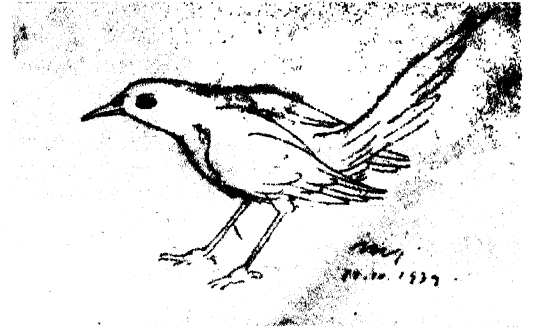
হ্যাভেল দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতার জন্য পাশ্চাত্ত্য মহাদেশিক ঐতিহ্যের খবর জানতেন না। (রাখতেন রবীন্দ্রনাথ)। হ্যাভেল সংস্কারের যে পতাকা াদেশিকতার সময় তুলে ফেললেন, তা সিন্ধুবাদের বোঝার মতো ভারী। মকালীন শিল্পকলার ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার অনুসন্ধানের মল তিনি নির্দেশ করতে পারেননি। সাদৃশ্য যে একমাত্র এবং শেষ সত্য য়, ক্যামেরা আবিষ্কারের পর পাশ্চাত্ত্যের শিল্পীরাও একথা বুঝে ফেলে, র্বকালের মানব-শিল্পকলার পরম্পরাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন, হ্যাভেল এই বার্তা দিতে পারেননি। তার খেসারত বহুকাল ধরে শিল্পীদের দতে হয়েছে।

হ্যাভেলের জেদ এবং দূরদৃষ্টির অভাবে, ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির শিক্ষার কার্যক্রম, সেই থেকে ভিন্ন হয়ে গেল। এখনও এই রীতিকে আলাদা করে সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয় শেখানো হয়। সাধারণের মধ্যে এখনও তথাকথিত ভারতীয় রীতির কদর কিঞ্চিৎ অধিক। পক্ষান্তরে শিল্পীদের মধ্যে এই অতি ব্যবহারে অধুনা জীর্ণ রীতিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখাই ইদানীংকার দস্তুর।

ভারতীয় শিল্পকলার সম্পদ এবং ঐতিহ্যের দিকে পথনির্দেশ করে হ্যাভেল যেমন আমাদের নিঃসীম কৃতজ্ঞতার কারণ হয়েছেন, তেমনি আবার এই ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন বোধের সেতুবন্ধ রচনা করতে নিষেধ করে সাধারণ মাপের বহু শিল্পীর অশেষ ক্ষতি করেছেন। াদেশিকতার সেই পর্বের দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতার জন্য তাঁর নির্দেশ পরম আদরের বলে ধরা হয়েছে। সেই থেকে ভারতীয় শিল্পী সমাজ স্পষ্টত দুই লে ভাগ হয়ে গেলেন। এঁদের মতান্তর পরে মনান্তরে পরিণত হল। দুই শিবিরের মসীযুদ্ধ এবং সংঘাত ক্রমে বৃদ্ধি পেল। স্বাধীনতার আগে যাঁরা নিন্দিত হতেন তাঁরা নিন্দিত হলেন এবং যাঁরা ধিকৃত হতেন তাঁরা স্বীকৃতি পেলেন। কিন্তু এসবের তো আসলে কোনো প্রয়োজন ছিল না।

শুধু দুজনের ভাবমূর্তি নিষ্কলঙ্ক রইল। তাঁরা দুজন গুরু-শিষ্য অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল। অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত নব্য ভারতীয় কলম (যা বেঙ্গল স্কুল বা বাংলা কলম নামে পরিচিত) সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠেছে। দেখা দিয়েছে সংশয়। কিন্তু ওঁদের দুজনের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি।

॥ ৫ ॥

নন্দলালের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি প্রথম থেকে স্থির করেছিলেন শিল্পী হবেন। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হবার পর এফ. এ. পরীক্ষা পড়া শেষ না করে ছবি এঁকে গেলেন। তুতো ভাই অতুল মিত্র তখন সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের ছাত্র। এঁর কাছেই বিলিতী রীতির ছবি আঁকায় নন্দলালের হাতে খড়ি। নন্দলাল তখন র‍্যাফেলের মেডোনার নকল করছেন। "মহাশ্বেতা" আঁকছেন রবি বর্মার ঢঙে। এইসময় অবনীন্দ্রনাথের "বজ্রমুকুট" এবং "বুদ্ধ ও সুজাতা" দেখে, তিনি অভিভূত হন। আর্ট ইস্কুলের আরেক ছাত্র তাঁর বন্ধু সত্যেন বটব্যালের সঙ্গে তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে যান। "মহাশ্বেতা" বাদে তাঁর ইউরোপীয় ছবির নকলগুলো হ্যাভেলের তেমন পছন্দ হয়নি। তবে পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেলেন তিনি। পাটনাই কলমচী লাল ঈশ্বরীপ্রসাদ ছিলেন পরীক্ষক। নন্দলালের "গণেশ" দেখে তিনি খুব খুশি। প্রধান শিক্ষক হরিনারায়ণবাবু এবং ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে তালিম নিয়ে তিনি এলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। কিছু সময় অবনীন্দ্রনাথের কাছে একা শিখতেন। তারপর সতীর্থ হয়ে এলেন সমরেন্দ্র গুপ্ত, ক্ষিতীন মজুমদার, শৈলেন দে এবং অন্য অনেকে।

নন্দলালের সেই সময়কার ছবি বা সহপাঠীদের কাজ দেখলে অনেকের একটু অবাক লাগে। নন্দলালের সেইসময়কার ছবি "সিদ্ধার্থ ও আহত মরাল" (১৯০৬) বা "সতী" বা "সতীর দেহত্যাগ" (১৯০৭) সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, ওঠেও, প্রত্ন পৌরাণিক বিষয়ে সেই সময়কার শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন কেন? যাঁরা ছবি বোঝেন না এমন বুদ্ধিজীবী থেকে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের মতো পণ্ডিত ("আয়ডেনটিটি: কনসাসনেশ এ্যাণ্ড দ্য বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট" নিবন্ধটি "রেনেসোনস ইন বেঙ্গল" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, নয়াদিল্লি ১৯৭৭) এই প্রশ্নের অতি তরল এবং সরল উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। প্রশ্ন তুলেছেন এঁরা সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে ছবি আঁকেননি কেন শিল্পীরা? এদের প্রথম ভুলটা হল— এঁরা ছবিকে চিত্র হিসাবে ভাবছেন না, সচিত্র হিসাবে ভাবছেন। কিন্তু আখ্যানমূলক ছবির বিচারও "বিষয়" দিয়ে হয় না। ভারতীয় পদ্ধতিতে বিচারে বসলে ষড়ঙ্গ প্রয়োগ করতে পারতেন। পাশ্চাত্ত্য রীতিতে আবার অঙ্কন, কাঠামো, নির্মিতি, রচনা, বর্ণপ্রয়োগ, বুনোট এবং কল্পনাশক্তি মিলিয়ে দেখতে পারতেন। ইউরোপীয় নবজাগরণ এবং পরবর্তী যুগে, মানবিকতাবাদী শিল্পীরা, গ্রীসীয়, রোমক, ইহুদী এবং খ্রীষ্ট পুরাণ অবলম্বন করে অজস্র এবং অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। ছবির মধ্যে বোতিচেল্লির "ভিনাসের জন্ম" এবং মূর্তির মধ্যে মিকানজেলোর "পিয়েতা" এঁরা পৌরাণিক বিষয় বলে বাকচ করে দেবেন? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে "সিদ্ধার্থ ও আহত মরাল" এবং "পিয়েতা"-র বিষয়ের মিল আছে। সুতরাং বিষয় নয়, এসব ক্ষেত্রে শিল্পের শর্ত পূরণ হচ্ছে কি-না সেটাই বিচার্য।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি অভিযোগ হল-যা আমার মতে আরও মারাত্মক-ভারতপ্রেমী সাহেবদের মন যোগাতে ছবি আঁকা হতো। নব্য ভারতীয় কলমের আন্দোলনের পেছনে ওঁদের অবদান স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে, তা কিন্তু হতো না। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির কর্মসমিতিতে লর্ড কিচনার, লর্ড কারমাইকেল, রোণালডাস প্রমুখের নাম প্রমাণ করে যে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল প্রেমবিদ্বেষ মেশানো। কোনো কাজে ওঁদের অনুমোদন এবং পৃষ্ঠপোষণা দেশবাসীদের সপ্রশংসদৃষ্টি এবং সমর্থন আদায়ের জন্য প্রয়োজন পড়তো। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি বিচিত্র এবং অদ্ভুত ছিল। গগনেন্দ্রনাথ লাটসাহেবের সঙ্গে নৈশভোজ সেরে বিপ্লবীদের অর্থ এবং অস্ত্র অকৃপণভাবে সাহায্য করতেন। এই বিচিত্র মানসিকতা ইনটেলিজেনসিয়ার এই দ্বিখণ্ডিত ব্যক্তিসত্তার স্ববৈপরীত্য জটিলতা, না বুঝলে সেই আমলকে বোঝা যায় না। ইংরাজের কথা তুললে জাপানীদের প্রভাবের প্রসঙ্গ তুলতে হয়। হ্যাভেলের পাশেই আছেন ওকাকুরা। অবনীন্দ্রনাথের ধৌতরীতির ছবি জাপানী এবং ইংরাজ জলরং-এর মধ্যে প্রায় সফল দৌত্য। বিষয়গুলি পুরাণ, ইতিহাস এবং কিংবদন্তী থেকে নেওয়া। এর পেছনে ভারতপ্রেমী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং পূর্বালোচিত আবর্ত আছে। অন্যদিকে গাঁ গঞ্জের মানুষের যে ধ্যান এবং কল্পনার জগৎ-মহাকাব্য, পুরাণ, চৈতন্যলীলা, দেবদেবী, ব্রতকথা, যাত্রা, কথকতা, পূজাপার্বণ মিলিয়ে-তা কিন্তু নন্দলাল এবং অন্তত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের ছবিতে ছিল। এরই এক পরিশ্রুত রূপকল্প নব্যরীতির ছবিতে এসেছিল। এগুলো "সাহেবভজা" বলা সুতরাং খণ্ডিত ইতিহাসবোধের লক্ষণ ছাড়া কিছু নয়। অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ভারতীয় রুচির পরিবর্তন এনেছিলেন। ছাত্ররা লাক্ষ্ণৌ, লাহোর, সিংহল-দূর দূর প্রান্তে সেই বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নন্দলালের ছাত্ররা ঠিক একইভাবে ছড়িয়ে পড়েন। নব্যরীতি যেন ক্যাটালিটিক এজেন্ট। দম্বল বা খামিরের মতো ভারতীয় সমকালীন শিল্পকলায় রসায়নের কাজ করেছে।

ঐতিহাসিক ভূমিকা বাদেও, প্রশ্ন উঠতে পারে নব্য রীতির এসব ছবি শিল্পবিচারে কেমন? সবসময় বন্যার পলির সঙ্গে আবর্জনা আসে। প্রতিমাকল্প, চিত্রাদর্শ, রূপবন্ধ অনুসন্ধানের সঙ্গে অনেকরকম সংকীর্ণ গণ্ডী কাটা হচ্ছিল। এরই ভেতর থেকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছাড়াও একেবারে ভিন্নধর্মী ছবি নিয়ে বেরিয়ে এলেন গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং সহজদক্ষ সুনয়নী দেবী। এঁরা যেন আন্দোলনের সঙ্গী, সহযাত্রী, সহযোগী।

আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রতিভার আবির্ভাব হল। বিনোদবিহারী এবং রামকিংকর এই রাগবিস্তারের দ্রুতলয় পর্বের শিল্পী। যেখানেই শিল্পী,ব্যক্তিত্ব নিয়ে, ঋজুভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছেন সেখানেই আন্দোলন বাঁক নিয়েছে, শিল্পকৃতির বিচারে উত্তরণ ঘটেছে। যেখানে শুধু নিয়মনিষ্ঠ আচার-বিচার সংস্কার এবং নিষেধের বেড়া তোলা হয়েছে, ঐতিহ্যকে অচলায়তন ভাবা হয়েছে, সেখানেই সেই প্রয়াস হয়েছে দুর্বল, অনুকরণমাত্র, জড়, মৃতবৎসপ্রসবতুল্য।

॥ ৬ ॥

নন্দলাল বসু, তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের মতোই ক্রমাগত নিজের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ঘটনাচক্রে নিজেকে নতুন করে নেবার সুযোগ এসেছে। রূপবন্ধ, প্রতিমাকল্প, করণকৌশল নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যকে ধরার জন্য দেশের শিল্পতীর্থে ঘুরেছেন। ১৯০৮ সালে "সতী" এবং "সতীর দেহত্যাগে"-র জন্য ওরিয়েন্টাল আর্ট

সোসাইটির পাঁচশ টাকা পুরস্কার পাবার পর অর্ধেন্দ্রকুমারকে সঙ্গে করে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যান। ১৯০৯ সালে লেডি হ্যারিংহ্যামের জন্য অজন্তার চিত্রাবলীর নকল করার জন্য অসিত হালদার ভেঙ্কটাপ্পার সঙ্গে যান। এমনি করে সারাজীবন কখনো যাচ্ছেন বাঘগুহায় ছবির প্রতিচিত্র করতে কখনো ঘুরছেন সিংহলের শিগিরিয়ায়। রাজগীর বা নালন্দা পুরী এবং কোণার্ক। কখনো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চলেছেন বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী মন্দিরে। একদিকে ঐতিহ্যের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা, অন্যদিকে বীরভূমের শুধু নয়, ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের গাছপালা, মানুষজন, ঋতুরঙ্গ তিনি আসক্তি নিয়ে দেখেছেন, এঁকেছেন, কবির নিমন্ত্রণে মুকুল দেকে নিয়ে গেছেন পদ্মার বোটে। এমন কি কবির সঙ্গে চীন জাপানে।

শুধু উগ্র স্বাদেকিতার জন্য যাননি ইউরোপে।

তেমনি শিখেছেন ছাত্রের মতো। পদ্মার বোটে থাকার সময় তিনি দেখলেন কবির দর্শনপ্রার্থী প্রজাদের ছবি ধ্রুপদী পদ্ধতিতে ধরা যাচ্ছে না, তখন মুকুল দে-র কাছে বিলিতী রীতির দ্রুত স্কেচ আঁকা শিখেছেন। জয়পুরী পঙ্কের কারিগর আনিয়ে ভিত্তিচিত্রের কাজ ছাত্রদের শেখাবার সময়, নিজে যোগানদারের মতো জিনিসপত্র আগিয়ে দিচ্ছেন। তার বিরক্তি গালাগালি সহ্য করছেন। বহু পরে সে বেচারা যখন জানলে তাঁর যোগানদার আসলে মাস্টার সাহেব, তখন তার অবস্থা শোচনীয়। জাপানী শিল্পীদের কাছে কলকাতায় কাজ শিখেছেন। আবার চীন জাপান ঘুরতে গিয়ে শিল্পীদের কাছে অতিথি হয়েছেন। কাজ শিখেছেন। তাত্ত্বিক দিকটাও রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অতিথি অভ্যাগত ও শান্তিনিকেতনের মনীষীদের কাছে শিখেছেন শুনে শুনে। স্টেলা ক্রেমরিশ এসে বক্তৃতা দিয়েছেন সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পকলার ওপর। সুতরাং ভেতর কপাট বা বহির্দুয়ার ভেজিয়ে রাখার সুযোগ পাননি। ক্রমাগত বদল হয়েছে তাঁর মননের। পরম্পরার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আত্মপরীক্ষা করেছেন। শান্তিনিকেতন আসার পর ধোয়া রীতিতে ছবি আঁকা প্রায় ছেড়ে দিলেন। অস্বচ্ছ এবং স্বচ্ছ জলরং, টেম্পেরা, জয়পুরী পঙ্কের কাজ এবং ইতালীয় ফ্রেস্কোর রীতি, চীনা জাপানী লেখনরেখার ঝলকানি এবং দোয়াতে চোবানোর পর কালো টানের পিচ্ছিল গতি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে প্রায় ধূসর মজা তৈরী করে সেইসব খেলা-জানতেন তিনি। বর্ণের জেল্লা থাকলেও, চাপিয়ে বা ছোপ ছুপিয়ে রঙ লাগাতেন, কখনো সমতল করে লাগাতেন, কখনো ক্রম নিয়ে, বর্ণের বিরোধ এবং সামঞ্জস্য নিয়ে ছোট ছোট সূক্ষ্ম কাজ করে গেছেন অক্লান্ত। স্বল্প রঙে কাজ করতেন। অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় রীতিতে প্রশিক্ষিত হয়ে ভারতীয় অণুচিত্র (মিনিয়েচার)-এর জগতে নিজস্ব কল্পনার মুক্তি দিয়েছিলেন, নন্দলাল তেমনি ভিত্তিচিত্রের মধ্যে নিজস্ব সিদ্ধির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

প্রথম জীবনে দেব দেবীর ছবি, পুরাণ মহাকাব্যিক বিষয়, শান্তিনিকেতন আসার পর থেকেই মাটি মানুষের টানে বদলে গেল। ভারতীয় ছবিতে নিসর্গদৃশ্য অবনীন্দ্রনাথের পর থেকেই নতুন করে এসেছিল। কিন্তু নন্দলালের ছবিতে স্বপ্নমেদুর ধোয়া পদ্ধতির আবছা ভাবটা জলরঙ এবং টেম্পেরায় অনেক বেশি উজ্জ্বল। অবনীন্দ্র এবং যামিনী রায়ের ছবিতে পটের চৌহদ্দির শেষ প্রান্তগুলির ভেতর ছবি এঁটে বসে থাকে। এর ভেতরে রচনার জ্যামিতি খুব আঁটসাট। তার ভেতর থেকে ওঁরা দেশ (স্পেস)-এর মায়া তৈরী করেন। নন্দলালের ছবি অনেক খোলামেলা এবং হাওয়া বাতাস বেশি-একটা উদাস যোজন যোজন ব্যাপ্তি। তাঁর একরকম কাজে যেমন চিরাচরিত ভারতীয় ভঙ্গিমা এবং প্রতিমাকল্পের ধরন আছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁর বহু ছবিতে, মানুষজন, গাছপালার মতো, আপনা থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে শান্তিনিকেতনের মতো আধা গ্রামে চলে আসা তাঁর ছবির ধরনটা বদলে দিয়েছিল। নন্দলালের ছেলেবেলার অনেকখানি মুঙ্গেরের খড়গপুরে কাটে। পাহাড় ঝিল, বন এবং কুমোর পাড়ায় ঠাকুর আর মহরমের তাজিয়া বানানো দেখে। মাঝখানে কলকাতার বছর কয়েক। তারপর আবার শহর থেকে কিছুদূরের শান্তিনিকেতন। ফলে ভেতরে ভেতরে দ্রুত বদলে গেল তাঁর ছবি। তিনি ঘোর স্বাদেশিক ছিলেন। শাসক ইংরাজের সংস্পর্শে আসার বা পৃষ্ঠপোষণার তেমন কোনো সুযোগ আসেনি তাঁর জীবনে। ফলে অনেক অকৃত্রিম তাঁর ছবির জগৎ। অথচ লোকশিল্পের মতো নয়। সরল কিন্তু প্রাগক্ষর নয়।

বস্তুত রাজনৈতিক জগতেও তখন বিরাট পালাবদল শুরু হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইতিমধ্যে রাজধানী সরে গেছে কলকাতা থেকে দিল্লি। এর ফলে প্রভাব প্রতিপত্তির ধরনটা পালটাচ্ছে। ভারতবর্ষময় প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিতে বৃটিশ সিংহ আহত এবং কমজোরী হয়ে পড়েছে। স্বায়ত্তশাসনের বদলে পূর্ণ স্বরাজের কথা তখন অনেকে ভাবছেন। এরমধ্যে গান্ধীজীর আবির্ভাব নেতৃত্ব এবং নীতির ক্ষেত্রে নতুনরকম জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

নন্দলাল প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে থাকেননি। কিন্তু মনে মনে তাঁর সহানুভূতি এবং বৃটিশ বিরোধিতা প্রবল ছিল। প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে ছাত্রদের বন্যায়, দাঙ্গায় বা মহামারীর মধ্যে সেবাকার্য করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছাপাই ছবিতে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য পোস্টার এঁকে দিয়েছেন (১৯৩২/৩৩)। লিনোকাটে অসংখ্য পোস্টার চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর একটির নাম "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা" অসংখ্য নরকরোটির ওপর মা ছেলের হাত ধরে ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটির নাম "আমি তোমার হাড় খাবো মাস খাবো, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব" ছবিতে জন বুলকে রিংমাস্টার হিসাবে চাবুক হাতে দেখা যায়। চারিদিকে সার্কাসের খেলা চলছে। ইংরেজের বিভদনীতির বহু রূপ এতে নন্দলাল দেখিয়েছেন। পেশোয়ারে নিরস্ত্র মুসলমান জনতার ওপর হিন্দু সৈনিক গুলি চালাচ্ছে। একজন হিন্দু নারীর শ্লীলতা হানি করছে মুসলমান দুর্বৃত্ত। মরা গরু নিয়ে মন্দিরে ঢুকছে মুসলমানের দল। অনুরূপভাবে মসজিদে শুয়োরের মাথা নিয়ে চলেছে হিন্দু মিছিল।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে আধুনিক ভারতশিল্পের পালাবদলের সময়। ১৯০০-৩০ পর্ব যদি হয় স্বাদেশিক প্রভাবে আত্মানুসন্ধানের কাল, তাহলে ১৯৩০-৪৫ হল লোকায়ন পর্ব। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক শাসনকার্যে কংগ্রেসী অংশগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিজাত পণ্য যথেষ্ট দাম না পাওয়ায় কৃষকের দুর্গতির রূপ দেখছেন নাগরিক নেতৃবৃন্দ। সমস্যার মহড়া নিতে হচ্ছে তাঁদেরই। তির্যকভাবে ছবি অনেক বেশি লৌকিক হল হয়তো এরই প্রভাবে। নন্দলাল, যামিনী রায় তো বটে, এমন কি স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ যখন আট বছর পর নতুন করে তুলি ধরলেন ১৯৩৮-এ তখন কৃষ্ণমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের লৌকিক জগতে এলেন। একই সঙ্গে লোকশিল্পের প্রভাব পড়ল এঁদের সবার ওপর।

গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্কের জন্য লক্ষ্মৌ কংগ্রেস থেকেই মণ্ডপসজ্জার ভার তাঁর ওপর পড়ল। এর মধ্যে লোকায়নের ক্ষেত্রে হরিপুরা পোস্টারের অবদান নিয়ে দ্বিমত নেই। এর বর্ণ অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং রূপারোপ খুবই সরল। অজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ উভয়দলকেই এই ছবি আকর্ষণ করেছিল।

নন্দলালের আত্মনবীকরণ শক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। স্বাধীনতার পর শিল্পাদর্শ বদলে যায়। এর সঙ্গে তাঁর তাল রাখার কথা নয়। শেষের দিকে শরীর ভেঙ্গে গেছিল তাঁর। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। বৃদ্ধবয়সে রাগ অভিমান বেড়ে গেছিল। একথা তাঁর তখন মনে হয়ে থাকবে সোনার তরী তাঁর ফসল নিয়ে চলে গেছে।

কিন্তু শিল্পকলা তার সময় এবং প্রয়োজনকে কখন যেন উত্তীর্ণ হয়ে যায়। নন্দলালের ছবির বৈচিত্র্য এবং বৈভব সমসাময়িক তর্কের ধূলিঝড় বন্ধ হলেই ক্রমে আমাদের চোখে পড়বে আরও উজ্জ্বল হয়ে।

প্রাচ্য সফরে নন্দলালের ভাবনা

রবি পাল

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচ্য সফরের সময় বাছাই করে তিন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। বাছাই বলবো এখানে তার কারণ সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, এই তিন বিষয়ে তিন দিকপালকে মনোনীত করেছিলেন। এঁরা হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কালিদাস নাগ এবং শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেন ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আর শ্রীনিকেতনের গ্রাম-পুনর্গঠন কেন্দ্রের তৎকালীন অধিকর্তা এলমহার্স্ট তো সচিব হিসাবে ছিলেনই।

ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ ব্রহ্মদেশ থেকে সফর শুরু করে চীন ও সব শেষে জাপান সফর শেষ করে কলকাতায় ফিরেছিলেন। পথে আরও কয়েক জায়গা ঘুরেছেন তবে যে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা কোন দেশের স্বরূপ প্রতিভাত হয় ঠিক সে দৃষ্টি নিয়ে নয় কারণ ওই সব জায়গা তাঁর কেমন লেগেছিলো সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জানাননি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীরূপে নন্দলাল সফরে গিয়েছিলেন কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গুরুদেবের সফরসূচীর সঙ্গে নন্দলালের সফর সূচীও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো।

রবীন্দ্র-ভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের একটা সাংস্কৃতিক মৈত্রী বন্ধন গড়ে তোলা। যাকে বলে Revival of Indological Studies-তাই এই বিশেষজ্ঞদের হাজির করে দিয়েছিলেন প্রাচ্যের বিভিন্ন বিষয়ের প্রগতির দোর গোড়ায়। যাতে তাদের ভূয়োদর্শনলব্ধ কলা এখানে ফিরে এসে আমাদের নিজের মত করে কাজে লাগাতে পারেন।

এই রকম একটি বিষয়ে ছিলো চারুকলা এবং গুরুদেবের চোখে নন্দলালই ছিলেন এ বিষয়ে একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গিনায় গগনেন্দ্রনাথ, গুরু অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে প্রাচ্য শিল্পের বহু নাম করা শিল্পী আসা যাওয়া করতেন, কাজ করতেন, ভাবের আদানপ্রদান চলতো—সেখানে নন্দলাল এই সব মহান শিল্পীদের কাজ দেখতেন—সৌন্দর্য অনুভব করতেন, ও হাতে কলমে কাজ করে প্রাচ্য শিল্পের অঙ্কন রীতি, গাঠনিক কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য সফরের সঙ্গী হিসাবে নন্দলালকে

অঙ্কিত কুমারী ও সধবার কেশ বিন্যাসের ধরন ও তফাৎ দেখিয়েছেন।

চীনে কবি, যাঁর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেছিলেন।

নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যই ছিলো প্রাচ্য শিল্পের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, না দেখা রূপভাণ্ডারের গুহায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। কতটা আহরণ করবেন বা মন-নৌকোয় কতটা বোঝাই করবেন সেই রূপভাণ্ডার থেকে সেটা ছিলো একান্তই নন্দলালের। সেখানে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। পরবর্তীকালে যদি নন্দলালের কালো সাদা আঙ্গিকের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখি, বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখবো যে তিনি প্রাচ্য অঙ্কন-পদ্ধতিতে চেনা বিষয়বস্তু নিজের মত করে এঁকেছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যালিগ্র্যাফিক প্রভাব বেশ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য যে কতখানি সফল হয়েছিলো সেটা আরও পরবর্তীকালে তাঁর কাজের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখলে বোঝা যায়। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও ইংরাজী ১৯২২ সালে কলাভবনের রূপকার অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেওয়ার অব্যবহিত পরেই ১৯২৪ সালে নন্দলালের প্রাচ্য সফর কলাভবনের তথা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

পরিণত মন নিয়ে নন্দলাল দেখেছিলেন প্রাচ্যের শিল্পকলা, প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ নিদর্শন, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি, কৃষ্টি; আলাপ করেছেন তাদের বড় কবি, বড় শিল্পীদের সঙ্গে। ভাবের আদান-প্রদান করে মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

দিবে আর নিবে মিলাবে, মিলিবে যাবে না ফিরে।

রবীন্দ্র-ভাবনায় বিশ্বভারতী ছিলো সমগ্র পৃথিবীর অতিথিশালা। নন্দলাল প্রাচ্য দেশে অতিথি হয়ে গিয়েও এই আশ্রম অতিথিশালার কথা ও চারুকলা-শিক্ষার অতিথিশালা—কলাভবনের কথা ভোলেন নি। চলাফেরা, ব্যস্ততার মাঝে কলাভবনের বা ভারতীয় শিল্পের সার্বিক বিকাশের কথা নানাভাবে ভেবেছেন। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের সামনে প্রাচ্য শিল্পের সঠিক ও শিল্পগুণসম্পন্ন নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করে পুরনো ছবি দেখে পছন্দ করে কলাভবন সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ করেছেন। এমন কি কিছু ছবি বা অন্যান্য জিনিস নিজের পয়সা দিয়েও কিনতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি ছিলেন প্রাচ্য শিল্পধারার সাধক ও নব্যশিল্পরীতির উদগাতা। অবনীন্দ্রনাথকে যদি ভারতীয় নব্য শিল্পধারার জনক বা পথিকৃৎ বলে স্বীকার করি তাহলে নন্দলাল তার যোগ্যতম ও একমাত্র উত্তরাধিকারী একথা অবনীন্দ্রনাথ নিজে 'হ্যাভেল হল' উদ্বোধনের প্রাককালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে বলেছেন।

নন্দলাল কলাভবনের ছাত্রছাত্রী শিক্ষককে এত আপন করে দেখতেন, একান্ত নিজের পরিবারের লোকের মত ভাবতেন যে তাঁর প্রাচ্য সফরের প্রথম চিঠিতে কলাভবনের আর্টিস্টদের উদ্দেশে লিখেছিলেন—২১ শে সন্ধ্যায় গঙ্গার মুখে জাহাজটার নাকে দড়ি দিয়ে সমুদ্র পানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ২২ শে ভোরবেলায় কাল জলে ভাসছি। এখানে তিনি জাহাজটাকে দেখে অনুভূতির সাগরে ডুব দিয়েছেন, নিজের মনের সঙ্গে জাহাজটার তুলনা করে আনন্দ ও বেদনার সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন। আবার ঐ চিঠিতেই পাই ঘরোয়া মানুষ নন্দলালকে। কঠোর বাস্তববাদীর মত লিখছেন—এখন আঁকার ইচ্ছা নেই। ডাঙ্গার মাছ মানুষ জলে পড়া কি রকম, এখানে থাকলে বুঝতে পারতে। আজ ২৩ শে মে। বটপত্রে ভাসছি। তোমাদের স্মৃতি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মাঝে মাঝে টক্-টক্ করছে, উথলে উঠছে, ভেঙ্গে পড়ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। একান্ত আপন জন দিগে ছেড়ে নূতন কিছু পাওয়া না পাওয়া দোলায়মান মন নিয়ে প্রাচ্য দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন।

কলকাতা বন্দর ছেড়ে বর্মা মাটিতে পা দিয়েই ২৫ শে মে সকাল ৮টায় কলাভবনের আর্টিস্টদের লিখেছিলেন, আজ আমরা রেঙ্গুনে পৌঁছালাম, তিনদিন থাকবো। রেঙ্গুন শহর দেখে সদ্য ছেড়ে আসা কলকাতাকে মনে পড়ছে, তিনি লিখেছেন, সবই কলকাতার মত তবে মাঝে মাঝে সুন্দর প্যাগোডা আছে। বাটোটাননি, স্যয়েডাগং, স্যলে প্রভৃতি প্যাগোডার অবস্থান—সমুদ্রের বুক থেকে দেখতে কেমন লাগে তা এঁকে পাঠিয়েছেন। নন্দলালের সফরের শুরু থেকেই নিপুণ অন্বেষক, গবেষক হিসাবে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ছোট মেয়ে যমুনাকে রেঙ্গুনের পেগু গ্রাম থেকে ২৬ শে মে-র এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে—এখানকার একটা চাষাদের ঘর পাঠাচ্ছি। কেমন ছোট পাখীর বাসার মত চার দিক খোলা। একটি মাত্র জিনিসপত্র রাখবার ঘর আর একটা চালের গোলা। এটা তো ওখানকার বসবাসের চিত্র দিলেন—তারপর আবার খাবার এবং তৈরী করার প্রণালীও আমাদের জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, তরকারীর বদলে নাপ্পি খায়। নাপ্পি তৈয়ারী করবার প্রণালী কতগুলি মাছ একটা হাঁড়িতে ফেলে কিছুদিন রাখে। যখন সেগুলো বেশ পচে যায় তখন সেগুলো বার করে শুকিয়ে কিছু লংকাগুঁড়ো দিয়ে কুটে নেয়—আর সেগুলো নাড়ু পাকিয়ে রেখে দেয়। দরকার হলে সব ঝোল, ভাজা ইত্যাদি করে ভাত দিয়ে খায়। তোমাদের জন্য কিছু নিয়ে যাবো। আমি একদিন চেকেছি, মন্দ না।

একটা নূতন দেশে গিয়ে নূতন কিছু শেখবার, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করবার অপরিসীম আগ্রহ তাঁর দেখতে পাই। তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে হয়তো মনে হতে পারে যে এ সব অভিজ্ঞতা—ছবি আঁকার কাজে কি লাভ হবে কিন্তু না—তিনি শুধু চিত্রশিল্পীই ছিলেন না—তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জীবনশিল্পী। তিনি জানতেন যে নিজের রসপোলব্ধি না হলে অপরকে রস বিতরণ করবেন কেমন করে। তাই নাপ্পি খেয়েও দেখেছেন—যদিও প্রস্তুতপ্রণালী শুনে আমাদের অনেকের গা বমি-বমি করতে পারে। মনের দিক থেকে কত উদার, কত সংস্কারমুক্ত হলে অন্য দেশে গিয়ে একাত্ম হয়ে সে দেশের চলতি ও প্রিয় খাবার খেয়ে তাদের কৃষ্টি জানবার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। নন্দলাল আমাদের সব রকম সংকীর্ণতাকে আঘাত করে ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছেন, সারা বিশ্ব সমাজের সঙ্গে এক হবার ডাক দিয়েছেন। আবার গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে সুরেন করকে লিখেছেন—এখানকার যত পোষ্টকার্ড আশ্রমে যাচ্ছে যত্নপূর্বক সংগ্রহ করে রাখবে কারণ অনেক জিনিস খাতায় নাই। ঐগুলি সম্বল. কিছু অবনবাবুকে, দু একটা এদিক ওদিক দিচ্ছি। ভালগুলো দরকারীগুলো পাঠিয়ে ওখানে পাঠাচ্ছি। এই বিশেষ মন্তব্যে দূরদর্শী নন্দলাল কলাভবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অতি নিকট থেকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং এও অনুমান করেছিলেন যে প্রাচ্য কৃষ্টি জানতে হলে হলে এগুলির অধ্যয়ন প্রয়োজন হতে পারে। ওই একই চিঠিতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কিছু টুকরো ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—তিনি লিখেছেন—এলমহার্স্ট সাহেব গুরুদেবের সব দেখেন কিন্তু কাপড়-গুছানো ইত্যাদির মত ছোটখাট কাজ তিনি নিজেই করেন। আমরা এখনো অনেকে মনে করি যেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই হেতু তিনি একটি কুটো কেটে দুটো করতেন না। কিন্তু এ ধারনা যে কতো অসার তা নন্দলাল আবার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শ্রদ্ধাপ্লুত মন গুরুদেবকে সাহায্য করার জন্য ছটফট করেছে। তিনি লিখেছেন—আমরা বিশেষ চেষ্টা করছি ওই সব কাজ করবার জন্য। কারণ তিনি নিজে কিছু বলেন না। যাক আমরা সদাই তাঁকে কি দরকার জিজ্ঞাসা করি ও নিজে গিয়ে সব গুছিয়ে দি না বললেও।

জাহাজ যাত্রার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে এক জায়গায় গৌরগোপাল ঘোষকে ২৮ শে মে লিখেছেন—আমি ও ঠাকুরদা (ক্ষিতিমোহন সেন) কালিদাসবাবু, একটা ক্যাবিনে যেন একটা খাঁচায় তিন রকমের পাখী। আর ওদিকে ফার্স্ট ক্লাসে চার ঘরে ওঁরা চারজন। গুরুদেবের সম্পর্কে লিখেছেন, সিঙ্গাপুরে আরও দুটো জোব্বা স্যানাটোজ (জার্মানী ওষুধ) ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করা হল। প্রথম দু'এক দিন গুরুদেবের শরীর খারাপ ছিলো এখন ভালো আছেন। ...অতঃপর কলাভবনের কথা ভেবে লিখেছেন, আমি কিছু ল্যাকারের কাজ মিউজিয়ামের জন্য পাঠাচ্ছি।

বর্মার একটি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে পোয়ে নাচ। প্রত্যেক জাতির জীবনে তার নিজস্ব নাচ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পোয়ে নাচ তেমনি শ্রেণী নির্বিশেষে বর্মীদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দীর্ঘকাল বৃটিশ শাসিত হয়েও তাদের নিজস্ব এবং মৌলিক এই নাচের কোন রূপান্তর হয়নি। এই নাচ সম্পর্কে তার বড় মেয়ে গৌরীকে ছান্দসিক নাচের ছবি এঁকে বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন—এইটা একটি বর্মী নাচ। এর নাম পোয়ে নাচ। ভারী সুন্দর কি ধীরে ধীরে

নাচে। মেয়েটা তোমাদের চেয়ে কিছু ছোট—ভারী সুন্দর দেখতে। কেমন খোপা বাঁধে। খোপা বাঁধাটা শিখে নিয়েছি। যখন খোপা খুলে বাঁধতে বলা হল কি লজ্জা, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো, তবে তার বড় বোন খোপা খুলে আবার বেঁধে দেখালো। গুরুদেব একগাছি মালা উপহার দিলেন। ইচ্ছা করলো নিয়ে তোমাদের ভিতর ছেড়ে দি। এমন সুন্দর নাচ আর দেখি নাই। যেন শেফালী ফুলটা। রেঙ্গুন দেখে ভারি আনন্দ হলো। এখানে আমরা এক অপূর্ব তুলনা দেখতে পাই। বাসন্তী রং-এর বোঁটা ও সাদা পাপড়ির সঙ্গে সেই ছোট্ট মেয়েটির তুলনা করেছেন। সাদা পাপড়ির মত গায়ের রং-এর সঙ্গে হয়তো পরনে বাসন্তী রং-এর গাউন ছিলো। সব মিলিয়ে একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে একটি ফুলের তুলনা করে মনের যে সৌন্দর্যরসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। আবার এই নাচ দেখে শান্তিনিকেতনে থাকা তার বড় মেয়ের কথা মনে পড়ছে। তাকে নাচের ছবি এঁকে পাঠিয়ে উৎসাহিত করছেন কেননা গৌরী তখন রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে অংশ নেয়, ভালোই নাচে। তাকে শিক্ষকের ন্যায় বলেছিলেন—কি ধীরে ধীরে নাচে। পরবর্তীকালে এই উৎসাহদানের সফল স্বীকৃতি দেখতে পাই যখন দেখি ইংরাজী ১৯৭৮ সালে হারানো দিনে নটীর পূজা নৃত্যনাট্যে অংশ নেওয়ার জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নন্দলালের সেই গৌরীকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আবার পোয়ে নাচের পোষাকআশাক, তার খোঁপা বাঁধার কৌশলও আয়ত্ত করেছিলেন—যা পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের সব উৎসব অনুষ্ঠানের সাজ-সজ্জার প্রকরণে ও অঙ্গসজ্জার শৈলীতে অভিনবত্ব এনেছিলো এবং বর্তমানেও তাঁর প্রবর্তিত সাজসজ্জার ধারা অব্যাহত আছে। চীনা ভবনের বারান্দায় আঁকা নটীর পূজা ছবিতে নটীর পোষাকে এই পোয়ে নাচের পোষাকের বা কেশ বিন্যাসের প্রভাব যে নেই তা কে বলতে পারে! বর্মী কুমারী ও সধবার কেশ বিন্যাসের সাযুজ্য আছে কিনা ছবি এঁকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

নন্দলাল বর্মীদের সামাজিক ধ্যান ধারনা ও লৌকিক আচার-আচরণের দিকেও তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখেছিলেন। সকল ধর্ম নির্বিশেষে আমরা ভারতবাসীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি পথিক বা যে কোন মানুষকে জল দান করলে পরম পুণ্য হয়। এবং পুণ্যলাভের আশায় আমরা বিশেষ বিশেষ জায়গায় কলসীতে জল ভরে রেখে দিই—এবং সঙ্গতি থাকলে কোথাও বা সঙ্গে ছোলা ভিজেও থাকে। এই প্রথা আবহমান কাল থেকে অদ্যাবধি নানা রূপে ভারতে প্রচলিত আছে। নন্দলাল ওখানে গিয়ে একই ছবি দেখেছেন। পুণ্য শোভা প্রাচ্য বাণীর সুর একাকার হয়ে নন্দলালের কানে বেজেছে। হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তাই তিনি আমাদের জানিয়েছেন,রাস্তার ধারে প্রায় সব বাড়ির সম্মুখে গাছতলায় একটা ছোট চালা দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে দুটো বা একটা জলপূর্ণ কলসী ও একটা গ্লাস, একটু ফুল সাজানো। এসব গুলি পথিকদের জন্য। তৃষ্ণা পেলে জল পান করবে। কত সুন্দর লাগলো। বর্মীজরা বড় অতিথি ভালবাসে। তিনি বর্মীজদের অতিথিবৎসল জাতি বলে ভারতীয়দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাদের সৌন্দর্যবোধ দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করে তার উদার শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

চীনে পাড়ি দেবার আগে সিঙ্গাপুরে পৌঁছে লিখেছেন আগামীকাল এস এস তোষামারু জাপানীজ জাহাজে চড়বো। এখানে পৌঁছেই তিনি পরদেশী প্রকৃতিকে দুচোখ ভরে দেখে শ্যামলা বাংলার উর্বরা মাটির কথা হয়তো মনে পড়েছে—বলেছেন—এখানে জমি ভারী উর্বরা, ছোট দ্বীপ সবুজ গাছে ভরা। এখানকার বন্দরে নেমে ভিতরে যেতে পারেননি তাই আক্ষেপের সুরে বন্দরের চেহারার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, পোর্টগুলি দেখে ঠিক এখানকার লোকেদের অবস্থা জানবার উপায় নাই কারণ সব ব্যবসাদার লোক। চীনে ও সিলোনী, মাদ্রাজী। খুব ভিতরে না গেলে কিছুই বোঝা যাবে না। এখানে পুরাদস্তুর বর্ষা পড়েছে। এই কমাসেই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত পরপর পাবো। বর্ষা গুরুদেবের মোটেই ভাল লাগছে না। বড় ভ্যাপসা হাওয়া। এখান হতে চীনের যা খবর পাচ্ছি বড় সুবিধার নয়। সব খ্রীস্তানদের আড্ডা হয়েছে। পুরাতন জিনিস কিছু নেই।

চীনের মাটিতে পা দেবার আগেই তিনি চীনের খবরাখবর নিতে আরম্ভ করেছিলেন। চীনারা যে বিভিন্ন চাপে পড়ে দ্রুত প্রাচ্য মনোভাব হারিয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে—তা সব খ্রীস্তানদের আড্ডা হয়েছে—মন্তব্যে পরিষ্কার বোঝা যায় এবং চীনে গিয়েও বহুবার বহু জায়গা থেকে তাঁর এই হতাশার বাণী আকুল হয়ে আমাদের শুনিয়েছেন।

প্রাচ্য শিল্পের পীঠস্থান চীনে পৌঁছেই নন্দলাল সেখানকার মহান শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন! ওখানকার পুরানো ছবি সংগ্রহ করার ও দেখার চেষ্টা করতে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখেছিলেন যে— এখানে সাংহাই হতে দু'জন পুরাতন-ধনী চীনের সন্ধান পেয়েছি। তাদের অনেক পুরাতন ছবির কালেক্‌শন আছে— তিনি আপাতত অনেক ছবির প্রিন্ট দেবেন এবং এখানকার সোসাইটির সঙ্গে আমাদের সোসাইটির যোগাযোগ স্থাপন করবেন। —প্রায় দশ পনেরোখানা ছবি খুব পুরাতন দেখলাম। মন্দ না, বেশ ভাল। এখন এখানে ছবি আছে। —এখন কালেক্ট করছি। ছবির দামও কম। কিন্তু প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন নন্দলালের পুরানো ছবি দেখে দু' চোখ ভরেনি, তাঁর শিল্পী আত্মা তৃপ্তি লাভ করেনি। পাকা জহুরীর মত কষ্টি পাথর দিয়ে খাঁটি সোনা যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন —কেন না তিনি ভালভাবে জেনেছিলেন যে চীনে পোটো ছাড়া— আরও তিন-চাররকম গোত্রের আর্টিস্ট আছে। তার মধ্যে চতুর্থ নম্বর গোত্রের আর্টিস্টরা দ্বিতীয় তৃতীয় নম্বর গোত্রের আর্টিস্টদের ছবি নকল করে বা জাল করে কেবলমাত্র পয়সার জন্য। কোনটা আসল বা পুরাতন-নূতনের ভাবনায় ভাবিত নন্দলালকে দেখতে পাই। তিনি এই প্রসঙ্গে কলা ভবনের আর্টিস্টদের উদ্দেশে লিখেছিলেন— দু' ঘণ্টা করে খাঁটি চীনা লোক দেখতে পাচ্ছি। ছবিও দু' একটা দেখছি— কি হাতের কসরৎ। কিন্তু নূতনের ভিতর খালি কসরতই আছে, প্রাণ আছে কি না বোঝা বড় শক্ত। ঠিক পুরাতন আর্টিস্টের দেখা পাই নাই। দুই একজন ভাল আর্টিস্ট আছেন, তাঁরা পাগল। আর্টিস্ট কারো সঙ্গে কথা বলে না যদিও অনেক কষ্টে কথা কওয়ান যায়, সে যা কথা দোভাষীও বুঝে না, ইসারায় যা বোঝা গেল— পাগলামি চাই ও হাতেরও কসরৎ চাই। নন্দলাল এখানে চীনে জাত শিল্পীদের একটি বিশেষ চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি যে হাতের কসরতপূর্ণ ও প্রাণবন্ত পুরানো ছবি মিউজিয়ামের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন—সেগুলি যে অমূল্য তা বুঝতে পারি যখন ডঃ যূ বা মাদাম যূর (বর্তমান চীনে শ্রেষ্ঠ ছবি বিশেষজ্ঞ) মত বিশেষজ্ঞরা দু' চোখ ভরে মমতা নিয়ে দেখেন, অবাক হন এবং নন্দলালের শিল্প বিষয়ক জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির প্রশংসায় মুখর হয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান চীনেও এইরকম ছবি নেই বললেই চলে। যদিও পাওয়া যায় তা লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের বিনিময়ে। এই ছবিগুলি এক-একটি রত্নখণ্ড; এগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। নন্দলালের সংগ্রহ প্রয়াস সামগ্রিকভাবে সার্থক হয়েছে বলে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি।

নন্দলাল সব সময় চেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে— তথা ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে চৈনিক শিল্পের এবং প্রাচ্যভাবের আদান-প্রদান গড়ে উঠুক। তিনি এ বিষয়ে সুরেন কর মহাশয়কে লেখা চিঠিতে মনের ভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে— কলাভবনে যা কালিঘাটের পট আছে তা হতে কিছু রঙীন পট-এর একটা কি দু'টো লাইনের পট। বাকী আমার বাড়ীর ডেকসে যে বাগের (গুহা, গোয়ালিয়র, বর্তমানে অবলুপ্ত) ড্রইং আছে যেগুলো। একটা অর্নামেন্টাল ড্রইং কলাভবনে আছে। এইগুলো রেজেষ্টী করে পিকিং পাঠাবে। আর সোসাইটি হতে আলপনার বই— প্রিন্ট আছে, গগনবাবুকে লিখবে। আর আশ্রমের কিছু কপি যদি থাকে ওই সঙ্গে পাঠাবে। চীনের জনগণ যে কলাভবনের কথা মনে রেখে যা কিছু উপহার দিয়েছিলেন তার বিনিময়ে নন্দলাল তাঁদের শান্তিনিকেতন তথা ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে নিজের উদ্যোগে কিছু উপহার দিতে চেয়ে সাংস্কৃতিক বন্ধনে অবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি দরদ দিয়ে আবার লিখেছিলেন ও একটা তালিকা দিয়ে পাঠাতে বলেছিলেন; তালিকা এইরকম— রূপাবলী— ১টা। ক্ষিতিনের বই ১টা। অসিতের বই— ১টা। আলপনা— ১টা। এ্যানাটমি বাই এ. এন ট্যাগোর— ১টা। বড়ঙ্গ— ১টা। অবনবাবুর পোর্টফোলিও— ১টা আর যা যা প্রিন্ট আছে কিনে পাঠাবে। কলাভবনের টাকা হতে ক্রয় করবে। না দিলে আমাদের

াকবে না।

াভবনের কথা এবং ছাত্রছাত্রীদের অভাব-অভিযোগ, আবদার এমন ক্তিগত জীবনের খোঁজ-খবর নিতেন বা নিজের পরিবারের মত মমতা দিয়ে উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি কলাভবনের আর্টিস্টদের ণ লিখতে পেরেছিলেন— তোমরা ভাল আছ শুনে বড় আনন্দিত। এখানে ফ্ল্যাট ব্রাশ পাওয়া যায় না। জাপান ৩১শে এখান হতে তথায় পাবো। তোমরা কে-কে ওখানে আছ জানি না। কাগজ রকম আছে কিছু নমুনার মত নিয়ে যাবো। এখানে এতরকম। কেনবার মত আছে মনে হয় একটা জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে কিন্তু লঙ্কায় সোনা সস্তা। তোমরা গরমে অস্থির আর এখানে। শীতে অস্থির। ধীরেনের (দেববর্ম্মা) বউ কেমন হলো— কে-কে বরযাত্র গেল। ছাত্রছাত্রীদের কত কাছের মানুষ, কত আপন হলে ম খোঁজ-খবর নিতে পারেন তখনকার দিনের এইরকম একজন ত ব্যস্ত শিল্পী।

নের সঙ্গে আমাদের দেশের আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, বসবাস, বেশভূষা, শিল্প বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, বিশ্লেষণ ছন। প্রাচ্য রীতি নীতির মূল সুর কোথায় নিহিত আছে তার ন্ধান ও অনুশীলন করেছেন। মিল খুঁজতে গিয়ে গুরু অবনীন্দ্রনাথকে এপ্রিল ১৯২৪ সালে লিখেছিলেন —আমরা সাংহাই হতে ও— এখানকার খুব পুরাতন জায়গা দেখলাম ২০০ বা ৩০০ এ ডি ভারতীয় সাধুরা উইলী নামে এক সাধুর নেতৃত্বে এখানে ছলেন। তাদের মূর্তি পর্বত গায়ে খোদা আছে। একটা মূর্তি মোহনবাবুর মত বলে বোধ হল। এখানকার গরীব লোকেরা দের চাদর গায়ে এই বেশভূষা দেখে অমিতাব (হয়তো অমিতাভ পোলামান, সিবন্দা, (উচ্চারণ ঠিক নাও হতে পারে) বলে অভিবাদন। পাহাড়ের মূর্তির সহিত আমাদের ক্ষিতিবাবুর শরীরের মিল দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে। অল্পে অল্পে এখানকার পুরাতন লোকেরা দেখা ছ। এঁরা আমাদের দেশের মতই দুনিয়ার খবর রাখে না। স্মরণাতীত থেকে ধর্মীয় বা কৃষ্টিগতভাবের যে আদান-প্রদান ছিলো তা আমাদের নে নূতনরূপে তুলে ধরেছিলেন। আকৃতিগত সাদৃশ্যের বর্ণনা দেবার রসবোধের পরিচয় পাই তার একটি চিত্রে। রেখাচিত্রটি যদি বিশ্লেষণ তাহলে দেখবো হাস্যরসে পরিপূর্ণ। নিজের, কালিদাস নাগ ও তমোহনবাবুর চেহারা ভিন্ন বস্তুর আকৃতির সঙ্গে তুলনামূলক কল্পনা ছেন। নিজের প্রতিকৃতির ঠিক উপরে একটা ঘষা চাইনিজ কালির ঐঁকে তার মাথার উপরে যেন কোঁকড়ানো চুল এঁকে দিয়েছেন। ন্দ্রর গায়ের রং কালো ও চুল কোঁকড়ানো ছিলো তাই নিজের গায়ের ক ব্যঙ্গ করে চাইনিজ কালির সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর কালিদাস মশায়ের চেহারা ছিলো একটু কাটখোট্টা ধরনের এবং সযত্নে লালিত জোড়া পাকানো গোঁফ। তাই কালিদাসবাবুর দেহের সঙ্গে বাঁশের ধী কালিরাখা পাত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং পাত্রটির মাথার দিকে জোড়া পাকানো গোঁফের ছবি এঁকে হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন। র ক্ষিতিমোহনবাবুর চাদর জড়ানো জবু-থবুভাবের চেহারা বোঝবার তীক হিসাবে রসিক মন নিয়ে মাথার উপরে একটা পোঁটলা এঁকে টি. বকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, আমরা তিন মূর্তি।

আবার ক্লাসিক শিল্পের সঙ্গে যখন যেখানে মিল খুঁজে পেয়েছেন তখন নাতে চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তখনকার দিনের বিখ্যাত সমালোচক চিত্রশিল্পী ও সি গাঙ্গুলীকে টেম্পল অফ্ হেভেন থেকে ১২ই মে খেছিলেন— পিকিং হতে লাঙমেন, পয়মাসু, চাং চাও ইত্যাদি জায়গা খলাম, অনেক পুরাতন রাবিং জোগাড় হয়েছে। যেগুলো পুরাতন প্রায় জন্তার সঙ্গে মেলে— টানটোনে কিন্তু ফোল্ডগুলো একটু বেশী, ফর্ম ট্টু কম। অজন্তায় অঙ্কিত স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ওখানকার পুরানো পত্যরীতির মিল উল্লেখ করে বলেছেন— থামগুলি অজন্তার মত, নার বাটিটা পাথরের। লাল রং করা। হাতের গড়ন একেবারে অজন্তার ইত মেলে দেখলে বুঝিবেন। পয়মাসুতে বিশেষ কিছু দেখবার নাই। মারজীব ইত্যাদি অনেক সাধুরা নাকি এখানে এসেছেন। এখানকার র্থদর্শন করে ধন্য হলাম। আবার চীনের আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পের দিকটাও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি এ বিষয়ে সুরেন র মহাশয়কে লিখেছিলেন— লোহিয়াং যাবার পথে মাটির পাহাড় হাওয়ায় জমে গিয়ে স্তূপ হয়েছে। লোকে তাতে ইঁদুরের মত গর্ত করে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছে। পিকিং (বর্তমান বেজিং) থেকে এই লোক বাস করা মাটির পাহাড়ের অবস্থান ও দূরত্ব জানিয়ে লিখেছেন ৪০০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং দেখতে কেমন লাগে তার একটি স্কেচ পাঠিয়েছেন।

গ্রামে গিয়ে স্কেচ করা নন্দলালের একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো। এই অমূল্য অভ্যাস তিনি আজীবন বজায় রেখেছিলেন। আশে-পাশের ছোট সাঁওতাল গ্রামগুলির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিলো। তাদের সুখ, দুঃখ ও আনন্দের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাদের অসুখ-বিসুখে ওষুধ পথ্যের সঙ্গে তাদের মাঝে মহত্তর হৃদয় নিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁর বিভিন্ন স্কেচে তাই তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠানের খুঁটি-নাটি দিক এত প্রাণবন্ত হয়ে তাঁর সাবলীল রেখায় ফুটে উঠেছে। চীনে গিয়েও তাঁর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো আমরা দেখতে পাই। চীনের মাটিতে বসে মেষ দলের মাঝে মেষ শাবক কোলে দণ্ডায়মান বুদ্ধের যে ছবি এঁকেছেন তার তুলনা মেলা ভার। এই বিখ্যাত রেখাচিত্রটিকে ভাবের ও কলা-কৌশলের আদান-প্রদানের দলিল হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। বর্তমানে ছবিটি কলাভবন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে (নথিভুক্ত নং— এন বি/এল ডি—১)। এই অপূর্ব রেখাচিত্র ছাড়াও নিয়মিতভাবে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদেরকে স্কেচ করে তথ্য পাঠানো থেকে নিবৃত্ত হননি। চীনের গ্রাম, তাদের স্বভাব, চেহারা বা সাজ-পোশাকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে চেয়ে ধীরেন এণ্ড আদারকে এক জায়গায় লিখেছিলেন যে— সাংহাই হতে ১৫ই হাংচাও গেছলাম। পাড়া-গাঁয়ে সবাই প্রায় একরকম যেন সাদা ওড়িয়ার দেশে এসেছি। সবই ঝুঁটি বাঁধা আর বড় হাঁও-মাঁও করে। ১৫/১৬ বৎসরের মেয়ে ৭/৮ বৎসর বলে বোধ হয়। পুরুষ কি বালক হঠাৎ চেনা যায় না। চীনের জীবনযাত্রায় ভারতীয় ডুলী বা বাংলার পাল্কী-সদৃশ মনুষ্যবাহী পরিবহণের চলন দেখতে পেয়েছেন ও তার ছবি এঁকে এবং লিখে ছাত্রছাত্রীদের একটা ধারণা দিতে চেয়েছেন।

এই পরিবেশ নন্দলালের অন্তঃস্থলে নাড়া দিয়ে তাঁর ছোট মেয়ে যমুনার কথা বা লতী নামের মেয়েটির কথা মনে পড়িয়ে দিত। মন পাখা মেলে মুহূর্তে শান্তিনিকেতনে উড়ে এসে বলতো— এখানকার ছোট মেয়েদের চেহারা ঠিক আপেল বল্লেই হয়। সিন্দুরের টিপ পরে দুই গালে বেশ করে আলতা লাগায়। পায়ের অবস্থা দেখলে হাসিও পায় কান্নাও পায়। পা বেঁধে-বেঁধে এইরূপ সুন্দর গড়ন করে কুট-কুট করে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলে। সুন্দর গড়ন বোঝাতে গিয়ে পায়ের পাতাগুলির গড়ন পদ্ম কুঁড়ির মত এঁকে পাঠিয়েছেন। আবার সিংহের ছবি এঁকে লতিকাকে (বর্তমানে রায়) সোহাগ ভরে বলেছেন— তোমার জন্য একটা সিংহীর ছানা নিয়ে যাবো, পুষতে পারবে তো! ছোট ছোট চীনে মেয়েদের চোখের রূপ বর্ণনায় সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে অনুভব করেছেন— বলেছেন— এখানেও তোমাদের মত ছোট-ছোট মেয়ে কিন্তু তাদের চোখে একটা করে যেন বোল্‌তা কামড়ে নিয়েছে। একটা ছোট মেয়েকে চীনে জাতির চোখের ফোলা-ফোলা গড়ন বোঝাতে গিয়ে এমন প্রকৃষ্ট উপমা টানার ক্ষমতা বোধহয় একমাত্র নন্দলালেরই ছিল। আবার সিংহ ছানার গড়ন নিয়ে ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাবনা আরও গভীরে যায়। পুরীর পাথরের ক্লাসিক সিংহ ভাস্কর্যের মিল খুঁজে পেয়ে মন্তব্য করেছেন— পুরীর সিংহছানা এই দেশেই হয়েছিল বোধহয়। পথে ঘাটে সিংহছানা কিল-বিল করছে।

চীনে গিয়ে যেমন বহু বিষয়ে মিল দেখেছেন তেমনি আবার গরমিলও দেখেছেন বহু ক্ষেত্রে। সখেদে বলেছেন, গুরুদেব যে মৈত্রীর বাণী নিয়ে এখানে এসেছেন তা কেউ কর্ণপাত করে না। ওখানে গিয়ে বোধহয় নন্দলাল মনে-মনে আহত হয়েছিলেন। চীনা জনগণের আচার-আচরণ নিয়ে যে কৌতূহল ছিল তা সব ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি। তিনি তৎকালীন চীনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও জনগণের আধুনিক ভাবনাচিন্তার এক সার্বিক রূপ ধ'রে ব্যথাতুর সুরে রথীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ পত্রে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে নিজের মানসিক যন্ত্রণার লাঘব করেছেন। তিনি ৮ই মে ১৯২৪ শে লিখেছিলেন—রথীবাবু আজ একটু বিস্তারিত খবর দিবার ইচ্ছা হয়েছে—কিন্তু বিস্তারিত খবর দেবার শক্তি আমার নাই আমার Memory বড় খারাপ। পর-পর শহর দেখলে কিছুদিন বাদে সব জুড়ে একটা তাল হয়ে যায় আমার মাথার ভিতর। ঠাকুরদা (ক্ষিতিমোহন সেন) বেশ বিস্তারিত খপর রাখছেন। কালিদাসবাবু একটু নিজের মসলা দিয়ে মিশিয়ে খপর রাখছেন। আর আমি সব খপর ঘণ্ট করে ফেলছি।

কখন খারাপ লাগছে কখন ভাল লাগছে কখন আশ্চর্য হচ্ছি। মোটের উপর দেশটা বিরাট শিল্পকাজে অদ্বিতীয় বিশেষ করে ব্যবহারিক শিল্পে এখনও বেশ ওস্তাদ আছে। চিত্র শিল্প বা উচ্চ অঙ্গের শিল্পের গোড়ায় পশ্চিম দেশীয় কীট প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ সাধারণের Taste খারাপ হয়ে আসছে। ভাল জাতীয় হাতের ছবির পাশে জাপান বা আমেরিকার Almanac ঝোলাচ্ছে। মেয়েরা গোড়ালি তোলা জুতা পরতে শুরু করেছে অৰ্দ্ধেক চীনে অৰ্দ্ধেক সাহেবের পোষাক ঘাড় চেঁচে সম্মুখে টমিদের মত একটু চুল। রাজ প্রাসাদে আশ্চর্য্য রকম সুন্দর কার্পেটের পাশে আজকালকার গোলাপ ফুল আঁকা খেলকার্পেট স্থান পেয়েছে। রাজপ্রাসাদে অনেক আশ্চর্য্য সুন্দর ছবি দেখলাম কিন্তু উপঢৌকন যেটা গুরুদেব সম্রাটের নিকট নিলেন সেটা বিশেষ কিছু না—কোল সম্রাটের শীল মাত্রই দামী। ভাল জিনিস দেখলেই আমরা গদ-গদ হয়ে প্রশংসা করি—কিন্তু সম্রাটের নিজের হাতে ক্ষমতা হলে কিছু আশা ছিল—কারণ সম্রাট বেশ দিলওলা লোক মনে হল কিন্তু ইহার শিক্ষক একজন সাহেব এবং তিনিই মালিক বলে মনে হল। আর এমন সম্রাট তাহার নিজের জিনিস পত্রের সহিত R. Govt.curio-র জিনিস মাত্র Museum এর জিনিস হয়ে পড়েছেন। তবে সম্রাটের প্রাসাদ দেখে আককেল গুড়ুম হয়ে গেছে। এক-একবার দমে যাই যখন এসব প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বড় ঘর-দালান উঠান Museum ঘর দেখি। তখন খালি এই বলে নিজকে আশ্বাস দি আমরা মানুষ হবার চেষ্টা করি—এসব দরকার হয় হবে, না হয় আর কিছু হবে। হাজার হোক এটা এদের নিজের দেশ। R. Govt একটা একটা University-র জন্য কি আয়োজন করেছে—দেখলে স্তম্ভিত হতে হয় যেন একটা শক্তিশালী লোক জেগেছে কিন্তু ঘুমঘোরেই কাজটা আরম্ভ করে দিয়েছে। সবই আমেরিকার ছাঁচে হচ্ছে। বাড়ীর চেহারা পর্য্যন্ত বদলে যাচ্ছে কাজে কাজেই। তবে জিনিস পত্র, Artএর জিনিসপত্র বিশেষ করে বাহিরে যাওয়া বন্ধ হয়েছে—এরা নিজের Museum স্থানে-স্থানে করছে। এমন কি Tourist-দের নিকট হতেও জানতে পারলে জিনিস উদ্ধার করে সংগ্রহ করছে। তবে এখানেও উঁচুদরের লোক

পর্বতগাত্রে খোদিত ভারতীয় সাধুর মূর্তি

আছে যারা ঠিক-ঠিক আর্ট-এর কদর বুঝে। আর একদল ছোকরাদের, এতে দুরকমের লোকই আছে চেঙ্গড়া ও নব্য ভাবুক, কবি, ইত্যাদি ইহারা নিজের পায়ে চলবার জন্য ব্যস্ত এবং পুরাতনকে খারাপ বলে ছাড়বার চেষ্টা করছে কিন্তু বিচার না করেই ছাড়ছে বলে মনে হয়। কারণ বিদেশীর হাত ধরে চলছে। তবে পুরাতনের ভিতরও কয়েক জন Artist আমাদের Society-র মত একটা society করেছেন এবং বেশ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং চীনের আয়তনের মতই বড় ভাবে আরম্ভ করেছেন। এই society-র সহিত আমাদের একটা যোগ করবার চেষ্টা করছি। এই society হতে গুরুদেবকে ৬ খানি original ছবি দিবে। আর এক দল আছে সাধারণ লোক ইহারা নিরীহ যাহা তাহাদের সম্মুখে ধরা হয়—ইহারা তাহাই লয়। আর একদল আছে বোধ হয় অনুমানে ইহারা বড় পুরাতন—'নূতনের প্রতি অন্ধ' খুঁজে পাওয়া শক্ত—চেষ্টায় আছি। যে দলে আমরা পড়েছি—সেটা ছোকরাদের—ইহারা এই পুরাতন দলকে গ্রাহ্যই করে না কাজেই ইহাদের খপর পাওয়া শক্ত। অনেক পুরাতন Rubbing পাওয়া গেছে এগুলি খুব সুন্দর—কতকগুলি এখান হতে বাঁধিয়ে নিয়ে যাব। Print Post card, বহি ইত্যাদি সংগ্রহ করছি। আমার দ্বারা যা সম্ভব চেষ্টা করছি তবে বড় দৌড় হচ্ছে—দৌড় এ-তে আমি বিশেষ দক্ষ নই আপনি জানেন।

এখান হতে কোন craftsman নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এরা আমাদের মতই ঘরকুনো বিশেষ করে চাষীরা ও গরীবরা। এমন কি বাপ মা, আত্মীয়স্বজন আপনার জন মরলে ঘরের পাশে বাগানেই গোর দেয়। তবে বড় Artist দের মধ্যে কেহ কখন যেতে পারে আশা করা যায়। চোখ কান বুজে ইহাদের সকলকেই আমাদের কুঁড়েতে নিমন্ত্রণ ত করে চলেছি। তুলি তৈয়ার করা ও কাকিমন (লম্বা-লম্বি Vertical ভাবে ছবি আঁকার জন্য তৈরী জমি) তৈয়ার করা এখানেও বেশ—তবে এখন সুযোগ পাই নাই দেখবার।

বর্মার ঐতিহ্যবাহী পোয়ে নাচের স্কেচ।

কেবল পিকিং শহরই ১ মাস লাগে — প্রকাণ্ড শহর — অনেক
নিস দেখবার আছে। আমরা একজন সিদ্ধি ভদ্রলোকের ঘরে আছি — ওয়ার ও থাকার খরচা লাগে না — খুব যত্ন করে রেখেছে। দুস্থানকে ভাইলোগ খুব ভাল এ অস্বীকার করা চলে না। প্রায় সব য়গায়ই পিকিং পর্যন্ত ভাইলোগদের দেখা পেয়েছি। এখানে ৮/১০ জন ত্র হিন্দুস্থানের লোক আছে। যে সব শহর দিয়ে গেছি তাহার একটা লিকা দিলাম। যাহাদের সহিত দেখা হচ্ছে তাহাদের ঠিকানা লওয়া চ্ছ। Miss Green শুনছি শীঘ্রই আমাদের অকূল পাথারে ফেলে চলে বেন, তবে থাকবেন এরূপ আশা এখন করি। লুমড়ীর রাজকুমার তমধ্যে জাপান ঘুরে Peking এ এসে যোগ দিয়েছেন আজকালই রত রওয়ানা হবেন। Elmhirst বেশ বন্দোবস্ত করছেন, খুব টছেন। তবে গুরুদেবের শরীর পূর্বের মতও নয় যত শীঘ্র পারা যায় কে নিয়ে ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে, একটা কথা উঠেছে চীনাতে কিছু জ করতে গেলে শুধু Lecture দিলে হবে না কিছু দিন এখানে ওঁকে কতে হবে, এরা নাকি ধীরে ধীরে বোঝে এই সব। তবে আপনারা মনে রতে পারেন আমাদেরও পালাবার ইচ্ছা আছে, বলতে পারি না থাকতেও রে। জাপান যাবার পথে অনেক বাগড়া পড়ছে। কিছু এখন ঠিক হয় ই। আজ হতে Lecture শুরু হবে, ৮টা Lecture দিবেন এর মধ্যেই ১/২৫ Lecture হয়ে গেল। Elmhirst রিপোর্ট লিখছেন। পনাদের পাঠাচ্ছেন কিনা জানি না, তিনি একটু নিঃশব্দে কাজ করেন। শা করি আপনারা কিছু খপর পাচ্ছেন। ক্ষিতিবাবুর চিঠি তো রাবাহিক আশ্রমে যাচ্ছে। ঠান্‌দি বোধ হয় বড় ব্যস্ত। কারণ শুনছি তাঁর ঠি সব তিনি পুনরায় নকল করে যথাস্থানে পাঠাচ্ছেন। ঠান্‌দি কে নাবেন আমি ঠাকুরদার তত্ত্বাবধান সদাই করি কারণ তিনি একটু ভোলা াক কিনা, ঠাকুরদার মুখে শুনলাম ঠান্‌দি নাকি উহার ভার আমার উপর য়েছেন আর আমার কথা মত চলতে বলেছেন। তার হাতে নিয়ে গিয়ে কুরদাকে আবার সঁপে দিতে পারলে বাঁচি। তিনি একটু বেশ হোম সিক্ য় পড়েছেন।

গতকল্য গুরুদেবের জন্য উৎসব হয়ে গেল গুরুদেবের ইহারা নূতন ম করলেন। বহু পুরাতন যুগে চীনা দেশকে ভারতীয়রা একটা নাম য়েছিলেন সেটা ওঁরা গুরুদেবের নামের শব্দের দিকটা মিলে এই নামটা জ চীনারা গুরুদেবকে ফিরিয়ে দিল — উচ্চারণটা ঠিক করা শক্ত, ভাল র অভ্যাস করে যাব পরে। দুটা নোড়ার মত প্রকাণ্ড শীল তৈয়ার করে নামে খুঁদে দিয়েছে। প্রায় ১৫/১৬ খানা ছবি বাঁধান Present রছে। একটা Thousand flowers বলে সুন্দর চীনা বাটী উপহার য়েছে। আর অনেক কিছু দিয়েছে সব পরে লিখব। —আমরা তিনজন লে আমাদের দেশবাসীর তরফ হতে এবং আশ্রমের তরফ হতে ইহার ন্য উৎসব করিলাম। আমি একটা ছবি, কালিদাসবাবু একটা কবিতা, কুরদা একটা ওজনদার শ্লোক উপহার দিয়ে পূজা শেষ করলাম। চিত্রা টক অভিনয় হয়ে গেল। এক রকম হল মন্দ নয় — ইংরাজীতে হল নাতে হলে ভাল হত। আমাকেও অল্প সাহায্য করতে হয়েছিল। কিন্তু দের চোখ নিয়ে বিপদে পড়তে হয়েছিল। এক রকম মণিপুরী গোছ হয়ে ল দেখতে। ইহাদের যুবক ও মেয়েদের মধ্যে তফাৎ খুব কম "চিত্রা" াধ হয় এদেশের লোক ছিলেন। ঠাকুরদার আজ বিবাহের উৎসব কি কটা করব তাই ভাবছি, ঠাকুরদা আজ সকাল হতে বসে ঠানদিকে চিঠি খতে আরম্ভ করেছেন।

মাঝে আমরা Hananfu গিয়ে এখানকার খুব পুরাতন স্থান দেখে লাম। এখানে পুরাতন যুগে বহু ভারতীয় সাধু ধর্ম প্রচার করতে সেছিলেন। Lungmen ও Paimasu এই দুটি জায়গা। Shinchen তে ৫, ৬ শতাব্দী B. C.-র বহু পুরাতন Bronze-এর পাত্র বাহির য়েছে দেখে এলাম। এসব Kaifung-এর University-তে আছে। সব জিনিসের একটা সেট ফটোই ওঁরা দিবেন বলেছেন। উপহারের নিস সব Elmhirst সাহেবই রাখছেন। একটা লিষ্ট করবার চেষ্টা রছি।

আমি কিছু পোঃ কার্ড Sketch করে পাঠাচ্ছি দেখেছেন বোধ হয়। ক সেট ফটো আমি যা তুলেছি পাঠিয়েছি। ক্যামেরাটা শেষ মুহূর্তে কিনে য়ে বড় উপকার করেছেন। আর এক সেট শীঘ্র পাঠাব যা হক একটা দল পাবেন।

পত্রের উপসংহারে বাড়ীর খবর পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সকল আশ্রম্ বাসীদিগকে ভালবাসা জানিয়ে শেষ করেছেন। এই দীর্ঘ চিঠিতে চীন সম্পর্কে নন্দলালের ভাবনার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার এই ঝিমিয়ে পড়া ও হতাশার ভাব কাটিয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠেন ও বাহবা দেন যখন দেখেন সারা চীন দেশ কাজ পাগল। তাই তিনি আফিংখোর হিসাবে সারা দুনিয়ায় চীনজাতির যে বদনাম আছে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন — এদেশের লোক আফিংখোর নয়। কাজ খোর, রাতদিন কাজ করছে। এক কথায়—নন্দলাল গুণীর কদর বুঝতেন ও যা ভাল তা স্বীকার করে নিতে কখনো পরাঙ্মুখ হতেন না।

শুনেছি নন্দলাল ভোজন রসিক ছিলেন। সাধারণ খাওয়ার মধ্যেই নূতন স্বাদ খুঁজতেন। স্কেচ করতে গিয়ে গ্রামে সরষের তেল মাখিয়ে মুড়ি খেতে ভালবাসতেন। গ্রামের লোকেরাও তাকে আপন বলে ভাবতো, সুখ, দুঃখের গল্প করতো। খাওয়ার জগতেও তিনি নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। (যোগীনের দোকানে পাতি লেবুর রস দিয়ে চা পান করা স্মরণ করা যেতে পারে) আমাদের একটা ধারণা আছে যে চীনের লোকেরা আরশোলা খায়। আরশোলা খাওয়া শুনেই আমাদের গা-টা কেমন যেন গুলিয়ে ওঠে। এ বিষয়ে নন্দলালের পাঠানো তথ্য থেকে তেমন কিছু জানতে পারি না। তিনি সেখানে গিয়ে বাঙ্গালী রান্না ও চীনে রান্নার স্বাদের তুলনা করেছেন। ঠানদিকে (ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী) বেশ মজা করে লিখেছিলেন—চীনে খাওয়া খেয়ে তবে আপনাদের রান্না খেলে লোকে তফাৎটা বুঝতে পারবে। কোনটা ভাল বিচার হবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের কথা, কলাভবনের ছাত্রদের কথা ভেবে কলা ভবনের বোহেমিয়ান ক্লাব মেসের উদ্দেশে লিখেছিলেন···বেশ মজা, রাস্তার ধারে ঘরে ঘরে চলন্ত রান্না ঘর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের আশ্রমে এ প্রথাটা চালালে ভাল হয়। ক্ষিদে পেলেই কিনে খাও। বর্তমানে আশ্রমের খাওয়া সমস্যায় জর্জরিত ছাত্রছাত্রীর দল এই রকম একটা প্রথায় খেতে পেলেই ভাল হত। এই রকম অভিনব মেসের কল্পনা ও ভারতের মাটিতে যেখানে এতো জাত-পাতের মারামারি সেখানে তা প্রয়োগ করার কথা ভাবা একমাত্র নন্দলালের পক্ষেই সম্ভব। সুদূর চীনে বসে নানান ব্যস্ততার মধ্যে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের তুচ্ছ খাওয়া নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন আবার বন্ধুর মত মজা করে চিঠি লিখেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পাড়ি দিয়ে চীন—তারপর চীন দেখে জাপানের মাটিতে পা দিয়েছিলেন নন্দলাল। দীর্ঘ সফরের ফলে শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো সেই কারণে খুব বেশী ঘুরতে পারেন নি। এ বিষয়ে এক জায়গায় নন্দলাল লিখেছেন—আমরা এখান হতে ২১শে জুন ছাড়বো। মাঝ পথে জাভা হয়ে যাবো। কালিদাসবাবু জাভায় থাকবেন। আমরা তিন জন ফিরবো—আগষ্ট মাসের গোড়ায় কি মাঝামাঝি ফিরবো। আমাদের শরীর বড় জখম হয়ে গেছে—সদাই ছুটোছুটি করতে হচ্ছে—বড় তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে—এত তাড়াতাড়ি দেখা অভ্যাস না থাকায় একটু অসুবিধা হচ্ছে। গুরুদেব সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জনিয়েছেন, তাঁর স্বাস্থ্যের খবর জানিয়ে বলেছেন—গুরুদেব ভাল আছেন, তবে বড় ধকল যাচ্ছে—উনি তাই সইছেন—আশ্চর্য সহ্য করবার শক্তি।

জাপানের মাটিতে পা দিয়েই জাপানের বিখ্যাত শিল্পী, কবি ও বিভিন্ন পেশার মানুষদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছেন—স্কেচ করেছেন, প্রাচ্য শিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইয়োনো নোগুচির মত বিখ্যাত কবি ও ইয়োকোয়ামা টাইকান বা কানজান্ শিমোমুরার মত বিখ্যাত শিল্পীদের স্টুডিওতে গেছেন ও শিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষত এই বিখ্যাত শিল্পীদ্বয় তৎকালীন জাপানের শিল্পকলায় এক ব্যাপক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছিলেন। জাপানের প্রথাগত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শিল্পকে মুক্তি দিতে চাইছিলেন। ঠিক ওই সময়ে নন্দলালের জাপান সফর ও ওই সব শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পের গতিপ্রতির ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিলো সন্দেহ নেই। ভারতীয় রেখা প্রধান ছবির সঙ্গে জাপানী ছবির একটা সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। সেখানে প্রত্যেক রেখাই প্রাণ, বিষয়বস্তু বাহুল্যবর্জিত ভারতীয় শিল্পের কাছে তারা যে ঋণী সেকথা অকপটে স্বীকার করে—কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব না রেখে নিজের মত করে আত্মসাৎ করে নিয়ে প্রকাশ করে।

জাপানীদের মধ্যে নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করার নমনীয় মানসিকতা ও প্রসারতা থাকলেও কোন বিদ্যা অপরকে শেখাবার অকৃপণ ইচ্ছা জাপানীদের নেই। সেকথা নন্দলাল এক জায়গায় লিখেছেন—এ দেশটা ঠিক বাংলা দেশের মত তবে বেশীর ভাগ পাহাড়—বোধহয় মণিপুরের মত, লোকেরাও মণিপুরের মত বড় মিশুক কিন্তু কোন জিনিস শেখাবার ইচ্ছা এদের বিশেষ নেই।

জাপানে গিয়ে চীনের মত বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি দেখেছেন ও উল্লেখযোগ্য উডকাটা প্রিন্ট সংগ্রহ করেছেন। এবং পরবর্তীকালে কলাভবনে জাপানী প্রথায় কাঠ খোদাই ও তার থেকে ছাপ নেওয়ার ক্রিয়া কৌশলের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

বর্মায় বা চীনে গিয়ে সমাজ সচেতন নন্দলাল যেমনভাবে ঐসব দেশ দেখেছেন জাপান সম্পর্কে সে রকম রকম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। মন্দিরে বুদ্ধ মূর্তির সামনে লীলায়িত ছন্দে বর্মী নাচ, তাদের খাওয়া দাওয়া বসবাস, তাদের ঘরবাড়ী, সেখানকার প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে যেমনটি আমাদিগে তথ্য দিয়ে, ছবি এঁকে জানিয়েছেন সে রকম জাপানের নাচ, সামাজিক আচার-আচারণ বা ধর্ম সম্পর্কে জানান নি। যদিও একটা দু'টা নাচের স্কেচ পাই—তার মধ্যে সামগ্রিক রূপ ও ছন্দ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। স্কেচের মাধ্যমে অভিবাদন বা প্রণাম করার ভঙ্গি দেখতে পাই ভারতীয়দের মত ধুতি মাথায় পাগড়ী পরিহিত হাতে মন্দিরা বাজানোর ভঙ্গির কিছু স্কেচ দেখতে পাই এবং ভারতীয় চেহারার সঙ্গে মিল খুঁজেছেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী ইকোয়ামা টাইকান সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—টাইকান সান-কে ধুতি পরিয়ে দিলে ভারতীয় বলে ভ্রম হয়। আর জাপানী মেয়েরা অন্যান্য কাজের মত সমুদ্রে মাছ ধরতে সমান পটু সেকথা নন্দলাল আমাদের জানিয়েছেন বা স্কেচ করে মাছ ধরার বিশেষ ভঙ্গি ধরে রেখেছেন। জাপানীরা যেন জীবনের সব রকম কাজের মধ্যে ছন্দ খুঁজে পায়—সে কথাটাই বোধ হয় পরোক্ষভাবে আমাদের বলতে চেয়েছেন। এই ছন্দকে আমরা ভারতীয়রা এখনো আয়ত্তে করতে পারি নাই।

জাপানীজ পুতুলের কথা পৃথিবী বিখ্যাত কিন্তু কোথাও সে সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান করেন নি। তবে এক জায়গায় দেখতে পাই জাপানের আর এক বিখ্যাত চিত্রকর আরাই কাম্পোসানের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছেন এবং আরাই কাম্পো কালো কালির তুলির আঁচড়ে, কেশ বিন্যাসের বিভিন্ন রূপ, ছাতা মাথা জাপানী বালিকার কিমানো পরিহিত ছবি প্রভৃতি এঁকেছেন। নন্দলাল এগুলিকে সস্নেহে তাঁর বড় মেয়ে গৌরীকে ৬ই মে ১৯২৪ তারিখে পাঠিয়ে দিয়ে লিখছেন—এগুলি তোমার আরাই কাকা এঁকে দিয়েছেন। কলাভবনে রাখতে দিও আজ আমরা টোকিও যাচ্ছি। তোমাদের পুতুলের বের নিমন্ত্রণ পেলাম। লুচিটা বাকী রইলো। এখানে নন্দলালের পারিবারিক ভাবনার সঙ্গে কলাভবনের সামগ্রিক ভাবনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কলাভবনকে তিনি নিজের পরিবারের একটা অঙ্গ মনে করতেন।

জাপানে পৌঁছে তিন সঙ্গীর সঙ্গে একত্রে থাকতে পারেন নি এবং জাপানী চিত্রকলার প্রচার ও প্রদর্শনী যাতে কলকাতায় হয় তার জন্য গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে সেখানকার বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা অবহিত করেন। তিনি লিখেছিলেন—আমরা টোকিওতে আছি। আমি আরাই সানের (মহাশয়) বাড়ীতে আছি, ক্ষিতিবাবু কিয়োতোতে একটি মন্দিরে আছেন। কালিদাসবাবু, এলমহার্স্ট ও গুরুদেব টোকিও ইম্পিরিয়াল হোটেলে আছেন। তাজিমা বলে একটি জাপানী ব্যবসাদার অনেক দিন কলকাতায় ছিলেন আপনাদের সহিতও খুব আলাপ আছে তাঁর ওখানে কয়েকদিন ছিলাম। সানু সান, কুসুমোতো সান, আরাই সান এবং অনেকগুলি আমাদের পূর্বেকার বন্ধু মিলে আমাদের যত্ন করছেন।

সাধারণ মানুষের বড় শিল্পীদের বসবাস করার বাড়ী ও তার আসবাবপত্র বা সাজানোর রীতি সম্বন্ধে নানা রকম কৌতূহল থাকে। নানা রকম কল্পনা থাকে। বিশেষ করে বিদেশী শিল্পীদের সম্বন্ধে। এখানে নন্দলাল টাইকানের বসবাস করার ও তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের এক সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন—তাইকান সানের বাড়ীতে গিয়েছিলাম বাড়ীটি বেশ সুন্দর একটি চালা ঘরের মধ্যে একটা গর্ত করে তাতে ধুনি জ্বালিয়ে তার চতুর্দিকে সকলের বসবার জায়গা করেছেন বাড়িটি ছবির মত। বড় অমায়িক লোক। আপনাদের কথা শুনে আহ্লাদিত হয়ে উঠলেন, সকলের কথা একে একে জিজ্ঞাসা করলেন। তাইকান সানের শরীর বড় খারাপ হয়েছে—অত্যন্ত মদ খাওয়ায় শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। এখানকার প্রায় সকলেই এক একটি ছোটখাট মাতাল বললেই হয়। তাইকান সান সম্প্রতি একটি ছবি শেষ করেছেন, তারও একটা ফটো দিয়েছেন। এঁর শরীর ভাল হলে আগামী বৎসর ভারতে যাবার বিশেষ ইচ্ছা আছে বললেন। সঙ্গে পনের ষোল জন আর্টিস্ট নিয়ে যাবেন। এরা সব বিজুতুইন সোসাইটির আর্টিস্ট। ইঁনি আমাদের ছবির একটা এক্জিবিশন এখানে করতে চান—এ বৎসরই করতে চান। ছবিগুলি তথা হতে আগস্ট মাসের প্রথমে পাঠানো দরকার—বড় তাড়াতাড়ি হবে। আর এক সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাঠালেও হয়। এক্জিবিশনের মত ছবি হবে কিনা জানি না। এ বৎসর হবে কি না বলতে পারি না। যদি সম্ভব হয় আপনি তাইকান সানকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন।

যে কোন চিঠি যে কোন মানুষের আসল ভাবনা প্রকাশের বাহন বলে যদি মেনে নিই তাহলে নন্দলালের এই চিঠিগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে নন্দলাল প্রাচ্য সফরের প্রথম থেকেই ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের, বিশ্ব সৌহার্দ্যের সন্ধান করেছেন। চীনে গিয়ে কোন একটা শিল্প সোসাইটির সঙ্গে তৎকালীন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত তাঁদের নিজেদের সোসাইটির ভাববিনিময় করতে চেয়েছেন। অনুরূপভাবে জাপানে গিয়ে সেখানকার শিল্প সোসাইটিগুলির সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে চেয়েছেন। এক কথায় নন্দলালের এই প্রাচ্য সফরে কলাভবন তথা ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে সার্বিক লাভ হয়েছিলো।

নন্দলাল পাশ্চাত্ত্য রীতিতে শিক্ষা লাভ করেও উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচ্য তথা ভারতীয় শিল্পধারাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে তাই তিনি মনে প্রাণে কলাভবনকে প্রাচ্য শিল্পচর্চার প্রাণ কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলে চেয়েছিলেন। কলাভবনকে কেন্দ্র করে যে নূতন শৈলী গড়ে উঠেছিলো তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভারতবর্ষ, সিংহল ও বহু বিদেশের ছেলে-মেয়েরা ইউরোপীয় প্রথায় শিল্প শিক্ষা ছেড়ে কলাভবনে শিক্ষালাভ করতে আগ্রহী হতো।

নন্দলালের জীবদ্দশায় বা তাঁর উত্তর কালে প্রাচ্য শিল্প রীতির কলা-কৌশল নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং তার ফসলে কলাভবন নানান দিক দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

বর্তমানে এত রকমের আধুনিক প্রয়োগরীতির ঢেউয়ের ধাক্কা ও চলন থাকা সত্ত্বেও প্রাচ্য শিল্পরীতির ধারা ওই সব আধুনিক করণ-কৌশলের উপর অস্পষ্ট ছায়া ফেলে ক্ষীণ কায়া হয়েও কলাভবনের অন্তঃস্থলে প্রবহমান আছে ও ভবিষ্যতে থাকবে বলে আশা করা রাখি।

এই রচনায় ব্যবহৃত আলোকচিত্র ও তথ্যাদি কলাভবন ও রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

শান্তিনিকেতনের শ্রী ও সৌন্দর্যের রূপকার নন্দলাল

দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[শা]ন্তিনিকেতনের সৌন্দর্য, রুচিবোধ, সুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান মঞ্চ সাজানোয় নন্দলাল বসুর প্রভাব অসীম। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে [কলাভ]বনের কর্ণধার হিসাবে ১৯১৯ সালে অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল [শান্তি]নিকেতনে এলেন—সেদিন থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনের [মাস্টা]র-মশাই"। শিল্পগুরু নন্দলাল যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন দেশ জুড়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ—মানুষের চেতনায় সাহিত্যে সঙ্গীতে জাতীয়তার স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষ—রবীন্দ্রনাথ সেই [ধা]রার অন্যতম রূপকার। শান্তিনিকেতনে তিনি যে প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চার গড়ে তুললেন সেখানে জাতীয় ঐতিহ্য শিক্ষা সংস্কৃতি অনুশীলন স্থান পেল। প্রাচ্যের শিল্প কলা সঙ্গীত সাহিত্য নানা বিদ্যার [অনুশী]লন শান্তিনিকেতনে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। ললিত কলায় গুরু অবনীন্দ্রনাথের ধারা এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণায় নন্দলালের যে সৃজনশীল রঞ্জনার ধারা নেমে এল—তারই [প্রতিফ]লন—শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতনের উৎসব-মঞ্চের সজ্জায়, [দেয়া]লচিত্রে, বাড়ি-তোরণ ও বাগান তৈরির পরিকল্পনায়, কলাভবনের [আঙি]নায়, এমন কি ছাত্র ছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনে—একান্তই প্রাচ্যের রুচি ও সৌন্দর্যবোধ বিকশিত হয়ে উঠলো। জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনে শিলাইদহ পদ্মার প্রকৃতি আর এই বীরভূমের রুক্ষ খোয়াইয়ের প্রকৃতি মিলে মিশে এক নূতন রূপ ধারণ করলো। যার প্রভাব এল শান্তিনিকেতনের ভৌগোলিক জীবনে পরিবেশ এবং রুচিতে। এই পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিক্ষাকে নানান সৃষ্টিশীলতায় রঞ্জিত করার ভার নিয়েছিলেন শিল্পী নন্দলাল। এখনকার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রতীর্থ পরিদর্শনে দেশ-বিদেশের লক্ষাধিক মানুষ প্রতি বৎসর আসেন। এখানে এসে এখানকার পরিবেশ, বাড়ি ঘর-এর স্থাপত্য-সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি সুরুচি যে কত সুন্দর ও শিল্পময় হতে পারে তা-তাঁরা অনুভব করেন। শান্তিনিকেতনের বাড়ি-সিংহাসদন, পুরানো লাইব্রেরী তার গায়ে ফ্রেস্কো, সন্তোষালয়, চীনা ভবন-হিন্দী ভবনের ফ্রেস্কো, চৈত্য, কলাভবনের কালো বাড়ি, হ্যাভেল হল, নবনন্দন এবং উত্তরায়ণে কবির শেষ জীবনের বাড়ি ঘর গুলির বিচিত্র স্থাপত্য সকলকে তৃপ্তি দেয়, রুচিকে উন্নত ও প্রসারিত করে। এখানে আনন্দ-অনুষ্ঠানের উৎসবের মঞ্চকলা, সজ্জা, রৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সজ্জায় রুচির অপূর্ব বৈচিত্র্যময় সামঞ্জস্য, এখানকার প্রাচ্য-ভাবাদর্শে স্থাপত্য, পোষাক পরিচ্ছদে সামঞ্জস্য

[বী]থিকা'র দেয়ালে অজন্তার রঙচিত্র—নন্দলাল স্বয়ং দেখাচ্ছেন তাঁর ছাত্রীদের

নন্দলাল পরিকল্পিত মণ্ডপের তোরণ। আলপনার জন্য নন্দলাল ছাত্রীদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ময় ভারসাম্য-সমস্ত কিছু অখণ্ড ভাবে প্রতিটি মানুষকে শুধু আকর্ষণ করে না—অনুপ্রাণিতও করে। শান্তিনিকেতনের এই বিশিষ্টতা, এই রুচি, সংযম সব কিছুর মূলে শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা আর তাঁর সহকর্মীদের দীর্ঘ দিনের চিন্তা ভাবনা আছে। রবীন্দ্র সহকর্মীদের মধ্যে প্রথম সারিতে যে ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যে নাম করতে হয় নন্দলালের।

শান্তিনিকেতনের রূপসজ্জায় নন্দলালের ভিত্তি চিত্র, যেগুলি হয় জয়পুরী পদ্ধের রীতিতে বা ইটালিয়ান বুয়ানো পদ্ধতিতে অঙ্কিত। আশ্রমের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো। এগুলি পুরানো লাইব্রেরীর বারান্দায়—ঘরে—দোতলায়, সন্তোষালয়ের দেওয়ালে, হ্যাভেল হলে, চীনভবন—দিনান্তিকার দেওয়ালে, শ্রীনিকেতনের উৎসব-মঞ্চে—এক অপরূপ রূপে বিরাজ করছে। শান্তিনিকেতনের ভিত্তি চিত্র অঙ্কন প্রথমে কি ভাবে শুরু হয়েছিল এই প্রসঙ্গে বর্তমান আশ্রমিক কলাভবনের প্রথম যুগের ছাত্র প্রবীণ শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—"১৯২১ সালে শীতকালে নন্দবাবু, অসিতবাবু, সুরেনবাবু মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র রাজ্যে বৌদ্ধযুগের বাগগুহার দেওয়াল চিত্র নকল করতে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা সর্বদা পোস্টকার্ডে ছবি এঁকে সংবাদাদি সহ চিঠি লিখতেন এবং তার মধ্যে দেওয়াল চিত্র অঙ্কন পদ্ধতি বিষয়ে উল্লেখ থাকতো। তাঁদের চিঠির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বিনোদ ও আমি যে গৃহে বাস করতাম (বর্তমান সন্তোষালয়, শিশুছাত্রীবাস) তার দেওয়ালে মাটির রং ও ভাতের মাড় মিশিয়ে দুইটি চিত্র এঁকেছিলাম। অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ তাঁদের থাকবার গৃহের দেওয়ালে অজন্তা চিত্রের নকলে কতগুলি হরিণের চিত্র এঁকেছিলেন। শান্তিনিকেতনে দেওয়াল চিত্র অঙ্কনে এটাই সর্বপ্রথম সূচনা। .... বাগগুহা চিত্রের নকল করার কাজ সমাপ্ত করে নন্দবাবু ওঁরা আশ্রমে ফিরে এলেন। ১৯২২ সালে। সেই বছরের গ্রীষ্মের ছুটির পর বাড়ি থেকে আশ্রমে ফিরে এসে দেখি পুরাতন লাইব্রেরীর পশ্চিমাংশের একটি গৃহের চারিপাশের দেওয়ালে নন্দবাবু ছবি এঁকে রেখেছেন। তাঁর তুলির স্পর্শে সমস্ত দেওয়াল জুড়ে পদ্মের, পদ্মপাতার, বক, মাছ ইত্যাদির ছবিতে শ্রীমণ্ডিত! তারপর ১৯২৯ সালে দেওয়াল চিত্র অঙ্কনে প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। জয়পুর থেকে একজন জয়পুরী দেওয়াল চিত্র অঙ্কনে পটু শিল্পী নরসিংলাল এঁর সহায়তায় নন্দবাবু তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে পুরাতন লাইব্রেরীর বারান্দার দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি আঁকলেন। পরবর্তীকালে ভিন্ন পদ্ধতিতে কলাভবনের নন্দন নামক গৃহের দেওয়ালে, চীনভবনে নন্দবাবু ও তাঁর ছাত্রের দল অনেক ছবি আঁকেন। ..... কলাভবনের ইতিহাসে দেওয়াল চিত্র অঙ্কনের যেন একটা ঢেউ এসেছিল।"

পুরাতন লাইব্রেরী (বর্তমান পাঠভবন) দোতলায় একতলায় দেওয়াল চিত্রের শিল্পসুষমা অপরূপ রূপ ধারণ করে আছে। যেমন অঙ্কনের ছন্দ তেমনি তার রং-এর বাহার—চোখকে আরাম দেয় মনকে আনন্দ দেয়। দোতলার দেওয়ালে জয়পুরী রীতিতে প্রথম আঁকা হয় চীনা পারসিক মিশরীয় চিত্রের অনুকৃতি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙক্তিও দেখা যায় ওখানে—

'হে দুয়ার তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ
.... রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।'

একতলায় বারান্দায় একই রীতিতে নন্দলাল আঁকলেন তাঁর প্রথম ফ্রেস্কো—'চৈতন্যের জন্ম' বর্তমান সন্তোষালয়ে (শিশুছাত্রী বাস) কলাভবন যখন দ্বারিক বাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত হয়—গৃহের অভ্যন্তরে দেওয়ালে নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের দিয়ে দেওয়াল চিত্র আঁকেন। চীনভবনের বারান্দায় তিনদিকের দেওয়াল জুড়ে শুধু ছবি আর ছবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নটীর পূজার দৃশ্য এবং প্রাচীন গল্পকথার চিত্রায়ণ। প্রথম ঘরে প্রথমেই চোখে পড়ে অজন্তা গুহাচিত্রের অনুকৃতি শিল্পী নন্দলালের আঁকা মারবিজয়। 'দিনান্তিকা' খেলার মাঠের পূর্বপ্রান্তে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। এটি বাসগৃহ নয় বৈকালিক চায়ের আসর। নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রদল 'দিনান্তিকার' দেওয়ালে অজন্তার রঙ্গ-চিত্র এঁকে চায়ের আসরকে সরস করলেন। শ্রীনিকেতনের উৎসব মঞ্চের দেওয়ালে নন্দলালের পরিচালনায় কলাভবনের অধ্যাপক, ছাত্রদল অঙ্কিত ফ্রেস্কো চিত্রে চিত্রিত আছে এক হলকর্ষণ উৎসবের স্মৃতি। ছয়টি প্যানেলে সম্পূর্ণ উক্ত ফ্রেস্কোতে রবীন্দ্রনাথ, এলম্ হারসট্ ও পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর প্রতিকৃতি দেখা যায়। এলম হারসট্ সাহেব লাঙল ধরে আছেন, রবীন্দ্রনাথ লাঙল স্পর্শ করে এলম্ হারসট্‌কে আশীর্বাদ করছেন, বিধুশেখর মন্ত্র পাঠ করছেন। ফ্রেস্কোর একদিকে আছে বেদ মন্ত্র, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের গান। যে গানে আছে শ্রীনিকেতনের মর্মবাণী....

'ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে
চেয়ে আছে মুখের পানে'..

দেওয়াল চিত্র অঙ্কন এর অপরূপ সজ্জা ছাড়াও শান্তিনিকেতনের বাড়ী ঘর তোরণ বীথি কুঞ্জ উদ্যান রচনার পরিকল্পনায় শিল্পী নন্দলালের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। প্রকৃতি ও গাছপালার সঙ্গে সমতা রেখে বাড়ী ঘর নির্মাণের পরিকল্পনায় স্থপতি শিল্পী সুরেন করকে তিনি সব সময় সাহায্য করেছেন শ্রীনিকেতনের প্রধান প্রবেশ পথের যে তোরণ তার দুটি বড় দরজা (গেট)—গ্রামীণ গরুর গাড়ীর চাকার আকৃতিতে তার পরিকল্পনা নন্দলালের। শান্তিনিকেতনের এক সময়ের 'বিজ্ঞান সদন'এর রাজশেখর তোরণ, তার পাশে নালন্দা বিশ্বদ্যিালয়ের অনুকরণে জলের ইঁদারা ও স্নানাগার, পান্থনিবাসের জলের ইঁদারা, সন্তোষালয়ের শিশুদের স্নানের জায়গায়—ঘিরে রাখা একটি অতি সাধারণ প্রাচীরের গায়ে শিশুদের প্রিয় হাঁস, হরিণ, ষাঁড় ও সিংহের প্রতিকৃতি রঙীন পোড়ামাটির শিল্প মণ্ডিত করা নন্দলালের পরিকল্পনায়— শিল্পী রামকিংকর ও ছাত্রছাত্রীদের কাজ জায়গাটিকে মনোরম করেছে। আশ্রমের কেন্দ্রস্থল 'চৈত্য' —কালো রঙের বাড়ির ভিত দেওয়াল সবই মাটির। কবির ইচ্ছায় শিল্পী নন্দলাল স্থপতি সুরেন কর পরীক্ষামূলকভাবে মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশিয়ে এই মাটির মন্দির তৈরি করেন (১৯৩৪)। আসলে এটি মন্দির নয়—প্রদর্শ কক্ষ। এখানে বিশেষ বিশেষ শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। 'চৈত্য' এর অনুকরণে ১৯৩৫ সালে শ্যামলী বাড়ি ও ১৯৩৭ সালে 'কালো বাড়ি' তৈরি হয়।

রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় 'শেষবেলাকার ঘরখানি' শ্যামলী'র স্থাপত্য ও ভাস্কর্য পরিকল্পনায় শিল্পী নন্দলাল ও স্থপতি সুরেন করের ভূমিকা সর্বজন বিদিত। শ্যামলীর গায়ে বিখ্যাত নতোন্নত ভাস্কর্য বা বাস্ রিলিফের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম নন্দলালের 'লড়াইয়ের ঘোড়া'—যার প্রাপ্তিস্থান গো-ঘাট থানার বালী দেওয়ান গঞ্জ গ্রামের ভগ্নপ্রায় মন্দির। শ্যামলীর দেওয়াল ভাস্কর্যগুলির মধ্যে দিয়ে নূতন পদ্ধতিতে মন্দির টেরাকোটার শৈলীর পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস দেখা যায়। এর আঙ্গিক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের —প্রচলিত পোড়া মাটির বদলে কাদা মাটি, তামাটে লাল রঙের বদলে আলকাতরার প্রলেপ বোলানো কালো রঙ—ছোট ছোট টালির বদলে বড় বড় একক প্যানেল। মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'—নির্মাণের স্মৃতিচারণে গুরুদেবের পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী বলেছেন (অনুলেখক সৌমেন অধিকারী)—"মাটির বাড়ি শ্যামলীর ডিজাইন করলেন সুরেন বাবু আর নালন্দা এবং বোরোবুদুরের ডিজাইন মিশিয়ে পারসপেকটিভ তৈরি করলেন স্বয়ং নন্দলাল বসু। ...দেওয়ালের গায়ে বাস্-রিলিফের কাজ করার দায়িত্ব নন্দবাবু দিলেন স্বয়ং রামকিংকরকে।...উত্তরায়ণের বাগান তখন জমে উঠেছে। শ্যামলীর আশে পাশে নন্দবাবুর ইচ্ছামত (মাটির রঙ মিলিয়ে)—রথীন্দ্রনাথ ইউক্যালিপটাস্ ও আম গাছের চারা ঘন করে লাগালেন। এখন দেখা যায় বাড়ির সঙ্গে ল্যাণ্ডস্কেপের কি অপূর্ব মিলন ঘটেছে।"১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখ জন্মোৎসব ও গৃহপ্রবেশের পর ২৯ বৈশাখ বিদেশে অবস্থান রত পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— "২৫ বৈশাখের হাঙ্গামা চুকে গেল। ওর সঙ্গে গৃহপ্রবেশ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। মাটির বাড়ীটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেওয়ালে মূর্তি করবার জন্য কিছু কাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করছে—রাত্রি আলো জ্বালিয়েও কাজ চলছিল। গ্রামের লোকের ঔৎসুক্য সব চেয়ে বেশী। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ।"

কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্রাবাস—। কালো বাড়ি ১৯৩৭ সালে চৈত্য—শ্যামলীর অনুকরণে তৈরি হয়। দেওয়াল চিত্রে—ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে এ'ও এক অপরূপ। নন্দলালের পরিকল্পনায় পশ্চিমদিকের দেওয়াল বাদে তিনদিকের দেওয়াল এবং থামগুলি বিচিত্র শিল্পকর্মে শোভিত!—আসীরীয় মিশরীয়—অজন্তা এবং বাংলার লোকশিল্পের সুন্দর অনুকৃতি এই ছাত্রাবাসকে এক চিত্রশালায় পরিণত করেছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে শিব-পার্বতীর বিবাহ দৃশ্য—দক্ষিণ ভারত কেরালার

একটি মন্দির গাত্রের ড্রইং বা রিলিফের কাজ থেকে সংগৃহীত।

পুরানো লাইব্রেরীর বারান্দায় মুক্তাঙ্গন মঞ্চের পরিকল্পনা. হ্যাভেল হলের দেওয়ালে গান্ধীজীর দাণ্ডি অভিযানের আর্কিটেকচার স্থাপত্য এখনো সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

শান্তিনিকেতনের উদ্যান রচনায়—বাগান সাজানোয়—ছায়াঘন দেশী গাছ লাগানোয় এবং গাছের ফলফুলের প্রতি নন্দলালের মমত্ব ছিল অপরিসীম। প্রখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরী তাঁর 'নন্দনের কুঞ্জতলে' প্রবন্ধে বলেছেন—"কলাভবনে শিক্ষাকালে গাছ পালা স্টাডি করবার জন্য তিনি আমাদের নিয়ে যেতেন গাছের কাছে, ফুলের কাছে। তিনি কোন গাছের ডালপালা ভাঙ্গতে দিতেন না—আমাদের এবং কেউ ভাঙ্গলে তিনি প্রাণে বড় ব্যথা পেতেন। তিনি বলতেন 'ওদেরও তো প্রাণ আছে'। সেই হতে সামান্য তৃণকেও তুচ্ছ মনে করতে পারি না। প্রকৃতির অন্তরালে তার যে কত বিচিত্র রূপ লুকিয়ে আছে, তিনিই একদিন আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। এখন যতই প্রকৃতি স্টাডি করি, দেখতে পাই তার অপরূপ সৌন্দর্য। একবার মাষ্টার মশাই আমদের কলাভবনের জানলার পাশে প্রত্যেক মেয়ের জন্য একটা করে ফুলের বাগান করার পরিকল্পনা করলেন। অনেক ফুলের ও গাছের নাম লিখে লটারী করা হোল! যার ভাগ্যে যে গাছের নাম উঠলো—তা নিয়েই সে বাগান করা শুরু করে দিল। আমার ভাগ্যে উঠেছিল একটি 'শাল বৃক্ষ'—। আর সকলের ভাগ্যে নানা রং-এর ফুল গাছ উঠেছে। আমার একটু মন খারাপ হলো এই ভেবে যে সকলেরই বাগান বেশ রং-চং ফুল গাছে শোভা বর্দ্ধন করবে আর আমি এত বড় শাল গাছ নিয়ে কি করবো, এই গাছ কতদিনেই বা বড় হবে। কিন্তু মাষ্টার মশাই আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বললেন—'শাল বৃক্ষতলে ভগবান বুদ্ধ সাধনা করতেন, এর মূল্য অনেক বেশী। এই গাছ বহুকাল বেঁচে থাকবে এবং অন্য ফুল গাছ সুন্দর হলেও তার অল্প আয়ু'। তাঁর কথায় সেদিন সত্যি আমি বড় আনন্দ পেয়েছিলাম।"

গাছ পালার ফুল—তার রং এর প্রতি নন্দলালের সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রসঙ্গে শিল্পী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মন তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন—'মার্চ মাস ১৯৫৪ সাল। কলাভবন প্রাঙ্গণে বসন্তকাল সমাগত। পলাশ-শিমুল ফুলের ছড়াছড়ি, ডালে ডালে আর পাখিদের আনাগোনা চলছে গাছে গাছে মধুর লোভে। অন্যান্য দু'একটি ফুলের গাছেও ফুল ফোটা আরম্ভ হয়েছে। যেমন—বনপুলক, পিয়াল ইত্যাদি। ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভরপুর। গাছের শুকনো পাতা ঝরা শুরু হয়েছে কিছুদিন পূর্বেই! শিরীষের শুকনো বীজগুলি হাওয়ায় নড়ে বিচিত্র ধ্বনি তুলছে। সকালের দিকে কলাভবন স্টুডিও গুলিতে ক্লাসের কাজ চলছে। আমার স্টুডিওর জানলার বাইরে হঠাৎ এসে গুরু নন্দলাল ডেকে বললেন, 'শিগগিরি এসে দেখ কি চমৎকার'—। ছুটে এসে দেখি ঝড়ো হাওয়ায় শিরীষ ফুলের শুকনো বীজগুলি শিমুল গাছের শুকনো পাতাগুলিকে পাখির ঝাঁকের মতো উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তিনি মন্তব্য করলেন 'এই সৌন্দর্য ছেলেদের চোখে পড়া চাই'—।"

কলাভবন প্রাঙ্গণে ছায়াঘন দেশী গাছ—জামবন, পেয়ারা, মেহেদি, কামিনী, নাকুড়, পিয়াল, সৌদাল, অশোক, পলাশ, শিমুল, শিরীষ, বনপুলক প্রভৃতি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা মাষ্টার মশাইয়ের। কলাভবন বাগান ও অন্যান্য উদ্যান প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু মহাশয়ের শিল্পী পুত্র বিশ্বরূপ বসু তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন—"কলাভবনের বাগান বেড়ে ওঠার সময় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সকালের দিকে কলাভবন প্রাঙ্গণে এসে বাবামশায়ের সঙ্গে ঘুরে এই বাগান দেখতেন। তাঁর গান-কবিতায় যে সমস্ত গাছ ও ফুলের কথা আছে বিশেষ করে দেশীয় গাছগুলির বেড়ে ওঠা দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। সুরেন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাবা-মশায় কলাভবন, ছাতিমতলা ও গুরুদেবের পুত্র উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রথীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরায়ণের বাগান সাজিয়েছিলেন। এখানকার ছোট-বড় মাঝারী গাছগুলি -তাদের আকার ফুল-পাতা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিল্প ও সৌন্দর্য রুচিতে এলোমেলো ভাবে (ইনফর্মাল) বসিয়েছিলেন। এখানকার উদ্যান দেখলে মনে হবে রুক্ষ খোয়াই-মাটির উপরে গাছগুলি আপনা থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কৃত্রিমতার জঞ্জাল এর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বেড়ে উঠেছে এবং এই সুন্দর মনোরম বাগানে পরিণত হয়েছে। এখন দেখা যায় ঋতু অনুযায়ী প্রকৃতির স-যত্ন রচিত নানান রং-এর ফুল পাতা নিয়ে উদ্যানগুলি আমাদের আনন্দ দিচ্ছে।"

আনন্দ অনুষ্ঠানে-উৎসব মঞ্চ সজ্জায়, উৎসব অনুযায়ী সুরুচিপূর্ণ পাত্র পাত্রীদের সাজ-সজ্জা, সভা সমিতিতে শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম পরিবেশ রচনা যা এখনো শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে বিদ্যমান তার জন্য নন্দলালের দান স্বীকার্য। একদা শান্তিনিকেতনের উৎসব মঞ্চের মধ্যমণি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যের আবাল্য পূজারী শান্তিদেব ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন—"যখনই কোন নাটক বা নৃত্যনাট্য আশ্রমে হোত, সেটা ছোটদের (স্কুল ছাত্র) হোক আর বড়দের হোক—মাষ্টার-মশাই মহড়ায় দিনের পর দিন উপস্থিত থেকে নাটকের চরিত্রগুলি এবং পাত্রপাত্রীর 'ফিগার' অনুযায়ী সাজ-সজ্জার উপকরণ তৈরি করতেন। মঞ্চ সাজানোয় তার পরিকল্পনা—কত নিষ্ঠা, কত পরিশ্রম করে করতেন তা ভাবাই যায় না। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে সামনে রেখে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাটকের সাজ-সজ্জা উপকরণে মাষ্টার মশাই কোন বিশেষ কাল ও দেশের অনুকরণ করেন নি। ভারতীয় ও স্থানীয় ছন্দে—রবীন্দ্র নাটকের পাত্র পাত্রীর পোশাক পরিচ্ছদ, স্টেজ সজ্জা—মঞ্চের পিছনে একটা নীল কাপড়ের উপর হলদে গেরুয়া, মেরুন রঙের কাপড় লাগিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি তিনি করেছেন যার মধ্যে সব সময় একটা নূতত্বের ছাপ যা কোন বিশেষ যুগের বা বিশেষ বছরের ছবি হয় নি। এ ছাড়া আশ্রমে যখনই কোন নাটক গান কবিতা অনুষ্ঠিত হত—অনুষ্ঠানের জায়গায় সৌন্দর্যের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন 'মাষ্টার মশাই'—নানা রঙের আলপনায়, মনোহর সজ্জায়, নাচের মেয়েদের ফুলের মালায় সাজিয়ে। উৎসব-বেদী স্থানীয় প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে সাজিয়েছেন। খোয়াই এর লাল মাটি, ধান জমির সাদা মাটি গোবর দিয়ে নিকিয়ে তার উপর ঋতু অনুযায়ী কখনো রঙীন পাথুরে মাটি দিয়ে, কখনো চাল, ডাল তিল সর্ষে দিয়ে, কখনো নানারঙের ফুল, কাঁঠাল পাতা, কলকে পাতা দিয়ে আলপনার রেখা এঁকেছেন—এবং উৎসব প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য বাড়িয়েছেন! উৎসব মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারে অস্থায়ী তোরণ সহজপ্রাপ্য উপাদান চট, কাপড়, তালপাতা, কুলো, খড় ইত্যাদি দিয়ে নির্মাণ করতেন। এখনও পৌষ মেলা মাঠের প্রধান প্রবেশ পথের তোরণ (খড়ের গেট) তারই অনুকরণ! ঋতু অনুযায়ী ফুল পাতা দিয়ে বর্ষামঙ্গল শারদোৎসবের স্টেজ সাজিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সহযোগী হিসাবে দেখেছি শিল্পী বিনায়ক মসোজী, শ্রীযুক্তা সুকুমারী দেবী ও সুরেনবাবুকে। তাই শান্তিনিকেতনের প্রতিটি আনন্দের আয়োজনে উৎসব অভিনয়ে মাষ্টার মশাইয়ের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য এবং অবশ্যস্বীকার্য।"

আজকের আশ্রমের কলাবিদ্যার যে দান, যে বিকশিত রূপ, আনন্দলোক সৃষ্টির মূল প্রেরণা, ভাষা ও ছন্দ, এক কথায় তার যা প্রাণ-বস্তু, সে সব সৃষ্টি হল আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের কিন্তু এর বহিরঙের শ্রী বৃদ্ধি, একে বিভূষিত করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন তিনি নন্দবাবু ও সুরেনবাবুকে। আজকের শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের যে রূপ-সৌন্দর্য, কলাবিদ্যার যে দান, যে বিকশিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় তা রূপকার নন্দলালের পরিশ্রমের ফল বললে অত্যুক্তি হয় না।

নন্দলাল বসু মহাশয় ১৯১৪ সালে প্রথমে একবার আশ্রমে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসেন। প্রথম আগমনে তার অভ্যর্থনা হল আশ্রমের আম্রকুঞ্জে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে একটি কবিতায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানান

"তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ!
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।"

বহুদিন আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রথম উপহারে নন্দলালকে নন্দিত করেছিলেন তার পূর্ণচ্ছেদ করে গেলেন, শেষ জীবনে মাষ্টার মশাই এর এক জন্মদিনে (৩.১২.১৯৪০), একটি ছোট্ট কবিতায়—

'রেখার রহস্য যেথা আগলিছে দ্বার
সে গোপন কক্ষে জানি জনম তোমার।
সেথা হতে রচিতেছে রূপের যে নীড়,
মরুপথ শ্রান্ত সেথা করিতেছে ভীড় ॥'

সংবাদে নন্দলাল (১৯০৭—১৯৭৬)

[চিত্রকলার ইতিহাসে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে নন্দলালের জীবন। ভারত তথা বাংলার বরেণ্য এই শিল্পীর সে জীবনকে নিয়ে হয়েছে নানা গবেষণা বহু আলোচনা। কিন্তু নন্দলালের জীবনকাহিনীর সবটা আজও অজানা। অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে নন্দলালের পথচলার সে কাহিনী। দৈনিক আর সাময়িকে প্রকাশিত সেই কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সংবাদ, মন্তব্য আর সমালোচনার মধ্যে। তাঁর জীবনেতিহাসের সেই বিচিত্র ঘটনাগুলিকে পরম্পরাক্রমে গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। তবে নন্দলালের জীবনকাহিনীর সম্পূর্ণ পঞ্জীয়ন এটি নয়। আয়তনের দিকে দৃষ্টি রেখে যতটা সম্ভব তাঁর সম্পর্কিত সংবাদ গ্রথিত করা হলো এ অধ্যায়ে। ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কিত সংবাদও আছে এ সংকলনে। তবে সেক্ষেত্রে সেগুলিকে উদ্ধৃত করা হলো অনুবাদের আকারে।]

দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট

গত শনিবার সন্ধ্যায় সোসাইটির সদস্য ও সুহৃদদের আপ্যায়নের জন্যে মিঃ ডাডলে মায়ারস 'অ্যাট হোম'-এর আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণকর্তার কৌতূহলোদ্দীপক চীনামাটির শিল্পসামগ্রীর সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়।...বিপুল পরিমাণ অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে প্রাচ্য এবং ইউরোপীয় শিল্পসামগ্রী প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।...দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অবনীন্দ্রনাথের 'ওমর খৈয়াম' নামের একটি ছোট চিত্র, যা তাঁর প্রদর্শিত অন্যান্য সামগ্রীর মতই মনোজ্ঞ, সেটির উল্লেখ করছি। এগুলির সঙ্গে আর্ট স্কুলের মিঃ বোসের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন একটি ছোট জলরঙের সামগ্রীও প্রদর্শিত হয়েছিল। আমরা এটি দেখে আনন্দিত। স্কুলটির বর্তমান ও অতীতের ছাত্রদের অনেকের যোগ্যতা
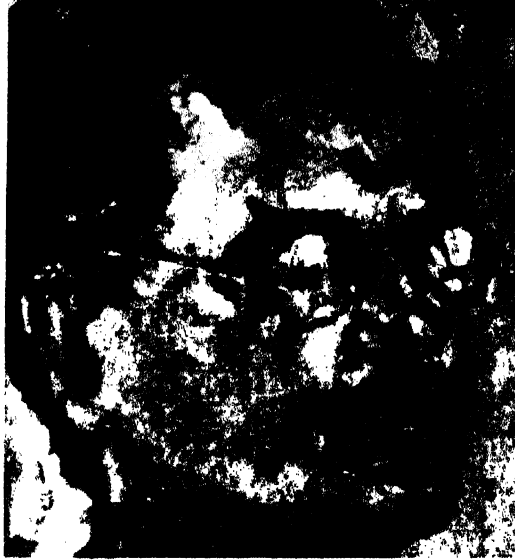
অতুল বসুর আঁকা নন্দলালের প্রতিকৃতি (১৯৩৬)

সন্দেহাতীত ও সুপ্রমাণিত। এ বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে, অন্যান্যদের মধ্যে, মিঃ গাঙ্গুলী, মিঃ এন এল বোস এবং মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদের সামগ্রীগুলির প্রতি অঙ্গুলীসঙ্কেত প্রয়োজন। আগামী শনিবার মিঃ গগনেন্দ্রনাথ এবং মিঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোসাইটি এবং এই প্রতিষ্ঠানের সুহৃদদের আপ্যায়ন করবেন।

দি ইংলিসম্যান : মঙ্গলবার, ২৩ জুলাই ১৯০৭

[মিঃ বোস, মিঃ গাঙ্গুলী,
মিঃ এন এল বোস এবং
ঈশ্বরীপ্রসাদ
যথাক্রমে হরিনারায়ণ বসু,
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
নন্দলাল বসু ও ঈশ্বরীপ্রসাদ
বর্মা।]

দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট

... ...গত শনিবার সন্ধ্যায় মিঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মিঃ গগনেন্দ্রনাথ ও মিঃ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের গৃহে সোসাইটি এবং সোসাইটির সুহৃদদের জন্যে যে 'অ্যাট হোম'-এর আয়োজন করেন সেখানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদর্শিত চিত্র 'মাদার ল্যাণ্ড'-এ এই সত্যই স্বীকৃতি পেয়েছে।... ...

তাঁর প্রভাব তাঁর ছাত্র মিঃ এন এল বোস এবং মিঃ এস গাঙ্গুলীর চিত্রেও সুস্পষ্ট। প্রথমজনের জলরঙে আঁকা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে সূর্যদেবের আরাধনারত কর্ণের চিত্রটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এগজিবিসনে পদকপ্রাপ্তির উপযুক্ত এবং মহাভারতের অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চিত্রটিও অতি চমৎকার।...

(দি ইংলিসম্যান : মঙ্গলবার, ৩০ জুলাই, ১৯০৭)

[আলোচ্য 'মাদারল্যাণ্ড'-ই হলো অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা'।]

প্রাচ্য চিত্রকলার প্রদর্শনী

সদস্যদের আয়োজিত কয়েকটি 'অ্যাট হোম'-এর পরে (শেষেরটি আপ্যায়নকারী ছিলেন সভাপতি অর্থাৎ কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ) গতকাল অপরাহ্নে দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রাচ্য চিত্রকলার আর্ট গ্যালারিতে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটি আগামীকাল থেকে বিনামূল্যে জনসাধারণের জন্যে বিজ্ঞাপিত সময়ে এক সপ্তাহের জন্যে খোলা থাকবে।

যে তিনটি দেশের প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রকলা প্রদর্শিত হবে সে দেশ তিনটি ভারতবর্ষ, জাপান ও চীন। দুষ্প্রাপ্য বা প্রাচীন সামগ্রীর বিভাগটিতে ভারতীয় চিত্রকলার মনোজ্ঞ সম্ভারের সঙ্গে মিঃ ই বি হ্যাভেলের সংগৃহীত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শনও রাখা হয়েছে।...চাম্বা স্টেট, মিঃ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মিঃ আর্লের সংগ্রহ থেকেও আনা হয়েছে ওই একই ধরনের নানা প্রাচীন সামগ্রী। বিচারপতি উডরফ ঋণ হিসেবে কয়েকটি পুরানো চীনা চিত্র দিয়েছেন।...

আধুনিক সামগ্রীগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমোক্তগুলি কলকাতার শিল্পীদের যথা, আর্ট স্কুলের অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল মিঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর ছাত্র মিঃ নন্দলাল বোস ও মিঃ সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এবং ঈশ্বরীপ্রসাদের ইণ্ডিয়ান পেন্টিং। শেষোক্ত জন আর্ট স্কুলের শিক্ষক।...

(দি ইংলিসম্যান : বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারি, ১৯০৮)

[ভারতের কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ ছিলেন তখন আর্ল কিচনার। তিনিই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব 'ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর প্রথম সভাপতি।]

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট

নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী যথা: কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ, বিচারপতি র‍্যাম্পিনী, মিঃ এন ব্লাণ্ট, মিঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ ডাডলে মায়ার্স, মিঃ এ চৌধুরী, মিঃ জে চৌধুরী, মিঃ সি এফ লারমর এবং জে পি গাঙ্গুলী তাঁদের পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা করেছেন। মিঃ নন্দলাল বোস ও মিঃ সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে তিন বছরের জন্যে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ ভ্রমণবৃত্তি পেয়েছেন। এই তিন শিল্পীকে চিত্রাঙ্কনের জন্যে সার্টিফিকেটও দেয়া হলো।...

(দি ইংলিসম্যান : ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮)

কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়

সম্প্রতি লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'দি স্টুডিও' ম্যাগাজিনে মিঃ হ্যাভেল কলিকাতার আর্ট স্কুলে ভারতবর্ষীয় চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুললিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার শিষ্য নন্দলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর অঙ্কিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

(ভারতী, ভাদ্র ১৩১৫)

"দময়ন্তীর স্বয়ম্বর"

মহাভারতের বনপর্বে নলোপাখ্যানে এই স্বয়ম্বরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।...এই চিত্রখানি শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত। ইহার উৎকর্ষহেতু ইহা কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের চিত্রশালার জন্যে ক্রয় করা হইয়াছে। এই ছবিখানি দেখিলে অজন্টাগুহা চিত্রাবলীর কোন কোন চিত্র মনে পড়ে।

(চিত্রপরিচয় : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৬)

ব্ল্যাপ

...কিছুদিন আগে মিঃ ই বি হ্যাভেলের প্রশংসনীয় গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়ান স্কালপচার অ্যাণ্ড পেন্টিং'-এর সমালোচনার সময়ে আমি কয়েকজন সমকালীন বাঙালী শিল্পীর শিল্পকলা সম্পর্কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা জ্ঞাপন করি। ওই অভিনন্দনের যথার্থ প্রত্যুত্তর হিসেবে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট থেকে দুটি ছোট মনোজ্ঞ ছবি আমার হাতে এসেছে। ছবি দুটি টোকিওর 'কোক্কা' পাবলিশিং কোম্পানীর কাঠের ব্লক থেকে রঙে রূপারোপিত মিঃ এ এন ঠাকুরের 'এ মুনলাইট মিউজিক পার্টি' এবং মিঃ এন এল বোস-এর 'কৈকেয়ী'। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ছবিদুটির উল্লেখ 'পাইওনীয়ার'-এ আগেই করা হয়েছে, তবুও আমি এ বিষয়ে আমার সশ্রদ্ধ প্রশংসা নিবেদনে বিরত থাকতে পারছি না। ছবিদুটির রঙ এবং অঙ্কনশৈলী উভয়ই দুর্লভ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যদ্যোতক। সত্যিই ছবিদুটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি।... **'পাইওনীয়ার'-এর লণ্ডনস্থিত 'আর্ট অ্যাণ্ড লেটার' স্তম্ভের লেখকের প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি**

(অমৃতবাজার পত্রিকা : ২৮ আগস্ট ১৯০৯)

[মিঃ এ এন ঠাকুর এবং মিঃ এন এল বোস যথাক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু।]

ভারতীয় শিল্পীদের আধুনিক গোষ্ঠী

গভর্নমেণ্ট হাউসে চিত্র প্রদর্শনী

লর্ড রোনাল্ডসের প্রচেষ্টা

লর্ড রোনাল্ডসের আমন্ত্রণে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সমাজের বহু বিশিষ্ট এবং প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিরা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের আনুকূল্যে আয়োজিত এক 'প্রাইভেট' চিত্রকলা প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট হাউসে এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন।...

নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, এ কে গাঙ্গুলী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কলকাতা গোষ্ঠীর অন্যান্য সুপরিচিত শিল্পীদের শিল্পরচনার নিদর্শন দেয়ালগুলিতে সাজানো হয়েছিল।...

(দি স্টেটসম্যান : ৫ ডিসেম্বর ১৯১৯)

বাগ গুহার যে ফ্রেস্কোগুলির অস্তিত্ব এখনও আছে তা অনুলিপি করার জন্যে গোয়ালিয়র স্টেট থেকে নিযুক্ত হয়ে সর্বশ্রী নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার এবং সুরেন্দ্রনাথ কর গোয়ালিয়রের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ এম এস গার্বের সঙ্গে বাগ গুহার উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন।

(আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিস্ট : ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট, ২য় খণ্ড : সংখ্যা ৫)

[১ জানুয়ারি ১৯২১ বোম্বে মেলে তিন শিল্পী গোয়ালিয়র রওনা হন।]

আশ্রম-সংবাদ

গত ২৪এ শ্রাবণ সায়াহ্নে উপরোক্ত স্থানেই বিশ্বভারতীর অধ্যাপক আচার্য শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি ও তাঁহার সহধর্মিণীর বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয়।...সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে মাল্যচন্দন বস্ত্র ও উত্তরীয় দান করিবার পর গুরুদেব তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া যে অভিভাষণটি উপহার দেন তাহা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় সযত্নে চিত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।

(শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৯)

[শান্তিনিকেতনের শিশু বিভাগের নতুন গৃহে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় (৯ আগস্ট ১৯২২)।]

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত

শান্তিনিকেতন সংবাদ

কুমারী আঁদ্রে কার্প্লে ফরাসী দেশীয় চিত্রশিল্পী। আচার্য রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ইহারই সাহায্যে বাঙ্গলা দেশের নারীগণের উন্নতির জন্য একটি শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারী কার্প্লে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল চারুশিল্পের প্রচলন রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ইনি আশ্রমের শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দেশের কাঠের কারিগর, মাটির কারিগর ও গালার কারিগরদের লইয়া আধুনিক সময়োপযোগী করিয়া ভারতের পুরাতন ও সমস্ত নষ্ট শিল্পের উদ্ধার করিতেছেন।

(২৪ এপ্রিল ১৯২৩)

রবীন্দ্রনাথের চীন যাত্রা

গত শুক্রবার রওনা হইয়াছেন

বিশ্বভারতীর সম্পাদক জানাইতেছেন :-১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পিকিনে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। এই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তিনি গত শুক্রবার 'ইথিওপিয়া' নামক জাহাজে পিকিন যাত্রা করিয়াছেন।...পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী, কলাভবনের অধ্যক্ষ চিত্র-শিল্পী নন্দলাল বসু, কৃষি বিদ্যালয়ের ডিরেক্টার মিঃ এলমহার্স্ট তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে গিয়াছেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ।

(রবিবার, ২৩ মার্চ ১৯২৪)

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু প্রণীত ফুলকারী

(শান্তিকিতন কলাভবন হইতে প্রকাশিত)

ব্লাউজের সূচীকার্যের (embroidery) অভিনব নমুনা (design) ও প্রণালী ইহাতে পাইবেন। সূচীশিল্পী মহিলাবৃন্দ এই পুস্তকখানি হইতে বহু শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। প্রথম খণ্ড বাহির হইল। মূল্য—ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—এম, সি, সরকার
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
শান্তিনিকেতন কলাভবন, বোলপুর

—বিজ্ঞাপন

(৫ অক্টোবর ১৯২৯)

[গ্রন্থটি অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত।]

ফুলকারী

২য় ভাগ প্রকাশিত হইল

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুত নন্দলাল বসুর সূচীশিল্পের পুস্তক 'ফুলকারী'-র ২য় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা মাত্র, সাত আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে বুকপোস্টে পাঠান হয়।

**প্রাপ্তিস্থান—
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১৫ নং কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা।**

—বিজ্ঞাপন

(৬ ডিসেম্বর ১৯২৯)

পুস্তক পরিচয়

ফুলকারী-প্রথম খণ্ড, শ্রীনন্দলাল বসু, কলাভবন, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। ইহা সূচীশিল্পের বহি। বিছানা, পর্দা, চাদর, ওড়না, শাড়ী, ছেলেদের ও মেয়েদের নানারকমের জামা অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত ছুঁচের কাজের দশটি চিত্র এই বহিখানিতে আছে। মহিলারা অনেকেই নিজের হাতে এই সব জিনিস ভূষিত করিতে চান। এই বহি তাঁহাদের কাজে লাগিবে। তদ্ভিন্ন, মেয়েদের যে সব সাধারণ বিদ্যালয়ে ও মহিলাশিল্প বিদ্যালয়ে সূচীশিল্প শিখান হয়, সেখানেও এই বইটি ব্যবহৃত হইলে ছাত্রীদের উপকার হইবে। ইহাতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি ভূমিকা আছে।

(প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৬)

কারুসঙ্ঘ

শান্তিনিকেতন, কলাভবনের শিল্পীগণ কারুসঙ্ঘ নামে যে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিষয় শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত আমাদিগকে জানাইয়াছেন—এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নানারূপ শিল্পকর্ম দ্বারা স্বাধীনভাবে উপার্জনের চেষ্টা করা।...

অল্প কিছু মূলধন লইয়া কারুসঙ্ঘের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। কারুসঙ্ঘের ছয়জন সভ্য আছেন...শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় হইলেন এই সঙ্ঘের সভাপতি।...কারুসঙ্ঘ 'সীবনী' নামে একটি ডিজাইনের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কারুসঙ্ঘের সভ্য শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

(নানাকথা : বঙ্গলক্ষ্মী, মাঘ ১৩৩৭)

[নন্দলাল বসু, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিনায়ক শিবরাম মসোজি, রামকিঙ্কর বেইজ ও ইন্দুসুধা ঘোষ কারুসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা -সদস্য।]

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত

শান্তিনিকেতন কারুসঙ্ঘ

শান্তিনিকেততন কলাভবনের শিল্পীগণ এই সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সংবাদ দিলে সকলেই অল্প আয়াসে একস্থানে নিজ নিজ প্রয়োজনমত শিল্পদ্রব্য বা নূতন ডিজাইন করিয়া লইতে পারিবেন। বর্তমানে নিম্নলিখিত কারুশিল্প আছে :-ছবি—জলবর্ণ ; তৈলবর্ণ ; বইয়ের ছবি ও বিজ্ঞাপন। মূর্তি ; সূচীশিল্প ; বাটিকের কাজ ; প্রাচীর চিত্র ; বাসন এবং গহনার নূতন ডিজাইন ও কারুশিল্পের নূতন ডিজাইন।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা :-

সম্পাদক—কারুসঙ্ঘ, কলাভবন
পোঃ শান্তিনিকেতন।

(২৫ মার্চ ১৯৩০)

রবীন্দ্র জয়ন্তী মেলা ও প্রদর্শনী

ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক উদ্বোধন

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরার মহারাজা টাউনহলে রবীন্দ্রজয়ন্তী মেলা ও প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবেন।....

আগামী খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে এই প্রদর্শনী একটা সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হইবে। গতকল্য প্রদর্শনী সাবকমিটির সদস্য শ্রীযুত নন্দলাল বসু, ও সি গাঙ্গুলি, ডাঃ স্টেলা ক্রেমরিস ও সুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীযুত কেদারনাথ চ্যাটার্জি কর্তৃক ভারতের সকল স্থান হইতে সংগৃহীত ছবিগুলির মধ্য হইতে সর্বোৎকৃষ্ট ছবিগুলি বাছাই করিবার জন্য টাউন হলে সমবেত হইয়াছিলেন।

(২৩ ডিসেম্বর ১৯৩১)

প্রসিদ্ধ চিত্রাবলী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রণীত রূপাবলী-

দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ছয় আনা
ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি অনুযায়ী অঙ্কনপ্রণালী শিক্ষার পুস্তক।
প্রাপ্তিস্থান—
চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং
১৫ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

—বিজ্ঞাপন
(৫ জুলাই ১৯৩৩)

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলম্বো যাত্রা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটের সময় সদলবলে কলম্বো যাত্রা করিবার জন্য কলিকাতা তক্তাঘাট হইতে এস এস 'ইঞ্চাঙ্গ' জাহাজে উঠিয়াছেন। শনিবার অতি প্রত্যূষে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল।

কবিবরকে বিদায় দিবার জন্য অনেক ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলা জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিলেন। কবিবরের সহিত তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী, শ্রীযুক্তা মীরা গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্তা হৈমন্তী চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শান্তিনিকেতনের কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী প্রভৃতি ২০/২৫ জন যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ইতঃপূর্বেই ট্রেনে করিয়া কলম্বো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

(শনিবার, ৫ মে ১৯৩৪)

শান্তিনিকেতনে কবি নোগুচি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংবর্ধনা

শান্তিনিকেতন, ৩০শে নবেম্বর
অদ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে অধ্যাপক নোগুচিকে এখানে সংবর্ধনা করিয়া বলেন, "পনের বৎসর পূর্বে আমি যখন প্রথম জাপানে যাই তখন জাপানবাসীরা আমাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তদবধি জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রদূত আমার এই বন্ধুবর অধ্যাপক নোগুচিকে অভ্যর্থনা জানাইবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।"... ...

অভ্যর্থনা কার্য শেষ হইবার পর শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অধ্যাপক নোগুচিকে আশ্রম ঘুরাইয়া সকল দেখান।...এ পি

(৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫)

লখনৌ কংগ্রেস প্রদর্শনী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় তাঁহার সহকর্মীদের সহিত লখনৌ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি প্রদর্শনীর তোরণ-দ্বারের চিত্রকারের ভার লইয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি প্রদর্শনীক্ষেত্রের আর্ট-গ্যালারি সুন্দরভাবে সাজাইবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন। কলিকাতা, বোম্বাই, পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে বিভিন্ন চিত্র-শিল্পীর ছবি সংগ্রহ করিতেছেন। ভারতবর্ষে পুরাতন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত চিত্রকলার প্রগতি দেখানই হইবে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

(২০ মার্চ ১৯৩৬)

ফৈজপুর তিলকনগরে উদ্দীপনার সঞ্চার

লুপ্তপ্রায় পল্লীশিল্পের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা

মহাত্মা গান্ধীর সারগর্ভ বাণী

তিলকনগর, ২৫শে ডিসেম্বর—শান্তিনিকেতনের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুত নন্দলাল বসুর উচ্চ প্রশংসা করিয়া মহাত্মাজী বলেন যে, তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুত বসু পূর্বাহ্নেই ফৈজপুর আসিয়াছেন। এখানে সকলে শিল্প প্রতিভার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন এই শিল্পসৃষ্টির উপাদান গ্রাম ও গ্রামবাসীদের নিকট হইতেই তিনি পাইয়াছেন।...গান্ধীজীর বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর ক্যাপ্টেন শ্রীমতী গোসেপ বেন একটি পিত্তল নির্মিত প্রদীপ লইয়া আসিলেন। আরতির জন্য শ্রীযুত নন্দলাল বসু এই প্রদীপটি পাঠাইয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন।

(২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৬)

হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর উপর রথ নির্মাণের ভার

বিঠলনগর, ৯ই জানুয়ারি—শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর প্রতি "বংশনগরীকে" কারুকলায় সুসজ্জিত করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। মাহদী হইতে সভাপতিকে ৫১টি বলদবাহিত রথে করিয়া বিঠলনগরে আনা হইবে। রথের নির্মাণকার্যের ভারও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর উপর দেওয়া হইয়াছে।—এ পি

(১৩ জানুয়ারি ১৯৩৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

বেলুড়ে শুক্রবার প্রতিষ্ঠা উৎসব

নবনির্মিত মন্দিরের বিবরণ

৩০শে পৌষ শুক্রবার মকর সংক্রান্তিতে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নবনির্মিত মন্দির ও মর্মর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইবে।..

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একটি মন্দির নির্মাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের যে সাধ অর্থাভাবে এতদিন অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।..

শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এই মন্দির সজ্জায় বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন।...

(বৃহস্পতিবার, ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৮)

কর্মকোলাহলপূর্ণ বিঠলনগর

কংগ্রেসের ইতিহাসে এক অপূর্ব নগরের নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত

বোম্বাই, ২রা ফেব্রুয়ারি_
ইহার পরেই কংগ্রেসের বিরাট মণ্ডপ। সেখানে লক্ষাধিক লোকের স্থান হইতে পারিবে। মণ্ডপে ছয়টি প্রবেশদ্বার...প্রবেশদ্বারগুলি শিল্পীর বিস্ময়কর সৃষ্টি। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর প্রচেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার সরল অথচ চমকপ্রদ কার্যের দ্বারা সমস্ত বিঠলনগর যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত বসু প্রবেশদ্বারগুলির উপরিভাগে ভারতীয় শিল্পের বিস্ময়কর চিত্রগুলি অঙ্কিত করিতেছেন। 'গরুদোহনেরত নারী', 'দধিমন্থনে রত নারী', 'চাকীর কার্যে রত নারী'—এই জাতীয় কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)

[পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেলের নামে গড়ে তোলা কংগ্রেসের হরিপুর অধিবেশনের অনুষ্ঠানস্থলের নাম দেয়া হয়েছিল 'বিঠলনগর'।]

মিঃ পি আর দাশ প্রদত্ত চি

সমারোহে স্টেশন হইতে কলাভবনে নীত

শান্তিনিকেতন, ২৬ আগস্ট—পাটনার ব্যারিস্টার মিঃ আর দাশ বিশ্বভারতীর কলাভব কতকগুলি মূল চিত্র উপহার দিয়াছে ঐ সমুদয় ডেলিভারী লওয়ার জ অদ্য প্রাতে কলাভবনের সমস্ত ছ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে হাঁটি বোলপুর স্টেশনে যায়।

যাহাতে ঐ সমস্ত বহুমূল্য চি নিরাপদে পৌঁছে, তজ্জন্য ঐ সমু চালান দিবার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করিব জন্য কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযু প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাটনায় পাঠ হইয়াছে।

ঐ সমস্ত চিত্রের মধ্যে ড অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত সম্র ঔরঙ্গজেবের একটি প্রমাণ প্রতিকৃ এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কি 'উমার তপস্যা' নামক একটি প্রম আকারের চিত্র আছে।

যে সমস্ত কাঠের বাক্সে ঐ সম চিত্র ছিল, তৎসমুদয় পুষ্পমাল্যে ভূষি ও চন্দনচর্চিত করা হইয়াছিল। ছাত্রদে মধ্যে কতক গর্বের সহিত সমস্ত বা বহন করিয়া লইয়া যায়; অবশি ছাত্রগণ নৃত্যগীত সহকারে তাঁহাদে অনুগমন করে।
—এ পি

(২৯ আগস্ট ১৯৩

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলা বসু

বরোদা গবর্নমেণ্ট কর্তৃ চিত্রাঙ্কনের জন্য নিযুক্ত

শান্তিনিকেতন, ৫ অক্টোবর—কলা-ভবনের অধ্য সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল ব বরোদা রাজ্যের 'কীর্তি মন্দিরে প্রাচীরগাত্রে 'ফ্রেস্কো' চিত্রাঙ্কনের জ বরোদা গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ভারপ্রা হইয়াছেন। কলা-ভবনের ঐ বিভাগী কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রসহ তি শীঘ্রই বরোদা রওনা হইবেন।—এ পি

(৭ অক্টোবর ১৯৩৯

শান্তিনিকেতনে প্রসিদ্ধ চীনা শিল্পী

শান্তিনিকেতন, ১৫ই ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ চীনা-শিল্পী জুপিয় শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হিসাবে চী হইতে এখানে আসিয়াছেন।

গতকল্য বৈকাল তিন ঘটিকা কলাভবনে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করার জন একটি সভা হয়। সভায় কবি ... বক্তৃতায় চীন ও ভারতের সংস্কৃ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তৎপর কবি ভারতের পক্ষ হইতে প্রসিদ্ধ শিল্পীকে অভ্যর্থনা করেন। অভ্যর্থনার উত্ত

জুপিয়ন বলেন যে...অধ্যাপক ইয়ানের তিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে চীন হইতে ভারতে আসিয়াছেন। ...জুপিয়নকে অভ্যর্থনা করার জন্য তিনি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

(সোমবার : ডিসেম্বর ১৯৩৯)

[জুপিয়ন-ই হলেন সু পেই-হুঙ (Hsu Pei-hung) **বা জু পেঅঁ** (Ju Peon) ।]

বোম্বাইয়ে ঠাকুর সপ্তাহ

চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন

বোম্বাই, ১৮ই ফেব্রুয়ারি—বোম্বাইয়ের ঠাকুর সোসাইটির উদ্যোগে ঠাকুর সপ্তাহ উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রমুখ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই উহার উদ্বোধন করেন।

—ইউ পি

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪)

কস্তুরবা গান্ধী মৃত্যু-বার্ষিকী

কংগ্রেস চিত্র প্রদর্শনী

স্বর্গীয়া কস্তুরবা গান্ধীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের জন্য কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ সপ্তাহব্যাপী 'কংগ্রেস চিত্র প্রদর্শনী' খোলার আয়োজন করিয়াছেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় ২৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত সভাপতিত্ব করিবেন। আচার্য নন্দলাল বসুর যে সকল প্রসিদ্ধ চিত্র হরিপুরার কিম্বা কংগ্রেসের অন্যান্য অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছে সেই চিত্রগুলি ইহাতে থাকিবে।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

[২৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ি।]

রবীন্দ্র ভবনে মহাত্মা গান্ধী

কলাভবনে কবি অঙ্কিত চিত্রাবলী পরিদর্শন

শান্তিনিকেতন, ২০শে ডিসেম্বর—অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল, শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধী, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী, রাজকুমারী অমৃত কাউর এবং শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম সহ মহাত্মাজী কলাভবন পরিদর্শন করেন। ডাঃ নন্দলাল বসু কলাভবনে রক্ষিত চিত্রগুলি, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও অবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য মহাত্মাজীর নিকট ব্যাখ্যা করেন।

(২১ ডিসেম্বর ১৯৪৫)

গণপরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নূতন শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর

(নয়াদিল্লি অফিস হইতে)

নয়াদিল্লি, ২৪শে জানুয়ারি—অদ্য সকাল ১১টার সময় গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটকাল ধরিয়া অধিবেশন চলে। সদস্যগণ কর্তৃক শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর করিতে ২ ঘণ্টাকাল অতীত হয়। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু প্রথম শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর করেন।...

উপস্থিত প্রায় ২৫০ জন সদস্য শাসনতন্ত্রের তিনটি কপিতে স্বাক্ষর করেন। ...বাঙ্গলার বিখ্যাত শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু শাসনতন্ত্র প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়াছেন এবং অন্যান্য পাতাগুলি চিত্রালঙ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০।

(২৫ জানুয়ারি ১৯৫০)

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত

বারাণসী, ২৭ নবেম্বর—গতকল্য সায়াহ্নে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম সমাবর্তন উৎসবে বিশ্বভারতী কলাভবনের (শান্তিনিকেতন) অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুকে সাহিত্যে সম্মানসূচক ডক্টর উপাধি প্রদান করা হইয়াছে ভারতে একজন শিল্পীর এবম্বিধ সম্মান সম্ভবত এই প্রথম।

ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য বলেন যে, শ্রীনন্দলাল বসু ভারতীয় নব জাগরণের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মূর্ত প্রতীক। তিনি ভারতীয় চিত্রকলাকে সমৃদ্ধশালিনী ও এই প্রাচীন দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

—ইউ পি

(২৮ নভেম্বর ১৯৫০)

ভারতীয় শিল্পসাধনার ঋত্বিক আচার্য অবনীন্দ্রনাথ

আলোকসামান্য প্রতিভাদীপ্ত মনীষীর জীবন কাহিনী

...শ্রীনন্দলাল বসুই আচার্য অবনীন্দ্রনাথের নূতন শিল্পকলা ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁহার অগণিত ছাত্রের মধ্যে তিনিই সম্ভবত সর্বাধিক স্নেহভাজন। শ্রীনন্দলাল নিজেও সগৌরবে স্বীকার করেন যে, তিনি প্রকৃতই তাঁহার পুত্রস্বরূপ। তিনি ইহা বলিয়াছেন বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, শিল্পী হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ আচার্যদেবের সৃষ্টি। বস্তুত আচার্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী শ্রীবসুর প্রতিভাদীপ্ত মানসক্ষেত্রে ইন্দ্রজালের মত কাজ করিয়াছে।...

(৭ ডিসেম্বর ১৯৫১)

[অবনীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের দু'দিন পরে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনের অংশ।]

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন

শান্তিনিকেতন, ২৩শে ডিসেম্বর—অদ্য প্রাতঃকালে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে নবগঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙ্গালা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দান করেন।

এই সমাবর্তন উপলক্ষে প্রভৃত গবেষণাকার্য পরিচালনা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মহাশয়কে 'দেশিকোত্তম' বা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট অব লেটার্স' উপাধি প্রদান করা হয়।...

শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুকে ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁহার অতুলনীয় অবদানের জন্য 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান করা হয়। শ্রীযুত বসু অসুস্থতাবশতঃ সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সমাবর্তন উৎসবান্তে রোগ শয্যায় শায়িত শ্রীযুত বসু তাঁহার গৃহে উক্ত উপাধিপত্র প্রাপ্ত হন। শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুত বসুর গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে উপাধি প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাঁহার গৃহে গমন করেন এবং উপাধি প্রদানকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

(২৪ ডিসেম্বর ১৯৫২)

শিল্পগুরু শ্রীনন্দলাল বসু

শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশে অর্ঘ্যদান উৎসবে

আচার্য ক্ষিতিমোহনের ভাষণ

শান্তিনিকেতন, ২০শে ডিসেম্বর—... ...শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর সম্মানার্থে যে 'অর্ঘ্যদান' উৎসবের আয়োজন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘ করিয়াছিলেন আজ সকালে তাহা অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শিল্পাচার্যের চিত্রাবলীর এক প্রদর্শনীর আয়োজনও এখানে করা হয়।...শিল্পাচার্য বর্তমান বৎসরে ৭১ বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

শিল্পাচার্য নন্দলাল তাঁহার দীর্ঘদিনের সাধনায় ভারতীয় চিত্রকলার যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা স্মরণে রাখিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ শিষ্যশিষ্যারা ও অগণিত ভক্তবৃন্দ আজ সকালে তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করেন।

(২১ ডিসেম্বর ১৯৫৩)

আত্মিক শক্তির উন্নয়নই শিল্পের মূল লক্ষ্য

শিল্পগুরু নন্দলালের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনে

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষণ

শনিবার সন্ধ্যায় সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে শিল্পগুরু শ্রীনন্দলাল বসুর চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, কলাশিল্পের মূল লক্ষ্য মানব-মনের উৎকর্ষ সাধন, আনন্দময় জীবনের রসাস্বাদনে আত্মিক শক্তির উন্নয়ন এবং পার্থিব অস্তিত্বের বন্ধন হইতে মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। এই কলাশিল্পের লক্ষ্য স্থান ও কালে সীমাবদ্ধ বস্তুর রূপায়ণই কেবল নহে, স্থান ও কালের অতীত আত্মিক সত্তাকে উপলব্ধির প্রচেষ্টাও মহত্তম শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং অপরের চিত্তকে স্পর্শ করিবার শক্তি আয়ত্ত করার অথবা সত্যিকার কোন মহৎ সৃষ্টির পূর্বে স্বয়ং শিল্পীর আত্মোন্নয়ন প্রয়োজন। আচার্য নন্দলাল বসু যদি তাঁহার চিত্রাঙ্কনে এই অবিনশ্বর মহত্ত্বকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কারণ, তিনি স্বয়ং স্বভাবের দিক হইতে নিয়মানুবর্তিতার সেই উচ্চগ্রামে উঠিয়াছেন যাহাকে বলা হয় সাধনা।...তাঁহার প্রতি দেশবাসিরূপে আমরা আমাদের অভিবাদন জানাইতেছি।

(রবিবার ২৮ মার্চ ১৯৫৪)

কলা সাহিত্য বিজ্ঞান ও জনসেবার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদক প্রদান (দিল্লি অফিস হইতে প্রাপ্ত)

১৪ই আগস্ট—অদ্য এখানে সরকারীভাবে (গেজেট অব ইণ্ডিয়ার এক অতিরিক্ত সংখ্যায়) ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ...লণ্ডনস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী বি জি খের, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধি শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন, প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু, বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডাঃ জাকির হোসেনকে 'পদ্মবিভূষণ' পদক (প্রথম বর্গ) প্রদান করিয়াছেন। এই পাঁচজনকে সর্বপ্রথম এই পদক প্রদান করা হইল।

(১৫ আগস্ট ১৯৫৪)

শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সংবর্ধনা

শান্তিনিকেতন, ২২ আগস্ট—"নানান দেশে নানা পদ্ধতি, তার সদ্গুণ ও সেইসব বিচিত্র ধারা আত্মসাৎ করে আমাদের ভারত-শিল্পপদ্ধতি পুষ্ট হয়ে এগিয়ে যাবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আমার একান্ত কামনা, ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্প যেন সমস্ত পৃথিবীতে নিজের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গৌরবের আসন লাভ করে।" স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনার সমাপ্তি দিবসে বুধবার, শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অভিনন্দনের

প্রত্যুত্তরে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীঅতুল বসু।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ আচার্যদেবকে সংবর্ধনা জানাইয়া বলেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস কর্মীরা যেমন গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের নিকট অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন, তেমনি আচার্য নন্দলাল তাঁহাদের প্রেরণা জোগাইয়াছেন।

(২৩ আগস্ট ১৯৫৬)

আচার্য নন্দলাল বসুকে ডক্টরেট পদবী দান

বিশ্বভারতীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসব

বোলপুর, ১৭ই ফেব্রুয়ারি—অদ্য অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কলাভবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসব হয়। এই বৎসরে আচার্য নন্দলাল বসুকে ডি লিট পদবী দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। ... ...

এই বিশেষ সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কলাভবনে আচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রসমূহের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭)

[বিশ্বভারতীর উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু শিল্পীকে উপাধিপত্র প্রদান করেন।]

আদর্শ শিক্ষকই আদর্শ ছাত্র গড়িতে সমর্থ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে শ্রীসুধীরঞ্জন দাশের ভাষণ

শনিবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে... ... উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র ভারতীর আদর্শ এবং শিক্ষাপদ্ধতি বুঝাইয়া বলেন। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে কৃতী ছাত্রদের তিনি অভিজ্ঞানপত্র দেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এবং শ্রীনন্দলাল বসু,—দেশের এই দুই বর্ষীয়ান শিল্পীকে এই বৎসর বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

(রবিবার ১ ডিসেম্বর ১৯৬৩)

শান্তিনিকেতনে উৎসব শেষে বিদায়ের পালা

শেষ দিনের অনুষ্ঠানে আচার্য নন্দলাল বসুকে উপাধি দান

শান্তিনিকেতন, ২৫শে ডিসেম্বর—... ... আজ সকালে শান্তিনিকেতনে দুটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। প্রথমটি হ'ল আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুকে রবীন্দ্র ভারতীর পক্ষ থেকে অনারারী ডি-লিট ডিগ্রী দান। রবীন্দ্র ভারতীর আচার্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু আজ স্বয়ং আচার্য বসুর বাড়ি গিয়ে তাঁকে এই ডিগ্রী দিয়ে আসেন। আচার্য বেশ কিছু কাল ধরেই অসুস্থ।... .... তাই আচার্য শ্রীমতী নাইডু নিজেই এই সম্মানপত্র আচার্য বসুর কাছে পৌঁছে দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩)

নূতন দিনের দুয়ারে

এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তব্য নবজাগ্রত এশিয়ার ইতিহাস প্রণয়ন।

... ...

সোমবার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এশিয়ার প্রায় দুই শতকের নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮তম বার্ষিক সভায় ঐ আহ্বান জানান।

এই অনুষ্ঠানে সোসাইটি রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, বিদেশী মনস্বী ডঃ আলবার্ট সোয়াইৎজার এবং শিল্পী নন্দলাল বসুকে যথাক্রমে ১৯৬২-৬৩

ডাক টিকিটে নন্দলাল

ও ৬৪ সালের জন্য রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পদক দিয়া সম্মানিত করেন। পদকপ্রাপ্ত তিনজনই অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রতিনিধিরা রাজ্যপালের হাত হইতে পদক গ্রহণ করেন।

(মঙ্গলবার, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫)

শিল্পজগতে মহাগুরু নিপাত

আচার্য নন্দলালের মহাপ্রয়াণ

বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক শিল্পগুরু আচার্য নন্দলাল বসুর জীবন দীপ নির্বাপিত।

শনিবার বিকাল ৫-৩২ মিনিটে দেশিকোত্তম দেশনন্দিত শিল্পসাধক নন্দলাল তাঁর "সব হতে আপন" শান্তিনিকেতনে নিজ বাসভবনে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যাঁর ৫০ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ (তখন "৭০ বছরের প্রবীণ যুবা") তাঁকে "কিশোর গুণী" আশীর্ভাষণে সম্ভাষিত করেছিলেন, মৃত্যুকালে সেই নন্দলালের বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর।

(রবিবার, ১৭ এপ্রিল ১৯৬৬)

নন্দনলোকের পথে নন্দলাল

শান্তিনিকেতনে শেষকৃত্য সম্পন্ন

শান্তিনিকেতন, ১৭ এপ্রিল—আজ দ্বিপ্রহরের কিছু আগে শান্তিনিকেতনের শ্মশানে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। মুখাগ্নি করেন প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ বসু।

অধিক রাত্রে উপাচার্য ডঃ ভট্টাচার্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিকে টেলিফোন করলেন মাস্টার মশাইয়ের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে।

উল্লেখযোগ্য, নন্দলাল বসু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তাঁর স্থানীয় অভিভাবক ছিলেন।

(১৮ এপ্রিল ১৯৬৬)

[ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য।]

আচার্য নন্দলাল স্মারক ডাকটিকিট

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ রবিবার ১৬ এপ্রিল ১৫ পয়সার ডাক টিকিট বের করবেন। কলকাতা জি পি ও-র ফিলাটেলিক ব্যুরো ওই দিন টিকিট বিক্রির জন্যে ১২টি অতিরিক্ত কাউন্টার খুলবেন।

১৩ এপ্রিল ১৯৬৭

পরলোকে সুধীরা বসু

স্বর্গত শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী সুধীরা বসু মঙ্গলবার কলকাতায় ৪৯/১৩বি হিন্দুস্থান পারক-এর ভবনে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর দুই পুত্র, দুই কন্যা বর্তমান।

(বুধবার ৬ নভেম্বর ১৯৬৮)

গান্ধীজির স্মৃতি রক্ষার্থে মাসটার প্ল্যান

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও শহরাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীউমাশংকর দীক্ষিত আজ সকালে গান্ধীজি যে জায়গায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই জায়গাটি পরিদর্শন করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, ওই জায়গায় গান্ধীজির স্মৃতিকে চির-অম্লান রাখার জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে। একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হবে। এই স্মৃতিস্তম্ভটির নকশা তৈরি করে দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু।

(২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২)

বিশ্বভারতীতে শ্রীমতী গান্ধী

কলাভবনে চিত্রশালার শিলান্যাস

আজ সকাল ৯টায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলাভবনে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল চিত্রশালার শিলান্যাস করেন। তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন "আজ কলাভবনে এসে আমার অনেক পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছে—মনে পড়ছে বিশেষ করে গুরুদেবকে এবং মাস্টারমশাই (নন্দলাল বসু)কে। কলাভবনের অগ্রগতির পথে এই চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই সহায়ক হবে বলে আশা করি।" ... ...

(৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২)

[৩০ ডিসেম্বর শ্রীমতী গান্ধী শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।]

কলাভবনে নন্দমেলার আয়োজন

শান্তিনিকেতন, ২৬ নভেম্বর—নন্দলাল বসুর আগামী জন্মোৎসব উপলক্ষে কলাভবন কর্তৃপক্ষ এ-বছর থেকে 'নন্দ-মেলা'-র আয়োজন করছেন। শিল্পাচার্যের জন্মদিন তেসরা ডিসেম্বর। পয়লা ডিসেম্বর থেকে 'নন্দ-মেলা' কলাভবনের 'নন্দনে' শুরু হবে।

(২৮ নভেম্বর ১৯৭৩)

চারুকলাসম্পদ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর—রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় ও অমৃতা শের-গিলের হাতের ছবি আর ভাস্কর্য এবার থেকে আইনের সীমানায় 'চারুকলাসম্পদ' বলে গণ্য হল। তাই ওই চার শিল্পীর আঁকা কোন ছবি এবং তাঁদের হাতে গড়া কোন মূর্তি কিংবা কলাবস্তু আর বিদেশে রফতানি করা যাবে না। রফতানি করলে ছ'মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত জেল তো হবেই, জরিমানাও দিতে হবে একই সঙ্গে।

ভারত সরকার গতকাল কেন্দ্রীয় গেজেটের বিশেষ এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা ঘোষণা করেছেন। ১৯৭২ সালের পুরাবস্তু এবং চারুকলাসম্পদ আইন অনুসারে বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে। —সমাচার

(৩ ডিসেম্বর ১৯৭৬)

কমল সরকার সংকলিত

নন্দলালের জীবন ও রচনাপঞ্জী

১৮৮২—৩ ডিসেম্বর, নন্দলাল বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু দ্বারভাঙ্গা মহারাজের খড়্গপুর তহসিলের নায়েব ছিলেন এবং ছিলেন মহারাজার প্রিয় স্থপতি। মাতা ক্ষেত্রমণি দেবী, ধর্মভীরু, স্নেহময়ী মহিলা ছিলেন। আলপনা, সূচী শিল্প এবং পুতুল গড়তে পারতেন ভাল। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে মুঙ্গেরের নির্জন নিসর্গের ভেতর। কুমোরপাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। ঠাকুরগড়া দেখতেন। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এখানকার মিডল্ ভারনাকুলার স্কুলে পড়াশুনো করেন।

১৮৯৭—পনেরো বছর বয়সে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট ইস্কুলে ভর্তি হলেন কলকাতায় এসে।

১৯০৩—কুড়ি বছর বয়সে এনট্রেনস্ পাশ করেন। এই সময় হিতোপদেশের "বীণাকর্ণ - চূড়াকর্ণ এবং মুষিক" অবলম্বনে ছবি আঁকেন। ক্লাসে বসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার মার্জিনে রেখাচিত্র আঁকেন। জেনারল এসেম্বলি কলেজে ফার্স্ট আর্টস (এফ এ) ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছর সুধীরা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর সম্পর্কিত ভাই অতুল মিত্র তখন সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের ছাত্র। নন্দলাল তাঁর কাছে সস পেনটিং, মডেল বসিয়ে আঁকা, স্থিরবস্তু চিত্রাঙ্কন শিখেছেন। পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না বলে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি।

১৯০৪—মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে কমার্স ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু পড়ায় মন বসে না। রাফেলের "মেডোনা"-র প্রতিচিত্র কিনে তাই দেখে ছবি আঁকেন। রবি বর্মার প্রভাবে "মহাশ্বেতা" আঁকেন। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের "বজ্র মুকুট" এবং "বুদ্ধ-সুজাতা"-র প্রতিচিত্র দেখে তিনি মোহিত হয়ে যান।

১৯০৫—অবনীন্দ্রনাথ ১৫ই আগস্টে সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হয়ে যোগদান করেন। সহপাঠী সত্যেন বটব্যালের মুখে নন্দলাল অবনীবাবুর সহৃদয়তার কথা শুনে তাঁকে মনে মনে গুরু রূপে বরণ করেন। এরপর আর্ট স্কুলে এসে দেখা করেন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। অবনীবাবু তাঁকে হ্যাভেল সাহেবের কাছে নিয়ে যান। হ্যাভেল নন্দলালের বিলাতী ছবির নকল অপছন্দ করলেও, "মহাশ্বেতা" ছবিটি পছন্দ করেন। পাটনাই কলমচী লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ তাঁর পরীক্ষা নেন। নন্দলাল "গণেশ" এঁকেছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন্তব্য করেন, নন্দলালের হাত খুব পাকা। ভর্তি হয়ে গেলেন নন্দলাল। তাঁর শ্বশুর প্রকাশচন্দ্র পাল খবর পেয়ে ছুটে আসেন। তখন অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করেন এই যুক্তিতে যে, নন্দলাল চাকরিতে কত আর—খুব বেশি পেলে একশ' টাকা পেতেন। দরকার হলে অবনীন্দ্রনাথ ঐ টাকার মাসহারা নন্দলালকে দেবেন। নন্দলাল ছবি আঁকার পাঠ নেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তখন তাঁর সতীর্থ হয়ে এলেন সুরেন গাঙ্গুলি, ভেঙ্কটাপ্পা, শৈলেন দে, ক্ষিতীন মজুমদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে। এঁরা আর্ট স্কুলে পাঁচ ছ'বছর ছিলেন। দু' বছর পরে বারো টাকার বৃত্তি পান নন্দলাল।

১৯০৭—সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। পরের বছর এঁদের প্রথম প্রদর্শনী। নন্দলাল "সতীর দেহত্যাগ" এবং "সতী" ছবির জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার পান। স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ। ১৯০৮ সালে অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলির সঙ্গে নন্দলাল দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করেন।

১৯০৬-৮ পর্যন্ত তাঁর আঁকা ছবির নাম ও আকার দেওয়া গেল। (১৯১১ পর্যন্ত তিনি ধোয়া পদ্ধতিতে ছবি (ওয়াশে) আঁকতেন প্রধানত)।

'কর্ণের সূর্যপূজা' ৮″×৯″। 'গরুড় স্তম্ভের পাদমূলে শ্রীচৈতন্য' ১৫$^{১}/_{২}$″×৯″। 'নকলে বুঁদি' ১০″×৭$^{১}/_{২}$″। 'কৈকেয়ী'। 'কর্ণ'। 'আহত মরাল হাতে সিদ্ধার্থ'। 'সতী' ১২″×৭$^{১}/_{২}$″ (মতান্তরে এটি ১৯১০-এ আঁকা। ১৯০৮ সালে পুরস্কৃত হলে ১৯১০-এ কি ভাবে আঁকা হয়?)

১৯০৯—অবনীন্দ্রনাথ এবং সিস্টার নিবেদিতার নির্বন্ধে নন্দলাল লেডি হেরিংহামকে অজন্তার ছবির নকল করতে সাহায্য করার জন্য অসিত হালদার, ভেঙ্কটাপ্পা, সমরেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে যান। সমসময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ। "চয়নিকা"র জন্য রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের সাতটি ছবি গ্রহণ করেন। নন্দলালের "দীক্ষা" ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন। এ বছরে আঁকা ছবির তালিকা :

'শিব ও সতী' ১৯$^{১}/_{২}$″×৬$^{১}/_{২}$″। 'দীক্ষা'। 'নৌকা বিহার'। 'সাবিত্রী ও যম'। 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা'। 'দয়মন্তীর স্বয়ংবরা'। 'তীর্থযাত্রা'। 'গান্ধারী'। 'পদ্মিনী'। 'প্রলয়নৃত্য'। 'চৈতন্য'। 'আরব্য রজনী'।

গগনেন্দ্রনাথ অঙ্কিত নন্দলাল

১৯১০-এ নন্দলাল ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন—'জতুগৃহ দাহ' ১৯″×১২″। 'অন্নপূর্ণা' ১৬″×১০$^{১}/_{২}$″। 'অহল্যার শাপমুক্তি' ৮$^{১}/_{২}$″×৬$^{১}/_{২}$″। 'মৃত্যুশয্যায় দশরথ'। 'সুজাতা' ৫$^{১}/_{২}$″×৪″। 'অগ্নি' ৭$^{১}/_{২}$×৫$^{১}/_{২}$″। 'পদ্মিনী এবং ভীম সিংহ'। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'।

১৯১১—ওরিয়েন্টাল সোসাইটির চতুর্থ প্রদর্শনী হয় এলাহাবাদে। নন্দলাল এতে "জগাই মাধাই" ছবির জন্য রৌপ্য পদক পান। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। এই বছরে নন্দলাল আঁকেন — ধোয়া পদ্ধতিতে : 'ইন্দিরা'। 'একলব্য'। 'দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষা দান'। 'হরিশচন্দ্র'। 'ষষ্ঠীপূজা'। 'কলসীপূজা কাঁখে রমণী' ৮″×৫$^{১}/_{২}$″। 'ডাক হরকরা'। 'পৌষ পার্বন'। 'জীবন-মৃত্যু'। 'তালপাতার ভেঁপু'। টেম্পেরায় আঁকেন রামায়ণের ২৬টি সচিত্রকরণ (কস্তুরবা সংগ্রহ)। রেখাচিত্র—'কাবুলিওয়ালা'। 'চাষী'। 'খেলা'। রাজস্থানী কলমের "সবুজ টিয়া" ছবিটি নকল করেন। অজন্তার ছবির নকল করেন — বুদ্ধপত্নী — গুহা ১। রাজকুমার সিদ্ধার্থ — গুহা ১। মা ও ছেলে—গুহা ১। ছবির অংশ — গুহা ১। সৈনিকের মুখমণ্ডল — গুহা ১। হাতী ধরা — গুহা ১৭। মদ্যপান — গুহা ১৭।

১৯১২-১৪—অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সঙ্গে মতান্তর হবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষের কাজে ইস্তফা দেন। নন্দলালের তখনও পাঠ শেষ না হলেও ব্রাউন তাঁকে উপাধ্যক্ষের পদ দিতে চান। নন্দলাল রাজী হননি। আর্ট ইস্কুল থেকে বেরিয়ে তিনি তিন বছর অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন। গুরুর কাছে ষাট টাকা মাসহারা পেতেন। কয়েক মাস নিবেদিতা গার্লস স্কুলের শিল্পশিক্ষক ছিলেন। ওরিয়েন্টাল সোসাইটিতে কাজ করতেন। অবনীন্দ্রনাথদের মাধ্যমে ওকাকুরা এবং কুমারস্বামীর সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়। কুমারস্বামীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির শিল্পসংগ্রহের তালিকা রচনা করেন।

১৯১২-তে তাঁর ধোয়া ছবি — 'পার্থসারথি' ৩১″×২১″। 'রাধাকৃষ্ণ'। 'গোকুল ব্রত'। রবীন্দ্রনাথ "ক্রেসেন্ট মুন" গ্রন্থে দুটি ছবির প্রতিচিত্র মুদ্রিত করেন।

১৯১৩—বিচারপতি উডরফের নির্বন্ধে শিবের মুখমণ্ডল আঁকেন নন্দলাল। উডরফ সে ছবি তন্ত্রাচারের জন্য ব্যবহার করতেন। পরে অনুরূপ ছবি আঁকেন ইউসুফ মেহের আলির জন্য। এই বছর তাঁর আঁকা ছবির তালিকা :

ধোয়া পদ্ধতির ছবি — 'অহল্যা' ৮$^{১}/_{৪}$″×৬″। 'অন্নপূর্ণা' ১৬″×১৩$^{১}/_{২}$″। 'জলতলে উমার তপস্যা'। 'কিরাতার্জুন'। 'গরুড়'। 'নবজাত কৃষ্ণ কোলে বাসুদেবের পলায়ন'। 'শিবের হলাহল পান'। 'যম ও নচিকেতা'। 'চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী'। 'মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠির'। 'ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়'। 'শিব মুখমণ্ডল'। রেখাচিত্র — 'কলকাতার রাস্তার দৃশ্য' এবং 'জগাই মাধাই'।

১৯১৪ — অসিত হালদার তখন কলাভবনের প্রধান। তাঁর সঙ্গে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসেন। নন্দলালের সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং আশীর্বচন নন্দলালকে স্বভাবতই অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করে।

এ বছরে ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'মেষ কাঁধে বুদ্ধদেব' ১৯″×১২″। 'ভরত কর্তৃক রামের পাদুকা পূজা'। 'সৌভাগ্য'।

১৯১৬ — রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে মুকুল দে-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর শিলাইদহে যাত্রা। কুঠি বাড়িতে থেকে বোটে পদ্মা ভ্রমণ করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রজাদের চটজলদি রেখাচিত্র আঁকার বিলাতি রীতি তিনি মুকুল দে-র কাছে শিখে নিতে কুণ্ঠিত হননি। পদ্মার সৌন্দর্যে

তিনি মুগ্ধ হন। "বিচিত্রা" স্থাপিত হয় ঠাকুরবাড়িতে। ষাট টাকা মাস মাইনেতে প্রধান শিল্পীর চাকরি পান নন্দলাল। আরাইশানের কাছে জাপানী লেখনরেখ এবং বর্ণিকাভঙ্গ শেখেন। পিতৃ বিয়োগ। অসিত হালদারের সঙ্গে রাঁচি যাত্রা।

এই বছরে তাঁর ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকা ছবি : 'শীতের পদ্মার ওপরে উড়ন্ত বলাকার সারি' ৩৬"×১৫১/২" (মতান্তরে এটি ১৯১৫ সালে আঁকা)। রেখাচিত্র — 'মীরাবাঈ'। 'কোল উপজাতির নাচ'। এই বছরেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তিচিত্র রচনা শুরু।

১৯১৭ — মহাভারত অবলম্বনে ছটি ভিত্তিচিত্র করেন নিবেদিতার উপরোধে জগদীশচন্দ্রের জন্য। নানা স্থানে ভ্রমণ। কোণারক তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে। গীতবিতানের জন্য ছটি সচিত্রকরণ করেন।

এই সালে আঁকা তাঁর ধোয়া পদ্ধতির ছবি 'বৃষ্টিধোয়া কোণারক' ৬০"×২৬"। 'কনের সাজসজ্জা'। 'কৃষ্ণার্জুন'। 'চৈতন্যের জন্ম'। 'তাঁতী'। গীতবিতানের জন্য সচিত্রকরণ — "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার", "আমি হেথায় যদি শুধু গাহিতে তোমার গান", "আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার"।

১৯১৮-২০ "বিচিত্রা" বন্ধ হবার পর নন্দলাল ওরিয়েন্টাল সোসাইটির শিল্পশিক্ষকের চাকরি নেন দু শ' টাকা বেতনে। ইংরাজি 'গীতাঞ্জলি' এবং 'ফ্রুট গ্যাদারিং' বইয়ের জন্য সচিত্রকরণ করেন নন্দলাল।

১৯১৮-তে ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন : — 'অরণ্যে পথহারা' ১৮"×৮"। 'জাল' ৫১/২"×৭"। 'আশ্রম'। 'রাখাল ছেলের দল'। 'শরৎ'। 'নটী'। 'অসি আর বাঁশী'। 'স্নান শেষে'। 'বাউলের গান' ৮১/২"×৫১/২"। 'পৃথিবী'। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তিচিত্র — মহাভারতের ছটি দৃশ্য। অজন্তার অনুকরণে কয়েকটি ছবি। কাঠের পাটায় এগ টেম্পেরা — 'শারদশ্রী'। অস্বচ্ছ জলরঙে — রবীন্দ্র কাব্য অবলম্বনে 'ঝরিছে জগতে ঝর্ণাধারা'। পাথরছাপ ছাপাই ছবি — 'সাঁওতালী নাচ' ১৭"×১১"। রেখাচিত্র — 'হরিণ', 'হাতী', 'ঘোড়া' — প্রত্যেকটির মাপ ২৪"×২০"।

১৯১৯-এ ধোয়া পদ্ধতির ছবি — 'সাঁওতাল মেয়ে' ৫১"×২৬১/২"। 'হাট থেকে ফেরা'। 'ঘাসফুল'। 'সাহায্যকারী'। 'আলপনা' ২৭"×১৬"। "দিনের শেষে'। 'খেলার সময়'। 'গ্রামের মেয়ে'। 'তাঁর একমাত্র সঙ্গী'। 'সুদামা এবং কৃষ্ণ'। 'উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁক'। 'গৃহ' ৫১/২"×৩·৬"। 'শর্বরীর শৈশব'। 'যৌবন'। মতান্তরে এই সালে ইংরাজি গীতাঞ্জলি এবং ফ্রুট গ্যাথারিং-এর জন্য বারোটি সচিত্রকরণ করেন নন্দলাল। আমার মনে হয় ছবি আঁকা হয় ১৯১৮-তে। কেননা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯।

১৯২০-তে ওরিয়েন্টাল সোসাইটির চাকরি ছেড়ে নন্দলাল শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগদান করেন। এই সালে করা "ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী" ছবিটি কেনেন ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব নরমান ব্লান্ট। গান্ধারী তাঁর বিনিদ্র রজনীর জন্য দায়ী — একথা বলে ব্লান্ট নন্দলালকে ছবিটি ফেরৎ দেন।

এই সালেই ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'আমার গুরু', 'মৃগ', 'দুপুরের কাজ,' 'গজ-উদ্ধার'।

১৯২১-এ সুরেন কর এবং অসিত হালদার সমভিব্যাহারে বাঘের গুহাচিত্র নকল করতে মধ্যপ্রদেশে যান। নালন্দা, রাজগীর, পাটনা, গয়া পরিক্রমা।

এই সালে ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'কালীর নৃত্য' ১৩১/২"×৯১/২"। 'বসন্তের আগমন'। 'উমার তপস্যা'। 'নৈশ যাত্রা'। টেম্পোরায় আঁকেন — 'উমার দুঃখ' ৫৩"×২১"। 'বাদলধারা' ৮"×১১"। 'খেটে খাওয়া মানুষ' ৪৬"×১৪"।

১৯২২ — নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ। স্টেলা ক্রেমরিশ কলাভবনে আধুনিক শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

নন্দলাল ধোয়া রঙে আঁকেন — 'শিবিরের ভেতর কৃষ্ণ ও অর্জুন' ৭·২"×৪·২"। টেম্পেরায় — 'বীণাবাদিনী' ১৭১/২"×৯১/২"। 'প্রত্যাশা' ১৮"×৮"। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাজসজ্জা ১০১/২"×৭"। 'পেঁচা' ৭১/২"×৬"। 'রাজগীরে'। 'বিশ্রাম গৃহ'। ফিকে লাল রঙের রেখাচিত্র — 'ছাত্রদের স্নান' ২৬"×১৬"।

১৯২৩ — আন্দ্রে কার্পালের কলাভবনে যোগদান। বক্রেশ্বর, কাথিওয়াড় ইত্যাদি নানা স্থানে ভ্রমণ।

এ বছর ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'ঝড়ের রাতে' ১৩১/২"×৯১/২"। টেম্পোরায় — 'জবা ফুল' ৭১/২"×৫১/২"। কালিকলমে — 'কাথিওয়াড়ের মন্দিরা নৃত্য' ১০১/৪"×৬"।

১৯২৪ — রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন ও জাপান ভ্রমণ। বছরের শেষে এবং ১৯২৫-এ নন্দলালের গৌড়, পাণ্ডুয়া, মালদা ভ্রমণ। সুরেন করের সহায়তায় গৌড়ের ইসলামী স্থাপত্যের ধরনে শান্তিনিকেতনের কয়েকটি বাড়ির নতুন রূপ দেন।

১৯২৪ ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'জলসত্র', 'পসারিণী', 'আলোর সমুদ্র'। টেম্পেরায় — 'পোয়ে নাচ' ৪২"×২৭"। 'কৃষ্ণচূড়া ফুল'। রেখাচিত্র — 'অসুস্থ শ্রমণ : বুদ্ধের সেবা' ১২"×৪১/২"। 'বুদ্ধ ও মেষশাবক' (প্রথম সংস্করণ)। কাগজ কেটে ছবি — বিসর্জনের জন্য দুটি সচিত্রকরণ. 'জনৈকা নারী' ৮১/২"×৬"। 'রঘুপতি'।

১৯২৫ — ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'শান্তিনিকেতনের দিগন্ত' ২৬১/২"×২·৮"। 'আশ্রমের মাঝখানে' ৬"×৩১/২"। 'আনমনা'। 'শিবপূজা'। 'নৈশপ্রহরা'। 'অর্জুনের তপস্যা'। 'পর্বতের চূড়া'। 'হরিণের পাল'। টেম্পেরায় করেন — 'কুরুক্ষেত্র' ২৯১/২৭১/২"। 'বীণাবাদিনী' ১৭"×৯"। 'পুরোনো বাড়ি' ৬·৮"×৪·৮"। "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য" (গীতাঞ্জলি) ১৪"×৯"। "এ মোর প্রার্থনা" ১৩·৮"×৯"। রেখাচিত্র — 'দুর্গা' ৩·৮"×২·৮"। বুদ্ধ ও মেষশাবক (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

বিশ্বভারতী গড়ে তোলার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করেন যাঁরা নন্দলাল তাঁদের মধ্যে শুধু অন্যতমই নন, তিনি প্রধান সহায়ক। কলাভবনে চারু এবং কারুকলার কেন্দ্র গড়ে তোলার সময়, শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও সমাজ উন্নয়নে, উৎসব অলংকরণে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভিত্তিচিত্র আঁকেন ছাত্রদের সঙ্গে। গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হন। ওঁর জন্য নন্দলাল সন্ত তুকারামের প্রতিকৃতি আঁকেন : এই বছরে শিল্পীর কন্যা "নটীর পূজা"-য় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন।

১৯২৬-এ ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'উত্তরা'। 'স্বপ্নের বাউল'। 'সাঁওতাল মায়ের সন্তানকে তেল মাখানোর দৃশ্য'। টেম্পেরায় — 'গুরু অবনীন্দ্রনাথ' ১২"×৭৩/৪"। 'কুণাল ও কাঞ্চনমালা'। 'মোরগ' (সেগুন কাঠে) ১৭১/২"×৯১/২"। 'সপ্ত মাতা' (সেগুন কাঠে)। রেখাচিত্র — 'যমুনা গঙ্গা', 'সঙ্ঘমিত্র' (রেশমে), 'চৈতন্যের পুথিরচনা' ৩৩"×২১"। পেনসিলে আঁকা—'কুণাল এবং কাঞ্চনমালা'। 'কেন্দুলির মেলা'।

১৯২৭—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলাল বালি যবদ্বীপ ভ্রমণে যান। বাটিক করা শিখে ফেরেন। বছরের শেষে পাহাড়পুর এবং রাজশাহী ভ্রমণ। এই বছরে তাঁর কাজের তালিকা : মিশ্র মাধ্যমে 'নটীর পূজা' ৬৩"×৩৪"। (কন্যা গৌরী দেবীর বিবাহের ঘটনা এবং নটীর ভূমিকায় অভিনয় এই কাজের প্রেরণা)। টেম্পেরা — 'সবুজ তারা'। স্পর্শন পদ্ধতিতে — 'পাইন গাছ', 'শাল গাছের পেছনে বুদ্ধ' (রূপোলী কাগজের ওপর সামান্য রঙে)। রেখাচিত্র — 'শ্রীচৈতন্য'। পেনসিলে — 'ঘরে ফেরা' ৮১"×৪৭১/২"।

১৯২৮ — ধোয়া পদ্ধতিতে করেন — 'প্রতিমার নেপালী কারিগর'। 'ঝড়' ২৪১/২"×১৩"। 'বৃহন্নলা'। 'দীনবন্ধু অ্যানড্রুজের প্রতিকৃতি' ২০১/২"×১৪৩/৪"। 'হলকর্ষণ' ইতালীয় পদ্ধতিতে করা ভিত্তিচিত্র। টেম্পেরায় — 'বরের যাত্রা' ৬১/২"×৪১/২"। স্পর্শন পদ্ধতিতে — 'কৃষ্ণচূড়া ফুল' ২৪১/২"×১৩১/২"। রেখাচিত্র — 'বুদ্ধ ও মেষশাবক' (তৃতীয় সংস্করণ), 'হলকর্ষণের পরিকল্পনা'। কাঠখোদাই — 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' (মিছিল) ১২"×৪১/৪"।

১৯২৯ — নন্দলাল কার্সিয়াং বেড়াতে যান। "তপতীর" অভিনেতা অভিনেত্রীর সাজ এবং মঞ্চসজ্জা তাঁকে ভাবায়। শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রে তিনি শিল্পশিক্ষা পরিচালনা করেন পিয়ারসনের অনুরোধে। কলাভবনের যাদুঘর 'নন্দন' উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ।

এই বছরে তাঁর ছবির তালিকা — ধোয়া পদ্ধতিতে — 'কাঞ্চনজঙ্ঘার যোগমূর্তি'। 'গুরুপত্নী'। টেম্পেরায় — 'শাল এবং বনপুলক গাছ'। এগ টেম্পেরায় কাঠের পাটায় 'নয়নতারা ফুল'। 'জানালা'। কালিতে স্পর্শন পদ্ধতির কাজ — 'কার্সিয়াংয়ের বারোটি নিসর্গদৃশ্য'। রেখাচিত্র — 'নটীর পূজা'। 'টোলে শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপনা' ৮"×৫১/২"। কাঠখোদাই — 'গাছের গুঁড়ির আড়ালে নারী'।

১৯৩০ — কারুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা। লবণ আন্দোলন এবং গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও দর্শন নিয়ে ভাবিত নন্দলাল। পুত্র বিশ্বরূপ এবং ছাত্র হরিহরণকে শিল্প শিক্ষার জন্য জাপানে প্রেরণ। 'সহজপাঠের' ১ম ও ২য় ভাগের কাজ। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের জন্য ৫৩টা বাটিক করেন।

এই বছরে তাঁর কাজের তালিকা — 'ডাণ্ডি যাত্রা' ১৫১/২"×৯৩/৪"। 'কুরু পাণ্ডবের পাশা খেলা'। লিনো কাটা — 'ডাণ্ডি যাত্রা'।

১৯৩১ — নন্দলালের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কবির আশীর্বাদ। নন্দলালের সাঁচী ভ্রমণ।

এই বছরে তাঁর ছবির তালিকা — টেম্পেরায় 'কালী'। 'শঙ্খ পদ্ম' (মোজায়িকের নকশা)। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ — 'গ্রীষ্ম', 'সন্ধ্যা', 'বসন্ত', 'রাত্রি' — সবগুলি ১৩"×২৬"। 'বারান্দাতে নারী'। লিনো কাটা — 'পাখি ধরা'।

১৯৩২-এ তাঁর কাজের তালিকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জয়পুরী পদ্ধতিতে তিনি 'চৈতন্যের জন্ম' রূপায়িত করেন — ৫৭"×৪২"। 'আদিকুটির' ১০২"×৩৩", 'শাপমোচন' ১০১"×৩৩"। 'সাঁওতাল মেয়ে' ৬৩"×২৯"। 'রাখাল এবং ষাঁড়ের লড়াই' ৭২"×১৫"। 'গরু চরানো' ৭৮"×১৭"। 'খোয়াই এবং নদী' ১৫৭"×২৯"। 'দীপ জ্বালানো' ৬৩"×২৯"। ধোয়া পদ্ধতিতে — 'চৈতন্যের জন্ম'। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ — 'বনশ্রী'। রেখাচিত্র — 'মহিষাসুরমর্দিনী' ৩১"×২৬"। 'দুর্গা' ৩০১/২"×১৯"। 'শিশু ভোলানাথ' ৪১/২"×৭৩/৪"। 'কালী' (১ম সংস্করণ) ২৮"×১৮"। 'কালী' (২য় সংস্করণ)

৩৬″×২০″।

১৯৩৩ — অধ্যাত্ম সংকট। নন্দলালের মনে হয় তিনি অশরীরী হয়ে যাচ্ছেন। পাগল হয়ে যাবেন। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে খবর পাঠান। তাঁর দ্বারা নন্দলাল মানসিক ভারসাম্য পুনরায় অর্জন করেন। নন্দলালের ওপর রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লেখেন। "বিচিত্রা-র" সচিত্রকরণ করেন নন্দলাল। এই গ্রন্থ কবিগুরু শিল্পাচার্যকে উৎসর্গ করেন। বিক্রমশালী পরিক্রমা করতে গিয়ে বৌদ্ধ আমলের কাজ দেখেন।

এই বছরে ধোয়া পদ্ধতিতে নন্দলাল করেন — 'শিবের বিষপান' (মানসিক সংকটের জন্য ৫ম সংস্করণ হলেও যন্ত্রণা ও স্থৈর্যের সমাহারে অনবদ্য কাজ)। 'জন্মাষ্টমী', 'আরাধনা'। টেম্পেরায় — 'প্রাসাদের বারান্দায় রমণী'। রেখাচিত্র — 'নবান্ন'। 'কালী' ৩৬″×২১″। কালিতে স্পর্শন পদ্ধতি — 'গঙ্গা' ১০১/২″×৮″। 'শখবিগলিঘাট' ১০১/২×৫″। 'গঙ্গাবক্ষে নৌকা' ১০১/২″×৫″। 'কাহালগাঁর গঙ্গাবক্ষে বজরা' ৩৩″×১২″।

১৯৩৪ — কবিগুরুর সঙ্গে সিংহল ভ্রমণ। সিংহলের বৌদ্ধরা ওঁকে সংবর্ধনা দেন। শ্রীগিরির ভিত্তিচিত্র দেখেন। ফেরার পথে মহাবলীপুরমের রেখাচিত্র আঁকেন।

এই বছরে আঁকেন ধোয়া পদ্ধতিতে 'যাত্রী' ১২″×৫১/২″। 'চৈতন্যের গৃহত্যাগ'। টেম্পেরায় — 'ওড়িশার মন্দিরের নৃত্যশিল্পী'। 'চৈতা'। রঙীন স্পর্শন পদ্ধতি — 'আশ্রমের ইস্টেশন' ১৩১/২×২১১/২″। 'বোলপুরের পথ' ১৩১/২″×২১″। 'নীচু বাঙ্গলা'। 'যাত্রী' ২১″×১১৬″ এবং 'তারকাখচিত রাত্রি' ২৭″×১৬″। রেখাচিত্র — 'চীনা খেলনা প্রস্তুতকারক' ১০″×৮″। 'কাথিওয়াড়ী মন্দিরা বাজিয়ে' ১০১/২″×৬১/২″। 'কান্দান নাচ' ১২″×৮″। 'বীণাবাদিনী' (রেশম)। 'সরস্বতী'। পাথর খোদাই কালো ছাপাই ছবি — 'শিব এবং উমার মুখমণ্ডল'। 'উমার তপস্যা'।

১৯৩৫ — কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাটয়ো, বংশবাটী, ত্রিবেণী ভ্রমণ। এঁদের মধ্যে কিশোরী ইন্দিরা গান্ধী একজন। শ্রীমতী গান্ধী না থাকলে নন্দলাল রেলে কাটা পড়তেন।

ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'নীলাচলে কীর্তন'। রেখাচিত্র — 'শ্রীকৃষ্ণ' ১০১/২″×৯১/২″। 'পার্বতী ও গণেশ' ৭″×৬″। 'শ্রীহর্ষ'। 'দুর্গা'। ধাতুরপাত ছাপাই ছবি — 'নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ'।

১৯৩৬ — পুত্র বিশ্বরূপের সঙ্গে নিবেদিতা ঘোষের বিবাহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষায় শিল্পকলার স্থান' বক্তৃতা। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের রেখাচিত্র দেখে "মহুয়া", "পরিশেষ" এবং "বীথিকা" লেখায় অনুপ্রাণিত হন। গান্ধীজীর আহ্বানে ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপসজ্জা।

এই বছরে টেম্পেরায় আঁকেন—'রাধার বিরহ'। 'সবুজ ঢেউ' (মণ্ডনধর্মী)। 'ত্রিলোকেশ্বর' ৪৭″×৫৬″। 'প্রতীক্ষা', 'স্বর্ণকুম্ভ' (কাঠের পাটায়)। কালিতে স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'কৃষ্ণরাও পোয়ার'। রেখাচিত্র—'দুর্গা'। 'মহিষাসুর মর্দিনী' (সাদা কালো)। শুখা-ডগা (ড্রাই পয়েন্ট) ছাপাই ছবি—'আম্রকুঞ্জ'। 'অর্জুন'। 'বাউল'। 'সাঁওতাল পরিবার'। ধাতুরপাত ছাপাই ছবি—'শিমূল গাছ' এবং 'নিসর্গ'। লিনো কাটা—'সাঁওতালের ঘরে ফেরা'। 'আব্দুল গাফফার খাঁ'।

১৯৩৮—হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য গান্ধীজীর নির্বন্ধে মণ্ডপসজ্জা।

বরোদার কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র শুরু। পুরী, কালিংপং এবং দার্জিলিং ভ্রমণ। নন্দলালের উৎসাহে কলাভবনে জাপানী চা-অনুষ্ঠান হয়।

এই বছরটি শিল্পকলা বিচারে নন্দলালের জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল বছর। টেম্পেরায় করেন—'ভারতীয় জীবনের দৃশ্য' ২৫১/২″×২৩১/২″। 'ভারতীয় বাজিকর' ২৫১/২″×২৩১/২″। স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'কঙ্কালীতলা' ১০১/২″×৯১/২″। 'নতুন মেঘ' ১৬″×২৭″। 'চৈতন্যের তীর্থযাত্রা'। 'দোলনচাঁপা ফুল' (রেশমে)। 'খোয়াই' (রঙীন রেখাচিত্র) ১৬″×১০″। রেখাচিত্র—'শরৎ' (শালুকফুল হাতে মেয়ে) ১৬″×১০১/২″। 'ঘিওয়ালা' ১০১/২″×৯১/২″। শুখা-ডগা ছাপাই ছবি—'ছাগল'। 'গোয়ালপাড়া'। 'গোয়ালপাড়ার পথে'। ধাতুরপাত ছাপাই ছবি—'তেঁতুল গাছ'।

হরিপুরার মণ্ডপসজ্জার ছবি—সবশুদ্ধ ৮৩টা আঁকেন। প্রত্যেকটির আকার হল ২৪″×২৪″। ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী—বীণাবাদক। গায়ক। রুদ্রবীণা। বংশীবাদক। ঢুলি। মন্দিরা বাজিয়ে। খঞ্জনি বাজিয়ে। শ্রীখোল বাজিয়ে। সারেঙ্গীবাদক। ঢাকী। শিঙা বাজিয়ে। সানাইবাদক। ডুগডুগি বাজিয়ে। গ্রাম্য সারেঙ্গী। ঘট বাজানো। বাউল। মোট ষোলটি। ভারতীয় খেলোয়াড়—কুস্তিগীর। অসিচালক। শিকারী। ঘোড়সওয়ারনী। ষাঁড় লড়িয়ে। খড়্গ খেলোয়াড়। ডোম যোদ্ধা। মোগল সৈনিক। মোট আটটি। ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবন—সাজসজ্জা। লেখক। কান পরিষ্কারের দৃশ্য। মহিলা শিল্পী। চামরধারিণী। মায়ের ছেলেকে খাওয়ানো। স্নানশেষে। প্রণাম। গৃহবধূ। রাখাল। পণ্ডিত। ঝি। প্রতীক্ষা। শিশুসহ শায়িতা মা। মঙ্গলশ্রী। মোট ষোলটি কাজ। ভারতীয় গ্রাম্য কারিগর—ছুতোর। দর্জি। ধুনুরি। কামার। ধোপা। শোলার কারিগর। কাগজ' তৈরী। কুমোর। মুচি। মালি। বাঁশের কারিগর। চাষী। কুলো ঝাড়া। যাঁতা পেষাই। কুটনো কোটা। ঢেঁকি ছাঁটা। দুধ দোয়া। ঘোল বানানো। রান্নাবান্না। পশম কাটা। সুতো কাটা। চাল কোটা। মোট বাইশটি। অলৌকিক মূর্তি (পরী/দেবদূত)—কদম গাছের নীচে। উড়ন্ত মূর্তি। চর্মকারের পাশে দাঁড়ানো পরী। ধনুক হাতে রতি। পদ্মহাতে উপবিষ্ট মূর্তি। ডানা মাথায় গুটিয়ে রেখে যুগলমূর্তি। মোট ছটি। জন্তুজানোয়ার এবং অন্যান্য মণ্ডনধর্মী নকশা— বসা সিংহ। দাঁড়ানো সিংহ। জাতীয় পতাকাবাহী রথ। ছাগল। ষাঁড়। উট। শেয়াল। মরাল। ময়ূর। চন্দ্রমল্লিকা এবং সবুজ পাখি। ভৃঙ্গার। মঙ্গলঘট। পূজার আসন। মোট পনেরোটি কাজ।

১৯৩৮-এর গোড়ায় দার্জিলিং-এ ছিলেন। সেখানে প্রবুদ্ধানন্দ মহারাজের সঙ্গে আলোচনার পর শিল্পশাস্ত্রের ওপর ছোট বই লেখেন। কলাভবনে হ্যাভেল হল প্রতিষ্ঠা। সেখানে শ্রীমতী হ্যাভেল তাঁর স্বামীর চিঠিপত্র, খবরের কাগজের কাটিং, চিত্রাদি এবং অন্যান্য টুকিটাকি সামগ্রি দান করেন।

এই বছরটিও নন্দলাল প্রচুর কাজ করেন। টেম্পেরায় করেন বুদ্ধ চিত্রমালা—বুদ্ধের জন্ম। গৃহত্যাগ। বুদ্ধ ও সুজাতা। বুদ্ধ ও আম্রপালি। স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন। মহাপরিনির্বাণ। স্পর্শন পদ্ধতির রঙীন কাজ—'বাঁদরওয়ালা' ১২১/২″×৯১/২″। 'তাগাদার বাড়ি' ১০১/২″×৯১/২″। 'দার্জিলিং-এর নিকুঞ্জ' ১০১/২″×৯১/২″। 'ভুটিয়া' ১০১/২″×৯১/২″। 'স্নানান্তে' ১৪″×৯″। 'দার্জিলিং-এর কুয়াশা' ২৪″×১৪″। 'পাইন বন' ১৬″×২৭″। 'কর্ণকুন্তী' ৭″×৫″। 'কৃষ্ণ এবং অর্জুন' ৭″×৫″। স্পর্শন পদ্ধতিতে কালির কাজ—'তাগাদা থেকে কালিংপং' ১০″×৮″। 'তাগাদা উপত্যকা' ১০″×৭১/২″। 'পাহাড়ী ঝরনা' ১০″×৮″। 'পাইন বনপথ' ১০″×৭১/২″। 'বনের হরিণ' ১৮″×১২″। 'গাছের তলায় গাধা' ১০১/২″×৯১/২″। রেখাচিত্র—'গণেশ জননী'। 'শায়িত অর্জুন' (সিল্ক) ৩০″×৬৪″। 'কৃষকের কুটির'। 'খেলা'। 'দুর্গা' (রুপালি পটে)। 'ঢুলি'। শুখা-ডগা ছাপাই ছবি—'গ্রামের এককোণ'। 'কৃষকের কুটির'। 'চিত্রাঙ্গদা'। 'পাইন বন' ৭১/২″×৪১/২″। 'অজয় নদীর ধারে বনভোজন'। 'তালতোড়ের পথ'।

১৯৩৯-৪৬ পর্বে বরোদার কীর্তিমন্দিরে বারবার গিয়ে তিনি ভিত্তিচিত্রগুলি শেষ করেন। ১৯৩৯-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রদর্শনী হয়।

কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র 'গঙ্গাবতরণ' ১৯৩৯ সালে করেন। শুখা-ডগা ছাপাই ছবি—'বাউল'। 'ভীমবাঁধ বন'। রেখাচিত্র 'গণেশ', 'লক্ষ্মী'। 'সরস্বতীসহ দুর্গা'।

১৯৪০ —শান্তিনিকেতনে আসেন গান্ধীজী। বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ এবং আগামী দিনের কলাভবন সম্বন্ধে নন্দলালের সঙ্গে আলোচনা করেন। গান্ধীজী ওঁর শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ আবার নন্দলালের ভূয়সী সাধুবাদ দেন। জু পেয় চীন থেকে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে কলাভবনে আসেন।

এই বছরের কাজ—কীর্তিমন্দিরে মীরাবাঈয়ের জীবনাবলম্বনে ভিত্তিচিত্র ২৬৪″×৪৮″। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ—'পদ্মাবতী'। রেখা এবং সমতল রঙ—'গৌরাঙ্গ ও হরিদাস'। টেম্পেরা—'মীরাবাঈয়ের জীবনী' (কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্রের খসড়া) ২৬৪″×৪৮″।

১৯৪১—রাজগীর, পুরী, ওয়ালটেয়ার পরিক্রমা। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে মুহ্যমান নন্দলাল। এসময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশ্রামের জন্য কাশীবাস। ফিরে এসে ওঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার ব্যবস্থা। সহজপাঠের তৃতীয় ভাগের সচিত্রকরণ।

এই বছরে ধোয়া পদ্ধতিতে করেন—'আগমনী'। 'বীণাবাদিনী' ৩৪১/২″×১৬১/২″। 'দরজা খোলা'। টেম্পেরায়—'বুদ্ধদেব'। 'সরস্বতী' ১৪১/২×৬১/২″ (ফুলসক্যাপে)। মেসোনাইটে স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'শবরীর যৌবন'। 'শবরীর মধ্যবয়স'। 'শবরীর জরা'। রেখাচিত্র—'বীণাবাদিনী' ১৬″×১১১/২″।

১৯৪২—মায়াবতীর অদ্বৈতাশ্রমে যান। "শিল্পসাধনা" রচনা। স্বামী পবিত্রানন্দজীর সঙ্গে গভীর আলোচনা করেন।

এই বছরে তাঁর কাজ—ধোয়া পদ্ধতিতে 'সুজাতা' (দ্বিতীয় সংস্করণ)। টেম্পেরায় —'দুর্গা'। 'অর্ধনারীশ্বর' ১২″×৮″। চীনাভবনে স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন ভিত্তিচিত্র—'নটীর পূজা' ২৮১/২″×৪৮″। স্পর্শন পদ্ধতি রঙীন কাজ—'ডগিলা গিরিপথ থেকে মায়াবতী' ১৬″×২৭″। 'জ্বলন্ত পাইন' ৩৩১/২″×২০১/২″। 'মোরগ মুরগী'। রেখাচিত্র—'মায়াবতী আশ্রম'। 'মায়াবতীর পথে'। 'প্রসাধন' ২৩″×১৩″। 'মা' ৭″×৪১/২″।

১৯৪৩ ছাত্রছাত্রী সমভিব্যাহারে পরেশনাথ ও হাজারিবাগ ভ্রমণ। এককভাবে ছোটনাগপুর পরিক্রমা। কলাভবনে অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন।

ধোয়া পদ্ধতিতে—'অন্নপূর্ণা এবং রুদ্র'। কীর্তিমন্দিরে ভিত্তিচিত্র—'নটীর পূজা' ২২″×৪৮″। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ—'গাই বাছুর' ৭১/২×৬১/২″। 'বাগাদার পথ'

(হাজারিবাগ) ১৬"×২৭"। 'পরেশনাথ পাহাড়' ২৭"×১৬"। 'মহুয়া বন' ২৭ ১/২"×১৭"। 'রাধা' ১৬"×২৭"। স্পর্শন পদ্ধতিতে কালির কাজ—'হাজারীবাগ থেকে রাঁচী যাবার পথ'। 'বরাকর নদী' ২৭"×১৬"। 'রাস্তার ধারে অশথ গাছ' ১২"×৮" 'গুরুদেব'। টেম্পেরায়—কীর্তিমন্দিরের নটীর পূজার খসড়া ২৬৪"×৪৮"।

১৯৪৪—কলাভবনে তাঁর সংগ্রহের ওষধীর প্রদর্শনী। "শিল্পকথা" বই হয়ে বেরোয়।

এই বছরে তাঁর কাজের তালিকা—কালি দিয়ে স্পর্শন পদ্ধতিতে—'রাজগৃহের পাহাড়ী কাঠুরে' ২০"×১৩"। 'মহিষের মাথা' ১৬"×১৩"। 'কাটুলিতে তীর্থযাত্রী' ১৭"×১৩"। 'গৃধ্রকূটের পথে' (রাজগেহ) ১৬ ১/২"×১৩"। 'জরাদেবী মন্দির' ১৬ ১/২"×১৩"। 'মহিষের পিঠে চেপে' ১৬ ১/২"×১৩"। 'গৃধ্রকূট' ৪১"×১২"। 'চখাচখি' ১৬"×১২"। 'কুন্দ' ১৬ ১/২"×১৩"। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ২০"×১৯"। 'দুমকার শাল গাছ' ৩৯"×১৩ ১/২"। রঙীন স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'চুল বাঁধা' ২৩ ১/২"×১৩ ১/২"।

১৯৪৫—গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে এলেন। নন্দলালের সঙ্গে বৈঠক।

এই বছরের গোড়ার কাজ—ধোয়া পদ্ধতিতে—'শিবের মুখমণ্ডল'। টেম্পেরা—'পার্বত্য কুহেলী' ৩৩ ১/২"×২০ ১/২"। 'প্রসাধন' ২৭"×১৬ ১/২"। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ—'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (দার্জিলিং থেকে) ১৫ ১/২"×২২"। 'উপত্যকায় পাইন বন' ১৪"×২২"। 'সকালের মেঘ' (দার্জিলিং) ১৪"×২৪"। 'ভুটিয়া জুয়াড়ি' ১৫ ১/২"×১০ ১/২"। 'কুয়াশায় দার্জিলিং' ২৪"×১৩"। 'শ্রমণকুমার'। 'মহিলা কাঠখোদাই করছেন'। কালিতে স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'বনের মৃগ' ১৮"×১২"। 'মেয়েরা করে খেলা' ১৩"×১৮"। 'কালো মেঘ'। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ২৪"×১৩"। রেখাচিত্র করেন—'মুরগী এবং ছা' (দার্জিলিং-এ)। বছরের শেষে গান্ধীজীর সংস্পর্শে কিছু রেখাচিত্র করেন—'ক্রুশ কাঁধে খ্রীষ্ট' ১০ ১/২"×৭ ১/২"। 'প্রার্থনারত গান্ধীজী' ২০ ১/২"×১৩"। 'দুর্গা'।

১৯৪৬—খড়্গপুর, কাশী, সারনাথ এবং বরোদা ভ্রমণ। কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র শেষ কাজ করেন।

এই বছরে তাঁর কাজ টেম্পেরায়—'প্রতীক্ষা'। 'বসন্ত'। (ঋতুসংহার অবলম্বনে)। 'মহাভারত' (কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্রের খসড়া) ২৭৭"×৫১"। রঙীন ভিত্তিচিত্রের—'অভিমন্যু বধ' (মহাভারত)। কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র ২৭৭"×৬১"। স্পর্শন পদ্ধতির রঙিন কাজ—'শকুন্তলা'। 'নারকেল গাছ লাগানো' ১৩"×১২"। রেখাচিত্র—'প্রেমিকের পদতলে ফোটা কাঁটা' ১১"×৮ ১/২"। 'চুলবাঁধা'।

১৯৪৭—রাজগির, গোপালপুর, মাদ্রাজ এবং ওয়ালটেয়ার পরিক্রমা করেন। আনন্দ কুমারস্বামীর মৃত্যু। নন্দলাল একটা রেখাচিত্র আঁকেন ছবির বিষয়বস্তু—ঘরোয়া পরিবেশে কুমারস্বামী সহ গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্রনাথ এবং শিল্পী নিজে।

এই বছরে তাঁর কাজ—'ঋতুসংহার' ১৪"×৯"। টেম্পেরায় 'কৃষ্ণ এবং সুবলের সঙ্গে রাধার প্রথম দেখা' ২৪"×১২"। 'দুর্গা' ১৬ ১/২"×১০ ১/২"। স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'গোপালপুরের সমুদ্র'। 'গোপালপুরের কাঁকড়া' ১১"×৯"। 'শালতি ভাসানো' ১১"×৯"। 'গোপালপুরের নির্জন উপকূল' ১৭ ১/২"×১১ ১/২"। 'গোপালপুরের আলপনা' ১১"×৯"। 'ঢেউ' ১৬ ১/২"×১৩"। 'তিনটে ঘোড়া' ১৪"×৯"। 'কৃষ্ণ ও কালী' ১৭ ১/২"×১২"। 'ঢেউ ও নৌকা' ৩৪ ১/২"×১০"। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ—'ওড়িশার কন্যা' ১৩"×১১ ১/২"। 'দিন গুজরান' ১৬"×২৭"। 'সন্ধ্যা'। 'লোকগায়ক'। 'মেলার পর' ১৪"×৯"। রেখাচিত্র—'ধীবরদের মাঝখানে খ্রীষ্ট' ১৭ ১/২"×১২"।

১৯৪৮ কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দিরের নকশা ও পরিকল্পনা রচনা। জহওরলালের অনুরোধে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণের জন্য পদ্মের বিভিন্ন আকার নিয়ে মানপত্রের নকশা ও সচিত্রকরণ করেন। অশথ পাতার মতো করে ভারতরত্নের নকশা করেন।

এই বছরে তাঁর কাজের তালিকা—ধোয়া পদ্ধতিতে 'চৈতন্য ও হরিদাস' ১০"×৭"। 'পূজারিনী' ১১ ১/২"×৭ ১/২"। টেম্পেরা—'রামায়ণী চিত্রমালা'—প্রত্যেকটি ২৬"×১০ ১/২"। 'রাম ও কৌশল্যা'। 'রামসীতা ও লক্ষ্মণ'। 'রাম ও অহল্যা'। 'রামের বিবাহ'। 'দুর্গা' (রূপালী কাগজের ওপর) ১৫ ১/২"×৯ ১/২"। রঙীন স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'নদী থেকে দুই বন' ১৪"×১০"। 'কলসী নিয়ে গ্রাম্যবালা' ৮"×১২"। 'দুপুরের সমুদ্র' ১৫ ১/২"×৯"। 'নুলিয়া মেয়ে জল নিয়ে'। 'ফোয়ড়' ১৪"×১২"। 'বসন্তোৎসব'। কালিতে স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'মেছুনী' ১০"×৭"। 'কোপাই নদী'। 'শান্তিনিকেতনের ঢিবি' ১২ ১/২"×১৬ ১/২"। 'নৌকার মিস্ত্রী—গোপালপুর' ১৩"×৯ ১/২"। 'ছুতোর মিস্ত্রী—গোপালপুর' ১৩"×৯ ১/২"। 'সমুদ্রবক্ষ—গোপালপুর'। 'বাড়ির পথে' ১৩"×৯"। 'আশ্রমের ভেতর দিয়ে' ১৩"×৮ ১/২"। 'শান্তিনিকেতন—আম্রকুঞ্জ' ১৩ ১/২"×১০"। 'বটগাছ—শান্তিনিকেতন' ১৩ ১/২"×১০"। 'ঝড়'। 'কাঠুরে' (রাজগেহ) ৩২ ১/২"×১৪"। 'জেলেদের সমুদ্রকে নমস্কার' ৩২"×১৩"। 'উত্তরদিক থেকে শান্তিনিকেতন' ৩৭"×১৪"। 'শাল গাছের নীচে গুরুদেব' ৩৭"×১৪"। 'দ্বিখণ্ডিত পূর্ণিমাতে সমুদ্রপাড়ে চৈতন্য' ১২"×২০" (প্রত্যেকটি খণ্ড)। 'জেলেরা চৈতন্যকে বাঁচায়' ১২"×২০"। 'সমুদ্রপাড়ে চৈতন্য' (দুভাগে) ১২"×২০" (প্রত্যেকটি)। 'চৈতন্য পুরীর মন্দিরে কীর্তন গান' (দুভাগে) ১২"×২০" (প্রত্যেকটি)। 'পুরীর মন্দিরে চৈতন্যের কীর্তন গান' (দুভাগে) ১২"×২০" (প্রত্যেকটি)। 'রাত্রে লাল বাঁধ' ২০"×১২"। 'সমুদ্র' (তিন ভাগে) ৭৮"×৯ ১/২"। (এই ভাগ বা খণ্ড জুড়ে টাঙালে একটি ছবি হয়)। রেখাচিত্র—'সাঁওতালী বিয়ে' ১০ ১/২"×৮ ১/২"। 'বসন্ত উৎসব' ২০ ১/২"×১১ ১/২"।

১৯৪৯—বুধগয়া ভ্রমণ। কামারপুকুর মন্দির প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত ছিলেন। সরোজিনী নায়ডু ওঁর নিসর্গচিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই বছরের কাজ, ধোয়া পদ্ধতিতে—'খেলা' ১৪"×১০"। 'বৃষ্টি' ১৪"×১৬"। টেম্পেরায়—'দুর্গা—মাথায় অগ্নিবলয়' 'যশোদা গোপাল' প্রত্যেকটি ১২"×৯ ১/২"। 'গোপাল ও যশোদার মাখন খুঁটে তোলা' ১৬"×১১"। 'রাধা বাঁশী শিখছেন কৃষ্ণের কাছে' ১৫"×৯ ১/২"। 'বসন্তোৎসব' ২৭"×১৬ ১/২"। 'স্বপনচারিণী' ৬ ১/২"×৫"। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ 'বৃদ্ধা' ১৩"×৭"। 'বন্যা' ১১ ১/২"×৭ ১/২"। 'উমার তপস্যা'। 'বৃষ্টির দিনে মেয়ে' ১১"×৯"। 'রাত্রিতে একপাল গরু' ১০"×৬ ১/২"। 'আমলকী গাছের নতুন পাতা' ২৭ ১/২"×১৬"। 'সর্ষে ফুল' ১৭ ১/২"×২৯"। কালিতে স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'তিনটে ঘোড়া' ১৪"×৯"। 'ওড়িয়া মা ও ছেলে' ১২"×৯"। 'বৃষ্টিতে বাড়ি' ১৪"×৯ ১/২"। রেখাচিত্র—'কৃষ্ণ বলরাম এবং গরুর পাল' ১৬"×১১"। 'কনের প্রসাধন' ১৫ ১/৪"×৯ ১/৪"। 'গ্রামের ছুরি ধারওয়ালা' ১৬ ১/২"×১২"। 'শ্রীমতি কল্যাণসুন্দরের কেশ' ১৬"×১৪"। 'বসন্তে আনমনা' ২৪"×১৩"। 'শিল্পী মাথা বাঁচাও' ১৩"×১৯ ১/২"। 'বাঁশী বাজান রাধা'। শুখা-ভগা ছাপাই ছবি—'কোপাই নদী'।

১৯৫০—পুরী পরিক্রমা। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত করেন ডি· লিট উপাধি ভূষিত করে। ভারতীয় সংবিধানের পাণ্ডুলিপি সচিত্রকরণ করার অনুরোধ করেন রাষ্ট্রপতি।

এই বছরে তাঁর ছবি—রেখাচিত্র 'লোক নর্তক'। 'সাঁওতাল বিবাহ'।

১৯৫১—কলাভবন থেকে অবসরগ্রহণ। প্রোফেসর এমারিটাস হন বিশ্বভারতীর শিল্পকলার।

এই বছরে তাঁর ছবি—টেম্পেরায় 'দুর্গা'। 'তৃষ্ণায় মরুভূমিতে পড়ে যাওয়া একটা হরিণ' ৭"×৪ ১/৪"।

১৯৫২—বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন।

ছবি টেম্পেরায় 'ঢুলি' ১১"×৫"। 'পঞ্চবটী দক্ষিণেশ্বর' ১৪ ১/২"×৬"। রেখাচিত্র—'আনন্দ ও প্রকৃতি' (দুটি সংস্করণ) 'রাসলীলা' (দুটি সংস্করণ) ৬ ১/২"×১৫ ১/২"। স্পর্শন পদ্ধতির কাজ 'পদ্মফুল'।

১৯৫৩—দাদাভাই নৌরজি পুরস্কার। আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক অর্ঘ্য দান। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মবিভূষণ।

এই বছরে তাঁর কাজ 'বুদ্ধ কর্তৃক অসুস্থ শ্রমণের শুশ্রূষা' (২য় সংস্করণ) ৬ ১/২"×৯"। 'চীনা খেলনাওয়ালা' (২য় সংস্করণ) ৭ ১/২"×১০ ১/২"। স্পর্শন পদ্ধতির কাজ—'মরাল' ৭"×৫ ১/২"। 'বৃষ্টিতে মোরগ' ১৬ ১/২"×১২"।

১৯৫৪—১৯৬৬ পর্যন্ত তাঁর জীবন খুব ঘটনাবহুল নয়। ১৯৫৬-এ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ওঁকে সম্মানিত করেন। এই বছর ললিতকলা আকাদমি, নয়া দিল্লির ফেলো নির্বাচিত হন। "শিল্পচর্চা" প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি· লিট দেন। ১৯৫৮ আকাদমি অফ ফাইন আর্টস তাদের রৌপ্য জয়ন্তী পদক প্রদান করেন তাঁকে। ১৯৬৩তে রবীন্দ্রভারতী তাঁকে ডি· লিট· দেন। ১৯৬৪-তে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে রবীন্দ্র শতবর্ষ পদক প্রদান করেন।

১৯৫৪-তে তাঁর কাজ—'দুটি ঘোড়া'। 'পাঁচটি সাঁওতালের ঘরে ফেরা' ১৪"×৩৪"।

নন্দলাল চেনাশোনা সকলকে পোস্টকার্ডে রেখাচিত্র এঁকে পাঠাতেন। এগুলির সংখ্যা অসংখ্য। এছাড়া কাগজ কাটা এবং সাঁটা ছবি করেছেন প্রচুর। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত প্রত্যেকদিন একটি করে ছবি কালি বা রঙে আঁকতে আরম্ভ করেন। ১৯৬১ পর্যন্ত গোনা হয়েছিল, তাতে ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় ৮১০। এরপর তিনি ছবি এঁকেছেন। কিন্তু শরীর ক্রমে অসুস্থ হতে থাকে।

১৯৬৬ এপ্রিল ১৬, নন্দলালের জীবনাবসান।

সন্দীপ সরকার সংকলিত

এই লেখার তথ্যের জন্য নন্দলালের পৌ[illegible] শ্রীবিশ্বরূপ বসুর কাছে ঋণী। ১৯৭৬ [illegible] বিনোদন সংখ্যায় নন্দলালের ওপর প্রবন্ধে[illegible] তথ্য সংগ্রহ করতে যাই। সেইসময় [illegible] পঞ্চানন মণ্ডল নন্দলালের জীবনপঞ্জি[illegible] স্মৃতিলিপি দেন। এইসব নথিপত্র ছাড়া[illegible] ওয়ার্লড উইণ্ডো, এপ্রিল জুন ১৯৬১-এর চিত্র তালিকার সাহায্য গ্রহণ করেছি।